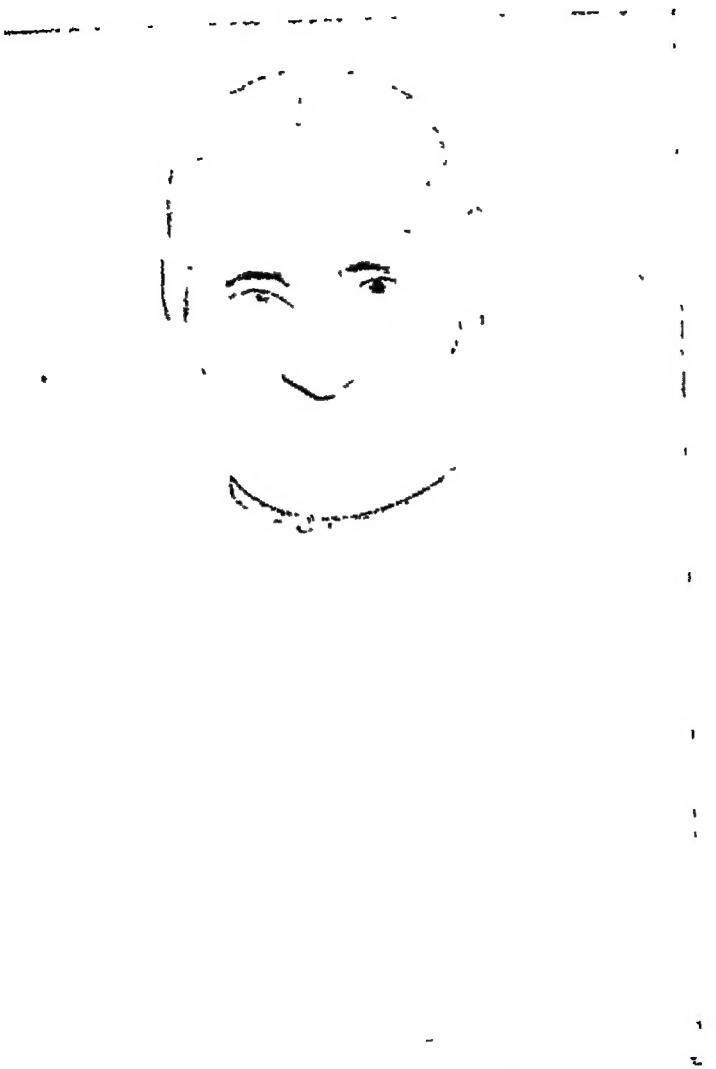

জ্ঞান তাপস যুবাচার্য মহাপ্রজ্ঞ

মূল পুস্তকের লেখক

মনের জয়ই জয়

তুলসী অধ্যাত্ম নীড়ম প্রকাশন

যুবাচার্য মহাপ্রজ্ঞ

মনের জয়ই জয়

মূল হিন্দি থেকে অনুবাদ : চম্পালাল অঞ্চালিয়া

প্রাপ্তিস্থান :

প্রভা প্রকাশন

৪ নবীন কুণ্ডু লেন, কলকাতা-৭০০০০৯

চম্পালাল অঞ্চালিয়া ॥ ২ রাজা উডমান্ট স্ট্রীট ॥ কলকাতা-৭০০০০১ ॥

এবং কলকাতার সমস্ত সম্ভ্রান্ত পুস্তকালয়ে

MANER JOY-YI JOI by Yuvacharya Mahaprajna
Translated in Bengali from Hindi original
by Champalal Anchalia

Price Rs 25 00 only

প্রথম প্রকাশ : সেপ্টেম্বর, ১৯৮৪

স্বর্গীয় জেঠমলজী অঞ্চালিয়ার পরিবারের সদস্যবৃন্দের
আর্থিক আনুকূল্যে এই সংস্করণ মুদ্রিত হয়েছে।

মূল্য : ২৫ টাকা

প্রচ্ছদ : চিত্ত দাস

তুলসী অধ্যাত্ম নীড়ম্, জৈন বিশ্ব ভারতী, লাডনু (রাজস্থান)-এর
পক্ষে শ্রীচম্পালাল অঞ্চালিয়া কর্তৃক প্রকাশিত এবং প্রিন্টিং অ্যাণ্ড
অ্যালায়েড সার্ভিস, ৮৬।৩৮ বি, রফি আহমেদ কিদোয়াই রোড,
কলকাতা-৭০০০১৩ থেকে বণেন গুপ্ত কর্তৃক মুদ্রিত।

উৎসর্গ

ধর্ম-দর্শনে যিনি ছিলেন সমধিক অনুপ্রাণিত
আমার সেই পরমারাধ্য প্রয়াত পিতৃদেবকে—
জগৎ এবং জীবন সম্বন্ধে যিনি
আমার প্রথম পথপ্রদর্শক।

ভূমিকা

মনের প্রশ্ন রীতিমত জট পাকিয়ে আছে। এই সমস্যা বহু হাজার বছর ধরে রয়েছে, ভবিষ্যতে আরও কত বছর পর্যন্ত তা থাকবে বলা মুসকিল। মনকে যাঁরা বুঝেছেন এবং মনকে যাঁরা দেখেছেন, তাঁদের ভ্রম শেষ হয়েছে। মনকে যাঁরা বুঝতে পারেন নি, মনকে দেখতে পান নি, তাঁরা মনকে জয় করার প্রশ্নেই সমস্যাগ্রস্ত রয়েছেন। জয়ের ভাষা হল লড়াইয়ের ভাষা। লড়াইয়ে হার বা জিৎ—দুয়েরই সম্ভাবনা থাকে। মনের সঙ্গে যিনি লড়াইয়ে নেমেছেন তিনি যেমন জিততে পারেন, ঠিক তেমনি হারতেও পারেন। একেবারে নিশ্চিত-ভাবে কেউ কখনই বলতে পারেন না, যিনি মনের সঙ্গে লড়াইয়ে নেমেছেন, তিনি জয়লাভ করবেনই। মনকে যিনি উপেক্ষা করেন, যিনি তাকে দেখেন, তিনি তটস্থ হন, মধ্যস্থ হন। উপেক্ষার কথা কত বড় হব, কেউ তাকে সইতে পারে না। মনকেও তিনি সইতে পারেন না এবং কোন লড়াই ছাড়াই তিনি নিজে নিজেই পরাজিত হন।

অধ্যাত্মক্ষেত্রে যুদ্ধের একটা নিজস্ব ভাষা আছে, যোদ্ধারও তেমনি নিজস্ব একটি ভাষা আছে। যুদ্ধ কেবল সমর-প্রাঙ্গণেই হয় না, কেবল অস্ত্র দ্বারাই সে লড়াই হয় না, লড়াই নিজের ভেতরে হতে পারে, এবং অস্ত্র ছাড়াই যুদ্ধ করা যায়। মহাবীর এজন্যই বলেছেন—'নিজে নিজের সাথে লড়াই কর। অন্যের সঙ্গে লড়ে কি হবে? 'জুদ্ধারিহং খলু দুল্লহং'—যুদ্ধের অবসর দুর্লভ, তাকে খুঁজো না।'

অধ্যাত্মের ঘোষণা হল—

ওহে বীর।
এই বিজাতীয় তত্ত্বগুলির সঙ্গে লড়,
নকল লড়াই করে কি হবে?
যুদ্ধের যে সামগ্রী পাওয়া গেছে,
তা করে বার বার পাওয়া যাবে?
এটাই হল সর্বাত্মক যুদ্ধের মওকা।
সামনেই ঘর রয়েছে,
যিনি সর্বস্ব-ত্যাগী, তিনি এই ঘরেই থাকেন
ওটাই হল সাম্য।
আমি এই অট্টালিকার শিখর থেকে
বিজাতীয় তত্ত্বগুলিকে অন্য দিকে ছুঁড়ে দিয়েছি
দ্বিতীয় শিখর তো এমন নেই,
যেখান থেকে ওগুলোকে এপারে ছুঁড়ে দিতে পারি।
শ্রান্ত হয়ো না।
থেমো না।
থামিয়ে দিও না।
নত হয়ো না।
সামনের দিকে এগিয়ে যাও।
দ্বিগুণ শক্তির সঙ্গে
সামনের দিকে এগিয়ে যাও।

বিজয়ের এই মন্ত্রকে যিনি বুঝতে পারেন নি, তাঁর কাছে মন চিরকাল অজেয়ই থাকে, অজেয়ই থেকে যায়। মনের বিজয়-রহস্য যিনি বুঝতে পারেন না তিনি মানসিক সমস্যারও সমাধান করতে পারবেন না। একটি দড়িরই দু প্রান্তে ধরে দুটি মানুষ টানাটানি করে, ফলে যখন দড়ি ছিঁড়ে যায়, তখন দুজনেই পড়ে যায়। একজন টানে, আর দ্বিতীয়জন তা ছেড়ে দেয়। যে টানে সে

পড়ে যায়, কিন্তু অপরজন দাঁড়িয়েই থাকে। প্রেক্ষাকে যিনি জানেন, দড়িকে যিনি ছেড়ে দিতে বা ঢিলে করতে জানেন, তিনিই বিজয়ী হন। এই সোজা কথাটিকে বুঝবার জন্যই বইটি পড়ুন, নিজে দেখুন এবং অনুভব করুন। যদি কথাগুলিকে বোঝা যায়, তাহলে জট-পাকানো প্রশ্নটির সহজেই সমাধান হবে।

আচার্যশ্রী তুলসী হলেন আমার প্রেরণা-স্রোত এবং জ্যোতিস্তম্ভ। তাঁর আশীর্বাদ এবং সান্নিধ্য, দুই-ই আমি পেয়েছি। তাঁরই উৎসাহ এবং প্রেরণায় সাধনা-শিবিরের ব্যবস্থাদি চলুক।

যুবাচার্য মহাপ্রজ্ঞ

আশীর্বচন

দেশনোক গ্রামের স্বর্গীয় জেঠমলজী অঞ্চালিয়ার পরিবার বরাবরই জৈনধর্ম এবং তেরাপন্থ দর্শন-সংস্কারে অনুপ্রাণিত পরিবার ছিল। ব্যবসায়িক কারণে বাংলায় প্রবাসী হওয়ায় ধর্মসঙ্ঘের সঙ্গে ঐ পরিবারের সম্পর্ক অনেকটা চিড় ধরে আসছিল। লাড়নু-নিবাসী প্রযাত মোহনলালজী খটেড় (আমার সংসার-পক্ষীয় জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা) ঐ সময়ে সিরাজগঞ্জে (অধুনা বাংলাদেশ) থাকতেন। ওখানেই জেঠমলজীর সঙ্গে ওঁর সম্পর্ক স্থাপিত হয়। ঐ সম্পর্কই ওঁদের আবার আমার কাছে আসার প্রেরণা যোগায়। ওঁরা এলেন, আর এমন ভাবেই এলেন যে আগের চেয়ে বেশি অধ্যাত্মধর্মী হলেন। ওঁর গোটা পরিবারের মধ্যেই ঐ কারণে সংস্কার পল্লবিত হল এবং ধর্মবিষয়ে একটা শ্রদ্ধা ওঁদের মধ্যে পুষ্ট হতে লাগল।

জেঠমলজীর জ্যেষ্ঠ পুত্র চম্পালালজী একাধারে শিক্ষিত, কর্মঠ এবং মিতভাষী। বাংলাদেশেই ওঁর শিক্ষা-দীক্ষা হওয়ায় একদিকে যেমন উনি বাঙালীই হয়ে গেছেন, তেমনি বাংলা ভাষার ওপরেও ওঁর বেশ অধিকার জন্মেছে। ওঁর সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপনের সুযোগ বিশেষ হয় নি, তাই উনি আমাদের কাছে অপরিচিতই রয়ে গিয়েছিলেন এতদিন।

আমাদের রাণাবাস চাতুর্মাসের সময় কলকাতায় এক বিশেষ সংবাদ পেয়ে চম্পালালজী রাণাবাসে এসে পৌঁছলেন। এখানে আসার পরেই ওঁর শ্রদ্ধা, রুচি এবং নিষ্ঠা বদলে গেল। আমি ওঁকে দেখলাম, ওঁর যোগ্যতা লক্ষ্য করলাম এবং আমাদের কাজে ওঁকে নেব বলে ঠিক করলাম।

ওঁর সাহিত্যধর্মী রুচি এবং বাংলাভাষায় দক্ষতা দেখে আমিই ওঁকে আমাদের সাহিত্যগুলি বাংলায় অনুবাদ করার নির্দেশ দিলাম। এই

নির্দেশ উনি প্রসন্নভাবে মেনে নিয়ে বললেন, 'আমি নিজে তো অনুবাদ করবই, অন্যকেও এ কাজে লাগাব।'

সর্বপ্রথম দুটি বই উনি নিলেন—'মন কে জিতে জিত' এবং 'আভামণ্ডল'। উভয় পুস্তকই যুবাচার্যজীর রচনা। এগুলি যোগ-সম্পর্কিত, প্রেক্ষাধ্যান-বিষয়ক এবং বিদ্বজ্জনের দৃষ্টি-আকর্ষণকারী। পুরো মনোযোগ এবং নিষ্ঠা নিয়ে উনি কাজ শুরু করলেন এবং কাজটিকে একেবারে শেষ করে তবেই বিশ্রাম নিলেন। অনুবাদটি কেমন হয়েছে, তার বিচার পণ্ডিতরা করবেন। তবে, আমি যতটুকু দেখেছি, তাতে অনুবাদ খুবই ভালো লেগেছে।

বাংলার মানুষরা যোগ-রসিক, সুরুচিপূর্ণ সাহিত্যের সমঝদার এবং অধ্যয়নপ্রিয়। ওঁদের কাছে এই লেখা পৌঁছক, জীবনের প্রতি সঠিক এবং নতুন দৃষ্টি দিতে সক্ষম হোন ওঁরা।

শ্রীঅঞ্জালিয়া নিজ কর্তব্য নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করেছেন। এ পথে উত্তরোত্তর ওঁর কুশলতার বিকাশ হোক, এই কামনাই করি।

৬ জুন, ১৯৮৪

জৈন বিশ্ব ভারতী — আচার্য তুলসী

লাডনু

আশীর্বাণী

মনের সমস্যার সমাধানের জন্য এক গভীর প্রচেষ্টা প্রয়োজন। সমাধানের উপায় বাঙালী জনসাধারণের কাছে পৌঁছে দেবার প্রচেষ্টাও খুব জরুরী। শ্রীচম্পালাল অঞ্চালিয়া এবং তাঁর-সহযোগীরা নিষ্ঠার সঙ্গে কাজ করেছেন। বাংলা-ভাষাভাষী পাঠকের সামনে ওঁরা মানসিক সমস্যার সমাধানের সূত্র তুলে ধরেছেন। এটা খুবই মহত্বের কাজ। এই বই থেকে আধ্যাত্মিক চেতনার জাগরণ, সর্বোপরি মনের সমস্যার সমাধানের সূত্র মিলবে। কল্যাণকারী এই প্রচেষ্টার জন্য মঙ্গলভাবনা রইল।

২ জুন, ১৯৮৪ — যুবাচার্য মহাপ্রজ্ঞ

জৈন বিশ্ব ভারতী

লাড়নূ

অনুবাদকের ভূমিকা

আজ থেকে প্রায় বছর পঁচিশ আগে আচার্যশ্রী তুলসী এবং যুবাচার্য মহাপ্রজ্ঞ কলকাতায় এসেছিলেন। বাংলার শ্রেষ্ঠ জ্ঞানীগুণীদের সঙ্গে তাঁদের সাক্ষাৎকার ঘটেছিল এবং এই ভাব-বিনিময়-পর্বেই তাঁরা স্থির করে ফেলেছিলেন, তাঁদের স্বলিখিত জৈন দর্শন ও ধ্যানবিষয়ক কিছু বই বাংলায় ভাষান্তরিত করাবেন, যাতে তাঁদের ভাবধারা বাংলাদেশেও প্রচারের সুযোগ পায় এবং বাংলার জ্ঞানীগুণী ও বিদ্বজ্জন উভয়েই উপকৃত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে পারস্পরিক ভাব-বিনিময়ের কাজটিও সম্পূর্ণ হয়। দীর্ঘ দিন পর্যন্ত তাঁদের সেই বাসনা অপূর্ণ ছিল। গত বছর নিতান্তই আকস্মিকভাবে তাঁদের সঙ্গে আমার যোগাযোগ ঘটে এবং আচার্যশ্রী তুলসী আমাকে গ্রন্থগুলির বঙ্গানুবাদের কাজে অগ্রণী হতে বলেন।

আচার্যশ্রী তুলসীর নির্দেশ মাথা পেতে নিয়ে যেদিন তাঁর কাছে 'মন কে জিতে জিত' বইটি বাংলায় ভাষান্তরিত করার প্রতিশ্রুতি দিলাম এবং আমার জন্মদাত্রী জননীও যখন প্রসন্নচিত্তে সেই প্রতিশ্রুতিকে অবিলম্বে কার্যকর করার আদেশ দিলেন, তখন ভাবতেই পারি নি, কি বিরাট বিস্ময় আমার জন্য অপেক্ষা করে আছে। নিতান্তই সহজ এবং সাধারণ মনে করে যা শুরু করেছিলাম, কাজে নেমে দেখি, তা রূপান্তরিত করার পথে এত বাধা যে হিমালয়ের উচ্চতা অতিক্রমের বাধাও যেন তার কাছে তুচ্ছ। প্রসঙ্গত বলি, হিন্দি ভাষার সঙ্গে যৎকিঞ্চিৎ পরিচিতি থাকলেও আমি বাংলার ছেলে—আচারে-আচরণে, কথাবার্তায় ষোল আনা বাঙালী এবং তার চেয়েও বড় কথা, আমার সম্পূর্ণ শিক্ষা-দীক্ষাও পূর্ব এবং পশ্চিম বাংলায়। তাই ঠিক বাঙালীর মতই হিন্দি

ভাষা আমার কাছে গ্রীক ভাষার সমতুল হয়ে দাঁড়াল। এই অবস্থায় পড়ে স্পষ্টই অনুভব করলাম, মা এবং আচার্যজীকে কথা দিয়ে কি সাংঘাতিক বিপদেই না পড়েছি। আমি প্রকৃত অর্থেই আদার ব্যাপারী, আমার সব কাজকারবার লোহা এবং ইনজিনিয়ারিং নিয়ে, অনুবাদ-রূপ জাহাজের খবর নিতে যাওয়ার কোন প্রয়োজনই যে ছিল না, তখন তা মর্মে মর্মে অনুভব করতে পারলাম। কিন্তু, জিদ চাপল, নেপোলিয়নের আপ্ত বাক্যকে মনে পড়ল—'অসম্ভব কথাটি কেবল মূর্খদের অভিধানেই পাওয়া যায়'—এবং দ্বিগুণ উৎসাহে ঝাঁপিয়ে পড়লাম অনুবাদ শেষ করার কাজে।

'মনের জয়ই জয়' অনুবাদ করতে আমার সময় লেগেছে প্রায় পনেরো মাস। অসঙ্কোচে বলি, বার বার ছ'বার আমি আদ্যন্ত এটি লিখেছি, কেননা প্রতিবারই অনুবাদ করার পর অনুবাদের ত্রুটি আমার কানকে পীড়া দিয়েছে। অবশেষে মুদ্রিত হরফে অনুবাদের চেহারা কেমন হল, তা বিচারের ভার রইল বিদ্বজ্জনের ওপরে—আমার শুধু এটুকুই সান্ত্বনা যে, অপরিসীম নিষ্ঠাভরে কাজটি সম্পন্ন করার চেষ্টা আমি করেছি। আমার মা এবং আচার্যজী উভয়েই সেই নিষ্ঠা আনয়নে প্রেরণা যুগিয়েছেন, নেপথ্যের এই দুটি মানুষকে আমি প্রণতি জানাই।

যুবাচার্যজীর অসংখ্য বইয়ের মধ্যে এই বইটিকেই অনুবাদকার্যের জন্য বেছে নিয়েছিলাম কেন, সেটিও এক প্রশ্ন। আজকের বস্তুতান্ত্রিক পৃথিবীতে মনের সমস্যাই সবচেয়ে বড় সমস্যা, আমরা প্রত্যেকেই নানা মানসিক সমস্যাভারে জর্জরিত। 'মনের জয়ই জয়' আগাগোড়া মনের সমস্যা নিয়েই চর্চা করেছে এবং কিভাবে তা অতিক্রম করা যায় সে ব্যাপারে বাস্তব এবং বৈজ্ঞানিক সমাধান দিয়েছে। এহেন কঠিন বিষয়কে যুবাচার্যজী এমন সহজ, সরল ও প্রাঞ্জলভাবে উপস্থাপিত করেছেন যে তা আমার মনকে আকর্ষণ করেছে। আমার বিশ্বাস, বাংলা ভাষায় এই ধরনের বই খুব বেশি নেই। তাই এ বই পড়ে বাঙালী পাঠক যে রীতি-মত উপকৃত হবেন তাতে কোন সন্দেহই নেই। মানসিক সমস্যা-পীড়িত এই পৃথিবীতে মনের সমস্যাকে অতিক্রম করার যেসব পদ্ধতির কথা যুবাচার্যজী বলেছেন, আজকের দিনেও তার প্রয়োগ অসম্ভব নয়।

এই প্রযোগকার্য সম্পন্ন করে দেশের মানুষ লাভবান হতে পারবেন বলেই আমার বিশ্বাস। তুলসী অধ্যাত্ম নীডম-কে ধন্যবাদ, দেশের ও দশের কল্যাণার্থে তাঁরা এই বইগুলি বিভিন্ন ভাষায় রূপান্তরণের কাজে ব্রতী হয়েছেন। প্রাথমিক পদক্ষেপ হিসেবে যে চারটি বইয়ের বাংলা সংস্করণ এঁরা প্রকাশ করলেন, সেগুলির সাফল্য এলে পরবর্তী গ্রন্থগুলিকে ভাষান্তরিতকরণের কাজ এঁদের পক্ষে সহজ হবে। তাই তাঁদের হয়ে বইগুলির বহুল প্রচারের জন্য বাংলার জ্ঞানী-গুণী, সাধারণ-অসাধারণ প্রতিটি মানুষের কাছ থেকে সহযোগিতা কামনা করছি।

এ বইয়ের অনুবাদ সম্বন্ধে একটা কথা সুধী পাঠক-পাঠিকাকে বলে নেওয়া ভাল। যুবাচার্যজী বইটি পাণ্ডুলিপির আকারে লেখেন নি, এটি তাঁর বিভিন্ন শিবিরে দেওয়া বক্তৃতার সঙ্কলন। টেপ-রেকর্ড করা বক্তৃতাকে পরবর্তীকালে বইয়ের আকারে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। বলা এবং লেখার ভাষা সর্বদা এক হয় না। তাই মাঝে মাঝে লেখার মধ্যে পুনরাবৃত্তি এসে গিয়েছে। আমরা অবশ্য সতর্কতার সঙ্গে পুনরাবৃত্তিকে যথাসম্ভব বাদ দেবার চেষ্টা করেছি। তবু, তাকে যে সর্বদা পরিহার করতে পেরেছি তা নয়। তবে এতে এই মূল্যবান বইয়ের রসাস্বাদনে কোন বিঘ্ন ঘটবে বলে মনে হয় না।

আর একটি কথা। যে প্রেক্ষা-ধ্যান নিয়ে এই বইয়ে আলোচনা করা হয়েছে, সে সম্বন্ধে যদি কেউ কিছু জানতে চান বা প্রেক্ষা-ধ্যান অভ্যাস করতে চান, তাহলে এই গ্রন্থের লেখক বা প্রকাশকের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারেন।

সবশেষে ধন্যবাদ জ্ঞাপনের পালা। সর্বপ্রথম ধন্যবাদ জানাই কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাষাতত্ত্ব ও তুলনামূলক সাহিত্য বিভাগের অধ্যাপক ডঃ সত্যরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়কে, শত ব্যস্ততার মাঝেও যিনি বইটির মূল্যবান ভূমিকা লিখে দিয়েছেন। অধ্যাপক সুকুমার চক্রবর্তী এ বইয়ের পাণ্ডুলিপিটি আগাগোড়া সংশোধন করে দিয়ে অপরিসীম ঋণপাশে আমাকে আবদ্ধ করেছেন। পাণ্ডুলিপি রচনার ব্যাপারে

শ্রীবংশীধর বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীসুবোধ কুমার রায়, শ্রীমতী শ্যামলী চক্রবর্তী এবং শ্রীগৌরগোপাল সাহা নানা ভাবে আমাকে সাহায্য করেছেন। শ্রীরণেন গুপ্ত খুব অল্প সময়ের মধ্যে বইটির মুদ্রণকার্য সম্পন্ন করেছেন, বেশির ভাগ প্রুফ দেখে দিয়েছেন এবং অনুবাদেও নানা ভাবে সাহায্য করেছেন। এঁদের সকলের কাছেই ব্যক্তিগতভাবে ঋণী রইলাম।

স্বাধীনতা দিবস, ১৯৮৪ বিনীত

২ রাজা উডমাণ্ট স্ট্রীট চম্পালাল অঞ্চালিয়া

কলকাতা-৭০০০০১

সূচীপত্র

১।	দেখা ও ভাবা	১
২।	শরীর সাধনা	১৬
৩।	শব্দ সাধনা	৩২
৪।	মনের পটুতা বিধান	৪১
৫।	না করার মূল্য	৫৬
৬।	মৌনতার মূল্য	৭০
৭।	চিন্তাশূন্যতার মূল্য	৮৭
৮।	শরীর পরিচয়	১০৫
৯।	প্রেক্ষা প্রয়োগ	১১৮
১০।	অনুপ্রেক্ষা	১৩১
১১।	রূপান্তরণের প্রক্রিয়া	১৪৬
১২।	স্থূল থেকে সূক্ষ্মে	১৬০
১৩।	অধ্যাত্মের রহস্যের সন্ধান	১৭৬
১৪।	অধ্যাত্ম এবং ব্যবহার	১৯২
১৫।	শরীর এবং তার বিশিষ্ট কেন্দ্র	২০৪
১৬।	শরীর বোধের অপেক্ষা	২১৭
১৭।	প্রাণ এবং তার কার্যক্ষেত্র	২২৬
১৮।	আহার : অনাহার	২৩২
১৯।	ভাবনা	২৪০

২০। অধ্যাত্মের সাধনা ২৪৮
২১। ইন্দ্রিয়-সংযম ২৫১
২২। অপ্রমাদ ২৬৬
২৩। জ্ঞান এবং সংবেদন ২৮১
২৪। জপ এবং মৌনতা ২৮৫
২৫। একাগ্রতা ৩৩৩
২৬। সাধনার তিন পক্ষ ৩১১
২৭। নির্বিচার ধ্যান ৩১৯
২৮। চেতনার দিক পরিবর্তন ৩৩৩
জিজ্ঞাসা ৩৪৫

মনের জয়ই জয়

সরদারশহর শিবির

(১০ অক্টোবর, ১৯৭৬ থেকে ১৬ অক্টোবর, ১৯৭৬)

১

দেখা ও ভাবা

এই সংসারে আমরা দুই রকম তত্ত্ব দেখতে পাই। তাদের একটি অভেদ, অপরটি ভেদ। যখন আমরা অভেদকে দেখি তখন মনে কোন বিকল্প বা সন্দেহ উৎপন্ন হয় না। কিন্তু যখন ভেদকে দেখি তখন মনে বিকল্প বা সন্দেহ উৎপন্ন হয়। এরকম হয় কেন? এই পার্থক্য কেন, এই ভিন্নতাই বা কেন? এই রকম এক ঘটনা সুদূর অতীতে ঘটেছিল।

একবার পার্শ্বনাথ পরম্পরার পট্টধর কুমার শ্রমণ কেশী তাঁর শ্রমণ পরিবারসহ শ্রাবস্তী নগরে আসেন এবং তিন্দুক উদ্যানে অবস্থান করেন। সেই সময়ে ভগবান মহাবীরের শিষ্য গণধর গৌতমও তাঁর শ্রমণ সহ ঐ নগরীতে আসেন এবং কোষ্ঠক উদ্যানে অবস্থান করেন। উভয়ের শ্রমণদল পরস্পরকে দেখার সুযোগ পান। কিন্তু পরস্পরের মধ্যে বেশভূষা ও আচরণের পার্থক্য লক্ষ্য করে তাঁদের মনে সংশয় জাগে। তাঁরা জানতেন যে তীর্থংকর পার্শ্ব চতুর্যাম ধর্মের প্রকল্পনা করেছিলেন এবং মুনিদের জন্য চার মহাব্রত বিধান করেছিলেন। আর মহাবীর শ্রমণদের জন্য পাঁচ মহাব্রতের নির্দেশ দিয়েছিলেন। চার মহাব্রত আর পাঁচমহাব্রত দুই বিধানের মধ্যে এই প্রভেদ কেন? পার্শ্বনাথের শ্রমণদের পরিধেয় বস্ত্র সব রকম রঙের ছিল। মহাবীরের শ্রমণদের বস্ত্র কেবল সাদা রঙের

ছিল। আচরণের পার্থক্যও ছিল। কিন্তু কেন? দুই সম্প্রদায়ের শ্রমণদের মনে সন্দেহ জাগল। আচার্য কেশী ও গণধর গৌতম সে কথা জানতে পারলেন। তাঁরা অতীন্দ্রিয় জ্ঞানী ছিলেন। তাঁরা দুজনে এক স্থানে মিলিত হলেন। তাঁদের শ্রমণরাও সঙ্গে ছিলেন। কুমার শ্রমণ কেশী গণধর গৌতমকে জিজ্ঞাসা করলেন: আমাদের লক্ষ্য এক ও অভিন্ন, আমরা একই উপলব্ধি লাভের জন্য সচেষ্ট। তবুও তীর্থংকর পার্শ্বনাথ চার মহাব্রতের এবং তীর্থংকর মহাবীর পাঁচ মহাব্রতের বিধান কি করে দিলেন? এই প্রভেদ কেন? বেশভূষাতে পার্থক্য কেন? চর্যাতেই বা পার্থক্য কেন? একই লক্ষ্য অভিমুখে চলা সত্ত্বেও এই পার্থক্য থাকায় শ্রমণদের মনে সন্দেহ উপস্থিত হয়েছে। এর সমাধান কি? আপনি আশুপ্রজ্ঞ, এর সমাধান করুন।

গৌতম সমস্যার সমাধান করলেন। তাঁর বক্তব্যের প্রথম চরণেই তিনি যা বললেন তা খুবই মহত্ত্বপূর্ণ। তিনি বললেন—"পন্না সমিক্খয়ে ধম্মং তত্তং তত্তবিনিচ্ছিয়ং"—ধর্মের পরম অর্থকে জানতে হলে, তাকে নিশ্চয় করে জানতে হলে, প্রজ্ঞার দ্বারা তার সমীক্ষা কর। প্রজ্ঞার দ্বারা দেখ তার ভেতরে কি আছে। তার বাইরের রূপকে দেখো না। 'পন্না সমিক্খয়ে'—প্রজ্ঞার দ্বারা গভীরে অবতরণ করে দেখ, তার অতল গভীরে পৌঁছে তবেই তুমি জানতে পারবে পরম ধর্ম আসলে কি। এই বেশভূষার পার্থক্য, চার-পাঁচ মহাব্রতের ভিন্নতা—সংখ্যার এই পরিবর্তন প্রকৃত প্রস্তাবে ধর্ম পদবাচ্য নয়। এগুলি থেকে ধর্ম মিলবে না। প্রজ্ঞার দ্বারা গভীরে অবতরণ করে দেখ। সেখানেই ধর্মকে দেখতে পাবে। তাতে কোন ভিন্নতা বোধ করবে না। সবই একই বস্তু বলে প্রতীত হবে। আজকে আমরা যে বিষয়ে আলোচনা করছি সেই প্রেক্ষা ধ্যান কি? প্রেক্ষা ধ্যান হল গভীরে অবতরণ করে দেখা। যতক্ষণ গভীরে অবতরণ করা না যায় ততক্ষণ সত্যকে দেখা সম্ভব হবে না। আমরা সত্যকে জানতে চাই। সত্যকে দেখা-জানার দুটি মাধ্যম আছে—একটি বিচার, অপরটি দর্শন অর্থাৎ দেখা। আমরা বিচারের সঙ্গে বিশেষ পরিচিত,

কিন্তু দর্শনের পরিচয় এখনও আমরা পাইনি। বিচারের ভূমি নিচেই থেকে যায়, কিন্তু দর্শনের ভূমি তার অনেক ওপরে ওঠে। দর্শনের যে শক্তি আছে বিচারে তা নেই। দর্শন যেখানে যেতে পারে বিচার সেখানে পৌঁছতে পারে না। বিচারের বিস্তার খুবই সীমিত, দর্শন সুদূরপ্রসারী। যেখানে দর্শন হয় সেখানে বিচার সমাপ্ত হয়।

বিচারের সমাপ্তি ঘটানোর সবচেয়ে প্রকৃষ্ট উপায় দর্শন। যখন আপনি দর্শনের ভূমিকাতে প্রবেশ করেন, দেখতে আরম্ভ করেন, তখন বিচার আপনা থেকেই বন্ধ হয়ে যায়। আপনি হয়ত বহুবার ভেবেছেন বিচারের পাশ কিভাবে ছিন্ন করা যাবে, বিচারের প্রবাহ কিভাবে রুদ্ধ করা যাবে। এই যে একের পর এক বিচার মনের মধ্যে উঠেই চলেছে তা কিভাবে বন্ধ করা যাবে। কিন্তু কেবল এই ধরনের ভাবনার দ্বারা বিচার রোধ করা যাবে না। বিচার বন্ধ করা সম্ভব দর্শনের দ্বারা, যথাযথভাবে দেখার দ্বারা। আপনি দেখার অভ্যাস করুন। আপনি যেমনি দর্শন করতে আরম্ভ করবেন, দেখতে শুরু করবেন, তখনই বিচার বন্ধ হয়ে যাবে। দুই কাজ এক সঙ্গে চলবে না। হয় দর্শন চলবে, নয়তো বিচার চলবে। দর্শন যদি হয় বিচার বন্ধ হবে, বিচার যদি চলতে থাকে দর্শন হবে না। তারা পরস্পর বিপরীত পথের পথিক। একসঙ্গে তাদের দুটিকে নিয়ে চলতে পারবেন না। আপনার অভিরুচিমত দুটিকে ধরুন, থাকবে সেই একটিই, হয় দর্শন না হয় বিচার। সাধনার দৃষ্টিতে 'দেখা' খুবই মূল্যবান। সত্যকে জানার, সত্যকে দেখার সবচেয়ে বড় উপায় দর্শন।

প্রশ্ন হতে পারে—কি দেখব? কেমন করে দেখব? কেন দেখব? এই তিনটি প্রশ্নই স্বাভাবিক।

কি দেখব, এই প্রথম প্রশ্ন। উত্তর হচ্ছে, যা কিছু সামনে আসে তাই দেখুন। কি দেখতে হবে সে বিষয়ে কেউ নিয়ম বেঁধে দিতে পারে না। কেউ বলতে পারে না, এগুলি দেখ, ওগুলি দেখ না। যেখানে দেখাই উদ্দেশ্য সেখানে কি দেখতে হবে আর কি দেখা চলবে না, এ নিয়ে কোন

প্রশ্নই হতে পারে না। যে কোন বস্তুকেই দেখা যেতে পারে।

আকারকে দেখুন। সেটাই সবচেয়ে সহজ দর্শন। যে কোন আকার সামনে এলেই আমরা তা দেখতে শুরু করি। যে কোন বস্তু দৃষ্টিগোচর হলেই আমরা তার বাহ্য রূপ দেখতে আরম্ভ করি। প্রত্যেক আকৃতির দুটি রূপ আছে—একটি বাইরের রূপ, অপরটি ভেতরের রূপ। একটি বাহ্য, অপরটি আন্তরিক। এমন কোন বস্তু নেই যার বাইরের রূপ আছে, কিন্তু ভেতরের কোন রূপ নেই। আবার অন্তরের রূপ আছে, কিন্তু বাহ্য কোনও রূপ নেই এমন কোন বস্তুও নেই। দুই রূপই থাকে। যেখানে রস থাকে সেখানে ছোবড়াও দেখি, রসও দেখি। আমরা উভয়কেই দেখে থাকি। বাইরের এবং ভেতরের দুই রূপকেই আমরা দেখি। প্রথমে বাইরেরটি দেখি, পরে ভেতরেরটি দেখি। প্রথমে স্থূল রূপকে দেখি, পরে সূক্ষ্ম রূপকে দেখি।

প্রথম দর্শনে যা আমাদের চোখের সামনে আসে তা হল স্থূল রূপ। কিন্তু প্রথম দৃষ্টিতে যতটা দেখা যায় তাই সব নয়, ভেতরেও অনেক কিছু থাকে, তাই আপনি সূক্ষ্মকেও দেখুন। আমার হাতে একটা পেন্সিল আছে, আপনি এর স্থূল রূপকেই কেবল দেখছেন। আপনি পেন্সিলটিকে গভীরভাবে দেখতে থাকুন, এক মিনিট দুই মিনিট পাঁচ মিনিট ধরে দেখুন। দেখতে দেখতে আপনার সামনে এর স্থূল রূপ নাশ পেতে থাকবে এবং এর ভেতরের রূপ, এর সূক্ষ্ম রূপ, প্রকাশ হতে থাকবে। আপনি দেখছেন আর দেখছেন আর দেখছেন, আর এই ভাবে গভীরে অবতরণ করছেন। এক বস্তুর কত যে নতুন নতুন রূপ ভেসে উঠবে তা দেখে আপনি বিস্ময়বিমূঢ় হয়ে যাবেন।

আজকে আমরা পেন্সিলের আকার দেখলাম, তার আকৃতিকে লক্ষ্য করে একাগ্র হয়ে গেলাম। প্রথমে ওর একটি রূপই দেখলাম, কেবল তার স্থূল আকারটিই দেখলাম। দ্বিতীয়বার দৃষ্টিপাত করে ওর রঙ যে কি তা দেখলাম এবং তৃতীয়বারে ওর গায়ে যে ক্ষুদ্র অক্ষরগুলি লেখা আছে তাও দেখলাম। এসব প্রথম বারেই দেখা সম্ভব হয় নি। পেন্সিল একটি

সামান্য বস্তু, কিন্তু তাও নিজের মধ্যে অনন্ত পর্যায় সংগ্রহ করে রেখেছে। একবার দেখলেই ঐ অনন্ত পর্যায় আমাদের সামনে প্রকট হবে না। কিন্তু আমরা যতই গভীরে অবতরণ করে যতই সূক্ষ্মতার সঙ্গে দেখতে থাকব ততই ঐ সমস্ত পর্যায় আমাদের দৃষ্টিপথে ক্রমশঃ একের পর এক উদঘাটিত হতে থাকবে। এমনও সম্ভব যে, যদি আমরা ঐ পেন্সিল পাঁচ-দশ দিন ধরে দেখতে থাকি তবে সেটি আর পেন্সিলই থাকবে না, আমাদের কাছে সেটি অন্য কিছু হয়ে যাবে। তখন পেন্সিলই হয়ে দাঁড়াবে সত্য উদঘাটনের একটি মাধ্যম।

আমরা আকার দেখব—তার বাইরেরটাও দেখব, ভেতরটাও দেখব। স্থূল-সূক্ষ্ম দুটি রূপই দেখব। দেখতেই থাকব আর দেখতেই থাকব, আর ক্রমশঃ গভীরে অবতরণ করে দেখতে থাকব। দেখা, কেবল দেখা, আর গভীরে নেমে দেখা। আমরা যত বেশি সম্ভব গভীরে অবতরণ করে দেখতে থাকব। দেখা, কেবল দেখা, আর গভীরে নেমে দেখা। আমরা যত বেশি গভীরভাবে দেখতে থাকব তত এমন সব নতুন নতুন পর্যায় উদঘাটিত হতে থাকবে যা প্রথম দর্শনকালে কল্পনাই করা যায়নি।

যেমন ভাবে পেন্সিলকে দেখা হল তেমন ভাবেই শ্বাসকে দেখা দরকার। কেবল বাইরের বস্তু যে আমাদের কাছে দেখার যোগ্য তা নয়, আমাদের আশেপাশেই দেখার যোগ্য অনেক কিছু আছে। শ্বাসকে দেখ, শ্বাসের কল্পনাকে দেখ। শ্বাস যে বিন্দুকে ছুঁয়ে আছে তাকেও দেখ। শ্বাস কত দূর পর্যন্ত যায়, কোথায় মোড় ফেরে, কোথা থেকে ফিরে আসে এবং কোথায় ঐ শ্বাস প্রশ্বাসে পরিণত হয়—এ সব দেখ। শ্বাসের তীব্রতাকে দেখ, শ্বাস কতটা স্থূল তা দেখ, শ্বাস কতটা ছোট তাও দেখ। শ্বাস কি অধিক পরমাণু-সম্বলিত, না অল্প পরমাণু-সম্বলিত অবস্থায় আছে? শ্বাস কতটা দীর্ঘ? ওর দৈর্ঘ্যকে লক্ষ্য কর। শ্বাসের গতিকে লক্ষ্য কর। একই শ্বাসের বিভিন্ন রূপকে দেখতে থাক।

শরীরকে দেখ। শরীরের আয়তন খুবই ছোট, কিন্তু তা এক অতি বৃহৎ ভাণ্ডার। শরীরের যন্ত্রপাতি এত বিপুল যে তাঁর সঙ্গে তুলনায় পৃথিবীর

অতি বড কারখানাগুলিও ছোট বলে মনে হবে। এই ক্ষুদ্র শরীরে এত বেশি সংখ্যক যন্ত্র আছে, আর তাদের নির্মাণকৌশল এতই আশ্চর্যজনক যে, কোন মানুষ যদি ঐ সব যন্ত্র নির্মাণ করতে চেষ্টা করে, তবে আজ সর্ব বিষয়ে বিকশিত বিজ্ঞানের যুগেও সে সফল হতে পারবে না। মানুষের এই ক্ষুদ্রাকৃতি মস্তিষ্কে কোটি কোটি প্রকোষ্ঠ আছে, যা সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম। কোন মানুষই তা নির্মাণ করতে সমর্থ হবে না। কোন মানুষেরই এমন ক্ষমতা আর যোগ্যতা নেই যে সে এত সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম যন্ত্র নির্মাণ করতে পারবে।

নিজের কাছেই যখন দেখার এত বস্তু পড়ে আছে তখন বাইরে দৃষ্টি দেওয়ার আবশ্যকতা কি? আপনি মস্তিষ্কের এক একটি প্রকোষ্ঠকে দেখতে শুরু করুন। মস্তিষ্কে কোটি কোটি প্রকোষ্ঠ আছে। কোনটি স্মৃতির প্রকোষ্ঠ, কোনটি অনুভূতির প্রকোষ্ঠ। কোনটি ক্রোধের প্রকোষ্ঠ, কোনটি ক্ষমার প্রকোষ্ঠ। কোনটি অভিমানের প্রকোষ্ঠ, কোনটি মায়ার প্রকোষ্ঠ। যত রকম আবেগ, যত রকম বৃত্তি, যত রকম বাসনা আছে—তাদের প্রত্যেকের পৃথক পৃথক প্রকোষ্ঠ আছে। সেগুলি দেখুন। আজ্ঞাচক্রকে দেখুন, নাসাগ্রকে দেখুন, নাভিমণ্ডলকে দেখুন। এই রকম আরও অনেক স্থান আছে। আপনি সবই দেখতে থাকুন। অনেক রহস্য উদঘাটিত হতে থাকবে।

দেখা কেবল দেখা নয়, তার একটা পরিণামও আছে। শরীরের কোন এক স্থানকে দেখার অর্থ হল, মনকে সেখানে কেন্দ্রিত করা। যখনই আপনি আজ্ঞাচক্রকে দেখবেন তখনই মন সহজেই একাগ্র হয়ে যাবে। কারণ ঐ স্থানের এমন এক বৈশিষ্ট্য আছে যে মন যখনই সেখানে পৌঁছবে তখনই সেখানে আটকে থাকবে। ঐ স্থানই মনকে ধরে রাখবে। আমাদের শরীরের অভ্যন্তরে এত অসংখ্য নাড়ী আছে, এত বৃহৎ নাড়ী-সংস্থান আছে যে, আমরা সেগুলি দেখে শেষ করতে পারব না।

আমাদের শরীরের মধ্যে অনেক গ্রন্থি আছে। যোগের প্রাচীন আচার্যরা ঐগুলিকে 'চক্র' বলে অভিহিত করেছেন। আধুনিক শরীর বিজ্ঞানীরা

ঐগুলিকে 'গ্ল্যাণ্ডস' বলেছেন। জাপানে প্রচলিত বৌদ্ধ পদ্ধতির 'জুডো'-তে ঐগুলিকে 'ক্যুসোস' বলে। এটা আশ্চর্যজনক ব্যাপার যে, যোগের আচার্যরা চক্রগুলির যে যে স্থান ও আকার বর্ণনা করেছেন, আধুনিক শরীর বিজ্ঞানীরা গ্ল্যাণ্ডগুলির যে যে স্থান ও আকার স্বীকার করেছেন, এবং জুডো পদ্ধতিতে ক্যুসোসের যে যে স্থান ও আকার বলা হয়েছে—তা তিন ক্ষেত্রেই সমান। বিশেষ কোন পার্থক্য নেই।

ক্রমিক সংখ্যা	জুডো ক্যুসোস	গ্ল্যাণ্ডস	যোগচক্র
১	টেণ্ডো	পিনিয়ল গ্ল্যাণ্ড	সহস্রার চক্র
২	উতো	পিটুইটারি গ্ল্যাণ্ড	আজ্ঞা চক্র
৩	হিচু	থাইরয়েড গ্ল্যাণ্ড	বিশুদ্ধি চক্র
৪	ক্যোটোট্সু	থাইমাস গ্ল্যাণ্ড	অনাহত চক্র
৫	সুইগেট্সু	সোলার প্লেক্সাস	মণিপুর চক্র
৬	মাইওজো	অ্যাড্রিনাল গ্ল্যাণ্ড	স্বাধিষ্ঠান চক্র
৭	সুরগিনে	পেলভিক প্লেক্সাস	মূলাধার চক্র

একের পর এক গ্ল্যাণ্ড বা ক্যুসোস বা চক্রকে দেখতে থাকুন। ঐ সবের স্থান স্পষ্টরূপে প্রতিভাষিত হতে আরম্ভ করবে। এদের দেখার পরিণাম সুমহৎ হয়ে থাকে।

আমাদের সামনে দেখার মত বহু বস্তু আছে। সুতরাং আমরা কি দেখব এই প্রশ্ন নিরর্থক। দেখার জন্য আমাদের এই শরীরই পর্যাপ্ত। তা ছাড়া জগৎ অতি প্রকাণ্ড। এত প্রকাণ্ড যে দেখার যোগ্য বস্তুর অভাব কোন দিনই হবে না। দেখার পক্ষে কোন বস্তুই অযোগ্য নয়। যে বস্তুকে আমরা সবচেয়ে তুচ্ছ বা ঘৃণ্য বলে মনে করি তার দর্শনেও আমাদের সত্যের দর্শন হতে পারে। কোন বস্তু ততক্ষণই তুচ্ছ বা ঘৃণ্য বা মন্দ থাকে যতক্ষণ আমাদের দৃষ্টিকোণ অন্য রকম থাকে। যখন আমাদের দৃষ্টিকোণ সত্যকে দেখার উপযুক্ত হয় তখন কোন বস্তুই তুচ্ছ বা ঘৃণ্য বা মন্দ থাকে না। তখন ভাল-মন্দের ভেদ সমাপ্ত হয়ে যায়।

কেবল যথার্থকে দেখবার, সত্যকে দেখবার কথাই শেষে থেকে যায়।

আমাদের প্রথম প্রশ্ন ছিল—কি দেখব? এ সম্বন্ধে আমি কিছুটা আলোচনা করলাম মাত্র।

এখন দ্বিতীয় প্রশ্ন—কেমন করে দেখব? এটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন। দেখা যতটা গুরুত্বপূর্ণ তার চেয়েও গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন—কেমন করে দেখব। এর সোজা উত্তর হবে, চোখ দিয়ে দেখ। এ উত্তর ঠিকই যে আমরা চোখ দিয়ে দেখি। কিন্তু কেবল চোখ দিয়ে দেখাই যথেষ্ট নয়। চোখ দিয়ে দেখার আগে যে সব অপরিহার্য শর্ত আছে সেগুলি বুঝতে হবে। প্রথম শর্ত হল, অনাসক্তভাবে দেখতে হবে। নির্লিপ্ত হয়ে দেখতে হবে। রাগ-দ্বেষ শূন্য চিত্ত নিয়ে দেখতে হবে। যদি আসক্তি এসে যায়, ঠিক দেখাই হবে না। চোখ দেখবে বটে, কিন্তু যথার্থ দেখবে না—নজরে অন্য কিছু এসে যাবে।

রসিক লোকের কাছে তার স্ত্রীর গোল মুখাবয়ব চাঁদের মত সুন্দর মনে হয়। আবার কিন্তু ক্ষুধার্ত লোকের কাছে তার স্ত্রীর গোল মুখ রুটির মত মনে হতে পারে। কারণ দেখার সঙ্গে একজন কামাসক্তি জুড়ে দিয়েছে, অন্য জন জুড়ে দিয়েছে পদার্থাসক্তি। নতুবা স্ত্রীর মুখ কি করে চাঁদের মত হবে, কি করেই বা রুটির মত হবে?

নাটকের এক দৃশ্য কল্পনা করা যায়—এক ক্ষুধার্ত ব্যক্তি চাঁদ দেখছে, পূর্ণিমার চাঁদ দেখছে, তার চোখের সামনে গোল গোল রুটি ভেসে বেড়াচ্ছে।

আমরা চোখ দিয়ে দেখছি, কিন্তু যথার্থ বস্তু দেখাই দিচ্ছে না। বস্তুর সঙ্গে আমার যে আসক্তি জুড়ে দিচ্ছি তাই আমি দেখতে পাচ্ছি। বহু সময়ে সুন্দর অসুন্দর হয়ে দেখা দেয়। আবার অসুন্দরও সুন্দর দেখা দেয়। যার সঙ্গে আসক্তি জুড়ে দেওয়া হয়েছে তা অসুন্দর হলেও সুন্দর প্রতীত হবে। যার সঙ্গে ঘৃণা বা তিরস্কারের ভাব জুড়ে দেওয়া হয়েছে তা সুন্দর হলেও অসুন্দর বলে প্রতীত হবে। বেচারা চোখ কোথায় যথার্থ বস্তু দেখতে পাবে? চোখের ওপরে যে আসক্তির, রাগ-দ্বেষের,

প্রিয়তা-অপ্রিয়তার আবরণ পড়েছে। যতক্ষণ পর্যন্ত এই আবরণ দূর না হয়—আসক্তি ও রাগ-দ্বেষ মিটে না যায়, প্রিয়তা ও অপ্রিয়তার বোধ নষ্ট না হয়—ততক্ষণ পর্যন্ত চোখ যথার্থভাবে দেখতে পারে না। যার যা প্রকৃত রূপ তাকে সেই রূপে দেখতে সমর্থ হবে না। কোন লোক যথার্থই ভাল, কিন্তু আমি তাকে মন্দ দেখছি, মন্দ বলে মনে করছি। আবার কোন লোক যথার্থই মন্দ। কিন্তু আমি তাকে ভাল দেখছি, ভাল বলে মনে করছি। কারণ ভাল বা মন্দ মনে করার সঙ্গে অন্য এক ভাবনা কাজ করছে। এ কারণেই অনাসক্ত হয়ে দেখুন। নিরপেক্ষ ভাবে দেখুন, তবেই কেবল যথার্থভাবে দেখতে পারেন। যা ঘটিত হচ্ছে ঠিক তাই দেখুন। তার সঙ্গে কোন রকমের চিন্তা বা ভাবনা জুড়ে দেবেন না। বস্তুকে অনাসক্ত ভাবে দেখা, রাগ-দ্বেষ-রহিত চিত্তে দেখা, নিরপেক্ষ ভাবে যা যে রকম তাকে ঠিক সেই ভাবে দেখা—এই হল আমাদের দেখার প্রকার।

যখন অনাসক্ত চেতনা জাগ্রত হয়ে যায় তখন যে কোন মাধ্যমকেই আমরা কাজে লাগাতে পারি। চোখ এক মাধ্যম। স্থূল বিষয়, যা চোখের মাধ্যমে দৃশ্য হয়, তা আমরা চোখ দিয়ে দেখব। যা মনের দ্বারা দেখার যোগ্য তা আমরা চোখ বন্ধ করে মনের দ্বারাই দেখব। যদি চোখ খুলে রেখেই দেখতে চান তো সেই ভাবেই দেখুন। ভেতরকে দেখুন। এই দেখাকে বলে 'অনিমেষ দর্শন'। কোনও বস্তুকে অপলক দৃষ্টিতে দেখুন। চোখ খোলা আছে, খোলাই থাকুক। পলক যেন না পড়ে। এই হল 'অনিমেষ দর্শন'। অর্থাৎ অপলক দৃষ্টিতে দেখা। তন্ত্র ও হঠযোগে একে 'ত্রাটক' বলা হয়েছে। ত্রাটকের অর্থ হল, অপলক দৃষ্টিতে এক বিন্দুকে দেখা। নিরন্তর দেখা।

তৃতীয় প্রশ্ন হচ্ছে—কেন দেখব? চেতনার মূল স্বভাবই হল দেখা। চিন্তা করা বুদ্ধির কাজ। বুদ্ধি চেতনার একটি রশ্মি মাত্র। আর বিচার তার আলোক। দেখা অখণ্ড চেতনার কাজ। চেতনা যখন অনাবৃত হয় তখন কেবল দর্শন হয় চিন্তন, আর হয় না। দেখাই আমাদের স্বভাব।

সেজন্য কেন দেখব এ প্রশ্নই হয় না। নিজের স্বভাবের সঙ্গে আমাদের পরিচয় কম, তাই এই প্রশ্ন অস্বাভাবিকও নয়। যতই গভীর ও স্থির ভাবে আমরা দেখতে শিখব ততই আমাদের একাগ্রতা বাড়বে ও সমাধির পুষ্টি সাধন হবে। সমাধি লাভ করার সবচেয়ে সরল উপায় হল দেখা। কোন এক বিন্দু বা লক্ষ্যের ওপর মনকে স্থির করুন আর নিরন্তর দেখতে থাকুন। কিছুক্ষণ পরেই নির্বিচারতা এসে যাবে এবং সমাধির অনুভব হতে থাকবে। নিরন্তর দেখার কাল যতই বাড়বে ততই সমাধির পুষ্টি সাধন হবে।

একাগ্রতা ও নির্বিচারতা লাভের যত প্রকার সাধন আছে, যথা—মন্ত্র,জপ, শ্বাস-নিরোধ, ঐকান্তিক বিচার, অবলম্বন প্রভৃতি—তাদের কোনটাই স্বাভাবিক নয়। কারণ প্রত্যেকটিতেই কোন না কোন বিশেষ বিকল্প বা প্রযত্নের প্রয়োজন হয়। দেখা কিন্তু স্বাভাবিক। তার জন্য কোন কল্পনা, বিচার বা বিকল্পের সহায়তা নেওয়ার আবশ্যক হয় না। মনকে নিয়োজিত করলেই চলে, তাতেই সহজে স্বভাব উদ্বুদ্ধ হয় আর লুক্কায়িত শক্তি প্রকট হতে থাকে। স্বভাবের অনুভূত চৈতন্যের সাক্ষাৎকার, স্থূলের মধ্যে গুপ্তভাবে অবস্থিত সূক্ষ্মের প্রতীকিকরণ, আনন্দ ও শক্তির অনুভব—এ সব নিরন্তর দর্শনের দ্বারাই পাওয়া যেতে পারে। সুতরাং দেখার অর্থ নিরতিশয় গভীর ও জটিলতাপূর্ণ নয়, এবং দুরূহ মীমাংসা-সাপেক্ষও নয়।

দর্শন (দেখা) সম্বন্ধে যে তিনটি প্রশ্ন উঠেছিল : কি দেখব ? কেন দেখব ? কেমন করে দেখব ? সেগুলির সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা হল।

এখন দ্বিতীয় প্রসঙ্গ হল, চিন্তন। চিন্তা করা, বিচার করা, ভাবা। চিন্তনও সত্যকে উপলব্ধি করার এক প্রকৃষ্ট সাধন। চিন্তন বা বিচারের সার্থকতা আছে। বিচার তখনই ব্যর্থ হয় যখন তা একটি বিষয়ের ওপর কেন্দ্রিত হয় না। কেউ যদি কেবল বিচারই করতে থাকে তবে বিচার অসার্থক হবে। একজন সমঝদার মানুষ ও পাগলের মধ্যে প্রভেদটা কোথায় ? তাদের মধ্যে সত্যিই খুব বেশি পার্থক্য নেই। যে ব্যক্তি

নিজের ইচ্ছামত নিজের বিচারশক্তির ওপর নিয়ন্ত্রণ রাখতে পারে সে সমঝদার, আর যে তা পারে না সে পাগল। সমঝদার ব্যক্তি বিচার করে, পাগলও বিচার করে। এমন মনে করবেন না যে, পাগল চিন্তা বা বিচার করতে পারে না। পাগলও চিন্তা করে, বিচার করে। কিন্তু যে বিচার তার মনে এসে যায়, তাকে আর সে ছাড়তে পারে না। ঐ বিচার যেন তাকে আঁকড়ে ধরে। ফলে তার মনে সতত ঐ একই বিচার চলে। যাকে বিচার আঁকড়ে ধরে, যে বিচার ছাড়তে পারে না, তাকে পাগল বলে। আর যে বিচারকে ছাড়তে পারে, তাকে ইচ্ছামত বদলাতে পারে, সে সমঝদার। দুজনের মধ্যে এই সামান্য পার্থক্য, যেন একটি সূক্ষ্ম রেখা দিয়ে দুজনের মধ্যে ব্যবধান করা হয়েছে।

কোন এক বিষয়ে চিন্তা করতে করতে যখন ইচ্ছা তখন সেই বিষয় ত্যাগ করে অন্য এক বিষয়ে চলে যাওয়ার ক্ষমতার খুবই উপযোগিতা আছে। আমরা বিচারের দ্বারা সত্যকে বুঝতে পারি, জানতে পারি। এই বিচার ধ্যানের দ্বারা অনেক মহত্ত্বপূর্ণ তথ্যের অনুসন্ধান করা হয়েছে। এক প্রাচীন পদ্ধতি আছে, যা যোগের প্রায় সব শাখাতেই পাওয়া যায়। আচার্য শিষ্যকে এক সমস্যা দিয়ে বললেন, এর সমাধান খোঁজ কর। কোন বইতে সমাধানের খোঁজ পাওয়া যাবে না, বস্তুতঃ বই থেকে কোন সাহায্যই পাওয়া যাবে না। আচার্য উপদেশ দিলেন, সমস্যাটি নিয়ে বিচার কর, চিন্তা কর। একদিন, দুদিন, দশদিন—যতদিন না সমাধান পাওয়া যায় ততদিন বিচার করতে থাক, চিন্তা করতে থাক। এই প্রক্রিয়ার দ্বারা অনেক দূরের ব্যাপারের খোঁজখবর পাওয়া গেছে, অতীতের ঘটনাবলীর সন্ধান মিলেছে, আর ভবিষ্যতে ঘটতে চলেছে এমন ঘটনা জানা গেছে।

এক পাথরের টুকরো হাতে এল। অনুসন্ধান করলে জানা যাবে এটা কোন উপাদানে গঠিত। তখন হয়ত জানতে হবে, কোন কোন অবস্থার মধ্য দিয়ে এই পাথর এতদিন টিঁকে আছে। পাথর নিয়ে বিচার চলল। পরিশেষে এমন এক অবস্থা এল যখন পাথর অব্যক্তরূপে তার সমস্ত

ইতিহাস জানিয়ে দিল।

কোন এক শব্দের অর্থ আমাকে জানতে হবে। আমি চিন্তা করতে লাগলাম। এমন সময় আসবে যখন শব্দ নিজেই তার অর্থ প্রকাশ করবে।

মহর্ষি চরক আয়ুর্বেদের প্রাচীন আচার্য। তিনি জঙ্গলে চলে গেলেন। সেখানে বিভিন্ন গাছপালার সামনে বসে বললেন—'তুমি আমাকে বল তোমার উপযোগিতা কি? কোন রোগের চিকিৎসায় তুমি কাজে লাগ? তোমার পরিণামই বা কি হতে পারে। বল, নিজের কথায় নিজের কাহিনী আমাকে শোনাও।' এই বলে তিনি তন্ময় হয়ে গেলেন, একাগ্রচিত্তে সমস্যার চিন্তা করতে লাগলেন। একাগ্রতা যখন চরম বিন্দুতে পৌঁছল, তখন গাছপালা তাদের শ্রেষ্ঠ গুণ ধর্ম বর্ণনা করতে লাগল এবং চরক তা জানতে পারলেন। এ ঘটনা সত্য। গাছ অবশ্য কথা বলে না। কিন্তু ঐ সমস্যা নিয়ে নিরন্তর চিন্তা করার ফলে মন এত গভীরে প্রবেশ করে যে সূক্ষ্ম পর্যায়ের সঙ্গে তার সাক্ষাৎকার হয়। তখন আপনা থেকেই শ্রেষ্ঠ পর্যায়গুলি উদঘাটিত হয়। এই হল বিচারের প্রক্রিয়া, সত্যকে জানার বিশেষ উপযোগী প্রক্রিয়া। এই প্রক্রিয়া দ্বারা আজও অনেক রহস্যের উদঘাটন করা যায়। জৈন পরিভাষায় একে 'ধর্ম্য ধ্যান' বলা হয়।

দুই প্রকার ধ্যানকে শুভ মনে করা হয়—এক ধর্ম্য ধ্যান, অপর শুক্ল ধ্যান। শুক্ল ধ্যানের অর্থ—আত্মাকে দেখা। এই ধ্যানে আত্ম-সাক্ষাৎকার হয়। ধর্ম্য ধ্যানের অর্থ হল বস্তুর স্বভাব। এখানে ধর্ম নেই, ধর্ম্য আছে। ধর্ম-অধর্ম শব্দ দুটি এখানে ব্যবহারযোগ্য নয়। এই শব্দ দুটি আচারের সঙ্গে, আচরণের সঙ্গে, সম্বন্ধযুক্ত, ধর্ম্য শব্দের সঙ্গে এদের সম্বন্ধ নেই। ধর্ম্য শব্দের অর্থ বস্তু স্বভাব। বস্তুর স্বভাব বিচার দ্বারা, অনুসন্ধানের দ্বারা, চিন্তন দ্বারা জানা—এই হল ধর্ম্য ধ্যানের প্রক্রিয়া। এর দ্বারা বস্তুর গুণ-ধর্ম জানা যায়। কোন বস্তুর কি গুণ, কি দোষ তা জানা যায়। বস্তুর অভ্যন্তরীণ স্বরূপ, সূক্ষ্ম স্বরূপ জানা যায়। এই হল

বিচার ধ্যান বা চিন্তন ধ্যান। এর তাৎপর্য হল বিচার প্রধান ধ্যান, চিন্তন প্রধান ধ্যান। আমি স্বীকার করি না যে চিন্তনের দ্বারা বা বিচারের দ্বারা ধ্যান হয় না; বিচার করাও ধ্যান, চিন্তা করাও-ধ্যান। তবে বিচার তখনই ধ্যানে পরিণত হয় যখন তা এক দিকেই গড়িয়ে প্রবাহিত হয়, চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে না বা বিক্ষিপ্ত হয় না। একদিকে যাওয়া জলধারায় পরিণত হয়। এই ধারাই চাই। ধ্যানের ধারা চলবে। ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত জলের বিন্দুতে জলধারা হয় না। সেই রকম ছড়িয়ে পড়া বিচার দ্বারা ধ্যান হয় না। বিচার যখন কেন্দ্রিত হয়, এক দিকে প্রবাহিত হয়, তখন তা ধ্যান পদবাচ্য হয়।

বিচারও ধ্যান, নির্বিচারও ধ্যান। উভয় প্রকার ধ্যানের নিজ নিজ মহত্ত্ব আছে। একদিকে প্রবাহিত বিচারই ধ্যান, তাকে বলে বিচার ধ্যান। দর্শনের ভূমিতে হয় নির্বিচার ধ্যান। এখানে বিচার হয় না, কেবল দর্শনই হয়। একথা মানা যায় না যে নির্বিচার ধ্যানে কিছুই ঘটে না। কিছুই না ঘটা তো মূর্চ্ছার অবস্থা, ধ্যানের অবস্থা নয়। ধ্যানের কোন না কোন উদ্দেশ্য বা লক্ষ্য বা বিষয় থাকে। এক প্রশ্ন হতে পারে যে, যখন আমরা একদিকে চিন্তাকে প্রযুক্ত করি তখন ধ্যান হয় না। যখন আমরা একভাবে দেখি তখন ধ্যান হয়। উত্তর হল, একদিকে চিন্তা করা বিচার-ধ্যান, আর দেখা নির্বিচার-ধ্যান; উভয়ই ধ্যান।

প্রেক্ষা ধ্যানে দুয়ের উপযোগিতা আছে। প্রেক্ষার অর্থ নির্বিচার ধ্যান, দেখার ধ্যান। প্রেক্ষা ধ্যানের প্রথম অঙ্গ হল দেখা। এই অবস্থায় আমরা কেবল দেখি, কোন বিচার করি না। শরীরকে দেখি, কিন্তু বিচার করি না। শরীরের ভেতরে যা কিছু ঘটে চলেছে তা লক্ষ্য করি। কোথায় চঞ্চলতা হচ্ছে? কোথা থেকে শব্দ আসছে? কোথায় কোন অবয়ব সক্রিয় আছে? এই সবই আমরা দেখি, কেবল দেখি, কোন চিন্তা বা বিচার করি না। আমাদের শরীরের ভেতরে সর্বদা নানা প্রকার ক্রিয়া হয়ে চলেছে, অনেক প্রকার শব্দ উত্থিত হচ্ছে। আমরা এই সব ক্রিয়ার কথা জানি না, এই সব শব্দ শুনি না। কারণ বাইরে এত শব্দ নিয়ত

উঠছে যে ভেতরের সূক্ষ্ম শব্দ শোনার অবসরই আমাদের হয় না। এই সব শব্দ আপনি ধ্যানের দ্বারা শুনুন, সত্যিই শোনা যাবে। আমাদের হৃৎপিণ্ড ধুক ধুক করছে, সে শব্দ আপনি শুনতে পারেন। রক্তের প্রবাহ নিরন্তর বয়ে যাচ্ছে, তার শব্দও আপনি শুনতে পারেন। এজন্য অবশ্য আপনাকে সূক্ষ্মতার মধ্যে যেতে হবে। পূর্ণ একাগ্রতা আনতে হবে। তবেই আপনি ঐ সব সূক্ষ্ম শব্দ শুনতে পারেন। প্রেক্ষা ধ্যানের অর্থ কেবল দেখা, চিন্তা করা বা বিচার করা নয়।

প্রেক্ষা ধ্যানের দ্বিতীয় অঙ্গ—অনুপ্রেক্ষা। অনুপ্রেক্ষার অর্থ, ধ্যানে আমরা যা কিছু দেখি তার পরিণাম সম্বন্ধে বিচার করা। 'অনু' শব্দটির অর্থ—যা পরে ঘটে। ধ্যানে যা দেখি, প্রেক্ষায় যা দেখি, তাকে পরে প্রেক্ষা করা, তার পরিণাম সম্বন্ধে বিচার করা— এই হল অনুপ্রেক্ষা। 'অনু'—অর্থাৎ পরে, 'প্রেক্ষা'—অর্থাৎ বিচার করা। আমরা দেখি শরীরের কোন অংশে স্পন্দন হচ্ছে। পরমাণু আসছে যাচ্ছে, পরমাণুর উপচয় হচ্ছে, আবার অপচয়ও হচ্ছে। পরমাণুর জন্ম হচ্ছে, বাড়ছে। আমরা এ সমস্ত দেখি। তার পরে চিন্তা করি, এ সবের পরিণাম কি হবে? আমরা অনিত্যকে অনুপ্রেক্ষা করি, কারণ পরমাণুর এই যে স্পন্দন আর যাতায়াত তা নিত্য হতে পারে না। ঐ সমস্ত যখন অনিত্য উপলব্ধ হয় তখন আমরা উপলব্ধি করি শরীর অনিত্য। শরীর অনিত্য, এ তথ্য জানার আধার কি? জানার আধার—প্রেক্ষা। যখন আমরা প্রেক্ষার দ্বারা দেখি শরীরে স্পন্দন, কম্পন, গতি, পরমাণুর যাতায়াত, পরমাণুর অপচয় আছে, তখন বুঝি এ সবের অর্থ, শরীর অনিত্যধর্মা। এই অনিত্যতা অনুভব করা, বিচার করা, চিন্তা করা—এরই নাম অনুপ্রেক্ষা।

প্রেক্ষা আর অনুপ্রেক্ষা এক সঙ্গে চলবে। আমরা প্রেক্ষা করব, অনুপ্রেক্ষাও করব। প্রেক্ষা ও অনুপ্রেক্ষা কোনটাই নিরন্তর চলতে পারে না। আমরা কখনও প্রেক্ষা করব, আবার কখনও অনুপ্রেক্ষা করব। প্রথমে প্রেক্ষা, তারপরে অনুপ্রেক্ষা। প্রথমে দেখা, তারপরে যা দেখলাম

তার সম্বন্ধে বিচার করা। বিচারের ফলে যা সার নিষ্কর্ষ পাওয়া যাবে তা জীবনে কাজে লাগাতে হবে।

ধ্যানের দুটি দিক—প্রেক্ষা ও অনুপ্রেক্ষা। আমরা দেখব আর চিন্তা করব। উভয় প্রকারে ধ্যানকে অবলম্বন করে আমরা সত্যকে অনুভব করব, যথার্থকে জানব আর নিরপেক্ষভাবে বস্তুকে দেখার অভ্যাস করব। তবেই আমরা প্রেক্ষাধ্যানে সফলতা লাভ করতে পারব। প্রেক্ষাধ্যানের প্রয়োজন এই যে, এর দ্বারা আমরা গভীরে অবতরণ করে দেখার ও সম্যক প্রকারে চিন্তা করার অভ্যাস করতে পারি এবং পরিশেষে সত্যের সাক্ষাৎ লাভ করে কৃতার্থ হতে পারি।

২

শরীর সাধনা

প্রথমে 'পাওয়ার হাউস' তৈরি করা হয়, পরে তা থেকে তার টানা হয়। তখন সেই তারের ভেতর দিয়ে বিদ্যুৎ প্রবাহিত হয় আর বালবের মাধ্যমে প্রকট হয়। যতক্ষণ পর্যন্ত বালবের সঙ্গে সংযোগ না ঘটে তত-ক্ষণ পর্যন্ত বিদ্যুৎ প্রকট হতে পারে না। আমরা কেবল বিদ্যুৎ প্রবাহের ওপর মনোযোগ কেন্দ্রিত করি না, বরং যার মাধ্যমে তা অভিব্যক্ত হয় তার ওপরও পূর্ণ মনোযোগ আরোপ করি।

আমাদের শরীর হচ্ছে সবরকম শক্তির অভিব্যক্তির সবচেয়ে শক্তিশালী মাধ্যম। আমরা যদি শক্তির ওপর মনোযোগ কেন্দ্রিত করি আর সেই শক্তির অভিব্যক্তির মাধ্যমের ওপর মনোযোগ না দিই, তবে তা হবে সবচেয়ে সাংঘাতিক ভুল। শরীরই মাধ্যম, সুতরাং তাকে উপেক্ষা করা মারাত্মক ভুল।

প্রথমেই আমাদের মনোযোগ দিয়ে দেখতে হবে, যেসব শক্তি প্রকট হবে সেগুলি ধারণ করার সামর্থ্য আমাদের শরীরের আছে কিনা। তার সে ক্ষমতা আছে কিনা। শরীর যদি সশক্ত না হয়, সক্ষম না হয়, তবে কোন শক্তিই তাতে অবতরণ করবে না বা অভিব্যক্ত হতে পারবে না। কারণ দুর্বল শরীরে কোন শক্তির অভিব্যক্তি সম্ভবপর নয়। আমাদের

শরীরে যতগুলি শক্তিকেন্দ্র আছে সেগুলিকে আগে সুদৃঢ় করতে পারলে তবেই শরীরে বিশেষ কোন শক্তির অবতরণ সম্ভব হতে পারে। এই দৃষ্টিকোণ থেকেই আমি পরামর্শ দিই যে, আমরা যেন আমাদের শরীরের প্রতি উদাসীন না হই বা ঘৃণার ভাব পোষণ না করি। বরং আমরা যেন শরীরকে ভালবাসতে শিখি। কারণ শরীরই আমাদের সব রকম সফলতার মাধ্যম এবং সবচেয়ে শক্তিশালী মাধ্যমও বটে। সবার আগে আমাদের শরীরকে বুঝতে হবে আর শরীরে যেসব শক্তি কেন্দ্র, যেসব চৈতন্য-কেন্দ্র অবস্থিত আছে সেগুলিকে বুঝতে হবে।

শরীর কি? সাধারণভাবে বলতে গেলে, রক্ত, মাংস ও নোংরা জিনিষের পিণ্ডমাত্র। এতে আছে হাড়, মজ্জা, মেদ প্রভৃতি। এগুলি বড়ই বীভৎস, দেখলেই মন ঘৃণায় ভরে ওঠে। আমাদের সামনে শরীর বীভৎস রূপ নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। বৈরাগ্যের দৃষ্টিকোণ থেকে আমরা তার বীভৎসতা দেখতে যত্ন করে থাকি। এই দৃষ্টিকোণ ভুল নয়। এ কথা সত্য যে শরীর যথার্থই বীভৎস, এতে সার পদার্থ কিছু নেই। যে সাতটি ধাতুতে শরীর গঠিত তার সব কটিই নশ্বর। শরীর যে বীভৎস, বিকৃত ও খারাপ তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু এ তো দেখার এক কোণ মাত্র, অন্য অন্য কোণ থেকেও দেখতে হবে। কোন বস্তুকে কেবল এক কোণ থেকে দেখলে যথেষ্ট হবে না। যদি আমরা কেবল এক কোণ থেকেই দেখি তবে আমরা একাঙ্গী হয়ে যাব এবং আমাদের দৃষ্টিকোণ অসম্যক হবে। আমাদের দৃষ্টিকোণ তখনই সম্যক হয় যখন আমরা একই বস্তুকে বিভিন্ন কোণ থেকে দেখতে অভ্যস্ত হই। যখন আমরা অনেক কোণ থেকে দেখি তখনই হয় প্রকৃত দর্শন। অন্যথায় কেবল দেখাই হয়। সে দেখা খণ্ডিত দৃষ্টি মাত্র, ফলে প্রমাদদুষ্ট।

শরীরকে দেখার অন্য দৃষ্টিকোণও আছে। তা এই যে, আমাদের পক্ষে শরীর যতটা সারভূত ততটা অন্য কোন মূর্ত বস্তুই নয়। একমাত্র এই শরীরই পরমাত্মার বা চৈতন্যের বা শক্তির অভিব্যক্তিকে প্রকট করতে সক্ষম। সমর্থ শরীর না থাকলে কেউ কেবলজ্ঞানী হতে পারে না।

কেবলজ্ঞান আত্মার শক্তি, আত্মার নিরাবরণ অবস্থা। এই অবস্থায় জ্ঞানের সমস্ত আবরণ দূর হয়, আর পূর্ণ চেতনার উদয় হয়। কিন্তু এই জ্ঞান প্রকট হওয়ার একটা শর্ত আছে। যে কোন শরীর কেবলজ্ঞানের অবতরণ সহ্য করতে পারবে না। এজন্য শর্ত এই যে, যে শরীর বজ্র-ঋষভ-নারাচের মত সুদৃঢ় সংগঠনযুক্ত একমাত্র সেই শরীরই কেবলজ্ঞানের অবতরণের ধাক্কা সহ্য করতে পারবে। এই রকম শরীর-ধারী ব্যক্তিই কেবলী হতে পারে, অন্য কেউ নয়। বজ্র-ঋষভ-নারাচ হল সবচেয়ে শক্তিশালী শরীর সংরচনা। এরকম শরীরে অস্থির বাঁধন খুব মজবুত হয়। এরকম শরীরসম্পন্ন ব্যক্তিই কেবলজ্ঞানী হতে পারে। সাধারণ কোন মানুষের পক্ষে তা সম্ভব নয়।

আপনি ভাবতে পারেন, এ কেমন শর্ত? শরীরের সঙ্গে কেন এমন শর্ত? কেবলজ্ঞান প্রাপ্তির অর্থ তো চেতনার অভ্যুদয়, বিশুদ্ধ চেতনার অবতরণ, চেতনার পূর্ণ বিকাশ। তা আত্ম-নির্মলতা থেকে পাওয়া যায়, সম্পূর্ণরূপে রাগ-দ্বেষের বিলয় হলে তা মেলে। তবে এর সঙ্গে শরীর-সম্বন্ধীয় শর্ত কেন? এই প্রতিবন্ধ কেন, যে ব্যক্তির শরীর-সংরচনা বজ্র-ঋষ-নারাচের মত সুদৃঢ়, সে ব্যক্তিই শুধু কেবলী হতে পারে, অন্যে নয়।

এরকম তর্ক হতে পারে বটে, কিন্তু আমি বলি এমন শর্ত খুবই মহত্বপূর্ণ।

মনে করুন, একটা ছোট মঞ্চ তৈরি করা হয়েছে। তার ওপর দশ জন বসতে পারে। ঐটুকু মাত্র তার ক্ষমতা। এখন যদি পঞ্চাশজন তার ওপর বসার চেষ্টা করে, তবে মঞ্চটি ভেঙ্গে যাবে। কারণ পঞ্চাশ জনের ভার বহন করার শক্তি তার নেই। পাতলা কাপড়ের ওপর বেশি ভারি জিনিস ফেলে দিলে কাপড় কেটে যাবে। যতটা ভার বহন করার ক্ষমতা যার আছে সে কেবল ততটা ভারই বহন করতে পারে।

শরীরের সংহনন, শরীরের সংরচনা যদি দুর্বল হয়, যদি স্নায়ু-সংস্থান, কমজোর হয় এবং তা সত্ত্বেও যদি কৈবল্যের মত বিরাট শক্তি সেই

শরীরে অবতরণ করে তবে সেই শরীর ফেটে যাবে। কৈবল্যের কথা দূরে থাকুক, ছোট কোন শক্তির অবতরণও সেই শরীর সহ্য করতে পারবে না। তা একেবারেই বিকল হয়ে যাবে।

মস্তিষ্কে সহস্রার নামে এক চক্র আছে, তা এক প্রসিদ্ধ শক্তি-কেন্দ্র। কোন দুর্বল ব্যক্তি ঐ শক্তি-কেন্দ্রের উপর ধ্যান করল। তার ফল কি হল? ধ্যানের দ্বারা ঐ চক্র সক্রিয় হয়ে উঠল এবং সক্রিয়তার ফলে উষ্ণতা উৎপন্ন হল, তাপ আর শক্তি উৎপন্ন হল। সেই তাপ এত তীব্র হয় যে দুর্বল শরীর তা সহ্য করতে পারে না, ধারণ করতে পারে না। ফলে সেই দুর্বল ব্যক্তি পাগল হয়ে যেতে পারে।

সাধারণত বলা হয়ে থাকে, সহস্রার চক্রের ওপর ধ্যান কর, মনকে সেখানে একাগ্র কর। কিন্তু সেই সঙ্গে এও মনে রাখতে হবে যে ঠিক কোন অবস্থায় ঐ কেন্দ্রের ওপর ধ্যান করা উচিত হবে। যদি আমরা আগে আজ্ঞাচক্রের সাধনা সম্পূর্ণ না করি, আজ্ঞাচক্রের ওপর ধ্যানকে কেন্দ্রিত করার ক্ষমতা বিকশিত না করি, অথচ সোজা সহস্রার চক্রের ওপর ধ্যান করার চেষ্টা করতে থাকি, তবে অনর্থ ঘটতে পারে। সেক্ষেত্রে লাভের বদলে লোকসানই হতে পারে। সহস্রার চক্রে ধ্যান করার এই যে প্রযত্ন, তা সার্থক হবে না, কারণ সেখানকার তীব্র তাপ সহ্য করার ক্ষমতা আমাদের শরীরে গড়ে ওঠেনি। অনেক ধ্যান-সাধক পাগল হয়ে যান। সেটা কিন্তু ধ্যানের দোষ নয়, সাধকেরই দোষ। কারণ সাধক জানে না, কখন কোন অবস্থায় কোন স্থানে ধ্যান করা উচিত, আগে কোন শক্তির বিকাশ করা দরকার এবং পরেই বা কোন শক্তির করা উচিত। যেখানে এই জ্ঞান থাকে না সেখানে উত্তেজনা বাড়ে, উত্তাপ বাড়ে এবং ফলে লাভের বদলে লোকসানই হয়।

আমাদের একথা বুঝতে হবে যে, শরীরের বিভিন্ন শক্তির বিকাশের একটা নির্দিষ্ট ক্রম আছে। শরীর সাধনা করতে হলে ঐ শক্তিগুলির ক্রমিক বিকাশ করতে হবে। শরীর সাধনার প্রথম ধাপই হল, ঠিকমত বসতে শেখা। এটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এই আধারের ওপরেই

আসনের বিকাশ ঘটেছে। বসার হাজার হাজার প্রকার বর্ণনা করা হয়েছে, কেবল দুই-এক প্রকার নয়। বসা একটা সামান্য কাজ বলে মনে হয়। এ সম্বন্ধে এত মনোযোগ দেওয়ার কারণ কি? বসার এত প্রকারভেদের সার্থকতা কি? আসনের বিশেষ বিকাশের প্রতি এত গুরুত্ব আরোপ করার আবশ্যকতা কি?

বসা সামান্য কাজ, মানুষ যেমনভাবে চায় তেমনভাবে বসতে পারে। কিন্তু যখন শরীরের সাধনা করা হয় এবং শরীরের মধ্যে বিশিষ্ট শক্তির অবতরণ সম্ভব করার জন্য প্রযত্ন করা হয়, তখন বসার প্রতি যথেষ্ট গুরুত্ব আরোপ করতেই হবে। কিভাবে বসতে হবে তা বুঝতে হবে।

এমনভাবে সোজা হয়ে বস, যাতে মেরুদণ্ডের হাড় যেন সোজা অবস্থাতেই থাকে এবং গ্রীবাদেশও যেন সোজা থাকে। পিছনের সম্পূর্ণ অংশ অর্থাৎ সুষুম্নার অগ্রভাগ থেকে মূলাধার পর্যন্ত সমস্ত অংশই, যেন সোজা থাকে। এভাবে বসার সাধনা করতে হয়। সাধারণত মানুষ সোজা হয়ে বসে না, হয় সামনের দিকে ঝুঁকে বসে, নয় পেছনের দিকে ঝুঁকে বসে, আবার কখন পাশে হেলে বসে। কোন ক্ষেত্রেই সে ঠিক সোজা হয়ে বসে না। সাধনার দিক থেকে সোজা হয়ে বসার খুবই প্রয়োজন আছে। সোজা হয়ে বসার উদ্দেশ্য হল, আমার প্রাণধারার পথে যেন কোন বাধা বা অবরোধ সৃষ্ট না হয়। প্রাণধারার সর্বাধিক প্রবাহ চলে পৃষ্ঠরজ্জুস্থ সুষুম্না নাড়ির ভেতর দিয়ে। মেরুদণ্ডের হাড় অনেকটা ফাঁপা। ওর ভেতরে সুষুম্না নালী আছে। ওটা মধ্য নালী, ওর ভেতর দিয়ে প্রাণের প্রবাহ চলে। যদি বাঁকা হয়ে বসি, প্রাণের প্রবাহে বাধা উৎপন্ন হয়। আমি শক্ত হয়ে বসলে বা এপাশে-ওপাশে হেলে বসলেও প্রাণপ্রবাহের বাধা হয়। ঠিক সোজা হয়ে বসলে এই বাধা উৎপন্ন হয় না। সেজন্য বলা হয় যে, সোজা হয়ে বস। মেরুদণ্ডের হাড়ের বা সুষুম্না নালীর গুরুত্ব কেবল সাধনার দৃষ্টিতেই নয়, স্বাস্থ্যের দৃষ্টিতেও এদের বিশেষ মূল্য আছে। আয়ুর্বেদের আচার্যরা লিখে গিয়েছেন, ভোজন করতে সোজা হয়ে বস, বেঁকে বস না। কথা বলার সময়ে বাঁকা

হয়ে বস না, হাঁটবার সময় বাঁকা হবে না। শরীরের যে কাজই কর, লক্ষ্য রেখ, মেরুদণ্ড যেন সোজা থাকে, যেন না বাঁকে।

সুষুম্নার সুস্থতাই আমাদের স্বাস্থ্যের মূল আধার। মেরুদণ্ডের হাড় যদি সুস্থ থাকে ও সঠিক অবস্থায় থাকে, তবে আমাদের সম্পূর্ণ সুস্থ থাকার বিষয়ে কোন গোলযোগ হবে না। আর তা যদি সুস্থ না থাকে, তবে তার প্রভাব সমস্ত শরীরের ওপরই বর্তাবে। এখন চিকিৎসাজগতে এই তথ্য স্বীকৃত হয়েছে যে, মেরুদণ্ডের হাড়ের বিকৃতির কারণেই ব্যাধির উৎপত্তি হয়। এজন্য কোন ব্যাধিরই আলাদাভাবে চিকিৎসা করার দরকার হয় না, কেবল মেরুদণ্ডের হাড়ের চিকিৎসা করলেই সেই ব্যাধির উপশম হয়। এটা চিকিৎসার এক পদ্ধতি।

আমার হাঁটুতে ব্যথা হওয়ায় একজন চিকিৎসক দেখাই। তিনি 'আকুপাংচার' পদ্ধতিতে চিকিৎসা আরম্ভ করেন। তিনি বললেন— 'মেরুদণ্ডের হাড়ে কিছু গোলযোগ ঘটেছে, তাই হাঁটুতে ব্যথা হয়েছে।' এ কেমন সম্বন্ধ। ব্যথা হয়েছে হাঁটুতে, আর সম্বন্ধ মেরুদণ্ডের হাড়ের সঙ্গে। পেটের ব্যথা, মাথার ব্যথা, কোমরের ব্যথা, শরীরের যে কোন স্থানের ব্যথা, সব কিছুরই কারণ মেরুদণ্ডের হাড়ের কোন না কোন গোলযোগ। তার চিকিৎসা করলেই ব্যথা সেরে যাবে, শরীর নিরাময় হবে। মেরুদণ্ডের হাড় আমাদের শরীরের ও স্বাস্থ্যের মূল কেন্দ্র। সাধনার দৃষ্টিতেও তা খুব গুরুত্বপূর্ণ। যে সাধক সুষুম্নাকে ঠিকমত বুঝতে সমর্থ হয়েছেন তিনি সাধনার শীর্ষবিন্দুতে আরোহণ করার যোগ্যতা লাভ করেছেন। আর যিনি সুষুম্নাকে ঠিকমত বুঝতে পারেননি তিনি সাধনা করতে চেষ্টা করলেও তাঁর সে চেষ্টা সফল হবে না।

আমাদের শরীরে অনেক চৈতন্য-কেন্দ্র আছে, যেখানে চৈতন্য বিকশিত হয়, প্রকট হয়। এই কেন্দ্রগুলির মাধ্যমেই বিশেষ বিশেষ শক্তির অবতরণ হয়। এই সব কেন্দ্রের সাধনা করতে হবে। বিকশিত করতে হবে। যতদিন আমরা সেগুলিকে বিকশিত করতে না পারি ততদিন প্রকৃতপক্ষে তাদের কোন উপযোগিতা হবে না। এই

প্রসঙ্গে এক গল্প বলছি, যাতে আলোচ্য তথ্য স্পষ্ট হয়ে ফুটে উঠবে।

এক ভাই তার বোনের বাড়ি গিয়েছে। আহারের সময় হয়েছে। না জানি বোনের মনে কোন্ ভাবের উদয় হল—সে এক থালা গম এনে ভাইয়ের সামনে রেখে দিল। ভাই তো আর প্রাকৃতিক চিকিৎসা করাচ্ছিল না যে কাঁচা গমই খাবে। বোনের দেওয়া গমের থালা দেখে ভাই বলল—'বোন। এ কি? এ কি করে খাওয়া যায়?' বোন বলল—'কেন,আমি তো মূল বস্তুই খেতে দিয়েছি। সব খাদ্যই তো গম থেকে তৈরি হয়, তাই ওটাই মূল খাদ্য। আমি ভাবলাম, ভাই আমার ঘেরে এসেছে, তাকে মূল বস্তুই খাওয়াব।' ভাই সে কথা শুনল, তারপর না খেয়ে উঠে পড়ল। বেচারা খাবেই বা কি?

এরপর কয়েক মাস গেল। ভাইয়ের কাছে বোনের মেয়ের বিয়ের সংবাদ এল। বোনের বাড়িতে ভাই এক পুটলি পাঠাল। ভাইয়ের বাড়ি থেকে কিছু এসেছে দেখে বোন খুশি হল। কিন্তু সে পুটলি খুলে দেখল তার ভিতরে তূলা—কেবল তূলা—আছে। বোন এর অর্থ কিছুই বুঝতে পারল না। সে আশা করেছিল খুব ভাল কাপড় এসেছে। অথচ এসেছে কেবল তূলা। কিছুদিন পরে ভাই বোনের বাড়ি এল। বোন জিজ্ঞাসা করল—'এ কেমন তামাসা? বিয়েতে তূলার কি দরকার? পাঠাবে কাপড়-চোপড়, আর পাঠালে শুধু তূলা। এ কেমন কাজ?' ভাই বলল—'বোন। আমি তো মূল জিনিসই পাঠিয়েছি। সব রকম কাপড় তো এই তূলা থেকেই তৈরি হয়। আমি ভাবলাম, কাপড়চোপড় কি পাঠাব। বোনের বাড়িতে বিয়ে হচ্ছে, সেখানে কাপড়ের মূল বস্তুই পাঠাই। তাই তূলা পাঠালাম। সব রকম কাপড়ের মূলই হল তূলা।'

সব আহার্য বস্তুই গম থেকে প্রস্তুত হয় আর সব কাপড়ই তূলা থেকে তৈরি হয়। একথা ঠিকই বটে, কিন্তু এর দ্বারা পুরো বিষয় বলা হয় না, তার একদিক মাত্র বলা হয়। আমিও স্বীকার করি যে, গম থেকেই সব ভোগ্য দ্রব্য তৈরি হয় আর তূলা থেকেই সব কাপড় তৈরি হয়। কিন্তু কেবল গম দিয়ে পেট ভরে না আর কেবল তূলা দিয়ে লজ্জা

নিবারণ হয় না বা শৈত্য ও আতপ থেকে রক্ষা পাওয়া যায় না। গম দিয়ে খাদ্য বানাতে হয়, তবেই ক্ষুন্নিবৃত্তি হয়। তুলা দিয়ে কাপড় বুনতে হয়, তবেই লজ্জা নিবারণ করা সম্ভব হয়, আর শৈত্য ও আতপ থেকে রক্ষা পাওয়া সম্ভব হয়। পেট কেবল তখনই ভরবে যখন গম থেকে রুটি বানিয়ে খাওয়া হবে। শৈত্য ও আতপ থেকে কেবল তখনই ত্রাণ পাওয়া সম্ভব হবে যখন তুলা থেকে কাপড় বুনে নেওয়া হবে।

শরীর মূল বস্তু, শরীর কাঁচা মাল। এর থেকে আমরা যা চাই তাই বানাতে পারি, প্রাপ্ত হতে পারি। এই শরীরের মধ্যে আমাদের সকল প্রকার শক্তির কেন্দ্র, চৈতন্যের কেন্দ্র বিদ্যমান আছে। সেখান থেকে আমরা বর্তমানকে দেখতে পারি, অতীতকে দেখতে পারি এবং ভবিষ্যৎকেও দেখতে পারি। শক্তিবিশেষের অবতরণ হলে আমরা নিজের হাড়কে বজ্রের মত কঠিন করে গড়তে পারি, নিজের বুকের ওপর মোটরগাড়ি বা হাতিকে তুলে নিতে পারি।

এমন অনেক লোক আছে যারা এই প্রকার শক্তি প্রদর্শন করে। তারা বুকের ওপর দিয়ে ট্রাক চালিয়ে নিয়ে যেতে দেয়। অথচ তাদের হাড় ভাঙ্গে না, শরীরের সামান্য ক্ষতিও হয় না। এ কি করে সম্ভব হয়? সম্ভব হয় এই কারণে যে, তারা প্রাণকে সাধনার দ্বারা শক্তিশালী করেছে। তাই তাদের শরীরের কিছুই বিকল হয় না। এটাই নিয়ম। কিন্তু কাঁচা মাল দিয়ে, কেবল শরীর দিয়ে, এমন কিছু করা সম্ভব নয়। কাঁচা গম দিয়ে পেট ভরে না, কেবল তুলা দিয়ে শৈত্য ও আতপের প্রতিরোধ হয় না। পেট ভরানোর জন্য, দেহ আচ্ছাদনের জন্য, অন্য অনেক প্রস্তুতির আবশ্যকতা থাকে। এ কথা শরীর সম্বন্ধেও প্রযোজ্য। শরীরের সাধনা করার আবশ্যকতা আছে। তার শক্তি ও চৈতন্যকেন্দ্র-গুলিকে বিকশিত করে নেওয়ার আবশ্যকতা আছে। পূর্ণ প্রস্তুতির আবশ্যকতা আছে। তাই সাধনার দৃষ্টিতে শরীরের সাধনা অত্যন্ত প্রয়োজনীয়।

শরীরের সাধনা করতে হবে। শরীরের প্রত্যেক অবয়বের শক্তি

আব চৈতন্যেব অবতবণ ঘটানোব, অভিব্যক্ত কবানোব যে যে ক্ষমতা আছে, সেই সব ক্ষমতা কেন্দ্রকে আমবা এমন সমর্থ কবে গড়ে তুলব যে প্রবল শক্তিব অবতবণ, বিশাল চৈতন্যেব অভিব্যক্তি সম্ভব হবে, আব আমবা তাব উপযোগ কবতে সক্ষম হব।

শবীব সাধনাব এক উপায হল—আসন। আপনাবা শুনে থাকবেন ভগবান মহাবীব ষোল দিন ষোল বাত একভাবে সোজা দাঁড়িযে থাকতেন। সোজা দাঁড়িযে থাকাও এক প্রকাব আসন। মহাবীব যদি কখন 'উকড়ু' আসনে বসতেন তো সাবাবাত সেই আসনে বসে থাকতেন। এই আসনে পাযেব পাতা মাটিব ওপব থাকে, কিন্তু গোড়ালি থাকে কিছুটা উঁচু। তিনি পাযেব পাতাব ওপব ভব বেখে সাবা বাত সাবা দিন বসে থাকতেন। জৈন, বৌদ্ধ আব বৈদিক পবম্পবায হাজাব হাজাব সাধু ও সন্ন্যাসী হযেছেন। তাঁবা শবীবেব সাধনাব জন্য বিভিন্ন প্রকাব আসনেব সাহায্য নিযেছেন। কোন সাধক এত দীর্ঘ সময একই আসনে বসে থাকেন—একথা অস্বাভাবিক ও প্রকৃতিবিরুদ্ধ বলে মনে হতে পাবে। এটা অস্বাভাবিক মনে হতে পাবে বটে, কিন্তু আসলে এটা তা নয। আপনাকে কেউ যদি বলে, সাবা বাত না শুযে 'উকড়ু' আসনে বসে বাত কাটান, তাহলে আপনি নিশ্চয ভাববেন—এ কি? এ তো অস্বাভাবিক কথা। কিন্তু যাঁবা শবীবেব সাধনা কবেছেন তাঁদেব কাছে এ সব প্রকৃতিবিরুদ্ধ নয, অস্বাভাবিকও নয।

কাযোৎসর্গ কবা অস্বাভাবিক ব্যাপাব বলে মনে হতে পাবে। তর্ক উঠতে পাবে যে, শবীবকে নড়াচড়া কবতে না দিযে কি কবে একভাবে বসে থাকা যেতে পাবে? এ অসম্ভব। আপনাবা জানতে পাবেন যে, ভগবান ঋষভেব পুত্র বাহুবলী বাব মাস ধবে কাযোৎসর্গেব মুদ্রায দাঁড়িযে ছিলেন। এইভাবে পুবো এক বছব গত হযেছিল। তাঁব চাবপাশে ঘাস গজিযে গিযেছিল। লতাপাতা তাঁব শবীবকে ঘিবে ফেলেছিল। পাখিবা তাঁব শবীবেব ওপব বাসা বেঁধেছিল। তিনি স্থিব ও অচঞ্চল ভাবে সোজা দাঁড়িযে ছিলেন। এ কি সম্ভব যে কোন ব্যক্তি এক বছব

ধরে, পুরো বার মাস ধরে, সোজা দাঁড়িয়ে থাকতে সমর্থ হয়েছিলেন? কোন রকম নড়াচড়া করেন নি? অসম্ভবই মনে হয়। সবাই এ রকম করতে পারে না। কিন্তু যে ব্যক্তি আপন শক্তিকে জাগ্রত করার জন্য, আপন শক্তিকেন্দ্রগুলিকে বিকশিত ও প্রকট করার জন্য, শরীরের সাধনা করেছেন সে ব্যক্তি ঐরূপ করতে পারেন। এমন অবস্থা যে হতে পারে তা অস্বীকার করা যায় না। তবে আমি স্বীকার করি যে, এই অবস্থাকে সম্ভব করে তুলতে যে প্রযত্নের দরকার তা আমরা করতে সমর্থ হই নি।

প্রথম কথাই হল, আসনের অভ্যাস করা। আসন বলতে দাঁড়িয়ে থাকা, শোয়া, বসা—সবই বোঝায়। শরীরের সাধনার জন্য আসনের সাধন খুবই আবশ্যক। আসনের সাধনার অর্থ হল, সুপ্ত শক্তি কেন্দ্রগুলিকে জাগ্রত করা, সক্রিয় করা ও গতিশীল করা। আসন শরীরসাধনার একমাত্র অঙ্গ নয়, আর এক অঙ্গ হল—শ্বাস।

শ্বাস শরীর থেকে আলাদা কিছু নয়, শরীরেরই এক ভাগ। শ্বাসের সাধনার অর্থ, শরীরের সাধনা আর শরীরের সাধনার অর্থই শ্বাসের সাধনা।

দ্বিতীয় প্রশ্ন এই যে, শ্বাস কি ভাবে গ্রহণ করব? হাজার রকমের আসন যেমন উদ্ভাবিত হয়েছে, তেমনই শক্তি জাগরণের দিকে লক্ষ্য রেখে শ্বাস নেওয়ার হাজার প্রকারের পদ্ধতি উদ্ভাবিত হয়েছে। আজ আমি সব রকম পদ্ধতি প্রয়োগের কথা বলব না, তাদের সামান্য কয়টির প্রয়োগের কথা বলব।

প্রেক্ষা ধ্যানে আমরা দীর্ঘশ্বাস, সমবৃত্তি শ্বাস ও সহজ শ্বাস—এই তিন রকম পদ্ধতি প্রয়োগ করে থাকি। অবশ্য এই তিন প্রকারই সব নয়। শ্বাসের প্রয়োগ অনেক আসনের সঙ্গেই বিকশিত হয়েছে। কোন ব্যক্তি এক ঘণ্টা শ্বাসকে রুদ্ধ করে বসে থাকতে পারে। কোন ব্যক্তি এক ঘণ্টা ধরে ভস্ত্রিকা প্রাণায়াম করতে পারে। দ্রুত শ্বাস নিয়ে শরীরকে প্রকম্পিত করতে পারে। আবার কোন ব্যক্তি সূক্ষ্ম শ্বাস দ্বারা শরীরকে নিস্পন্দ করে রাখতে পারে। এ সবই উৎকৃষ্ট প্রক্রিয়া। তবে

এগুলির দ্বারা যে বিকাশ হয় তা আত্মিক বিকাশ নয়। এই বিকাশের জন্য প্রযত্ন করার পেছনে এই দৃষ্টি থাকে যে, এর দ্বারা শক্তিকেন্দ্রগুলিকে মজবুত ও দৃঢ় করে গড়া যাবে। কোন লৌহকার বা স্বর্ণকার হাপরের সামনে লোহা বা সোনা রেখে তাকে আগুনে তাপ দেয়। তারা এ কাজ বৃথা করে না। তাদের উদ্দেশ্য, তারা তাপদিয়ে লোহা বা সোনাকে এমন নরম অবস্থায় আনবে যে তারা তাদের ইচ্ছামত আকার ঐ লোহা বা সোনাকে দিতে পারবে। সোনাকে এই উদ্দেশ্যে গালিয়ে ফেলা হয় যে, যে আকারে ইচ্ছা সেই আকারে তা গড়ে নেওয়া যাবে। তেমনই প্রাণায়াম হল, শ্বাসের উত্তাপে শক্তিকেন্দ্রগুলিকে ঢেলে দেওয়ার এক প্রক্রিয়া। এমন বহু প্রক্রিয়া আছে যাতে আমরা শক্তিকেন্দ্রগুলিকে এত উত্তমরূপে বিকশিত করতে পারি যে তাদের মধ্যে অতি উচ্চস্তরের শক্তির অবতরণ ঘটা সম্ভব হতে পারে। আমাদের সমস্ত স্নায়ু-সংস্থান, নাড়ী-সংস্থান প্রভৃতি, যা শক্তিকে ধারণের ক্ষেত্রে কাজ করে, তা সবই এই প্রক্রিয়ার দ্বারা বিকশিত ও শক্তিশালী হয়।

তৃতীয় প্রশ্ন হল, শরীরস্থ চক্রগুলির বিকাশ। এই চক্রগুলি হল জ্ঞানকেন্দ্র, শক্তিকেন্দ্র। শরীর বিজ্ঞানে যাকে বলা হয় গ্রন্থি, যোগের ভাষায় তাকে বলা হয় চক্র।

আধুনিক বিজ্ঞান বলে যে, আমাদের মস্তিষ্কের পশ্চাৎ অংশে দুটি গ্রন্থি আছে। এরা খুবই ছোট এবং পরস্পরের সঙ্গে জড়িত। এই দুটি গ্রন্থির মধ্যে বিশেষ একটিকে বিকশিত করার ফল হবে এই যে, সেটি বিকশিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আপনার মন আনন্দে ভরে যাবে। আপনার সংবেদন নষ্ট হয়ে যাবে। যা কিছু ঘটুক না কেন, আপনার মনে কোন সংবেদন হবে না, কোন পীড়া বা ব্যথা হবে না। এক অখণ্ড আনন্দ নিরন্তর বর্তমান থাকবে।

কিন্তু এই গ্রন্থির সঙ্গে জড়িত অপর গ্রন্থিটি যদি জাগ্রত হয়ে যায়, বিকশিত হয়ে যায়, তবে আপনার মন সর্বদা দুঃখে ভরা থাকবে, আর সে দুঃখের শেষ কখনও হবে না। ভাল-মন্দ যাই ঘটুক, দুঃখ নিরন্তর

বর্তমান থাকবে। দুঃখের পার আপনি পাবেন না।

দুটি গ্রন্থি জড়িত হয়েই আছে, অথচ তাদের একটি আনন্দের, অন্যটি দুঃখের। একটি বিকশিত হলে আনন্দের সাগরে হিল্লোল ওঠে, অন্যটি বিকশিত হলে দুঃখের পাহাড় ভেঙ্গে পড়ে। গ্রন্থিদুটি এমনভাবে জড়িত যে তাদের বিশেষ একটিকে জাগ্রত করার প্রক্রিয়ায় বিপদ এই যে, আনন্দের গ্রন্থিকে জাগ্রত করতে গিয়ে সামান্য ভুলের ফলে দুঃখের গ্রন্থির জাগরণ ঘটলে সাধক দুঃখের কূপে নিপতিত হবেন। আনন্দের গ্রন্থিকে জাগাতে গিয়ে দুঃখের গ্রন্থিকে জাগিয়ে তোলা যে কত বড় বিপদ, তা কল্পনা করাও কঠিন।

সুখ, দুঃখ, জ্ঞান, শক্তি—এ সবই কেবল আমাদের গ্রন্থি, জ্ঞানতন্তু আর শরীর তন্তুসমূহের আধারেই প্রকট হতে পারে। এগুলি সারা শরীরে বিস্তৃত। এমন অবস্থায় আমরা কি করে শরীরকে উপেক্ষা করতে পারি? শরীরকে তৈরি না করে আমরা কেবল ভাবনার বলে আগে এগোতে পারব না। এটা খুবই আবশ্যক যে, আমরা যেমন ভাবনাকে শুদ্ধ করার জন্য চেষ্টা করি, তেমনই যেন শরীরের শক্তিকে বিকশিত করার জন্য প্রযত্ন করি। শরীরে যে সব সুপ্ত জ্ঞানতন্তু আছে, জ্ঞানতন্তুর গুচ্ছ আছে—সেগুলিকে বিকশিত ও প্রস্ফুটিত করার জন্য আমাদের চেষ্টা করতে হবে। যতদিন সেগুলি প্রস্ফুটিত না হবে ও তাদের বিশিষ্ট শক্তিকে ধারণ করার ক্ষমতা বিকশিত না হবে, ততদিন বিশিষ্ট শক্তির ও আনন্দের অবতরণের জন্য চেষ্টা করলেও তা সফল হবে না। শরীর বিজ্ঞান বলে যে, আমাদের গ্রন্থিগুলির স্রাব ও হর্মোন উপযুক্ত মাত্রায় নির্গত না হলে কোন বিশেষ প্রক্রিয়াই কার্যকর হয় না। স্বাস্থ্যের দিকে থেকেও এই এক কথা, যতক্ষণ কোন বিশেষ হর্মোনের অভাব থাকবে ততক্ষণ শরীর ঠিক চলবে না।

'থাইরয়েড' একটি গ্রন্থি। যদি ঐ গ্রন্থির স্রাব ঠিক না হয়, উপযুক্ত মাত্রায় না হয়, তবে আপনার মন হতাশায় ভরে যাবে, আর হীন ভাবনা আপনার মনে উদয় হবে। এমন ক্ষেত্রে শরীর যদি শিশুর হয়

তবে তার বিকাশ বন্ধ হয়ে যাবে, শরীরের বাড় ও হ্রাস প্রভৃতির মত গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার এই গ্রন্থির স্রাবের ওপর নির্ভর করে। কেউ খিটখিটে স্বভাবের হয়, কারও স্বভাব হয় প্রসন্ন। এটা আপনি কেবল ব্যক্তিগত কর্মফল বলে মনে করবেন না। কর্মের ফল হতে পারে বটে, কিন্তু কর্মের ফল কোন মাধ্যমে প্রকট হবে, সে সম্বন্ধেও আপনাকে চিন্তা করতে হবে। আমাদের সবচেয়ে বড় ভুল এই যে, আমরা মেনে নিয়েছি প্রত্যেক কার্য ক্রিয়া বা কর্মের আধারের ওপরই ঘটে বা ভাবনার আধারের ওপরই ঘটে। অথবা অন্য কোন নিমিত্ত আমরা মেনে নিয়েছি। কিন্তু একথা আমরা ভুলে গিয়েছি যে, এর পেছনে শরীরেরও হাত আছে, বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ যোগ আছে। আমরা তো শরীরকে উপেক্ষা করে বসে আছি। আর শরীরকে উপেক্ষা করাই আমরা বৈরাগ্য বলে মনে করেছি। একেই আমরা শরীরের প্রতি বিরক্তি বলে বুঝেছি। আমরা মনে করেছি, শরীরে এমন কি পদার্থ আছে যে তার প্রতি আমরা মনোযোগ দেব। শরীরের প্রতি মনোযোগ দেওয়ার কোন আবশ্যকতাই নেই।

এই দৃষ্টিকোণ সম্পূর্ণ ভুল। আমাদের চিন্তা-ভাবনার সাথে, আমাদের প্রসন্নতার সাথে, আমাদের শক্তির বিকাশের সাথে শরীরের নিবিড় সম্বন্ধ আছে, এ কথা কখনও ভুললে চলবে না। আমরা এখন যদি সাধনার চর্চা করতে ও বিশেষ প্রকার শক্তিকে নিজের মধ্যে অভিব্যক্ত করতে চাই, তবে সবার আগে মনোযোগ দিয়ে এই কথা ভাবতে হবে আমরা কতটা শরীরের সাধনা করেছি, শরীরকে আমরা কতদূর উপযুক্ত করে নিয়েছি। কোন চিত্রকরই উপযুক্ত ভিত্তি ছাড়া চিত্র নির্মাণ করতে পারে না। সুন্দর চিত্র অঙ্কিত হবে অথচ ভিত্তিতে আছে গোময়ের লেপ, সেক্ষেত্রে সুন্দর চিত্র অঙ্কিত হবে কি করে? সুন্দর চিত্রের জন্য উপযুক্ত উপকরণ ও উপযুক্ত অবস্থা চাই। এগুলি যদি মেলে তবেই সুন্দর চিত্র নির্মাণ করা সম্ভব হয়।

অনুরূপ ভাবে বলতে হয়, আমরা যেন মূল বস্তুকে না ভুলি। শরীরের সাধনা করতে হবে, তার বিশিষ্ট কেন্দ্রগুলিকে জানতে হবে,

বিকশিত করতে হবে এবং সেগুলিকে শক্তিশালী করতে হবে। এ সবই অত্যন্ত জরুরী কাজ।

মনোবিজ্ঞানে একটি শব্দ প্রচলিত আছে—মনোদৈহিক। এর অর্থ, শরীরও মনের সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত। আমরা শরীর ও মনকে সব রকমে পৃথক করতে পারি না। কারণ বাস্তবিকপক্ষে মন শরীরের এক অংশ। শরীরের সমস্ত ক্রিয়া মস্তিষ্কের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়, আবার মস্তিষ্ক শরীরেরই এক অংশ।

শরীরের তিনটি প্রধান ভাগ—মস্তিষ্ক, ধড় ও পা। মস্তিষ্ক শরীরের মুখ্য ভাগ। মন শরীরের এক ভাগ, বচন শরীরের এক ভাগ আর শ্বাসও শরীরের এক ভাগ। এ সমস্তই শরীরের মাধ্যমে প্রকট হয়। সিদ্ধান্তের ভাষায় এমন বলা যায় যে, মনের জন্য অণু গ্রহণ শরীরই করে, বচনের জন্য অণু গ্রহণ শরীরই করে এবং শ্বাসের জন্য অণু গ্রহণও শরীরই করে। ওদের জন্য যে কাঁচামাল দরকার হয় তা সবই শরীর যোগান দেয়। বাকি সব কিছু পরে তৈরি হয়।

মন কাকে বলা হয়? মনের গঠনযোগ্য যে সব অণু শরীর গ্রহণ করে, সে সব অণু ত্যাগের ক্রিয়ার নামই মন।

বচন কাকে বলা হয়? বচনের গঠনযোগ্য যে সব অণু শরীর গ্রহণ করে, সে সব অণু ত্যাগের ক্রিয়ার নামই বচন।

শ্বাস কাকে বলা হয়? শ্বাসের গঠনযোগ্য যে সব অণু শরীর গ্রহণ করে, সে সব অণু ত্যাগের ক্রিয়ার নামই শ্বাস।

এই ভাবে দেখা যায়, শরীরই সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী কেন্দ্র। শরীর সম্বন্ধে দুটি বিষয়ের প্রতি আমাদের মনোযোগ দিতে হবে। প্রথমটি হল, শক্তির বৃথা ব্যয় আমাদের বন্ধ করতে হবে। দ্বিতীয়টি হল, আমাদের প্রাণশক্তি সঞ্চয় করতে হবে।

আমরা জেনে অথবা না জেনে বহু শক্তি ব্যয় করে বসি। শক্তির ব্যয় শরীর করে, মস্তিষ্ক করে, স্বচালিত নাড়ী-সংস্থানও করে। এই তিনটির দ্বারাই শক্তি ব্যয়িত হয়।

সাধনার ক্ষেত্রে কায়োৎসর্গের গুরুত্বপূর্ণ স্থান আছে। কায়োৎসর্গ করার বিধান বার বার দেওয়া হয়েছে। কিন্তু কেন? এর একমাত্র উদ্দেশ্য হল, শক্তির যে অযথা ব্যয় হচ্ছে তা বন্ধ করা। বলা হয়েছে, মৌন অবলম্বন কর। কেন? এই জন্য যে, কথা বলার দ্বারা যে শক্তি খরচ হয় তা বাঁচান যায়। বলা হয়েছে, মনকে কেন্দ্রিত কর, চঞ্চলতা স্তব্ধ কর। কেন? এই জন্য যে, মস্তিষ্কের যে শক্তি অনর্থক খরচ হয় তা বাঁচান যায়।

এ সবই উৎকৃষ্ট ক্রিয়া। কারণ এদের দ্বারা শরীরের শক্তিকে রক্ষা করা যায় এবং শক্তির বৃথা অপচয় বন্ধ করে তা প্রকৃত উদ্দেশ্যে ব্যয় করা যায়। যে শক্তির বৃথা ব্যয় হচ্ছে তা বন্ধ করে শক্তির ভাণ্ডার সুরক্ষিত রাখা যায়, আর বিশিষ্ট চেতনার অবতরণের জন্য শক্তির উপযোগ করা যায়।

দ্বিতীয় কথা হল, শক্তির সঞ্চয়—প্রাণশক্তির সঞ্চয়। প্রাণধারা আমাদের শক্তির সবচেয়ে বড় স্রোত। প্রাণধারার দ্বারাই শক্তির প্রাপ্তি হয়। আমাদের শক্তির কেন্দ্র হল মূলাধার চক্র, আর সেখানে অবস্থিত ব্রহ্মগ্রন্থি। সেখানে প্রাণ উৎপন্ন হয়। মূলাধারের তাপেই প্রাণের উৎপত্তি। নাভিচক্র থেকে স্বাধিষ্ঠান চক্রের নিচ পর্যন্ত দেহের যে ভাগ, সেখানকার তাপে প্রাণতত্ত্ব প্রকাশিত হয়। এই প্রাণই আমাদের জীবনী-শক্তি আর প্রাণশক্তি। তা আমাদের জীবনকে সঞ্চালিত করে। এই শক্তিকে উৎপন্ন করা যায়।

এক প্রয়োগের কথা আমি আপনাদের বলছি। আমি নিজে অনেকবার এই প্রয়োগ করে দেখেছি। চলতে চলতে যখন শ্রান্ত হয়ে পড়েছি এবং বোধ করেছি সমস্ত শরীর যেন শিথিল হয়ে গিয়েছে, পা যেন আর চলছে না, তখন এই প্রয়োগ করেছি এবং কিছুক্ষণের মধ্যেই তার ফল পেয়েছি। মনে হয়েছে শরীরে নতুন বল এসেছে, আর সব শ্রান্তি মিটে গিয়েছে। বসে থাকতে থাকতে যখন শিথিলতা অনুভব করেছি তখন দশ-বিশ বার এই প্রয়োগের পুনরাবৃত্তি করেছি, আর

তৎক্ষণাৎ শিথিলতা মিটে গিয়েছে, সজীবতার অনুভূতি এসেছে। এটা প্রাণশক্তিকে উৎপন্ন করার প্রয়োগ। এই প্রয়োগ হল—মূলবন্ধ মুদ্রা। আপনি আপনার গুহ্যদেশকে সঙ্কুচিত করুন। দশ-বিশ মিনিট ঐ মুদ্রায় অবস্থান করুন। আপনার তখন মনে হবে, নতুন শক্তির সঞ্চার হতে আরম্ভ হয়েছে, নতুন সামর্থ্য আসছে। কারণ, প্রাণ উৎপন্ন হওয়ার যে কেন্দ্র আছে, সেই কেন্দ্রের ওপর আপনি সংযম করেছেন, তাকে নিয়ন্ত্রণ করেছেন, তাকে 'জেনারেটর' বানিয়েছেন। এই হল শক্তির সঞ্চয়।

শক্তি উৎপন্ন করতে বাইরের কিছুর সাহায্যও নেওয়া যেতে পারে। সূর্য প্রাণশক্তির, জীবনীশক্তির সবচেয়ে বড় কেন্দ্র, সবচেয়ে বড় ভাণ্ডার এবং অক্ষয় ভাণ্ডার। আমরা সূর্যের সাহায্যে প্রাণশক্তিকে আকর্ষণ করতে পারি। প্রাতঃকালে সূর্যোদয়ের সময় সূর্যের সামনে দাঁড়িয়ে আমরা সঙ্কল্প করব—প্রাণশক্তির সংগ্রহ হচ্ছে, সঞ্চয় হচ্ছে, মস্তিষ্কমার্গে প্রাণশক্তির অবতরণ হচ্ছে। দশ-বিশ মিনিট মনে মনে এই সঙ্কল্পকে আলোড়ন করে আমরা ধ্যানস্থ মুদ্রায় দাঁড়িয়ে থাকব। তখন আমাদের মনে হবে যে, নতুন শক্তির ও স্ফূর্তির সঞ্চার শুরু হয়েছে।

আমি শরীর-সাধনার বিষয় ও উপায় সম্বন্ধে কিছু রেখাপাত করলাম। এটি দিগদর্শন মাত্র। তবে যদি আমরা এ সব কথা ঠিকমত বুঝতে পারি তো শরীরকে আমরা এমনভাবে তৈরি করতে পারব যে, আমরাই অতি বৃহৎ শক্তিকে শরীরে অবতরণ করার জন্য, প্রকট ও অভিব্যক্ত হওয়ার জন্য আহ্বান করতে সমর্থ হব।

৩

শরীর সাধনা

ধ্যানের সঙ্গে ধ্যেয়ের অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধ। ধ্যেয় অনেক প্রকারের, ধ্যানও অনেক। সকলের পক্ষে একই ধ্যেয় অনুকূল হয় না। বিভিন্ন ব্যক্তির পক্ষে বিভিন্ন ধ্যেয় অনুকূল হতে পারে। একের পক্ষে যা অনুকূল তা অপরের পক্ষে অনুকূল নাও হতে পারে। সহজ শ্বাসের ওপর ধ্যান করা কারও পক্ষে সরল ও অনুকূল হয়। কেউ আবার সহজ শ্বাসকে ধরতে পারে না, অথচ অনুলোম ও বিলোমকে সহজেই ধরতে পারে এবং তার ওপরেই তার মন জমে যায়। কেউ আবার দীর্ঘ শ্বাসকে অনায়াসে ধরতে পারে। অতি সম্প্রতি এক সাধক বলেছেন যে, সমবৃত্তি শ্বাসের ওপর ধ্যান কেন্দ্রিত হয়। কিন্তু সহজ শ্বাসকে আয়ত্ত করা যায় না। সুতরাং দেখা যাচ্ছে, এটা আবশ্যক নয় যে, সব সাধকের পক্ষে ধ্যেয় একই প্রকার হবে। কারণ, মানুষ যন্ত্র নয় বা যান্ত্রিকও নয়। প্রত্যেকের ভিন্ন ভিন্ন ক্ষমতা আছে, ভিন্ন ভিন্ন রুচি আছে। তাই সকলের ধ্যেয় যে একই হবে এমন মনে করা উচিত নয়। যেমন প্রেক্ষা ধ্যেয়, তেমনি অনুপ্রেক্ষাও ধ্যেয়। আজ আমি কেবল শব্দাত্মক ধ্যানের আলোচনা করব। এই ধ্যানকে পদস্থ ধ্যানও বলা হয়।

চার প্রকার ধ্যানের কথা বলা হয়েছে—পিণ্ডস্থ, পদস্থ, রূপস্থ আর রূপাতীত। এদের মধ্যে দ্বিতীয় ধ্যান হল—পদস্থ। এটি শব্দ-ধ্যান, শব্দের সাধনা। কথা না বলা, মৌন থাকা এক ব্যাপার, আর কথা বলা আর এক ব্যাপার। আমরা কেবল মৌন থাকব, কথা বলব না, এ সম্ভব নয়, আবার কেবল কথা বলেই যাব, এও সম্ভব নয়। জীবনে বলা ও না বলার সামঞ্জস্য বিধান করা দরকার। না বলার বিষয় নিয়ে আলোচনা করার আগে আমি বলতে চাই যে, আমাদের শব্দ-সাধনা করতে হবে। আমাদের শব্দের মহত্ত্ব বুঝতে হবে, তৎসংক্রান্ত সমস্ত প্রক্রিয়াও জানতে হবে। এর অর্থ হল, পদস্থ ধ্যান করা বা পদকে ধ্যেয় করা এবং তার আধারেই চিত্তের একাগ্রতাকে স্থাপিত করা।

পদের বিশেষ মহত্ত্ব আছে। আমরা যখন কোন পদ উচ্চারণ করি তখন কেবল পদই নির্গত হয় না বা কেবল শব্দ নির্গত হয় না, সেই সঙ্গে আমাদের ভাবনা, আমাদের সঙ্কল্প, আমাদের মনের শক্তিও বাইরে আসে, আর সব কিছুর সঙ্গে শ্বাসেরও যোগ হয়। শরীর, শ্বাস, বায়ু, ধ্বনি, সঙ্কল্প-শক্তি, মানসিক শক্তি—এই সব কিছুর যখন যোগ হয় তখন কোন শব্দ আমাদের শ্রুতিগোচর হয়। কোন ব্যক্তি যখন কথা বলে তখন সেই বলার পেছনে কেবল শব্দই থাকে না, বিশিষ্ট প্রকারের শক্তিও থাকে, আর বক্তার নিশ্চয় অনুসারে সেই শক্তি প্রকট হয়।

শ্রীকৃষ্ণ ও পাণ্ডবেরা অমরকংকায় গেলেন। সেখানকার রাজা পদ্মনাভ দ্রৌপদীকে অপহরণ করেছিলেন। পদ্মনাভ সংবাদ পেয়ে নিজের সেনাকে সজ্জিত করে যুদ্ধস্থলে উপস্থিত হলেন। শ্রীকৃষ্ণ পাণ্ডবদের বললেন—'যাও, যুদ্ধ কর।' পাণ্ডবরা যুদ্ধ করতে গেলেন। তাঁরা অত্যন্ত পরাক্রান্ত ও শক্তিশালী ছিলেন। পদ্মনাভ সামনে এলেন। পাণ্ডবরা বললেন—'আজ এমন ভীষণ যুদ্ধ হবে যে সে যুদ্ধে হয় আমরা থাকব আর না হয় পদ্মনাভ থাকবে। দু পক্ষের এক পক্ষ মাত্র থাকবে।' এই কথার মনের যে সঙ্কল্প ছিল, ভাবনা ছিল, তা প্রকট হয়ে গেল। যুদ্ধ হল। পরিস্থিতি এমন হল যে, পদ্মনাভ স্থির থাকলেন

আব পাণ্ডবদেব পলাযন কবতে হল। এব কাবণ, পাণ্ডবদেব সঙ্কল্প শিথিল ছিল। তাঁদেব সঙ্কল্প সূত্র ছিল—'অমুহে বা পউমনাভে বা' হয আমবা থাকব, নয পদ্মনাভ থাকবে। পদ্মনাভ থাকলেন, আব তাঁবা পালিযে গেলেন।

শ্রীকৃষ্ণ সব দেখলেন। তিনি এগিযে এসে বললেন, 'সঙ্কল্পেব ভাষা আমি বলছি। 'অমুহে, ন পউমনাভে'—আমবা থাকব, পদ্মনাভ থাকবে না। আবাব যুদ্ধ হল। পদ্মনাভ যুদ্ধ হেবে পালিযে গেলেন।

আমাদেব মুখ থেকে কেবল শব্দ নির্গত হয না, তাব সঙ্গে সঙ্গে আমাদেব অন্তঃকবণেব শক্তি, সঙ্কল্পেব শক্তিও নির্গত হয। আমাদেব যেমন নিশ্চয, যেমন ভাবনা, আব ঐ নিশ্চয ও ভাবনাব যেমন বল—তা সবই শব্দেব সঙ্গে প্রকট হয। আমবা শব্দেব শক্তিকে বুঝতে পাবছি, আব এও জানতে পাবছি যে শব্দেব সঙ্গে আবও কিছু জডিত থাকে।

আমবা অর্হমেব ধ্বনি কবি, অর্হম্ উচ্চারণ কবি। প্রেক্ষাধ্যান আবম্ভ হয অর্হম্ ধ্বনিব দ্বাবা। প্রত্যেক কাজ আবম্ভ হয অর্হম ধ্বনি দিযে কিন্তু কেন? আমবা যখন ধ্যান করতে বসেছি, তবে ধ্বনি কেন? ধ্যানে তো মৌন থাকাই উচিত, কিন্তু অর্হম্ ধ্বনি কেন? অনুপ্রেক্ষা কেন? শব্দেব প্রযোগ কেন?

আমবা শব্দ প্রযোগ ছাডতে পাবি না। শব্দেব শক্তি অতি বিপুল। মন্ত্রেব শক্তিব সঙ্গে লোকে পবিচিত। সেটি কোন্ শক্তি? ও তো শব্দেবই শক্তি। ঐ শক্তি আজ বিজ্ঞানে, বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যাতে, বিশ্লেষিত হচ্ছে। আমাদেব শবীবেব দুটি মুখ্য ভাগ আছে—একটি মস্তিষ্ক, আব অপবটি শবীবেব বাকি সমস্ত অংশ। এই দুই ভাগেই বিদ্যুৎ উৎপন্ন হচ্ছে। শবীবেব মধ্যে বক্তেব গতি আছে, সংক্রমণ আছে। প্রত্যেক ধমনীব ভেতবে, প্রত্যেক স্নাযুব ভেতবে বক্তেব প্রবাহ চলছে। হৃৎপিণ্ড নিজের কাজ কবছে, যকৃৎ নিজেব কাজ কবছে, পাচন-তন্ত্রও নিজেব কাজ করে চলেছে। প্রত্যেক অবযবই আপন আপন কাজে ব্যাপৃত আছে। ফলে সংঘর্ষণ সৃষ্ট হচ্ছে, আব সংঘর্ষণ থেকে বিদ্যুৎ

উৎপন্ন হচ্ছে। একে 'ঘার্ষণিক' বিদ্যুৎ বলা যায়, কারণ সংঘর্ষণ থেকে তা সঞ্জাত হয়। আর এক প্রকার বিদ্যুৎ আমাদের মস্তিষ্কে উৎপন্ন হয়, একে 'ধারাবাহিক' বিদ্যুৎ বলা যায়। এ বিদ্যুৎ নিরন্তর উৎপন্ন হয়েই চলেছে। আমাদের শরীরে এই দুই প্রকার বিদ্যুৎ আছে—ঘার্ষণিক বিদ্যুৎ আর ধারাবাহিক বিদ্যুৎ। দুটিতেই বিপুল শক্তি আছে। বায়ু দেহের মধ্যে প্রবেশ করছে, তার ধাক্কায় শব্দ উৎপন্ন হচ্ছে। শব্দের সঙ্গে দুই প্রকার বিদ্যুৎ যুক্ত হয়। শরীরের ঘর্ষণজাত বিদ্যুৎ ও মস্তিষ্কের চুম্বকীয় বা ধারাবাহিক বিদ্যুৎ—উভয়ই শব্দের সঙ্গে যুক্ত হয়। ফলে শব্দ শক্তিশালী হয়, শব্দকে কেন্দ্র করে শক্তি উৎপন্ন হয়।

আমরা যখন কথা বলি, তখন শব্দের সঙ্গে বিদ্যুৎ নির্গত হয়। এক ব্যক্তির কথা অপর ব্যক্তির ওপর প্রভাব বিস্তার করে। তার কারণ, শব্দের সঙ্গে যে বিদ্যুৎ নির্গত হয় সেই বিদ্যুৎ প্রভাবশালী। আমাদের শরীরে বিদ্যুৎ নির্গমনের কয়েকটি প্রধান স্থান আছে, যথা— হাতের আঙুল, পায়ের আঙুল, চোখ আর ধ্বনি। এই সব স্থান দিয়ে শরীরের বিদ্যুৎ বহির্গমন করে। শব্দের সঙ্গে বিদ্যুতের সংযোগ হয়, আর ঐ সংযোগ শব্দকে শক্তিশালী করে তোলে। ফলে শব্দ প্রভাব উৎপাদন করে। শব্দের তরঙ্গ, প্রকম্পন বাইরে নির্গত হয়ে শক্তি উৎপন্ন করে।

সাধারণ ভাষায় এই যা বলছি তার বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যাও দেওয়া যায়। আমি যেভাবে কথা বলছি সেভাবে যদি বার বছর নিরন্তর বলতে থাকি তবে যে পরিমাণ বিদ্যুৎ নির্গত হবে তা দিয়ে একবার দাড়ি কামানোর উপযুক্ত জল গরম করে নেওয়া যাবে। এই পরিমাণ অবশ্য খুবই সামান্য, কিন্তু যখন মুখ-নিঃসৃত শব্দের সঙ্গে সঙ্কল্পের শক্তি যুক্ত হয় তখন তাতে তীব্রতা আসে, আর তার গতিও হয় তীব্র। সঙ্কল্প শব্দকে এতই তীব্র গতিসম্পন্ন করে যে, শব্দ এক সেকেণ্ডে এক কোটি মাইল পথ অতিক্রম করতে পারে। আলোর গতি প্রতি সেকেণ্ডে এক লাখ ছিয়াশি হাজার মাইল। কিন্তু সঙ্কল্প-শক্তির সঙ্গে নির্গত শব্দ এমন বিশিষ্ট প্রকার গতি-সম্পন্ন হয় যে, তা এক সেকেণ্ডে এক কোটি মাইল যেতে পারে।

বর্তমানে এ'ব্যাপারে বহু প্রকার অনুসন্ধান চলছে। বিজ্ঞানের অনেক বিকাশ হয়েছে। আজ 'সুপারসোনিক' বিমান আকাশের বুক ভেদ করে উড়ে চলেছে। তার গতি শব্দের গতির চেয়েও অধিক। হীরা কাটার জন্য এমন যন্ত্র নির্মিত হয়েছে, যা এক সেকেণ্ডে বিশ হাজার 'স্ট্রোক' বা আঘাত করতে পারে। ঐ যন্ত্র সূক্ষ্ম ধ্বনির দ্বারা চালিত হয়।

আমাদের পদস্থ ধ্যানের শক্তি বুঝতে হবে। পদ এক মাধ্যম। শব্দ এক মাধ্যম। আমরা অর্হমের জপ করি, অর্হমের ধ্বনি করি। অর্হমের ধ্বনি কেবল শব্দ নয়। ধ্যেয় সর্বদা গুপ্ত থাকে, আমাদের সামনে আসে না। ধ্যেয় যদি প্রকট হয়, ধ্যেয়কে যদি প্রকটিত করা যায়, তবে আর ধ্যানের কোন আবশ্যকতা থাকে না। কারণ ধ্যেয় স্থূল রূপেই আমাদের সামনে বিরাজ করে। সর্বদাই অসিদ্ধকে সিদ্ধ করার প্রয়াস করা হয়। তর্কশাস্ত্রে সাধ্যের লক্ষণ করা হয়েছে—'অসিদ্ধং সাধ্যম্'—যা অসিদ্ধ, তাই সাধ্য। যদি সিদ্ধ বস্তু হয়, তবে তাকে সাধ্য করা চলে না, কারণ সিদ্ধকে সাধন করা পণ্ডশ্রম মাত্র। সাধ্য সেই বস্তুকেই করা যায় যা সিদ্ধ নয়, যাকে সাধা হয়নি, যার সাধনা করতে হবে। যদি অর্হম্ আমাদের সামনে প্রকট হয়, সিদ্ধ হয়, তবে তাকে ধ্যেয় বলে নেওয়ার কোনই আবশ্যকতা থাকে না। আমরা অর্হমকে ধ্যেয় করেছি এই জন্য যে, তা আমাদের কাছে প্রকট নয়, সিদ্ধ নয়। আমরা তাকে প্রকট করতে, সিদ্ধ করতে, চেষ্টা করি।

আমরা অর্হম্‌কে ধ্যেয় করে নিয়েছি। অর্হম্‌কে ধ্যেয় করার দুটি উপায় আছে— আকার ও শব্দ। আমরা ধ্যেয়র কোন প্রতিকৃতি করি বা মূর্তি বানাই, অর্থাৎ কোন আকারে তাকে গড়ে নিই এবং কল্পনা করি যে, এটিই অর্হম্।

দ্বিতীয় উপায় হল শব্দ। আমরা অর্হম্‌কে ধ্যেয় করি, আর শব্দকে করি ধ্যানের মাধ্যম। আমরা অর্হমকে জপ করি, ধ্বনি করি। আমরা অর্হমের ধ্বনিকে কেবল উচ্চারণ করি না, কিন্তু ঐ উচ্চারণের পেছনে আমাদের যে ধ্যেয় অর্হং গুপ্ত আছেন তাঁর সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করি।

শব্দকে মাধ্যম করে, অর্হম্ শব্দ যার প্রতিনিধিত্ব করে, অর্হতের সেই স্থিতি পর্যন্ত আমরা পৌঁছতে চাই। আমরা সেই স্থিতি পর্যন্ত পৌঁছতে চাই, যা অর্হম শব্দের বাচ্য। তাই হল অর্হতের স্থিতি।

একটি বাচ্য, অপরটি বাচক। শব্দ বাচক, তার অর্থ বাচ্য। অর্হম্ বাচক, আর তার যা অর্থ তা বাচ্য। অর্হম শব্দের অর্থ হল, অর্হতের স্থিতি। আমরা বাচকের দ্বারা বাচ্য পর্যন্ত পৌঁছতে চাই। সাধন দ্বারা সাধ্য পর্যন্ত পৌঁছতে চাই। আমরা শব্দের ধ্বনির সঙ্গে নিজের ভাবনা জুড়ে দিয়ে নিজের ভেতরে অর্হতের যে স্বরূপ লুক্কায়িত আছে তাকে প্রকট করতে চাই।

অর্হমের এই প্রকৃষ্ট ভাবনা যদি আমাদের বোধগম্য হয় তবে অর্হমের ধ্বনির প্রকৃত অর্থ আমরা বুঝতে পারব, আর এই ভাবনা যদি বোধগম্য না হয় তবে অর্হমের ধ্বনি আমাদের কাছে এক প্রথাগত শব্দ রূপেই থেকে যাবে।

মন্ত্রের পদের নির্বাচন এক বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোণ থেকে করতে হয়। সর্ব প্রথম দৃষ্টিকোণ হল, শ্বাসের সঙ্গে মন্ত্র পদের সম্বন্ধ। আমরা যেন একথা ভুলে না যাই যে, আমাদের সাধনার সমস্ত প্রক্রিয়ার মধ্যে শ্বাস সবচেয়ে মহত্ত্বপূর্ণ সাধন। আমরা শ্বাসকে যেন বিস্মৃত না হই, তার গুরুত্ব যেন ভুলে না যাই। প্রত্যেক বস্তুর সঙ্গে শ্বাসের যোগ করা প্রয়োজন।

মন্ত্রের নির্বাচন এমন হবে, যাতে এক নিঃশ্বাসেই সম্পূর্ণ মন্ত্র রটন করা যায়। মন্ত্রের সঙ্গে শ্বাসের লয় যুক্ত করা চাই। শ্বাসের সঙ্গে মন্ত্রের সম্বন্ধ স্থাপন করা চাই। অর্হম একটি মন্ত্র শব্দ। এর উচ্চারণ সহজেই আনন্দের সঙ্গে এক শ্বাসেই করা যায়। তাতে কোন অসুবিধেই নেই। দীর্ঘ উচ্চারণ করলেও এই শব্দ একই শ্বাসে সমাপ্ত হবে।

তবে নির্বাচন ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের হতে পারে। মন্ত্র বড়ও হতে পারে। যেমন—ণমো অরহংতাণং, ণমো সিদ্ধাণং, ণমো আয়রিয়াণং,

ণমো উবজঝায়ণং, ণমো লোএ সব্ব সাহুণং। এই মন্ত্রে পাঁচ পদ আছে। পাঁচ পদের এই পুরো মন্ত্রটি একই শ্বাসের উচ্চারণ করা খুবই কঠিন কাজ। সে ক্ষেত্রে এক উপায় আছে। মন্ত্র যদি বড় হয় তবে তাকে ভাগ করে নেওয়া যায়। এক এক ভাগ এক এক শ্বাসে উচ্চারণ করা যায়। 'ণমো অরহংতাণং'—এই ভাগের উচ্চারণ এক শ্বাসে সহজেই করা যায়। 'ণমো সিদ্ধাণং'—এই ভাগের উচ্চারণ দ্বিতীয় শ্বাসে করা যায়। এই ভাবে পাঁচটি পদ পাঁচটি শ্বাসে উচ্চারণ করা সম্ভব হয়। পাঁচ শ্বাসে পুরো মন্ত্রের জপ করা যায়। শ্বাসের কথা এখানেই পর্যাপ্ত নয়। শ্বাসের সঙ্গে মন্ত্র-পদের লয়বদ্ধতা হওয়া আবশ্যক।

সঙ্গীতজ্ঞ বাদ্যযন্ত্রের সঙ্গে গান গায়। বাদ্যের সঙ্গে তার গানের লয়ের একতা হয়। সেই রকম, শ্বাসের সঙ্গে মন্ত্র পদের একতা হওয়া দরকার। শ্বাসের সঙ্গে যখন মন্ত্র পদের লয় যুক্ত হয় তখন সহজেই একাগ্রতা আসে। তখন শ্বাস ও মন্ত্র পদের উচ্চারণের মধ্যে কোন অসঙ্গতি থাকে না। উভয়ের সম্পূর্ণ মিল হয়, ফলে তন্ময়তা এসে যায়। শ্বাসের প্রকম্পন আর ধ্বনির প্রকম্পন—দুটি একসঙ্গে যুক্ত হয়ে যায়।

আমরা সবাই এক প্রকম্পনের জীবন যাপন করি। যদি এমন কোন ক্যামেরা বা আয়না থাকত যার সামনে দাঁড়িয়ে আমরা দেখতে পারতাম, তবে দেখার ক্ষমতা থাকলে আমরা দেখতাম যে বাইরের সব কিছু কেবল স্থূল ও বস্তুত তুচ্ছ। সূক্ষ্মরূপে দেখতে গেলে সমস্ত শরীর অণুর প্রকম্পন মাত্র। প্রবল বর্ষা আরম্ভ হয়েছে। জোরে জল নিচে গড়িয়ে পড়ছে। জলে একটি বুদ্‌বুদ উঠল, আর ফেটে পড়ল। দ্বিতীয় বুদ্‌বুদ উঠল, আর ফেটে পড়ল। আবার তৃতীয় বুদ্‌বুদ উঠল ও ফেটে পড়ল। এই ক্রমই চলতে লাগল। প্রবল বর্ষায় বুদ্‌বুদের নাচন লেগে যায়। আমাদের শরীরেও এই রকম নাচ চলছে। পরমাণু আসছে, আবার যাচ্ছে, সংঘটিত হচ্ছে, আবার বিঘটিত হচ্ছে। তরঙ্গের পর তরঙ্গ উঠছে। সারা শরীর যেন তরঙ্গ প্রবাহের প্রকম্পনের

এক পুলিন্দা। তবে ভাগ্য ভাল এই অবস্থা দেখতে পাওয়ার উপায় আমাদের নেই। তাই আমরা মনে করি যে, শরীর একটি সুদৃঢ়, নিরেট বস্তু। কিন্তু নিরেট হবে কি করে? বিজ্ঞান স্বীকার করে যে আমাদের সমস্ত দৃশ্য জগৎ, যাকে আমরা জানি ও চিনি, তাকে যদি কেটেকুটে একত্র সংহত করি, তবে তা আয়তনে একটা খেলার বলের মত হবে। সারা জগৎ একটা বল যতটা বড, মাত্র ততটা বড হবে। কেবল আপনারা বা আমরা নই, সব পাহাড়, নদীনালা, সব ঘরবাড়ি, সমস্ত বালুকণা সব কিছু কেটেকুটে এক করে নিলে, সেই পুঞ্জিত বস্তুর পরিমাণ হবে একটা বলের যে পরিমাণ, কেবল তাই। নিরেট বস্তু খুবই কম আছে। কেবল প্রকম্পন, প্রকম্পন আর প্রকম্পন। শরীরকে নিরেট বস্তু বলে মনে হচ্ছে, কিন্তু ভেতরে যান, ভেতরে গেলেই দেখবেন সবই ফাঁপা, কেবল ফাঁপা। ওপরে চামড়া দিয়ে ঢাকা, তাই ভেতর দেখাই যায় না। একটি মানুষকে কেটেকুটে একত্রিত করে নিলে বোধহয় তা একটি পরমাণুর সমানও হবে না। শরীরের তরঙ্গ, শ্বাসের তরঙ্গ, বিচারের তরঙ্গ, ধ্বনির তরঙ্গ—আমরা কেবল তরঙ্গের দ্বারা বেষ্টিত আছি। দর্শনের ভাষায় বলতে হয়, আমরা পর্যায়ের দ্বারা বেষ্টিত আছি। পর্যায়ের পর পর্যায়। দ্রব্য কোথায়? আত্মা দ্রব্য, তাকে তো দেখা যায় না। অণুও দ্রব্য, কিন্তু তা অতি সূক্ষ্ম। সবই পর্যায়ের আবর্ত। তরঙ্গের পর তরঙ্গ। পর্যায়ের পর পর্যায়। প্রকম্পনের পর প্রকম্পন। প্রকম্পনের মধ্য দিয়ে আমাদের জীবনধারা চলেছে।

আমরা ঠিকভাবে প্রকম্পনের উপযোগ করব, তার শক্তির উপযোগ করব। ধ্বনির তরঙ্গের উপযোগ করতে আমরা শিখব। ধ্বনির তরঙ্গ থেকে উৎপন্ন শক্তিকে ঠিকভাবে নিয়োজিত করব। যখন ধ্বনি তরঙ্গ মনের তরঙ্গের সঙ্গে যুক্ত হয়, সঙ্কল্পের তরঙ্গের সঙ্গে যুক্ত হয়, আর শ্বাসের তরঙ্গের সঙ্গেও যুক্ত হয়, তখন অতি বড় শক্তি উৎপন্ন হয়।

শব্দের কম্পন তার চরম সীমাতে পৌঁছে 'স্ক' কিরণ-এক্স-রে-রূপে পরিণত হয়। তখন তার গতি প্রতি সেকেণ্ডে এক কোটি মাইল হয়ে

যায়। সংকল্পের কম্পন তাতে আরও শক্তি নিয়োজন করে। একজন যোগের মর্মজ্ঞ আচার্য বলেছেন, যার দৃঢ় নিশ্চয়ে কোন ছেদ নেই, সে কি না করতে সমর্থ? তার পক্ষে কিছুই দুষ্কর নয়। শব্দের সিদ্ধি আস্থার থেকে হয়। আস্থাহীন শব্দ শক্তিশূন্য হয়ে যায়। শব্দের সাধনার অর্থই হল আস্থা ও শব্দের মধ্যে ব্যবধান লোপ করা। আর অর্থ হল, ধ্বনিকে আস্থার কবচ পরিয়ে দেওয়া।

৪

মনের পটুতা বিধান

আমাদের চেতনার অনেক স্তর আছে। তাদের মধ্যে সর্বাধিক স্থূল স্তর হল ইন্দ্রিয়। ইন্দ্রিয় অপেক্ষা মন সূক্ষ্ম, মন অপেক্ষা বুদ্ধি সূক্ষ্ম, আর বুদ্ধি অপেক্ষা অধ্যবসায় সূক্ষ্ম। এই রকম অসংখ্য স্তর আছে। প্রত্যেক স্তরের নামকরণ করা সম্ভব নয়। চেতনার অনেক স্তরের মধ্য দিয়ে আমরা অগ্রসর হচ্ছি, অনেক স্তরের মধ্য দিয়েই আমাদের জীবন অতিবাহিত হচ্ছে।

ইন্দ্রিয়গুলি খুবই স্থূল, তাই তারা আমাদের কাছে সুস্পষ্ট। মনের চেতনা সূক্ষ্ম, তাই মনকে বোঝা অপেক্ষাকৃত কঠিন। আমরা ধ্যান করি, আমাদের ধ্যানের সম্বন্ধ মনের সঙ্গে। ধ্যানের সঙ্গে ইন্দ্রিয়ের কোন সোজাসুজি সম্বন্ধ নেই। ধ্যানের প্রথম সম্বন্ধই মনের সঙ্গে। ধ্যান এক প্রকার মানসিক ক্রিয়া। বাস্তবিক পক্ষে ধ্যান খুব বিপজ্জনক। ধ্যান খুব সহজ কাজ নয়, এর থেকে অনেক বিপদ হতে পারে। যা লাভজনক হয়, তা বিপজ্জনকও হয়। পৃথিবীতে এমন কোন বস্তু নেই যার থেকে কেবল লাভই হয় কখনও কোন বিপদ হয় না। বরং লাভের সম্ভাবনা যত অধিক হয় বিপদের সম্ভাবনাও তত অধিক হয়। আমাদের সর্বদা মনে রাখতে হবে যে, ধ্যান থেকে আমরা যেমন অনেক

কিছু লাভ করতে পারি, তেমনই ধ্যান থেকে আমাদের অনেক রকম বিপদও হতে পারে। যদি আমরা ঠিক প্রক্রিয়া না বুঝে ধ্যান করতে যাই তবে অনেক ক্লেশের মধ্যে পড়তে পারি। ধ্যানের দ্বারা এক বিশেষ প্রকার তাপের সৃষ্টি হয়। কেউ যদি সে তাপ সহ্য করতে না পারে তবে সে পাগল হয়ে যেতে পারে। সেজন্য ভালভাবে বুঝে সুঝে, বিচার বিবেচনা করে ধ্যান করা উচিত। ধ্যানের ক্ষেত্রে খুব ধীর গতিতে অগ্রসর হওয়াই উচিত। এটা সম্ভব নয় যে, প্রথম দিন ধ্যান করতে বসেই এক ঘণ্টা ধরে ধ্যান করতে পারব। এক ঘণ্টা ধ্যান করার অভ্যাস করতে দীর্ঘ সময় লাগে। প্রথম দিন যদি দু মিনিট ধ্যান হয় তবে বিরাট সফলতা লাভ হয়েছে মনে করতে হবে। দু মিনিট ধ্যান সামান্য কথা নয়। যদি কোন ব্যক্তি দু মিনিট কেন্দ্রিত থাকতে পারে, একাগ্র থাকতে পারে, স্থির থাকতে পারে, তবে বুঝতে হবে তার সাফল্য এসেছে, তার উপলব্ধি হয়েছে। এমন লোক খুবই কম মেলে যে এক বৎসরের চেষ্টায় দু মিনিট ধরে এক বিষয়ে একনাগাড়ে একাগ্র থাকতে পারে। কারণ ঐ সময়ের মধ্যেই তার মন বিচলিত হয়ে যেতে পারে। দু মিনিট কাল মনে কোন ব্যবধান আসবে না, কোন বিকল্প উদয় হবে না—এ বড় কম কথা নয়।

আমাদের মনে নিরন্তর বিকল্প উদয় হচ্ছে, ব্যবধান এসে যাচ্ছে। আমরা কোন এক বিচার নিয়ে বসলাম। সেই বিষয়ের ওপর একাগ্র হওয়ার চেষ্টা করা মাত্রই মনে বিভিন্ন বিকল্প আর ব্যবধান উৎপন্ন হতে থাকে। মন যখন চঞ্চল অবস্থায় থাকে তখন কত যে ব্যবধান হতে পারে তা কল্পনা করাই যায় না। একাগ্র হলে পরে বোঝা যায় যে বিকল্পের প্রবাহ কত দ্রুত চলছে আর একাগ্রতায় কত ব্যবধান উৎপন্ন করছে। ধ্যান খুবই বিপজ্জনক। প্রথম ক্ষণেই বা প্রথম দিনেই বা শিক্ষণ-শিবিরের প্রথম আয়োজনেই ধ্যান সিদ্ধ হয়ে যাবে—এটা কোন কথাই নয়। এটা স্পষ্ট মনে রাখতে হবে এখন যে অভ্যাস চলছে তা কেবল অবধানের অভ্যাস।

যোগের ভাষায় মনের তিন অবস্থা আছে—অবধান, একাগ্রতা বা ধারণা, আর ধ্যান। মনোবিজ্ঞানেও অনুরূপ বিচার আছে। তাতেও তিন অবস্থার কথা বলা হয়েছে, যথা—অ্যাটেন্‌শন, কনসেন্‌ট্রেশন আর মেডিটেশন। অবধান, কেন্দ্রীকরণ আর ধ্যান। মনের এই তিন অবস্থা। সমস্ত মানসিক ক্রিয়া এই তিন অবস্থার মধ্যেই ঘটে।

মনের প্রথম অবস্থা—অবধান, অ্যাটেন্‌শন। এটা মনের ক্রিয়া, যে ক্রিয়ার দ্বারা আমরা মনকে কোন বস্তুর প্রতি ব্যাপৃত, লগ্ন করি। যে মন সর্বদা ঘুরে বেড়ায়, তাকে এক বস্তুর প্রতি ব্যাপৃত করা, মনকে সচেতন করা—চৈতন্যবান করা—এই হল অবধানের অবস্থা। এই অবস্থায় পদার্থের সঙ্গে মনের সম্বন্ধ স্থাপিত হয়। একেই অবধান বলে। আমরা বলি—সাবধান হয়ে যাও। এর অর্থ হল—এক কার্যের প্রতি একচিত্ত হয়ে যাও। যা করতে হবে কেবল তার ওপর চিত্তকে লগ্ন কর।

অবধান যেমন বাহ্য বস্তুর ওপর হয়, তেমনই সময় সময় নিজের মূল স্বরূপের প্রতিও হয়। যখন মৌলিক স্বরূপের প্রতি অবধান হয়, তখন সেই স্থিতিতে প্রজ্ঞার উদয় হয়। আর বাহ্য বস্তুর প্রতি অবধান হয় না। মনের অবধান তখন নিজের প্রতিই চালিত হয়। নিজের প্রতি মনের অবধান এক বিশেষ প্রকার স্থিতির লক্ষণ। এই স্থিতিতে প্রজ্ঞার উদয় হয়, আন্তরিক চেতনা প্রকট হয়।

মনের দ্বিতীয় অবস্থা—কন্‌সেন্‌ট্রেশন, যা যোগের ভাষায় একাগ্রতা বা ধারণা। এটা অবধানের পরের অবস্থা। এই অবস্থায় আমরা যে বিষয়ে অবধানকে ব্যাপৃত করেছি, পদার্থের সঙ্গে মনের সম্বন্ধ স্থাপিত করেছি, সেই বিষয়েই কেন্দ্রিত হয়ে যাই। যে মন চারদিকে ঘুরে বেড়াচ্ছে, অনেক বস্তুর প্রতি ধাবিত হচ্ছে, তাকে অন্য সব বস্তু থেকে হটিয়ে এনে একই বস্তুতে কেন্দ্রিত করা—এই হল কন্‌সেন্‌ট্রেশন, একাগ্রতা বা ধারণা। এই মনের ধারণাবস্থা। ধ্যানের আগে ধারণা করতে হয়। শরীরের কোন অংশে বা কোন বস্তুতে মনকে স্থাপিত করে নেওয়া, মনকে আরোপিত করে নেওয়া—এই হল ধারণা।

পতঞ্জলি ধারণার এই পরিভাষা করেছেন—'দেশবন্ধঃ চিত্তস্য ধারণা' চিত্তকে কোন প্রদেশে বেঁধে দেওয়া, কোন বস্তুর সঙ্গে চিত্তের সম্বন্ধ স্থাপিত করা যাতে চিত্ত তাতেই বাঁধা থাকবে, অন্যত্র কোথাও যাবে না, এই হল ধারণার অবস্থা।

মনের তৃতীয় অবস্থা—মেডিটেশন, ধ্যান। অবধানের পর ধারণা, আর ধারণার পর ধ্যান। কেন্দ্রীকৃত মনের যে সঘন অবস্থা, তাই হল ধ্যান, ধ্যানে মন স্থির হয়ে যায়, একেবারে জমে যায়। দীর্ঘ সময় ধরে মন যখন জমে থাকে তখন সেই অবস্থাকে বলা হয় ধ্যানাবস্থা। এই হল মেডিটেশন, ধ্যান।

আমরা তিন অবস্থা সম্বন্ধেই বিচার করলাম। ধ্যান হল তৃতীয় অবস্থা।

সর্বপ্রথমে অবধানের অভ্যাস করতে হবে। মনের এমন স্থিতি আনতে হবে যাতে অবধান করা সম্ভব হয়। মন অত্যন্ত গতিশীল তত্ত্ব। মনের কাজই হল গতির ওপর থাকা। বাস্তবে কিন্তু এটাই মনের স্বভাব নয়। আমরা একেবারে বিপরীত দিকে যেতে চাই। স্রোতের সঙ্গে চলা খুব স্বাভাবিক। প্রত্যেকেই স্রোতের সঙ্গে চলতে পারে। নৌকাও স্রোতের সঙ্গে চলে। স্রোতের প্রতিকূলে চলা কঠিন কাজ। যে স্রোতের প্রতিকূলে চলতে সক্ষম হয় সেই সাধক, সাধনা তাকেই সাজে। ভগবান মহাবীর বলেছেন—

'অনুসোযপটিঠএ বহুজণম্মি পডিসোযলদ্ধলকেখণং।
পডিসোযমেব অপ্পা দাযব্বো হোউকামেণং॥'

সমস্ত সংসার স্রোতের পিছেই চলছে। সারা সমাজ, সকল জনতা স্রোতের পিছে চলছে—প্রবাহের সঙ্গে সঙ্গে চলছে। এরূপ স্থিতিতে প্রতিস্রোতে চলা খুবই কঠিন কাজ। তিনি আগে খুবই মহত্ত্বপূর্ণ কথা বলেছেন—'অনুসোও সংসাও, পণ্ডিসোও উত্তারো'—অনুস্রোত অর্থাৎ স্রোতের পিছনে চলা—তারই নাম সংসার। স্রোতের পেছনে চলাই হল চঞ্চলতা। স্রোতের সঙ্গে সঙ্গে চলা—তাকেই বলে অশান্তি,

তাকেই বলে দুঃখ। স্রোতের প্রতিকূলে চলা—তাকেই বলে শান্তি। তাকেই বলে স্থিরতা, তাকেই বলে উত্তরণ, পার পেয়ে যাওয়া। যে স্রোতের প্রতিকূলে চলার ক্ষমতা রাখে সে বাস্তবিকই পার পেয়ে যায়। ধ্যানের ক্রিয়া প্রতিস্রোতের ক্রিয়া, স্রোতের প্রতিকূলে চলার ক্রিয়া। যে মন চঞ্চল ও গতিশীল তাকে কেন্দ্রিত করা, অবহিত করা, স্থির করা—এ সবই বিপরীত ক্রিয়া অর্থাৎ মনের যে স্বভাব নয় সেই স্বভাবেই মনকে টেনে স্থাপিত করা। এর থেকেই বোঝা যায়, ধ্যান কত কঠিন ক্রিয়া। এ কথা মনে করবেন না যে, ধ্যান খুবই সহজ ও সরল ক্রিয়া। আমি ধ্যানকে বিভীষিকা রূপে দেখাতে চেষ্টা করেছি। হয়ত কিছু লোক এতে ভয় পেয়ে যাবে। তারা ভাববে ধ্যানের সাধনা যদি এত কঠোর হয় তবে তারা ধ্যান করতে বসবে কেন? আমি চাই না যে বস্তুস্থিতি কি—প্রকৃত অবস্থা কি, তা আপনারা বুঝবেন না। আপনাদের মনে ভয় হতে পারে বলে আমি সত্যকে গোপন করব—একথা আমি মানি না। এরকম ভ্রান্তি আমি পছন্দ করি না। আমি চাই না যে আপনারা ভ্রান্তি নিয়ে থাকুন। যে জিনিষ যে রকম তাকে ঠিক সে রকমই বুঝতে হবে। ধ্যানের সাধনা বাস্তবিকই কঠিন। আমরা যদি ধ্যানকে সহজ মনে করে চলি তবে আমরা ভ্রমে পতিত হব, আর হয়ত আমরা ধ্যানের স্থিতি পর্যন্ত পৌছতেই পারব না। এ রকম আত্ম-আন ভ্রান্তি বাঞ্ছনীয় নয়। আমরা ধ্যান করছি মূর্চ্ছাকে ভাঙ্গার জন্য, প্রমাদকে ধ্বংস করার জন্য। সে স্থলে যদি ধ্যানের দ্বারা নতুন মূর্চ্ছা বা নতুন ভ্রান্তি জন্ম নেয় তবে খুবই অনিষ্ট হবে। আমরা অসত্যকে দূর করার জন্য ধ্যান করছি, অথচ ধ্যানের ফলে নতুন অসত্যের সৃষ্টি হল এ কখনই বাঞ্ছনীয় পরিস্থিতি হতে পারে না। সেজন্য যথার্থবাদী ও বস্তু-বাদী হয়ে, বাস্তবিক অবস্থা বুঝে, আমাদের ধ্যানের মার্গে প্রবেশ করতে হবে। আমাদের মানতে হবে ধ্যান এক দীর্ঘস্থায়ী সাধনা, এক সুদীর্ঘ প্রক্রিয়া। অল্প সময়ের মধ্যেই ধ্যানকে সিদ্ধ করার জন্য আমরা যেন ত্বরা না করি। ধ্যানকে সিদ্ধ করার জন্য যে প্রস্তুতির প্রয়োজন তার

আলোচনা আমি 'কাকে সাধনা করব ?'—এই বিষয়ের অন্তর্গত করেছি। সম্পূর্ণ তৈরি না হয়ে, অন্য যে সাধন প্রয়োজন তা সমাপ্ত না করে, আমরা যদি ধ্যানকে সিদ্ধ করতে চাই, তবে লাভের বদলে ক্ষতির সম্ভাবনাই অধিক হবে।

যে ব্যক্তি মন্ত্রের সাধনা করছে সে যদি কবচের ক্রিয়া না করে, তবে তার ভীষণ বিপদ হতে পারে। সর্বপ্রথমেই তাকে আত্মরক্ষার কবচ বানিয়ে নিতে হয়। এজন্যই বিভিন্ন মন্ত্রের দীক্ষার সঙ্গে বিভিন্ন কবচের ব্যবস্থা করা হয়েছে। কবচ তৈরি করার উদ্দেশ্য হল, নিজের জন্য বজ্রসম দৃঢ় পঞ্জর নির্মাণ করা। কবচ প্রস্তুত করে নেওয়ার পরে বাইরের কোন শক্তি কবচধারীকে আঘাত করতে পারে না। শরীরের প্রত্যেক অবয়বের জন্য পৃথক পৃথক কবচের ব্যবস্থা আছে। মাথা থেকে পায়ের অঙ্গুষ্ঠ পর্যন্ত প্রত্যেক অবয়বকেই কবচ পরিয়ে দিয়ে সুরক্ষিত করা যায়।

প্রাচীনকালে সৈনিক কবচ ধারণ করে যুদ্ধস্থলে আসত। লোহা বা অন্য ধাতু দিয়ে তৈরি কবচ এত মজবুত হত যে তরবারি বা বর্শার আঘাত তা ভেদ করতে পারত না। কবচ পরিধান করে যোদ্ধা সুরক্ষিত হত, বাইরের আঘাত থেকে মুক্ত থাকত।

অনুরূপ ভাবে, মন্ত্রের সাধক মন্ত্রের সাধনা আরম্ভ করার আগে কবচ তৈরি করে তা ধারণ করে, যাতে বাইরের কোন শক্তি তাকে আঘাত করতে না পারে বা তার কোন অনিষ্ট করতে না পারে।

প্রস্তুতি সকলকেই করতে হয়। পূর্ব প্রস্তুতি ছাড়া কোন কাজ করা সম্ভব হয় না। ধ্যানের জন্যও পূর্ব প্রস্তুতির প্রয়োজন আছে। এই প্রস্তুতির অঙ্গ হিসাবে শরীরের সাধনা খুবই দরকারী। আর মানসিক প্রস্তুতির জন্য সর্বাগ্রে অবধানের অভ্যাস করা আবশ্যক।

সেজন্য আজ আমি ধ্যানের আলোচনা করার আগে মনকে পটু, কুশলী ও প্রশিক্ষিত করার বিষয়ে আলোচনা করছি। মনকে এই প্রকারে প্রশিক্ষিত করতে হবে যে, মনের ক্ষমতা বিকশিত হবে আর

ধ্যানেব স্থিতি পর্যন্ত পৌঁছে যাওযাব যোগ্যতা সম্পাদিত হবে। অবধান দ্বাবা যোগ্যতাব সম্পাদন হয। মনকে পটু না কবে—মনেব পটুতা বিধান না কবে—ধ্যানেব ভূমি পর্যন্ত পৌঁছান সম্ভব হয না। সেজন্য মনকে কুশলী ও দক্ষ কবা বিশেষ প্রযোজন। মনকে পটু কবাব জন্য অনেক বকম অভ্যাস বিধান কবা হয। আসনেব অভ্যাস এই জন্য কবান হয যে, এব দ্বাবা শবীবে পটুতা আসে। আসনেব দ্বাবা আমাদেব মেরুদণ্ডেব হাড এমন নমনীয হয যে, আমবা ইচ্ছামত শবীবকে বাঁকাতে বা ঘোবাতে পাবি। যাব মেরুদণ্ডেব হাড নমনীয নয সে শবীব বাঁকাতে পাবে না, তাব শবীব অনড হয। যেমন শাবীবিক সাধনাব উদ্দেশ্যে মেরুদণ্ডেব হাড নমনীয বাখাব জন্য আসনেব অভ্যাস কবা আবশ্যক, তেমনই মানসিক সাধনাব উদ্দেশ্যে অবধানেব বিবিধ প্রযোগ কবাও আবশ্যক।

মনেব সম্বন্ধ বাহ্য বিষযেব সঙ্গে। মনকে আমবা শিক্ষিত কবতে চাই। মনেব প্রশিক্ষণেব একটি ক্রম আছে। নন্দীসূত্রে এই ক্রম সুন্দরভাবে প্রতিপাদিত হযেছে।

প্রথম ক্রম-যুগল হল—অল্পগ্রাহী, বহুগ্রাহী। মনকে আমি এক কাজে লাগালাম, যাব একবিন্দু মাত্রই মন ধবতে পাবে, মন অল্পই ধবতে পাবে আব অল্পকালই কোন বস্তুকে ধবে বাখতে পাবে। এই হল অল্প-গ্রাহী। বহুগ্রাহীব অর্থ—বহুকে ধবা, বড বস্তুকে ধবা, আব দীর্ঘকাল ধবে বাখা।

আমবা প্রেক্ষা কবি। শবীবেব প্রেক্ষা কবি, শ্বাসেব প্রেক্ষা কবি। উপদেশ দেওযা হয, নাসাগ্রে যাতাযাতকাবী শ্বাসকে দেখ। শ্বাসেব আগম দেখ, নির্গমও দেখ। যে শ্বাস ভিতবে আসছে তাব প্রতি লক্ষ্য বাখ। যে শ্বাস বাইবে যাচ্ছে, তাকেও লক্ষ্য কব। নাসাগ্র বিন্দুতে কেবল শ্বাসকে দেখ। মনকে নাসাগ্রেব ওপব কেন্দ্রিত কব, অবহিত কব। মনেব অবধানকে নাসাগ্রেব ওপব স্থাপিত কবে যাতাযাতকাবী শ্বাসকে দেখ। দবজায দাঁডিযে প্রহবী সর্বদা দৃষ্টি বাখে, কে ভেতবে

আসছে আব কে বাইবে যাচ্ছে। যখন কেউ ভেতবে আসে বা বাইবে যায, তখন প্রহবী সতর্ক হযে দেখে। সেই বকমভাবে নাসাগ্র থেকে যে শ্বাস আসছে-যাচ্ছে, তাকে দেখতে হয। এই শ্বাস বাইবে গেল, এই শ্বাস ভেতবে এল—এই গতাগতি দেখ, ধ্যানকে কেন্দ্রিত কব। এই হল অল্পেব প্রেক্ষা, অল্পেব অবধান। এই হল অল্পগ্রাহী।

বহুগ্রাহী অর্থাৎ বহুব প্রেক্ষা। উপদেশ দেওযা হয, মনকে শ্বাসেব সঙ্গে ভেতবে নিযে যাও, প্রশ্বাসেব সঙ্গে মনকে বাইবে নিযে এস। এটা বহুব অবধান—বহুগ্রাহী। অল্পগ্রাহীব ক্ষেত্রে আমাদেব পথ ছিল অল্প, এখন আমাদেব পথ হল দীর্ঘ। অল্পগ্রাহীব ক্ষেত্রে মনকে কেবল নাসাগ্রে স্থিব বাখা হযেছিল, এখন মনকে শ্বাস-প্রশ্বাসেব পুবো পথেবই অবধান কবতে হয। পথ দীর্ঘ হযে যায, ফলে যাত্রাও দীর্ঘ হয। যেখানে নাভিব আশপাশ থেকে শ্বাস উঠছে সেখানেই শ্বাসেব সাথে মনকে জুড়ে দিতে হয আব তাকে শ্বাসেব সঙ্গে সঙ্গে ভেতবে নিযে যেতে হয। যেখানে গিযে শ্বাসযন্ত্র সমাপ্ত হয আব শ্বাস ফুসফুসে প্রবেশ কবে, সেখান পর্যন্ত মনকে নিযে যেতে হয। একেবাবে ডাযাফ্রাম পর্যন্ত মনকে নিয়ে যেতে হয। যেখানে শ্বাসেব সীমা সে পর্যন্ত শ্বাসকে টেনে নিতে হয। এই হল বহুব অবধান, বহুব গ্রহণ, বহুব প্রেক্ষা। সুতবাং অভ্যাসেব এই দুটি ক্রম আছে—

১। অল্পেব গ্রহণ—অল্পকে দেখাব অভ্যাস।

২। বহুব গ্রহণ—বহুকে দেখাব অভ্যাস।

প্রথমটিব ক্ষেত্রে আমবা একটি ক্ষুদ্র বিন্দুকে দেখি, দ্বিতীযটিব ক্ষেত্রে আমাদেব পথ দীর্ঘ হযে যায, অবগাহনেব মার্গও দীর্ঘ হযে যায।

অভ্যাসেব দ্বিতীয ক্রম-যুগল হল—

একবিধগ্রাহী।

বহুবিধগ্রাহী।

এক প্রকাব বস্তুকে দেখা আব বহু প্রকাব বস্তুকে দেখা। উপদেশ দেওযা হযেছে, নাসাগ্রে যে প্রকম্পন হচ্ছে তা দেখ, অথবা নাসাগ্রেব

ওপর শ্বাসের স্পর্শ অনুভব কর। এও এক প্রকারের অবধান।

যেমন জলে প্রকম্পন হয়, ঊর্মিমালা ওঠে, তেমনই শরীরও প্রকম্পিত হয়। কেবল প্রকম্পন আর প্রকম্পন। ঊর্মি আর ঊর্মি। স্থিরতা বলে কোন পদার্থই নেই। এই পরিস্থিতিতে উপদেশ দেওয়া হয়েছে, নাসাগ্রে যে প্রকম্পন হয় তা দেখ। এও এক প্রকারের গ্রহণ, এক প্রকারের অবধান। এতে মনকে এক স্থানের ওপর অবহিত করে দেওয়া হয়েছে। একে বলে, একবিধগ্রাহী।

বহুবিধগ্রাহীর অর্থ হল—এক সঙ্গে অনেক বস্তুকে দেখা। মনের পটুতা আরও বেড়ে যায়। একসঙ্গে অনেক বস্তুকে কেবল দেখা নয়, মন তাদের গ্রহণ করতেও সমর্থ হয়।

যে অবধান করে, সে মনকে পটু করার প্রশিক্ষণও নেয়। তার অভ্যাস এত তীব্র হয়, ফলে তার পটুতা এত বিকশিত হয়, সে একই সঙ্গে অনেক বস্তুকে ধরতে পারে। উপাধ্যায় যশোবিজয়জী শ্রেষ্ঠ অবধানকারী ছিলেন। তিনি অত্যন্ত প্রতিভাশালী তার্কিক বিদ্বান ছিলেন। তিনি অবধান করতে লাগলেন। একশ পিতলের বাটি তাঁর সামনে রাখা হল। এক ব্যক্তি এক এক করে সবগুলি বাটি বাজাতে লাগল। প্রত্যেক বাটির ধ্বনিই অবধানকারী অবধান করলেন। তাঁর মন ধ্বনির সূক্ষ্মতা সম্বন্ধে অবহিত হল। একশ বাটির ধ্বনিই এই ভাবে গৃহীত হল। তারপর পরীক্ষার সময় এল। পরিষদ থেকে এক ব্যক্তি এল। সে একটি বাটি বাজাল, আর তার সংখ্যা জিজ্ঞাসা করল। অবধানকারী বলে দিলেন ঐ ধ্বনি অমুক সংখ্যার বাটির ধ্বনি। এই ভাবে আরও অনেক প্রশ্নকর্তা এল, বাটির সংখ্যা জিজ্ঞাসা করল। অবধানকারী প্রত্যেক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলেন।

এ ধ্বনি পটুতার জ্ঞান। একই রকমের বাটিগুলির ধ্বনি প্রায় এক রকমেরই হয়। কিন্তু অবধানকারী ধ্বনিগুলির মধ্যে সূক্ষ্ম পার্থক্য ধরতে পারেন। তিনি আপন শ্রবণেন্দ্রিয়ের পটুতা এতই বিকশিত করেছেন যে ধ্বনির অতি সূক্ষ্ম পার্থক্যও তাঁর জ্ঞানগোচর হয়।

আমাদের সঙ্ঘের কিছু অবধানকারী 'সপ্তসন্ধান' নামক অবধান করে থাকেন। এটা এক সঙ্গে অনেক বিষয় গ্রহণ করার ক্ষমতার পরিচায়ক। একজন এক কথা বলল, আর একজন সেইক্ষণেই আর এক কথা বলল। অবধানকারীর পেছনে তার দুই হাতে দুটি ভিন্ন বস্তু স্পর্শ করান হল। তিন জন সামনে দাঁড়িয়ে তিনটি ভিন্ন ভিন্ন বস্তু দেখাল। এইভাবে সাত ব্যক্তি সাতটি ভিন্ন ভিন্ন ক্রিয়া করল। সমস্তটাই একই ক্ষণে করা হল। অবধানকারী ঐ সাতটি ক্রিয়াকেই একই ক্ষণে গ্রহণ করে নেয়। এমনি ভাবে ভিন্ন ভিন্ন ইন্দ্রিয়ের ভিন্ন ভিন্ন কাজ একই সঙ্গে ধরতে পারা, আর সেগুলি যথাযথ বলতে পারা বহুবিধগ্রাহীর এক প্রকৃষ্ট উদাহরণ। অবধানের এরূপ কুশলতা থেকে, পটুতার এরূপ অভ্যাস থেকে, এক সঙ্গে অনেক বস্তুকে ধরতে পারার ক্ষমতা এসে যায়।

এই চারটি বিকল্প হল—অল্পের গ্রহণ, বহুর গ্রহণ, একবিধের গ্রহণ ও বহুবিধের গ্রহণ। এ মানসিক প্রশিক্ষণের ক্রম। এই ক্রম অনুসরণ করে মনকে প্রশিক্ষিত করা যায়। মনের কি প্রবল শক্তি আছে আপনি কল্পনা করুন। আপনারা একে যাদু বা আশ্চর্য ব্যাপার বলে মনে করবেন না। মনের এই প্রবল শক্তি সকলেই মধ্যেই আছে। আপনাদের মধ্যে আছে, আমার মধ্যে আছে, প্রত্যেক ব্যক্তির মধ্যে আছে। প্রত্যেক ব্যক্তির মন সকল শক্তির আধার হয়ে আছে। এই মাত্র পার্থক্য যে, কিছু ব্যক্তি অভ্যাস দ্বারা মনের পটুতা বিধান করেছে, মনকে বিকশিত করেছে। আর কিছু ব্যক্তি সেরকম কোন প্রযত্ন করেনি, ফলে তাদের মন বিকশিত হয়নি। পার্থক্য কেবল প্রযত্নের, কেবল অভ্যাসের। আমরা যদি প্রযত্ন করি তবে আমরাও মনের পটুতা সাধন করতে পারি, আর তা হলে বহুবিধ গ্রহণ আমাদের পক্ষেও সহজ হয়ে যাবে।

আমাদের অনেক সাধু-সাধ্বী অবধানের প্রয়োগ করে থাকেন। সাধারণ লোকের কাছে এটা আশ্চর্যজনক ক্ষমতা বলে মনে হয়। তারা মনে করে এটা চমৎকারী দৈবী শক্তির নিদর্শন। কিন্তু এতে চমৎকারিতা

কিছু নেই। এটা কোন দৈবী শক্তি বা বিদ্যা নয। বাইবেব কোন শক্তিই নয। এটা কেবল মনেব প্রশিক্ষণ, মনেব শক্তি। এই আধাবেই সব প্রযোগ ঘটে। একে চমৎকাব বলে মনে হতে পাবে, কিন্তু আসলে এটা মনেবই পটুতা, তাব অতিবিক্ত কিছু নয়।

তৃতীয চবণ হল—ক্ষিপ্রগ্রাহী, চিবগ্রাহী। এবাও একটি যুগল।

মনকে এমন অভ্যাস কবান হয যে তা বাহ্য পদার্থ তৎক্ষণাৎ গ্রহণ কবতে পাবে। অর্থাৎ একবাব মাত্র দৃষ্টিপাত কবে সব কিছু গ্রহণ কবে নিতে পাবে। তৎক্ষণাৎ গ্রহণ কবতে পাবে। কেউ একটি ঘব এক মুহূর্ত দেখল, তাবপবে চোখ বুঁজে ঘবে বা কিছু আছে সব বলে দিল। ভিতেব বঙ সাদা, সামনে কাল বঙেব বোর্ড, এতগুলি লেখাব তক্তা আছে, তাতে লাল, কাল, নীল অক্ষব আছে, এতগুলি দবজা-জানালা আছে। মোটেব ওপব ঘবেব পুবো বিববণ দিযে দিল। একেই বলে, ক্ষিপ্র-গ্রহণ। এককালেই সব কিছু গ্রহণ কবা, সব কিছু ধবে নেওযা।

আমবা মনেব ক্ষমতাব সঙ্গে পবিচিত নই। মনেব প্রচুব ক্ষমতা আছে। আমবা খুবই কম জানি। অল্প কিছু জানতে পাবলেই আমবা আশ্চর্যান্বিত হই। যদি আমবা মনেব সম্পূর্ণ ক্ষমতা জানতে পাবি, বিকশিত কবে নিতে পাবি, তবে কি না কি হতে পাবে বোঝা কঠিন। আজ মনেব কিছু ক্ষমতাকে বিকশিত কবে মানুষ ভগবান বনে যায, সাবা দুনিযা তাকে ভগবান বলে মেনেও নেয। ঠিক আছে। ভগবান হযে যাওযা কিছু খাবাপ কথা নয। নিজেব অন্তবে নিজেব যে ভগবান আছেন তাঁকে প্রকট কবা খুবই ভাল কথা। তবে দুনিযা খুবই তাডাতাডি ভগবান বলে স্বীকাব কবে। মনেব সামান্য কিছু ক্ষমতাব প্রকাশ সামনে ঘটল, অমনি ভগবান বলে মেনে নিল। মনেব পূর্ণ ক্ষমতা যদি জানতে পাবি, যদি সেই ক্ষমতাকে সাধনা কবে অভিব্যক্ত কবতে পাবি, তবে না জানি কত বড ভগবান হযে যাব।

অন্যপক্ষে বিকল্প হল—চিবগ্রাহী। চিবগ্রাহী কোন কিছু তৎক্ষণাৎ ধবতে পাবে না, কিন্তু ধীবে ধীবে দীর্ঘ সমযে তা ধবে ও গ্রহণ কবে।

চতুর্থ চরণ হল—অনিঃসৃতগ্রাহী, নিঃসৃতগ্রাহী। এও এক ক্রমযুগল।

এই অনিঃসৃতগ্রাহী এক বিচিত্র ক্ষমতা। এটা মনের এমন অভ্যাস, এমন অবধান, যে তা আমরা কল্পনাই করতে পারি না। এই বিষয় স্পষ্ট করার জন্য আমি এক কাহিনী বলছি :

এক শ্রেষ্ঠ চিত্রকর রাজসভায় গেলেন। সেখানে দৈবযোগে তিনি রাণীর পায়ের একটি আঙুল দেখতে পেলেন। প্রাচীনকালে রাণীরা 'অসূর্যম্পশ্যা রাজদারা' হতেন, সূর্যও তাঁদের দেখতে পেত না। এখনকার দিনে অন্যরকম—এখন তো সব কিছুই অনাবৃত। যা হোক, চিত্রকর রাণীর পায়ের আঙুল দেখে নিলেন। তারপর তিনি রাণীর এক পূর্ণ প্রতিকৃতি আঁকলেন। তিনি সেই চিত্র রাজার কাছে আনলেন। রাজা দেখলেন—মহারাণীর চিত্র। তিনি স্তম্ভিত হয়ে গেলেন। তারপরে ভাল করে চিত্রটি দেখলেন। যেখানে রাণীর দেহে তিল আছে বা জট আছে, চিত্রেও ঠিক সেখানে তিল বা জট আছে। রাণীর দেহের প্রত্যেকটি চিহ্ন চিত্রিত রাণীর দেহেও আছে। চিত্রকর ভেবেছিলেন চিত্রটি দেখে রাজা প্রসন্ন হবেন এবং যথেষ্ট পুরস্কার দেবেন। কিন্তু ফল হল বিপরীত। রাজা মনে করলেন রাণীর সঙ্গে চিত্রকরের গুপ্ত সম্বন্ধ আছে, নতুবা এমন চিত্র সে কি করে আঁকল। রাজা সন্দিগ্ধ হলেন, তাঁর মনে ভ্রান্ত ধারণা জন্মাল। তিনি চিত্রকর ও রাণী উভয়ের মৃত্যুদণ্ডের আদেশ দিলেন।

মন্ত্রীর হল দুর্ভাবনা। দেশের সর্বশ্রেষ্ঠ চিত্রকর, যাঁকে পাওয়া দেশ বা রাষ্ট্রের সৌভাগ্য—তাঁর মৃত্যুদণ্ড। এ যে মহা অনর্থ। মন্ত্রী রাজার কাছে গিয়ে বললেন—'মহারাজ! আপনি এ কি করছেন? এমন কুশলী চিত্রকরকে বধ করবেন, তাঁকে মৃত্যুদণ্ড দেবেন?' রাজা উত্তর দিলেন—'তুমি ঠিক জান না। এ লোক দুষ্ট, দুশ্চরিত্র, অযোগ্য।' মন্ত্রী বললেন—'সত্যিই কিন্তু এমন নয়, মহারাজ।' রাজা বললেন—'কি নির্বোধের মত কথা বলছ? শরীরের কোথায় কোন চিহ্ন আছে তা

শরীর না দেখে কি করে জানা যায়?' তখন মন্ত্রী বললেন—'মহারাজ। এই চিত্রকরের অদ্ভুত শক্তি আছে। সে দেহের যে কোন অবয়ব দেখে সম্পূর্ণ চিত্র বানাতে পারে, এই রকম চিত্রই বানাতে পারে।'

রাজা পরীক্ষা করে দেখলেন। চিত্রকর পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলেন। রাজা তাঁর মৃত্যুদণ্ড রদ করলেন।

এই হল অনিঃসৃতগ্রাহী। কোন বস্তুর অল্প কিছুকে আশ্রয় করে গোটা বস্তুটিই বিশ্লেষণ করে দেওয়া।

আর এক ঘটনার কথা বলি।

রোমের বাদশাহ ভারতের রাজার কাছে কিছু সুরমা পাঠালেন এবং জানালেন যে ঐ সুরমা অতিশয় মূল্যবান ও শক্তিশালী। ঐ সুরমা অন্ধত্ব দূর করে—অন্ধের চোখে লাগালে সে দৃষ্টিশক্তি ফিরে পায়। আসলে বাদশাহ পরীক্ষা করতে চেয়েছিলেন ভারতে বুদ্ধিমান ব্যক্তি আছে কিনা। বুদ্ধিমান ব্যক্তি যদি না থাকে তবে সে দেশ সহজেই জয় করে নেওয়া যাবে।

দূত সুরমা নিয়ে ভারতে এল। রাজার কাছে এসে বাদশাহের সব কথা বলল। রাজা ভাবলেন, সুরমার পরিমাণ তো খুবই অল্প, এ কাকে দেওয়া যাবে? নগরে তো অনেক অন্ধ লোকই আছে। যেটুকু সুরমা আছে তাতে কেবল একজোড়া চোখের দৃষ্টি ফিরতে পারে। রাজার তখন নিজের বৃদ্ধ প্রধান মন্ত্রীর কথা মনে হল। এই মন্ত্রী অতিশয় বুদ্ধিমান ও দূরদর্শী ছিলেন। তিনি অন্ধ হয়ে যাওয়ায় রাজকার্য থেকে নিবৃত্ত হয়ে ঘরেই সময় কাটাচ্ছিলেন। রাজা তাঁকেই ডেকে পাঠালেন। প্রধান মন্ত্রী এলেন। রাজা তাঁকে বললেন, 'এই সুরমা নিন, চোখে লাগান, আবার দেখতে পাবেন। সুরমা কিন্তু এত অল্প যে তা একবারই দু চোখে লাগানো যেতে পারে। একথা মনে রাখবেন।'

প্রধান মন্ত্রী সুরমার কৌটো নিলেন। তুলিতে সুরমা ভরে এক চোখে লাগালেন। অল্পক্ষণের মধ্যেই সেই চোখের জ্যোতি ফিরে এল। এক চোখে দেখতে পেলেন। তখন তিনি আর এক তুলি ভরে সুরমা নিলেন,

কিন্তু তা চোখে না লাগিয়ে জিহ্বার ওপর রেখে দিলেন। রাজা বললেন, 'আরে, এ কি করলেন? আপনি তো কানা হয়ে থাকবেন, কেবল এক চোখে দেখতে পাবেন। লোকে আপনাকে কানা বলবে। ছিলেন অন্ধ, এবার হলেন কানা।'

প্রধান মন্ত্রী বললেন—'রাজন্। আমি কানা হব না। স্বয়ং চক্ষুষ্মান হয়ে হাজার হাজার লোকের দৃষ্টি ফিরিয়ে দেব।'

প্রধান মন্ত্রী যে সুরমা জিহ্বাতে লাগিয়েছিলেন তা বিশ্লেষণ করে ফেললেন। বস্তুটি যে কি জানতে পারলেন। আর দেখতে দেখতে সুরমার পুরো 'ফর্মুলা' লিখে রাজাকে দিলেন। প্রধান মন্ত্রী বললেন, 'রাজন। এই সুরমার সব উপাদানই আমি জানতে পেরেছি। এখন আমি এই সুরমা প্রস্তুত করে হাজার হাজার চক্ষুহীনকে চক্ষুষ্মান করব। যদি আমি সুরমার দ্বিতীয় তুলি আমার আর এক চোখে লাগাতাম তবে আমার দুই চোখই দেখতে পেত, কিন্তু তাতে কেবল আমার একলারই লাভ হত। এখন আমি আমার এক চোখের সাথে সাথে লক্ষ লক্ষ চোখের জ্যোতি ফিরিয়ে আনতে পারব।'

মন্ত্রী ঘরে গিয়ে সুরমা প্রস্তুত করলেন। রোম থেকে আগত দূতকে এক কৌটা সুরমা দিয়ে বললেন, 'ঘরে ফিরে যাও। তোমার বাদশাহকে বল, এই রকম সুরমা তিনি যত চান আমাদের দেশ থেকে চেয়ে নিতে পারেন।'

দূত রোমে ফিরে বাদশাহকে সব কথা বলল। বাদশাহ বুঝলেন, যে দেশে এমন বুদ্ধিমান ব্যক্তি বাস করে সে দেশ আক্রমণ করলে পরাজয় অবশ্যম্ভাবী।

এই হল অনিঃসৃত গ্রহণ। এটি অদ্ভুত শক্তি। কোন বস্তুর অল্প কিছু অংশকে আশ্রয় করে সম্পূর্ণ বস্তুটি বিশ্লেষণ করে দেওয়া।

এসব কল্পিত কাহিনী নয়, কেবল কল্পনা বিলাস নয়। এ সব মনের বিচিত্র ক্ষমতাগুলির প্রকাশ।

আমি মনের অবধানের কিছু কিছু প্রয়োগ, মনের প্রশিক্ষণের কোন

কোন প্রণালী, আলোচনা করলাম। এর থেকেই আমরা বুঝতে পারব যে, মনের ক্ষমতা অভ্যাসের দ্বারা, সাধনা দ্বারা বিকশিত করা যায়, আর মনকে পটু করে গড়ে নেওয়া যায়। এ সবই অবধারণের বিবরণ, ধ্যানের বিবরণ নয়। অবধারণের দ্বারাই যখন মনকে এতটা পটু করা যায় তখন ধ্যানের দ্বারা মনের ক্ষমতা কতদূর বিকশিত হতে পারে তা নিজেরই বোধগম্য। আপনারা তা কল্পনা করে নিতে পারেন—আমার বুঝিয়ে দেওয়ার আবশ্যকতা নেই।

অতএব আমাদের সর্বাগ্রে অবধানের অভ্যাস করতে হবে। মনকে কোথায় নিয়োজিত করতে হবে, কেমন করে নিয়োজিত করতে হবে এই সব তথ্য আমাদের ঠিক বুঝে নিতে হবে, যাতে আমাদের চেতনায় ধ্যান করার যোগ্যতা ও ক্ষমতা আবির্ভূত হয়। অবধারণের পরে সংকেন্দ্রনে মনের ধারণার কথা বুঝতে হবে। যখন এই দুইটি ঠিক বুঝতে পারব, তখন তৃতীয় চরণ, আমাদের চেতনায় ধ্যান করার ক্ষমতা জাগ্রত হবে।

৫

না করার মূল্য

একটি লোক একটি বাগানে ঢুকে দেখল অনেক লম্বা লম্বা গাছ আছে। সে বাগানের মালিকে বলল, 'গাছগুলি বড়ই লম্বা হয়েছে।' মালি বলল, 'বাবুজী, 'গাছের লম্বা হওয়া ছাড়া আর কোন্ কাজ আছে।'

সবার আগে কাজের কথাই আমাদের চিন্তায় আসে। গাছ পর্যন্ত নিষ্কর্মা নয়। কোন পদার্থই কাজ ছাড়া থাকে না। বস্তুর লক্ষণই হল অর্থক্রিয়াকারিত্ব। সেই বস্তুই সত্য, যা নিজের কাজ করতে থাকে, কিছু না কিছু করতে থাকে। যা কিছু করে না তা সৎ নয়, অর্থাৎ তার কোনও অস্তিত্ব নেই, তা পদার্থ নয়। পদার্থের অর্থই হল ক্রিয়াশীল। ক্রিয়াশীলতা পদার্থের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত।

আমরা একথা জানি এবং মানি যে, প্রত্যেক লোকেরই কিছু না কিছু করা উচিত। পদার্থেরও কিছু না কিছু করতে হয়। চেতন বা অচেতন উভয়ের মধ্যেই কিছু না কিছু কাজ হতে থাকে। যে লোক কিছু করে তাকে উদ্যোগী, কর্মঠ, কর্মী পুরুষ বলে মানতে হবে একথা আমরা গ্রাহ্য করেছি। যে লোক কিছু করে না তাকে অলস, বেকার, প্রমাদগ্রস্থ এবং অকর্মণ্য বলে আমরা মনে করি। মানুষের কোনও না কোনও কাজে নিরত থাকা উচিত, এই কথার ওপরে আমরা বিশেষ

জোর দিই। যে কিছু করে সে 'আমি কিছু করছি' ভেবে আনন্দ পায়, আবার কখনও কখনও গর্বও অনুভব করে। যে কিছু করে না সে 'আমি কিছু করি না' এই ভেবে হীনমন্যতা অনুভব করে। অন্য লোকেও তাকে উপহাস করে বলে—ও নিষ্কর্মা, কিছুই করে না।

নিষ্কর্মা লোকের এই দুনিয়ার কোনও স্থান নেই। সর্বদাই কোনও না কোনও কাজে ব্যাপৃত থাকা উচিত। বর্তমান কালের অর্থশাস্ত্রও বলছে, নিষ্কর্মা হয়ে থেকো না। ব্যবসা বা অন্য যে কাজ পাও তাই কর, আর যদি কোন কাজ না মেলে তবে গর্ত খোঁড়, বোঁজাও, আবার গর্ত খোঁড়, আবার গর্ত ভর, তবুও কর্মহীন হয়ে থেকো না। কোনও একটা কাজ করতে থাক। এই ভাবে কাজ করার ওপরে আমরা এতটা জোর দিই যে নৈষ্কর্মের মূল্য আমাদের দৃষ্টি থেকে একেবারে লোপ পেয়ে গিয়েছে। নিষ্ক্রিয়তারও তাৎপর্য আছে, একথা আজকাল আমরা আর স্বীকার করি না। বর্তমান যুগ এত প্রবৃত্তিবহুল যে নিবৃত্তির কথা আমাদের বোধগম্য হয় না। নিবৃত্তির এত নিন্দা করা হয়েছে যে তার যে কোনও মূল্য আছে একথা আমরা স্বীকার করতে চাই না। তাকে আমরা মূল্যহীন বানিয়ে দিয়েছি।

প্রবৃত্তির ঘর্ষণ থেকে স্ফুলিঙ্গ উৎপন্ন হতে থাকে। প্রবৃত্তি সংঘাত সৃষ্টি করে, সংঘাত উৎপাদন করে। প্রবৃত্তিকে একাধিকার দেওয়াই বর্তমান কালের সব সংঘর্ষের সবচেয়ে বড় কারণ। বর্তমান কালের অশান্তির মূল কারণ শুধু ক্রিয়াকে মূল্য দেওয়া, অক্রিয়ার মূল্য অনুভব না করা। নৈষ্কর্মের যে একটা বাস্তব মূল্য আছে এ কথা অস্বীকার করা। এটাই আজকাল সবচেয়ে বড় সমস্যা হয়েছে।

আমি আজ কিছু উল্টোপাল্টা কথা বলব। এই প্রবৃত্তিবহুল যুগে আমারও হয়ত প্রবৃত্তির সমর্থন করা উচিত ছিল, কিন্তু আমি তা করব না। প্রবৃত্তির বিরুদ্ধে আমাকে কিছু বলতে হবে। শ্রোতাদের হয়ত সে সব কথা ভাল লাগবে না। কিন্তু সত্য গোপন করাও উচিত নয়। সত্য চিরন্তন, অমোঘ। কারণ সত্যকে অস্বীকার করলে তা থেকে নানা

প্রকার সমস্যার উদ্ভব হয় এবং তা মানুষকে আক্রমণ করে। যদি প্রবৃত্তির মধ্যে ভারসাম্য স্থাপন করে নিবৃত্তির যথার্থ মূল্য নিরূপণ করা যায় তা হলে হয়ত নানা সমস্যার আপনা থেকে সমাধান হয়ে যাবে।

নিবৃত্তির মূল্য প্রবৃত্তির চেয়ে কম নয়। অক্রিয়া ক্রিয়ার চেয়ে কম মূল্যবান নয়। যদি এই কথার অর্থ বোধগম্য হয় তাহলে কর্মও খুব অর্থপূর্ণ হতে পারে। কর্মের সাথে সাথে দুটি দোষ আসে। সেগুলি কমে যেতে পারে। গীতাতে সুন্দর একটি কথা বলা হয়েছে—'প্রত্যেক প্রবৃত্তির সাথে দোষ জড়িত আছে। এমন কোনও প্রবৃত্তি নেই যার সঙ্গে কোনও দোষ সংশ্লিষ্ট নয়। যেমন ইন্ধন দ্বারা প্রজ্জ্বলিত অগ্নির সাথে ধূমের উপস্থিতি অনিবার্য তেমনি প্রবৃত্তির সাথে দোষের সহাবস্থান অনিবার্য। 'সর্বারম্ভা হি দোষেণ ধূমেনাগ্নিরিবাবৃতা।' অগ্নি যেমন ধূমের দ্বারা আবৃত সেই রকম সমস্ত আরম্ভ দোষের দ্বারা আবৃত। এই অনুভব বাস্তবিক, তা সত্য পর্যন্ত পৌঁছেছে। প্রবৃত্তির যখন নিবৃত্তির সঙ্গে সঙ্গতি হয় তখন প্রবৃত্তির সহগামী দোষসমূহের সমাপ্তি ঘটতে পারে। প্রবৃত্তি যেন নিবৃত্তির সাথে সাথে চলে। অন্যথায় প্রবৃত্তির দোষ অত্যন্ত বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়ে মানুষের সর্বনাশের কারণ হয়। এই জন্য আমরা যেন নিবৃত্তির মূল্য বুঝি, অক্রিয়ার মহত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম করি এবং নৈষ্কর্মের মহত্ত্বপূর্ণ পরিণাম অনুভব করি।

প্রবৃত্তির সবচেয়ে বড় সাধন যন্ত্র হল এই শরীর। শুরুতে আমি শরীরের প্রবৃত্তিগুলি সম্বন্ধে আলোচনা করেছি। আজ আমি কিছু বিপরীত আলোচনা করব। আমি প্রবৃত্তির থেকে মুক্তির বিষয়ে আলোচনা করতে চাই।

আপনি কায়োৎসর্গ করুন। কায়াকে বিসর্জন করুন। শরীরকে ত্যাগ করুন। জীবিতাবস্থায় নিজেকে মৃতবৎ অনুভব করুন। শরীরকে সম্পূর্ণ নিষ্ক্রিয়, নিশ্চেষ্ট এবং প্রবৃত্তিশূন্য করুন। একেই বলে কায়গুপ্তি বা কায়োৎসর্গ। শরীরকে উৎসর্গ করা, কায়াকে ত্যাগ করা, এ বড়ই কঠিন কাজ। মৃত্যুর পরে প্রত্যেক মানুষই শরীর ছেড়ে চলে যায়, কিন্তু

জীবিত অবস্থায় শরীরকে ত্যাগ করা বড়ই কঠিন সাধনা। কায়াকে ত্যাগের কথায় মহামুনি গৌতমের মনেও একটি প্রশ্ন জাগল। তিনি ভগবানকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'কায়াগুপ্তযাত্র ণং ভন্তে। জীবে কিং জণয়ই? ভগবন্। কায়গুপ্তি কা পরিণাম ক্যা হৈ।'

কায়গুপ্তিতে জীবের কি লাভ হয়? কায়গুপ্তির পরিণাম কি? তার উত্তরে ভগবান বললেন 'কায়াগুপ্তযাত্র ণং সংবরং জণয়ই।' কায়গুপ্তি দ্বারা সংবরণ হয়। দুটি কথা আছে— আস্রব এবং সংবর। যার দ্বারা দোষ আমাদের ভেতর প্রবেশ করে তাকে আস্রব বলা হয়। আমাদের ভেতরে কোন দোষ নেই। আমাদের আত্মাতেও কোনও দোষ নেই। ঘর পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন। তার ভেতরে কোনও মলিনতা বা আবিলতা নেই। দরজা এবং জানালা দিয়ে ময়লা ও ধুলো ভেতরে আসতে থাকে। যেখানে এতটুকু ফাঁক আছে সেখান দিয়ে ধুলো ভেতরে ঢুকতে থাকে। ঝড় আসে। তাকে রোধ করা সম্ভব হয় না। কেউ কখনও ঝড়ের গতিরোধ করতে পারে না। এমন কোনও উপায় নেই যার দ্বারা ঝড়-তুফানের দুর্বার প্রবাহকে অচল করে দেওয়া যায়। কোনই উপায় নেই। কেউ কোনও দিন ঝড়-তুফানের গতিরোধ করতে পারে নি। কিন্তু এমন ব্যবস্থা বা উপায় আছে যার দ্বারা ধুলোর ঘরের ভেতরে প্রবেশ করা বন্ধ করা যায়। যদি আমরা দরজা-জানলা সব বন্ধ করে দিই তবে ধুলো ঘরের ভেতরে আসতে পারবে না, বাইরেই থেকে যাবে। আমাদের চেতনায় কোনও আবিলতা নেই। চেতনা শুদ্ধ, নির্মল, স্বচ্ছ। কিন্তু যেমন প্রত্যেক ঘরেরই দরজা জানালা আছে সেই রকম চেতনারও প্রবেশপথ আছে, দরজা জানালা আছে। তাকে আমরা আস্রব বলব। আস্রব কথাটির অর্থ ছিদ্র। সেই ছিদ্রপথে বাইরে থেকে তত্ত্ব আসে, আর তাতে আমাদের চেতনা ভরপুর হয়ে যায়। এই সব তত্ত্ব বিজাতীয়, আগন্তুক। যা বিজাতীয় তা প্রায়শই সঙ্কট সৃষ্টি করে, নানা প্রকার সমস্যা সৃষ্টি করে। যা স্বাভাবিক, আপনা আপনি ঘটে, তা থেকে বিঘ্নের উদ্ভব হয় না। বিজাতীয় বস্তুতে সর্বদাই বিঘ্নের আশঙ্কা থাকে।

তাকে অস্বীকার করা সম্ভব নয়। আমাদের এমন ব্যবস্থা করতে হবে যাতে আস্রব না থাকে। চেতনার দরজা জানালা যেন খোলা না থাকে, কোনও ছিদ্র যেন খোলা না থাকে। সব প্রবেশপথ যেন বন্ধ হয়ে যায়, সুরক্ষিত হয়। সংস্কৃত ভাষায় 'গুপ্' ধাতুর অর্থ 'রক্ষণ'। 'গুপ্ত' কথাটির অর্থ হবে 'সুরক্ষিত'। কায়গুপ্তির অর্থ, শরীরকে সুরক্ষিত করা। আমরা শরীরকে এমনভাবে সুরক্ষিত করব যাতে ভেতরে কোনও আগন্তুক বস্তু কোনও অবকাশ বা শূন্যস্থান না পায়। বাইরের কোনও কিছু ভেতরে আসতে না পারে। কেবল আমরা থাকব, আমাদের চেতনা থাকবে, এ ছাড়া ভেতরে আর কিছু থাকবে না। এই প্রক্রিয়ার নাম 'সংবর'। ভগবান মহাবীর বলেছেন, 'যে কায়গুপ্তি করতে পারে সে সংবর উৎপন্ন করে, আস্রবের পথ রুদ্ধ করে। যে সংবর উৎপাদন করে সে নিজেই সংবর হয়ে যায়।'

তিনি এক বিরাট মহত্ত্বপূর্ণ কথা বলেছেন, বাইরে থেকে যা কিছু নেওয়া হয় তা নেওয়ার একমাত্র উপায় আমাদের শরীর। মানসিক, বাচনিক বা শ্বাসসংক্রান্ত যে কোন পরমাণু আমাদের ভেতরে প্রবিষ্ট হোক না কেন তাদের সবার জন্য একটিমাত্র আস্রব বা প্রবেশ পথ আছে—সেটি আমাদের শরীর। শরীরে যদি চঞ্চলতা না থাকে, প্রবৃত্তি না থাকে, সক্রিয়তা না থাকে, তবে শরীরের ভেতরে কোনও কিছুই প্রবেশ করতে পারে না। যে সমস্ত পরমাণু শরীরের ভেতরে প্রবিষ্ট হয় সেগুলি শুধু শরীরের চঞ্চলতার ফলেই প্রবিষ্ট হতে পারে। শরীরের চঞ্চলতা নিঃশেষিত করা, তার সমাপ্তি ঘটানোর নামই কায়গুপ্তি। শরীরে এমন স্থৈর্য আনতে হবে যাতে দেহ নিজেই ধ্যানে পরিণত হয়। আপনারা ভাববেন না যে কেবল মনেই ধ্যান হয়। অনেক যোগাচার্য, অনেক বিদ্বান লোক কেবল মানসিক ক্রিয়াকে ধ্যান মনে করেন। কিন্তু জৈন আচার্যদের মত অন্য রকম। তাঁরা তিন প্রকার ধ্যানের কথা বলেছেন— কায়িক ধ্যান, বাচনিক ধ্যান ও মানসিক ধ্যান। যেমন স্থির মন ধ্যানে পরিণত হয় তেমন স্থির দেহও ধ্যান

হতে পারে। শরীরের স্থিরীকরণও ধ্যান।

ধ্যানের আক্ষরিক অর্থ—চিন্তা করা। 'ধ্যে' ধাতুর মৌলিক অর্থ চিন্তা করা। এই ধাতু থেকে 'ধ্যান' শব্দটি নিষ্পন্ন হয়েছে। এটি শাব্দিক সংজ্ঞা মাত্র। শব্দের অর্থের বিস্তার হয়। সঙ্কোচন হয়। শব্দের অর্থের যখন বিস্তার হয় তখন শব্দ মূল অর্থের সঙ্গে বাঁধা থাকে না। 'ধ্যান' এই শব্দও তার মূল 'চিন্তা করা' এই অর্থের সঙ্গে আবদ্ধ থাকে না। তার অর্থ প্রসার লাভ করেছে। এর অর্থ হয়েছে স্থিরীকরণ বা স্থির করা। ধ্যানের অর্থ—শরীরকে স্থির করা, বচনকে স্থির করা, মনকে স্থির করা। মন স্থির হলে মানসিক ধ্যান হয়। বচন স্থির হলে বাচনিক ধ্যান হয়। শরীর স্থির হলে কায়িক ধ্যান হয়। কায়িক ধ্যান সব ধ্যানের মূল। যতক্ষণ কায়িক ধ্যান না হয় ততক্ষণ বাচনিক বা মানসিক ধ্যান সম্ভব হয় না। শরীরের স্থিরতা ছাড়া শ্বাসের স্থিরতা হয় না, শ্বাসের স্থিরতা না হলে মনের স্থিরতা আনা সম্ভব নয়। মনকে স্থির করতে হলে শ্বাসের স্থিরতা আনতে হবে, আর শ্বাসকে স্থির করতে হলে কায়ার স্থিরতা আনতে হবে। সেই জন্য বলা যেতে পারে ধ্যানের আধারভূত তত্ত্বসমূহের মধ্যে সবচেয়ে বড় তত্ত্ব কায়ার স্থিরতা, অর্থাৎ কায়োৎসর্গ বা কায়গুপ্তি।

মানসিক ধ্যান পর্যন্ত পৌঁছনো অত্যন্ত কঠিন কাজ, কায়িক ধ্যান পর্যন্ত পৌঁছনো অপেক্ষাকৃত সহজ। সাধকের পক্ষে সাধনার প্রারম্ভিক পথ কায়িক স্থিরতা বা শিথিলীকরণ অভ্যাস করা। যে লোক কায়িক স্থিরতা অভ্যাস করেছে সে মানসিক স্থিরতা পর্যন্ত পৌঁছবার ক্ষমতা প্রাপ্ত হয়েছে। যে শরীরের স্থিরতা সাধন করতে পারে না সে মানসিক ধ্যান পর্যন্ত যেতেই পারে না। সবার আগে শরীরের স্থিতি আনা প্রয়োজন। তা করতে পারলে মস্তিষ্ক অস্থিরতা থেকে মুক্ত থাকবে, তার কোনও রকম উত্তেজনা থাকবে না। জ্ঞানবাহী স্নায়ু সম্পূর্ণ স্থির হয়ে যাবে, তাতে আর উত্তেজনা থাকবে না। মাংসপেশীসমূহ শিথিল হয়ে যাবে, ঢিলে হয়ে যাবে। দৃঢ় মাংসপেশী অবরোধ সৃষ্টি করে, সেইজন্য তাদের

শিথিল করা অত্যন্ত আবশ্যক। মেরুদণ্ডের হাড় শিথিল হওয়া প্রয়োজন যাতে তার ভেতরে কোনও উত্তেজনা না আসে। শরীরের প্রত্যেক অবয়ব যেন উত্তেজনা থেকে মুক্ত থাকে, কোনও রকম বক্রতা বা ক্ষোভ না থাকে। এই হল প্রারম্ভিক সাধনা। সবার আগে আমাদের এমন নিপুণতা লাভ করতে হবে যে আমরা ইচ্ছা করলেই আমাদের শরীরকে শিথিল করতে পারি। সাধারণ সাধকের পক্ষে এই প্রক্রিয়া অত্যন্ত উপযোগী। আমি স্বীকার করছি যে কিছু লোকের মানসিক ধ্যানের ভূমিকা পর্যন্ত পৌঁছবার ক্ষমতা আসতে পারে। সবাই ঐ ভূমিকা পর্যন্ত পৌঁছতে পারে না। যদি কেউ এই ভূমিকা পর্যন্ত যেতে পারে তবে সেটা তার পক্ষে অত্যন্ত আনন্দের বিষয়। কিন্তু কাজটা বড়ই কঠিন। শারীরিক স্থিরতা, কায়িক ধ্যান, কায়োৎসর্গ বা কায়গুপ্তি সকলের পক্ষেই সম্ভব হতে পারে। যদি এই ভূমি প্রাপ্ত হওয়া যায় তবে জীবন সফল হবে।

কেউ কেউ মনে করেন, অবধানের ভূমিকা যদি বা পাওয়া যায়, ধ্যানের ভূমিকা অনেক দূরে। আমি বলতে চাই যে অভ্যাস করতে করতে আমরা যদি অবধানের ভূমি পর্যন্ত পৌঁছতে পারি তবে তা কি ধ্যানের ভূমির দিকেই এগোনো নয়? এ কি কম কথা? মনের যে অবধান চারদিকে এলোমেলোভাবে ঘুরে বেড়ায় তাকে যদি এক বিষয়ের ওপরে কেন্দ্রিত করতে আমরা সফলকাম হই তবে সেটা খুব সামান্য উপলব্ধি বলে মনে করবেন না। ভাবনা পর্যন্ত পৌঁছতে পারা আরও বড় কথা। আমি বলতে চাই আপনারা হয়তো অবধানের ভূমিকাতেও পৌঁছবেন না, ভাবনা পর্যন্তও পৌঁছবেন না। কিন্তু আপনারা যদি কায়োৎসর্গের ভূমিকা পর্যন্ত পৌঁছতে পারেন, যদি কায়িক স্থিরতা এবং শিথিলীকরণের স্থিতি পর্যন্ত আসতে পারেন তবে আপনি ধ্যান সাধনার দিকে অগ্রসর হচ্ছেন, সেই দিকেই এগিয়ে যাচ্ছেন।

আজকালকার সবচেয়ে বড় সমস্যা—শারীরিক উত্তেজনা। বর্তমান যুগ অতিরিক্ত সক্রিয়তা এবং দৌড়ঝাঁপের যুগ। শক্তিক্ষয়ের তথা

জীবনীশক্তির অপব্যয়ের সবচেয়ে বড় কারণ অতিরিক্ত সক্রিয়তা। অতিরিক্ত সক্রিয়তার ফলে শ্বাসের অত্যধিক তীব্রতা এসে যায় এবং তার ফলে অনেক শক্তির অপচয় হয়। শরীর স্থির করা এবং দীর্ঘ শ্বাস নেওয়া এই দুটি কৌশল যদি আজকালকার লোকে শিখে নেয় তাহলে তারা অনেক কঠিন সঙ্কট থেকে বাঁচতে পারে। বর্তমান প্রবৃত্তিবহুল যুগের পক্ষে কায়োৎসর্গ বা কায়গুপ্তি মহৌষধের কাজ করতে পারে। এর দ্বারা লোকে বহু কঠিন সঙ্কট থেকে আত্মরক্ষা করতে পারে। প্রবৃত্তিবহুলতা এবং অতিব্যস্ততার ফলে মানুষ অনেক রকম মানসিক বিকৃতি ও শারীরিক ব্যাধিতে আক্রান্ত হচ্ছে। ঐ সব রোগ থেকে বাঁচার একমাত্র উপায় শরীরকে স্থির করা, শিথিল করা। এ মস্ত বড় উপলব্ধি। শান্ত শ্বাস এবং শান্ত শরীর, সাধনার দুটি মহত্ত্বপূর্ণ উপায়। এই কথাকে খুবই মহৎ তত্ত্ব বলে স্বীকার করতেই হবে। শারীরিক মূল্যের দিক থেকে আমি এই তত্ত্বের আলোচনা করলাম। এর আধ্যাত্মিক মূল্যও কম নয়।

সূত্রকৃতাঙ্গ সূত্রে একটি প্রশ্ন উত্থাপন করা হয়েছে—কে কর্মের ক্ষয় করতে পারে? আমাদের সঞ্চিত সংস্কার কি করে নিঃশেষে ক্ষয় পেতে পারে? এই প্রশ্নের উত্তরে বলা হয়েছে—

ন কম্মুণা কম্ম খবেংতিবালা
অকম্মুণা কম্ম খবেংতি ধীরা।

অর্থাৎ কর্মের দ্বারা কর্মক্ষয় হয় না। জ্ঞানীগণ অকর্মের দ্বারা কর্ম ক্ষয় করেন।

অজ্ঞানী লোক মনে করে তারা প্রবৃত্তির দ্বারা প্রবৃত্তির ক্ষয় করবে, সংস্কার দ্বারা সংস্কার নষ্ট করবে। তারা ভ্রান্ত, অজ্ঞান, তমসাচ্ছন্ন। তারা সত্যকে জানে, কিন্তু বাস্তবিকতাকে জানে না। প্রবৃত্তি দ্বারা প্রবৃত্তিকে নিঃশেষ করা যায় না, সংস্কার দ্বারা সংস্কারের সমাপ্তি ঘটানো যায় না। মাঝে মাঝেই প্রবৃত্তির পুনরাবৃত্তি হয়। প্রবৃত্তি অনেক সময়েই গোপন থেকে যায়। প্রত্যেক প্রবৃত্তি সংস্কার চালনা করে। ঐ

সংস্কার অন্য প্রবৃত্তির আশ্রয় নেওয়ার প্রেরোচনা দেয়। আমরা অপর প্রবৃত্তিকে আশ্রয় করলে সেই প্রবৃত্তি তার সংস্কার চালনা করে। সেই সংস্কার তৃতীয় প্রবৃত্তির প্রেরণা দেয়। এই রকম চক্রাকারে প্রবৃত্তি ও সংস্কার চলতে থাকে। তার কোনও শেষ নেই। প্রবৃত্তি দ্বারা প্রবৃত্তির চক্রব্যূহ ভেদ করা যায় না। এই প্রবৃত্তির পালা অন্তহীন ভাবে প্রলম্বিত শৃঙ্খল। কেউ তাকে অতিক্রম করতে পারে না, তার শেষের নাগাল পায় না। তাহলে এই প্রশ্ন দাঁড়ায় যে, এই প্রবৃত্তির পালাকে কি ভাবে ভেঙ্গে দেওয়া যায়। এই সব সংস্কারের কি করে সমাপ্তি ঘটানো যায়? যে সব সংস্কার আমাদের প্রবৃত্তির সঙ্গে সংলগ্ন করে রেখেছি, একের পর এক যে সব সংস্কার নির্মিত হচ্ছে, আর যা বহু বিভিন্ন প্রবৃত্তির প্রেরণাদাতা, তাদের কি করে নির্মূল করা সম্ভব হতে পারে? তার উত্তরে বলা হয়েছে, 'অকম্মুণা কম্ম খবেন্তি ধীরা।' যে জ্ঞানী, যার সত্যের বোধ হয়েছে, অন্ধকার ভেদ করে যে আলোতে পৌঁছেছে, যার বাস্তবিকতার বোধ এসেছে, সে জানে অকর্মের দ্বারা কর্মকে ক্ষীণ করা যায়। অকর্ম অর্থাৎ নিবৃত্তি দ্বারা প্রবৃত্তির সমাপ্তি ঘটানো যায়।

প্রবৃত্তির অবসান হলে পুরানো সংস্কার জেগে থাকলেও তার বৃদ্ধি বা পুনরাবৃত্তি হয় না, ফলে সংস্কার শিথিল হয়ে যায়। আবার জাগলে যদি তার পুনরাচরণ না হয় তবে তা আরও শিথিল হয়ে যায়। সংস্কার মাথা উঁচু করলে যদি তার পুনরাবৃত্তি না ঘটে তবে তার বিলোপ হয়, বিনাশ হয়।

অতিথি এসেছে। তার সংস্কার করা হয়েছে। সে যদি আবার আসে এবং সে যদি আবার আতিথ্য পায় তো সে আবার আসবে। সে মনে করবে—এ তো বেশ ভাল ব্যাপার, আতিথ্যও মিলছে, পরিচর্যাও মিলছে। সে আসতেই থাকবে।

অতিথি এল। সে সৎকার পেল না। সে উপবাসে রইল। যদি সে নির্লজ্জ বেহায়া হয় তবে দ্বিতীয়বার আসবে। আবার উপেক্ষা পেলে আর তৃতীয়বার আসবে না। সে ভাবে—যেখানে শুধু তিরস্কার পাওয়া

যায় সেখানে কেন যাব? সে আর যায় না।

এই হল প্রবৃত্তির রীতি। সংস্কার জেগে উঠলে তার যদি থাকার জায়গা মেলে তবে তা জমতে আরম্ভ করবে। সে আর তখন অতিথি থাকতে চায় না, পরিবারের সদস্য হতে চায়। তখন তাকে সেখান থেকে সরিয়ে দেওয়া বড় কঠিন ব্যাপার হয়ে পড়ে। যে সংস্কার এসেছে তার যদি থাকার জায়গা না মেলে, যদি সে শুধু উপেক্ষা পায়, তবে তার আর পুনরাবৃত্তি হয় না। তিরস্কৃত হলে সংস্কার ধীরে ধীরে ক্ষীণ হয়ে যায়। একবার তিরস্কার কটু বলে অনুভূত হয়েছে, দ্বিতীয় ও তৃতীয়বারও যদি একই অনুভূতি হয় তবে সেই সংস্কার আর আসতে পারে না, তা ক্ষীণ হয়ে যাবে, বিনাশপ্রাপ্ত হবে। এ রকম হতে হতে অবশেষে সংস্কার শেষ হয়ে যাবে। সে আর পরিবারের সভ্য হতে পারে না, আবার অতিথির ভূমিকা নিয়েও ঘরে প্রবেশ করতে পারে না।

এই জন্যই বলা হয়েছে—'অকম্মণা কম্ম খবেন্তি ধীরা।' যে লোক গম্ভীর, যার ধৃতি ও ধৈর্য আছে, যে ঘটনাকাণ্ডে ভীত হয় না, বিচলিত হয় না, যা ঘটে তা জানে, দেখে, কিন্তু বিচলিত হয় না, সে অকর্ম দ্বারা, অপ্রবৃত্তি দ্বারা কর্মকে ক্ষীণ করে। সে সংস্কারকে নিঃশেষ করে, বিলীন করে।

অকর্ম দ্বারা কর্মকে ক্ষীণ করার, নিবৃত্তি দ্বারা প্রবৃত্তিকে ক্ষীণ করার, তথা নিবৃত্তি দ্বারা প্রবৃত্তির দোষসমূহ ক্ষীণ করার তত্ত্ব আজকাল আমাদের কাজে গৌণ এবং অনেক দূরের ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। আজকাল একটা রব উঠেছে, 'কর', 'কর', আরও 'কর'। তার পরিণাম হিসেবে আজকালকার লোক শারীরিক ক্লান্তি, স্নায়বিক শ্রান্তি এবং মানসিক অবসাদে পীড়িত হচ্ছে। এই সমস্ত অবসাদ বা ক্লান্তি থেকে বিরক্তি, চিত্তবিক্ষেপ, অসহিষ্ণুতা, বিভ্রান্তি, আকুলতা, ব্যাকুলতা, লোভ প্রভৃতি নানা প্রকার দোষ সমুদ্ভূত হয়। তার পরিণাম কোথাও লড়াই, কোথাও যুদ্ধ, কোথাও সংঘর্ষ, কোথাও বিরোধ, কোথাও বা বিবাদ। সবাইকে এ সব অপ্রিয় পরিণাম ভোগ করতে হচ্ছে। এত দুঃখ, এত

ক্লেশ সত্ত্বেও কেন আমরা এই বিষয়ে কোনও চিন্তাভাবনা করি না ?

উদ্যোগপতিরা এবং রাজনীতির নেতারা বার বার প্রগতির কথা বলতে ক্লান্তি বোধ করেন না। তাঁরা সদা সর্বদা প্রগতির কথা বলে চলেছেন। প্রগতির জন্যই প্রবৃত্তি অনিবার্য। ভৌতিক প্রগতি বা পদার্থতান্ত্রিক প্রগতির জন্য প্রয়োজন বিরামবিহীন কঠোর পরিশ্রম, আর নিরবচ্ছিন্ন প্রবৃত্তি। প্রগতির জন্যই প্রবৃত্তি অনিবার্য হয়েছে। এ কথা সত্য, কিন্তু এর পরিণামের কথা যেন আমরা ভাবি। পরিণাম বিবেচনা করলে আমরা জানতে পারব যে নিরঙ্কুশ ঔদ্যোগিক এবং ভৌতিক প্রগতি মানুষকে অন্য আর এক দিকে ঠেলে দিচ্ছে। মানুষ শুধু এলোমেলো ভাবে ঘুরে মরে। পরিণাম সুখকর হয় না। মানুষ নিজেই প্রবৃত্তির গ্রাস হয়ে পড়েছে, প্রবৃত্তির শিকারে পরিণত হয়েছে। আধুনিক রাজনীতির নেতারা এবং উদ্যোগপতিরা যদি আপন আপন স্বার্থকে গৌণ করতে পারে এবং এই তথ্য বুঝতে পারে যে প্রবৃত্তিকে সীমাবদ্ধ করা এবং সঙ্গে সঙ্গে নিবৃত্তির যে মূল্যায়ন করা উচিত, আমি স্বীকার করি যে তাহলে মানুষের চেতনা ঠিক দিকে প্রবাহিত হতে থাকবে, সুস্থ থাকবে এবং সত্যের দিকে বিকশিত হবে।

আজকালকার সংঘর্ষ চেতনা ও পদার্থের সংঘর্ষ। বর্তমান কালে পদার্থই প্রধান হয়ে পড়েছে। পদার্থের আবরণে চেতনা আচ্ছন্ন হয়ে যাচ্ছে। কিন্তু তা না হয়ে চেতনায় বিকশিত হওয়া এবং পদার্থের চেতনার অনুগামী হওয়া উচিত। যদি তা নাও হয় তবে অন্তত তাদের একটা ভারসাম্য নিয়ে আসা অত্যন্ত প্রয়োজন। কিন্তু আজকাল সব বিপরীত ঘটনা ঘটছে। সমস্ত বিশ্ব আজ তার দুঃখময় পরিণাম ভোগ করছে।

এই জন্য আমাদের কায়গুপ্তির মূল্য বোঝা প্রয়োজন। তার মূল্য অতি মহৎ। সাধনারও মূল্য অনেক মহৎ।

লোকে শিবিরে আসে দশ, বিশ কিংবা খুব বেশি হলে ত্রিশ দিনের জন্য। তারা মনে করে তারা নির্ধর্মা হয়ে বসে আছে। কোনও কাজ

করতে হচ্ছে না। বিনা কাজে সময় কেটে যাচ্ছে। শিবির আলস্য শিক্ষা দিচ্ছে, এই রকম অনুভব হয়। যে বহু কাজ করতে অভ্যস্ত এবং প্রবৃত্তিতে অতিশয় বিশ্বাসী, তার মনে হবে শিবিরে নিতান্ত কর্মহীন ভাবে দিন কাটছে। এতে অলস লোকের সমাজ তৈরি হবে। আমি বুঝি, ঐ চিন্তা যথার্থ নয়। ঐ রকম চিন্তা করা উচিত নয়। আমরা তো প্রবৃত্তিময় জীবন যাপন করছি। কিন্তু আমাদের প্রয়োজন নিবৃত্তি কি তা বোঝা, নিবৃত্তির মূল্য নিরূপণ করা এবং প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তির মধ্যে একটা ভারসাম্য স্থাপন করা। এই অভিমুখে যদি আমাদের গতি হয় তবে শিবিরের মস্ত বড় সার্থকতা হবে। যদি শিবিরে অকর্মের বাস্তবিক অভ্যাস হয়ে থাকে এবং তার যথার্থতার মূল্য আমরা বুঝতে পেরে থাকি তবে আমি মনে করব শিবিরের বিরাট সার্থকতা লাভ হয়েছে, ব্যর্থতার অনুভূতি আসবে না। অকর্মের ক্ষণেই আমাদের জীবনের বিকাশ হয়। যে লোক সদা সর্বদা ব্যস্ত থাকে তার পক্ষে এই জ্ঞান যথেষ্ট উপলব্ধি করা সম্ভব নয়। যদিও শারীরিক দৃষ্টিতে প্রবৃত্তির এই ব্যবস্থা যে, লোকে দিনের বেলায় জেগে থাকবে এবং রাতে ঘুমোবে, যতটা কাজ করবে ততটা বিশ্রাম করবে, লোকে এই নিয়মও লঙ্ঘন করছে। যে সময়টা নিদ্রার জন্য নির্দিষ্ট সেটাও তারা কেড়ে নিচ্ছে। আগেকার দিনে যারা এই নিয়ম লঙ্ঘন করত তাদের নিশাচর বলত। নিশাচরের অর্থ রাক্ষস। তারা রাত্রিকালে পরিভ্রমণ করে। আজকালকার মানুষ সেই নিশাচরে পরিণত হয়েছে। তারা রাতে খাওয়াদাওয়া করে, রাতে কাজ করে, রাতে যাতায়াত করে। জীবনযাত্রার ধারা একেবারে উলটে গিয়েছে। কিন্তু শারীরিক এবং স্নায়বিক ব্যবস্থার তথা আপেক্ষিক বিশ্রামের দৃষ্টিকোণ থেকে এবং নিবৃত্তিজাত প্রবৃত্তির পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করলে আমরা এ কথা অস্বীকার করতে পারব না যে প্রবৃত্তির সঙ্গে নিবৃত্তির, কর্মের সঙ্গে অকর্মের সামঞ্জস্য হওয়া প্রয়োজন। কর্মের পরিমাণ এত হওয়া উচিত নয় যে তাতে অকর্ম লোপ পেয়ে যাবে। কর্মের বোঝা এত গুরুভার না হয় যে তাতে মানবচেতনা একেবারে

আচ্ছন্ন হয়ে যায়। আচারাঙ্গ সূত্রে বলা হয়েছে—'অকর্মে জানই।' যে অকর্মা সেই জানবে, দেখবে। আপনারা হয়ত পড়েছেন যে বৈজ্ঞানিকদের গুরুত্বপূর্ণ উপলব্ধিগুলি তাঁদের নিশ্চিন্ত এবং নিষ্ক্রিয়ভাবে অবস্থানের সময়ে হয়। খুব কম লোকের কাজ করতে করতে মহত্ত্বপূর্ণ উপলব্ধি হয়েছে। যে লোকের ইনটুইশন অর্থাৎ আন্তরিক বোধ তথা আন্তরিক শক্তি বিকশিত হয়েছে, কোনও মহৎ তত্ত্বের অনুভূতি হয়েছে, তার সেই উপলব্ধি সম্ভব হয়েছে চিন্তাশূন্য এবং নিশ্চেষ্টভাবে অবস্থান-কালে। নিষ্ক্রিয়তা নিজেই একটি মহৎ উপলব্ধি। নিষ্ক্রিয়তার অর্থ, বাইরে কর্মহীনতা আর ভেতরে সক্রিয়তা। নিষ্ক্রিয়তার অর্থ আলস্য নয়। কোন লোক বাইরে সক্রিয় এবং ভেতরে নিষ্ক্রিয় হতে পারে। আবার, অন্য কোনও লোক বাইরে নিষ্ক্রিয় এবং ভেতরে সক্রিয় হতে পারে। যারা চেতনার জগতে সক্রিয় কিন্তু বাইরের জগতে নিষ্ক্রিয়, তাদের আমরা অলস মনে করে থাকি। এটা আমাদের মস্ত বড় ভুল। যে লোক বাইরেও নিষ্ক্রিয় ভেতরেও নিষ্ক্রিয়, সেই লোকই প্রকৃতপক্ষে আলস্যপরায়ণ। সে লোক মূর্চ্ছাগ্রস্ত, মোহগ্রস্ত, প্রমাদগ্রস্ত। সেই ব্যক্তি অকর্মণ্য, আলস্যপরায়ণ। কিন্তু যে ব্যক্তি বাইরে নিষ্ক্রিয় থেকে থেকে অন্তরে চেতনার প্রদীপ জ্বালিয়ে রাখে, যার ভেতরে আগুন নিরন্তর জ্বলছে, চেতনার বহ্নিশিখা যার ভেতরে দেদীপ্যমান, সে ব্যক্তি অকর্মণ্য এবং অলস নয়। পরন্তু সে লোক সক্রিয়, সে এক অতি মহৎ শক্তিকে জাগিয়ে তুলতে ব্যস্ত। পদার্থজগতেও ঐ শক্তির উপযোগিতা অনেক।

গীতায় বলা হয়েছে—

কর্মণ্যকর্ম যঃ পশ্যেৎ অকর্মণি চ কর্ম যঃ।
স বুদ্ধিমান মনুষ্যেষু স যুক্ত কৃৎস্ন কর্মকৃৎ॥

যে কর্মের ভেতরে অকর্ম দেখে এবং অকর্মের ভেতরে কর্ম দেখে, সে যোগী পুরুষ, সে-ই সম্পূর্ণ কর্ম করতে সমর্থ।

আমরা অকর্মের ভেতরে কর্ম দেখার তত্ত্ব ভুলে গিয়েছি। অকর্মের

অন্তরে মহৎ কর্ম হয়ে থাকে। অকর্ম থেকে সম্ভূত কর্ম বাস্তবে অনেক বেশি নির্দোষ কর্ম। কর্ম থেকে উদ্ভূত কর্মে সমূহ দোষ থাকে। অকর্মের এই মহত্ত্ব আমরা বুঝতে পারি। কায়াগুপ্তি, কায়া শিথিলীকরণ, কায়াবিসর্জন—এ সব যেন আমরা বুঝতে চেষ্টা করি। আজ আমি বিধির আলোচনা করব না। বিধি প্রয়োগের দ্বারা বোঝানো হচ্ছে। প্রয়োগের দ্বারা মাথা থেকে পা পর্যন্ত কিভাবে সমস্ত শরীর স্থির করা যায় সে বিষয়ে চর্চা করা যায়। শরীর এতটা স্থির করা সম্ভব যে তাতে চপলতা থাকবে না, প্রকম্পন থাকবে না, সমস্ত শরীর স্থিরতা লাভ করবে। স্থিরতার জন্য যদি একবার মানসিক উত্তেজনা উৎপন্ন করা প্রয়োজন হয় তবে তাই করুন। এতে শিথিলীকরণ অনেক তাড়াতাড়ি সম্ভব হবে।

আপনি মাটির ওপরে শুয়ে পা ছড়িয়ে দিন, হাত ওপর দিকে তুলুন, যতই পারেন হাত পায়ের দিকে টান করুন। একবার এইভাবে শরীর টান করতে পারলে পরম স্থিরতা অনুভূত হবে। শরীরের টান অবস্থা শিথিল করে দিন, শরীর সম্পূর্ণ শিথিল হয়ে যাবে। শিথিলীকরণের এই এক প্রক্রিয়া।

শিথিলীকরণের অন্য একটি প্রক্রিয়া আছে। পা থেকে মাথা পর্যন্ত প্রতিটি অঙ্গে সঙ্কল্প করুন যে, সে অঙ্গ শিথিল হোক। আবার মাথা থেকে পা পর্যন্ত এই সঙ্কল্পের পুনরাবৃত্তি করুন। শরীর শিথিল হয়ে যাবে। কেবলমাত্র শুলেই শরীর শিথিল হয় না। সঙ্কল্প করতে হবে, শরীরকে প্রেরণা দিতে হবে। এই হল শিথিলীকরণের দ্বিতীয় বিধি বা প্রক্রিয়া।

সাধনার দৃষ্টিকোণ থেকে শিথিলীকরণের প্রক্রিয়া বিশেষভাবে বাঞ্ছনীয়। এর মূল্য অনেক। আমি চাই প্রত্যেক সাধক সে মূল্য অনুভব করুন।

৬

মৌনতার মূল্য

কথা বলার সঙ্গে আমাদের পরিচয় আছে। কথা বলার কি মূল্য তা আমরা ভালভাবেই জানি। আমাদের সমস্ত ব্যবহার, অর্থাৎ পরস্পরের মধ্যে আদান-প্রদান, কথার মাধ্যমেই চলে। কিন্তু কথা না বলারও একটি নিজস্ব মূল্য আছে। ভাষণের যতটা মূল্য, অ-ভাষণের মূল্য ততটাই, বরং সম্ভবস্থলে বাক-সংযমের মূল্য বেশি। ঐ মূল্য আমাদের বুঝতে হবে। যে প্রাণী বিকশিত হয়ে ওঠে তার কথা বলার ওপরে নির্ভর করতে হয় না। দেবতাদের পর্যাপ্তি পঞ্চবিধ। তার মধ্যে ভাষাপর্যাপ্তি এবং মনপর্যাপ্তি নামে দু রকম হলেও প্রকৃতপক্ষে অভিন্ন। সাধারণ মানুষের, সাধারণ প্রাণীর পর্যাপ্তি ছয়, কিন্তু দেবতাদের পর্যাপ্তি পাঁচ। একথা স্বীকার করা হয় যে চক্রবর্তীদের পর্যাপ্তি পাঁচ। যে মনের দ্বারা নিজের কথা বলে তার কথা বলার প্রয়োজন হয় না। যখন আমরা আমাদের কথা মনের দ্বারা বলতে পারি না তখন এবং সেই জন্য আমাদের কথা বলার দরকার পড়ে। যখন আমরা মন দ্বারা ভাষণ বুঝতে পারি না তখন আমাদের কথা বলে আলাপ করা প্রয়োজন হয়। কিন্তু যদি মনের দ্বারা ভাষণ সম্ভব হয় তখন ভাষা ব্যর্থ বা নিরর্থক হয়ে যায়। তার আর কোনও সার্থকতা থাকে না। তখন

ভাষণের ওপরে নির্ভর করতে হয় না। মানুষ যেমন যেমন জ্ঞানের ভূমির দিকে অগ্রসর হবে তেমন তেমন ভাষণের ওপরে নির্ভর কমে যাবে। তবুও এরকম প্রশ্ন ওঠে, তীর্থঙ্কর কথা বলেন কেন? কেবল জ্ঞানী কেন কথা বলেন? তাঁরা যখন কৃতকৃত্য হয়েছেন, যখন তাঁদের সমস্ত কার্য সম্পন্ন হয়ে গিয়েছে, যখন তাঁদের সব কিছুতে সিদ্ধি হয়েছে, তখন তাঁদের কথা বলার প্রয়োজন কি? কেন তাঁরা কথা বলেন? কেন বাক্যালাপ করেন, কেন ধর্মবিষয়ে ভাষণ দেন, কেন উপদেশ-কথা বলেন? তাঁদের তো কথা বলার, উপদেশ দেবার কোনও প্রয়োজন নেই। প্রাচীন ব্যাখ্যাকাররা এই প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে বলেছেন তীর্থঙ্কর তথা কেবলী কৃতকৃত্য। তাঁদের কথা বলার কোনও প্রয়োজন নেই। কিন্তু তীর্থঙ্কর শাস্ত্রবিহিত কর্মের উদয়স্বরূপ, সেই জন্য তাঁরা কথা বলেন। তাঁরা নিজস্ব ভঙ্গিতে যথার্থ চিন্তা করেছেন আর সমাধানের এই ভাষা প্রস্তুত করেছেন। এর অন্য রকম সমাধানও হতে পারে। সে হল এই—জ্ঞানী লোকেরও অজ্ঞানী লোকের জন্য কথা বলার প্রয়োজন হয়। যখন কোনও লোকের পরম জ্ঞানের উপলব্ধি হয় তখন তিনি পরম-জ্ঞানীতে পরিণত হন। তাঁদের মনে এক করুণা জাগে যে তাঁরা যা জেনেছেন, যা দেখেছেন, যা অনুভব করেছেন তা অন্যেরও লাভ হোক। তাঁদের মনে পরম করুণা, পরম অনুকম্পা, পরম সৌহার্দ্য আর মৈত্রীর ভাবনা জাগে। ঐ ভাব থেকে যারা পরম রসের আস্বাদ পায় নি, পরম জ্ঞান প্রাপ্ত হয় নি তাদের তাঁরা এমন কিছু বলতে চান যা তারা জানে না। তাঁরা এক ইশারা করতে চান, এক ইঙ্গিত করতে চান, আর কিছু দিতে চান। তাঁরা করুণাপরবশ হয়ে বাণী দিয়ে থাকেন। যদি দুই কেবলজ্ঞানী মিলিত হন তাঁদের কথা বলার প্রয়োজন হয় না। তাঁদের মধ্যে বাক্যের বিনিময় হয় না। তাঁদের আত্মার সঙ্গে আত্মার আলাপ হয়। সেখানে ভাষা নিরর্থক, তার কোনও উপযোগিতা নেই। দুই বিশিষ্ট জ্ঞানীর সাক্ষাৎ হলে তাঁদের বাক্যবিনিময়ের কোনও প্রয়োজন হয় না। যদি একজন জ্ঞানী

এবং আর একজন অজ্ঞানী হয় তবে কথা বলার কিছুটা প্রয়োজন হয়। দুই জ্ঞানীর মিলন হলে কথাবার্তার প্রয়োজন শেষ হয়ে যায়। তাঁদের মধ্যে কেউ কথা বলবেন না। ইনিও মূক, উনিও মূক। দুজনে বোবার মত একে অন্যের দিকে চেয়ে থাকেন, কেউ কথা বলেন না।

এক ঘটনা ঘটেছিল। রবীদ বহু শিষ্যসহ পদযাত্রা করেন। যখন তিনি কাশীর পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন তখন তাঁর শিষ্যরা তাঁকে বলল, খুব সুন্দর সুযোগ মিলেছে। পাশেই কবীরের আশ্রম। সেখানে চলুন এবং দুদিন বিশ্রাম করুন। বিশ্রামও হবে এবং দুই জ্ঞানী পুরুষের মধ্যে আলাপও হবে। আমরা জানার, বিশেষতঃ শোনার, সুযোগ পাব। শিষ্যরা রবীদকে অনুরোধ করল। রবীদও অনুরোধ রক্ষা করতে সম্মত হলেন।

এদিকে কবীরের শিষ্যরা সংবাদ পেল যে রবীদ কাশীর পাশ দিয়ে যাচ্ছেন। তাঁর সাথে শিষ্যরাও আছে। তাদের মনেও ভাবনা জাগল। তারা কবীরকে বলল, 'রবীদ এই দিক দিয়ে যাচ্ছেন। আমরা তাঁকে এখানে আটকাই। আপনাদের দুজনের মধ্যে কথাবার্তা হবে। দুই জ্ঞানী লোকের সাক্ষাৎ হবে। কবীর এবং রবীদ পরস্পরের সাথে মিলিত হবেন। দুজনে জ্ঞানী পুরুষ। খুব জ্ঞানপূর্ণ কথাবার্তা হবে। আমাদের শোনার এবং জানার সুযোগ মিলবে। খুব ভাল হবে।' কবীর বললেন, 'খুব ভাল কথা।' কবীর তাঁর শিষ্যদের নিয়ে চললেন। রবীদও আসছিলেন। তাঁদের দেখা হতে দুজনে দুজনের গলা জড়িয়ে ধরলেন। কবীর রবীদকে থাকতে বললেন। রবীদ তাঁর অনুরোধ মেনে নিলেন। তাঁরা দুজনে এলেন। আশ্রমে রইলেন। আশ্রম কবীরের। সেখানে কবীর এবং রবীদ দুজনেই রইলেন। তাঁদের শিষ্যরাও ছিল। দুজনেরই শিষ্যরা খুব উৎকণ্ঠিত বোধ করছিলেন। এক দিকে রবীদ এবং তাঁর শিষ্যরা বসেছিলেন। আর একদিকে সশিষ্য কবীর বসেছিলেন। সব শিষ্যই দুজনের কথাবার্তা শোনার জন্য উৎসুক হয়ে ছিল। শিষ্যরা ভাবছিল কে আগে কথা বলবেন—কবীর, না রবীদ। সবাই বসে প্রতীক্ষা

করতে লাগল। এক ঘণ্টা গেল, দু ঘণ্টা গেল। সবাই মৌন। দুই জ্ঞানীও মৌন। কবীর ফরীদের এবং ফরীদ কবীরের দিকে ঝুঁকে ছিলেন। দু জনের চোখে চোখে মিলন হচ্ছিল। কিন্তু তাঁদের মুখের তালা খোলে নি। মৌন, মৌন, কেবল মৌন। কেউ কথা বলছেন না। না কবীর কথা বলছেন, না ফরীদ কথা বলছেন। শিষ্যরা প্রতীক্ষা করে ধোঁকা খেয়ে গেল। এই ভাবে সময় চলে যেতে লাগল, প্রতীক্ষার কাল দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর হল, সবাই প্রতীক্ষা করে ক্লান্ত হয়ে পড়ল। এই ভাবে প্রতীক্ষার কাল বেড়ে চলল, আর সবার মনে গভীর আকাঙ্ক্ষা আর উৎকণ্ঠার সৃষ্টি হল। প্রতি ক্ষণ তাদের অতি দীর্ঘ মনে হতে লাগল। এক এক ক্ষণ এক এক ঘণ্টার মত দীর্ঘ বোধ হল। সব শিষ্য প্রতীক্ষা করতে করতে ক্লান্ত এবং বিরক্ত হল। তারা ভাবতে লাগল—ফরীদ কি বোবা, না কবীরই বোবা। দুজনেই নীরব। দুজনের কেউই কথা বলছেন না। শেষ পর্যন্ত কি হল? আরও কিছুটা সময় কেটে গেল। তার পরে কবীর উঠে দাঁড়ালেন। ফরীদও উঠলেন। দুজনেই সেখান থেকে চলে গেলেন। নিজ নিজ কাজে রত হলেন। ভোজনের সময় এল। ভোজন করলেন। বিশ্রাম করলেন। মধ্যাহ্নে দুজনে আবার মিলিত হলেন। তাঁরা দুজনে বসে রইলেন, আর একে অন্যের দিকে চেয়ে রইলেন। দুজনের চোখে চোখে মিলন হল, দুজনে মৌন। শিষ্যরা প্রতীক্ষা করে রইল। পুরো দিন কেটে গেল। সূর্যাস্ত হল। সভা শেষ হল। শিষ্যরা ভাবল, হয়তো তাঁরা রাতে কথা বলবেন। রাতে আবার তাঁরা একত্র হলেন। আবার সেই নীরবতার পালা। শিষ্যরা ক্লান্ত হয়ে পড়ল। আবার দিন এল। সারা দিন গেল। শুধু নীরবতা। কোনও কথাবার্তা নেই। রাতে দেখা, তবুও কোন কথা নেই। শিষ্যদের মন বিরক্তিতে ভরে গেল। তৃতীয় দিন এল। ফরীদ চলে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হলেন। কবীর তাঁকে এগিয়ে দিতে সাথে সাথে চললেন। দুজনেই নীরবে চলতে লাগলেন। অবশেষে দুজনের ছাড়াছাড়ি হওয়ার সময় এল। দুজনে দুজনের গলা জড়িয়ে

ধরলেন। ফরীদ এগিয়ে গেলেন। কবীর নিজের আশ্রমে ফিরে এলেন। আশ্রমে পৌঁছে শিষ্যরা কবীরকে বলল, 'এ কেমন ব্যাপার? আমাদের শুধু ধোঁকা দিলেন কেন? আপনারা কেউ কথা বলবেন না, এ কথা আমাদের আগে বলতে পারতেন। আমরা তাহলে এত দীর্ঘকাল অপেক্ষা করতাম না। আমরা আটচল্লিশ ঘণ্টা প্রতীক্ষা করেছি। আমাদের কি গভীর উৎকণ্ঠা হয়েছিল। আকাঙ্ক্ষা হয়েছিল, ভাবনা হয়েছিল। আমরা ভেবেছিলাম—দুই জ্ঞানী মিলবেন। এক কবীর, আর এক ফরীদ। দুজনের কথাবার্তা হবে। আমরা শুনব, আমাদের জ্ঞান বাড়বে।'

কবীর বললেন—কার সঙ্গে বাক্যালাপ করব? কার সঙ্গে কথা বলব? ফরীদ সামনে বসে ছিলেন। ফরীদ এত জ্ঞানী যে মনের কথা বুঝতে পারেন, তাঁর সামনে কথা বলে কি নিজের অজ্ঞতা প্রকাশ করব? কথা বললে শুধু নিজের অজ্ঞতা প্রকাশ পেত। আমি কার সঙ্গে কথা বলব? তোমরাই বল। আমার সামনে যদি কোনও অজ্ঞানী লোক বসে থাকত তবে অবশ্যই তার সঙ্গে কথা বলতাম। কিন্তু তিনি তো মহাজ্ঞানী, তাঁর সঙ্গে কি কথা বলব? তিনি আমার মনের সমস্ত কথাই জানতে পেরেছেন।

ফরীদের শিষ্যরাও ফরীদকে ঐ প্রশ্ন করেছিল এবং তিনিও তাদের ঐ উত্তরই দিয়েছিলেন। আমি কার সঙ্গে কথা বলব? কবীরের মত জ্ঞানী ব্যক্তি সামনে ছিলেন, তিনি আমার মনের সমস্ত কথা জেনেছিলেন। তার পরে আমি আর কি বলব? আমি যা বলতে চেয়েছিলাম সে সব কিছুই তিনি জানতে পেরেছিলেন। ঐ রকম পরিস্থিতিতে তাঁর সামনে আমি কিছু বললে শুধু নিজের মূর্খতাই প্রকাশ করতাম। আমার সামনে কথা বলার কোনও প্রশ্নই ছিল না। যেখানে সামনে অজ্ঞানী উপস্থিত থাকে সেখানেই কথা বলার দরকার হয়। দুজনেই যদি অজ্ঞানী হয় তবে তাদের কথা কখনই শেষ হয় না। দীর্ঘকাল বাক্যালাপ হয়। দুই পণ্ডিতের সাক্ষাৎ হলে শাস্ত্রার্থ আলোচনা কখনও শেষ হয় না। বিবাদ

কখনও সমাপ্ত হয় না। এই রকম পরিস্থিতির কথা মনে রেখে ভগবান মহাবীর বলেছেন—যদি কোন পণ্ডিত, কোনও অর্থশাস্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাৎ হয় তাকে বোঝাও, আবার বোঝাও। যদি বোঝাবার পরেও সে স্বীকার না করে তবে বাকগুপ্তি কর, বচন গোপন কর, অর্থাৎ মৌনাবলম্বন কর। একেবারে মৌন হয়ে যাও। সেটিই সবচেয়ে সুন্দর সমাধান।

বাদশাহ বীরবলকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন—'মূর্খের পাল্লায় পড়লে কি করা উচিত?' বীরবল বলেছিলেন—'জাঁহাপনা, মৌন হয়ে যাওয়া উচিত। মৌন থাকাই সবচেয়ে ভাল সমাধান।' বিবাদ শেষ করার এর চেয়ে ভাল উপায় আর হতে পারে না।

মহাবীরও বলেছেন, যদি কোনও পণ্ডিত বা ভাষাশাস্ত্রী উপস্থিত হয় এবং কেবল তর্কের কথা বলে বিবাদ বাড়াতে চায়, শাস্ত্রার্থ করতে চায় তবে মৌন হয়ে যাও, বাকগুপ্তি কর। ঐ তার সমাধান বটে।

দুই জ্ঞানী মিলিত হলে তাঁরা বাক্যালাপ করেন না। যেখানে এক জন অতিশয় জ্ঞানী আর একজন তাঁর চেয়ে কম জ্ঞানী, সেখানে ভাষার প্রয়োগ হয়। যেখানে দুজনেই জ্ঞানী, দুজনেই সমান বোদ্ধা, সেখানে ভাষার প্রয়োগ নিরর্থক।

মৌন থাকার এই বড় সুবিধে যে তাতে আমাদের জ্ঞান বাড়ে। যখন ভাষার ব্যবহার কম হবে তখন আমাদের জ্ঞান বাড়বে। যত বেশি ভাষার প্রয়োগ হবে, আমরা যত বেশি কথা বলব ততই আমাদের অন্তর্জ্ঞানে বাধা ঘটবে। চঞ্চলতা বাধা সৃষ্টি করে। ভাষার প্রথম কাজ চঞ্চলতা সৃষ্টি করা। পূজ্যপাদ লিখেছেন—জনেভ্যো বাক্ ততঃ স্পন্দঃ—যখন সম্পর্ক হয় তখনই বাক্য আসে। একলা একলা তো কোনও কথাবার্তা হয় না। একাকী কেউ কথা বলে না। একলা থাকলে কথা বলার কোনও প্রয়োজন থাকে না। দ্বিতীয় কেউ থাকলে সম্পর্ক হয় এবং বাক্যালাপ হয়। আর, কথার পরে আসে চঞ্চলতা। কথা বলার আগেও চঞ্চলতা, আর পরেও চঞ্চলতা। আমাদের কথা বলতে হলে সবার আগে আমাদের মনকে চঞ্চল করতে হয়। মনকে চঞ্চল না করলে

কোনও লোক কথা বলতে পারে না। লোকে কোনও কিছু বলতে চাইলে প্রথমে চিন্তা করে, তার পরে বলে। বলার মতলব থাকলে প্রথমে মনকে চঞ্চল করে, তারপরে বলে। বলার আগে চঞ্চলতা, আবার পরেও চঞ্চলতা। কথা বলা নিজেই চঞ্চলতা বিশেষ। বলার পরে ঐ বিষয়ে আবার যে চিন্তা হতে থাকে তা স্বয়ং চঞ্চলতা উৎপাদন করে। ভাষণের আগে চাঞ্চল্য, ভাষণের সময়ে চাঞ্চল্য। ভাষণের পরেও চাঞ্চল্য। এ সমস্তই চঞ্চলতার ব্যবহার, আর এই ব্যবহার অন্তর্জ্ঞানের পথে বাধা উপস্থিত করে। যে লোক অন্তর্জ্ঞানের সঠিক মর্ম বোঝেন তিনি খুবই কম কথা বলে থাকেন। তিনি বেশির ভাগ সময় মৌন থাকেন।

ভগবান মহাবীরকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল—'ভগবন্, বচনের গুপ্তি অর্থাৎ মৌন দ্বারা লোকে কি পায়?' ভগবান উত্তরে বলেছিলেন যে বচনগুপ্তি থেকে মানুষ নির্বিচারতা প্রাপ্ত হয়। 'নিব্বিযারতং' কথাটি প্রাকৃত ভাষার শব্দ। সংস্কৃতে তার দুটি রূপ হতে পারে—নির্বিচারত্ব বা নির্বিকারত্ব অর্থাৎ নির্বিচারতা বা নির্বিকারতা। বচনগুপ্তি দ্বারা নির্বিচারতা বা নির্বিকারতা প্রাপ্ত হওয়া যায়। বিকৃতির অর্থ পরিণতি। নির্বিকৃতির অর্থ স্থিরতা, যার কোনও পরিণতি নেই। স্থিরতা স্থায়ী। ভাষা থেকে যে বিকৃতি সম্ভূত হয় তার সমাপ্তি আছে।

বচনগুপ্তির এক পরিণাম—নির্বিচারতা। আমরা এই জন্য চিন্তা করি যে আমরা বলব, অন্য লোককে বলব। আমাদের মনে যখন বলার কথা আসে তখন আমরা চিন্তা করি। যখন আমরা মৌন থাকি তখন নির্বিচারতার স্থিতি উৎপন্ন হয়। বচনগুপ্তি থেকে মহৎ লাভ নির্বিচারতা। অভাষণের মূল্য নির্বিচারতা। সেখানে বিচারের স্থিতির শেষ।

ভাষা ব্যবহার না করার আর একটি মূল্য—বিবাদমুক্তি। বিবাদ থেকে ছুটি মিলে যায়। মৌন হয়ে যাও, বিবাদ আপনা থেকে শেষ হয়ে যাবে। হামেশাই কথা বলার ফলে বিবাদ তথা লড়াই হয়। যখন একজন বলতে থাকে তখন অপর জন যদি মৌন থাকে তবে বিবাদ সমাপ্ত হয়ে যায়। 'অতৃণে পতিতো বহ্নিঃ স্বয়মেব বিনশ্যতি।' আগুন

জ্বলছে। তার ইন্ধন স্বরূপ ঘাস না মিললে, ভোজন না মিললে সে নিবে যাবে, আর জ্বলবে না। সেই রকম দুই ব্যক্তি যদি কথা বলে চলে তবে লড়াইয়ের আগুন লকলক করে জ্বলে ওঠে, নেবে না, শান্ত হয় না। লড়াইয়ের আগুনের ইন্ধন মিলে যায়, খাদ্য মিলে যায়, আর আগুন জ্বলতেই থাকে। যখন একজন কথা বলে তখন আর একজন যদি চুপ করে থাকে, কোনও কথা না বলে তাহলে আগুনের খাদ্য মেলে না, ফলে তা আপনা থেকে শান্ত হয়ে যায়, নিবে যায়। মৌনের দ্বিতীয় লাভ—বিবাদমুক্তি।

মৌনের তৃতীয় লাভ—অহংমুক্তি। কথা না বললে অহঙ্কার শেষ হয়ে যায়। কথায় অহঙ্কার বৃদ্ধি পায়। 'আমি বেশ বলেছি'—এ অহঙ্কার। 'ভাষার উপরে আমার প্রভুত্ব আছে'—এও অহঙ্কার। এতে অহং উৎসাহিত হয়। ভাষার জ্ঞান যতটা হয় ততটাই অহং বোধ বৃদ্ধি পায়। এইজন্যই ভগবান মহাবীর বলেছেন, 'ন চিন্তা তায়যে ভাসা কয়ো বিজ্জাণুসাসনং'—ভাষা আমাদের ত্রাণ করে না। নানা প্রকার ভাষা ত্রাণস্বরূপ হয় না। আমি সংস্কৃত জানি, হিন্দি জানি, প্রাকৃত জানি—এই রকম ভাবে ভাষার অহঙ্কার বেড়ে যায়। ভাষা বাক্যের মাধ্যম, বিচার ব্যক্ত করার মাধ্যম, তা আমাদের অহঙ্কারের মাধ্যমে পরিণত হয়।

স্বামী রামতীর্থ আমেরিকা গিয়েছিলেন। আমেরিকার রাষ্ট্রাধ্যক্ষ তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে এসেছিলেন। এসে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, 'স্বামীজি, আপনি নিজেকে বাদশাহ বলে থাকেন, এ কেন করেন? আপনার তো কিছুই নেই। যা আছে তা সামান্য। তবে আপনি বাদশাহ কিভাবে হলেন তা আমি ঠিক বুঝতে পারছি না।' রামতীর্থ বলেছিলেন—'আমার কিছু নেই বলেই তো আমি বাদশাহ। যে বস্তুকে আঁকড়ে ধরে সে তো গরীব। যে গরীব সে সব কিছু সংগ্রহ করতে চায়, সব কিছু সঞ্চয় করতে চায়। আমি গরীব নই, আমি বাদশাহ। আমার কোনও কিছুর প্রয়োজন নেই। সারা দুনিয়া আমার। আমি

কেন সংগ্রহ করব, কেন সঞ্চয় করব, কোথায় সঞ্চয় করব ? সারা দুনিয়া তো আমার। গরীব সংগ্রহ করার চেষ্টা করে। আপনারা সবাই সংগ্রাহকের দল, আপনারা সবাই তো গরীব। আমিই প্রকৃত বাদশাহ, যে কিছুই সংগ্রহ করে না বা সঞ্চয় করে না। আমার কিছুই নেই, এই জন্য আমি বাদশাহ।'

বস্তুত এই কথা অতিশয় তাৎপর্যপূর্ণ। তা রাষ্ট্রাধ্যক্ষের মনে বোধ জাগিয়েছিল। একজন অকিঞ্চন লোকের কথা কার্যকর হতে দেখে সন্ন্যাসীও সন্তোষ লাভ করেছিলেন। তিনি ভারতে ফিরে এলেন। তিনি ভাবলেন—আমি যা কিছু বলেছি, যা কিছু অনুভব করেছি তা ভারতের লোকদেরও বলব। ভারতে তিনি কাশীধামই বেছে নিলেন, কারণ কাশী পণ্ডিতদের নগর। পণ্ডিতরা তাঁর ঐ কথা ভালভাবে বুঝতে সক্ষম হবে, বেশি গুরুত্ব দেবে। তিনি কাশী এলেন। সভা আয়োজিত হল। বহু লোক এল। বড় বড় পণ্ডিত, দিগ্‌গজ বিদ্বান লোক এলেন। রামতীর্থ তাঁর অভিজ্ঞতার কথা শোনালেন। সে কথা শোনার পরে এক বিদ্বান উঠে বললেন—'মহারাজ! আপনি কি সংস্কৃত জানেন ?' রামতীর্থ উত্তর দিলেন, 'আমি সংস্কৃত জানি না।' তখন সেই পণ্ডিত বললেন, 'তবে আপনি জ্ঞানের কথা কি বলছেন ? যে সংস্কৃত জানে না সে ব্রহ্মজ্ঞানের কথা কি বুঝবে। সে আবার ব্রহ্মজ্ঞান সম্বন্ধে কি আলোচনা করবে, কেমন করেই বা করবে ? সে লোকের ব্রহ্মজ্ঞান সম্বন্ধে আলোচনা করার অধিকার নেই।'

আলোচনা সেখানেই শেষ হয়ে গেল, মনে হল সংস্কৃত যেন ব্রহ্মজ্ঞান অধিকার করে নিয়েছে। কিন্তু ব্রহ্মজ্ঞানে অন্য ভাষারও অধিকার আছে। যে ব্রহ্মজ্ঞান আত্মার নির্মলতা, পবিত্রতা তথা বিশুদ্ধি থেকে উদ্ভূত হয়, যে ব্রহ্মজ্ঞান অন্তঃকরণের পবিত্রতা থেকে সঞ্জাত, তাকে ভাষায় বন্দী করা হয়েছে, এ কত বিড়ম্বনা। যে সংস্কৃত জানে সে-ই ব্রহ্মজ্ঞানে অধিকারী। যে সংস্কৃত জানে না সে ব্রহ্মজ্ঞানের অধিকার প্রাপ্ত হয় না। অন্তরের জ্ঞান, আত্মার সহজভাবে উৎপন্ন জ্ঞানকে

ভাষার বাঁধনে বেঁধে আমরা অহংকে বর্ধিত করার রাস্তা প্রস্তুত করেছি। এই জন্যই ভগবান মহাবীর বলেছেন—'ন চিত্তা তায়যে ভাসা।' নানা প্রকার ভাষা আপনাকে মুক্তি দিতে সক্ষম হবে না, দুঃখ থেকে ত্রাণ করতে পারে না, আত্মিক জ্ঞান উৎপন্ন করতে সমর্থ হবে না। 'কযো বিজ্জাণুসাসনং'। এই বিদ্যার অনুশাসন, যা সমস্ত হয় বচনের মাধ্যমে, ভাষার মাধ্যমে, তা আপনাকে সুরক্ষিত করতে পারে না। আপনার নিজের সুরক্ষা আপনার জ্ঞানে, আপনার নিজের মধ্যেই নিহিত আছে। ঐ জ্ঞান কথার দ্বারা পাওয়া যায় না, কিন্তু অভাষণের দ্বারা অবশ্যই পাওয়া যায়। ঐ জ্ঞানের কথা নিজের বলার প্রয়োজন নাই, কোনও ভাষারও প্রয়োজন নাই।

দুনিয়াতে অনেক আত্মজ্ঞানী লোক এসেছেন। ইংরেজি, ফরাসী, তথা হিন্দি ভাষা জানা লোকও আত্মজ্ঞানী হয়েছেন। সংস্কৃত এবং প্রাকৃত জানা লোকও আত্মজ্ঞান লাভ করেছেন। এ ছাড়া কোনও ভাষাই ভালভাবে জানেন না বা বুঝতে পারেন না, এমন লোকও আত্মজ্ঞানী হয়েছেন। আবার এমন লোকও আত্মজ্ঞানী হয়েছেন যিনি নিজের বিচার ভাষায় প্রকাশ করতে পারেন না, ভাষণ দিতে জানেন না, নিজের কথাও সম্পূর্ণ বলতে পারেন না। ভাষার সঙ্গে আত্মজ্ঞানের কোনও সম্বন্ধ নেই। ভাষা বাইরে থেকে আসে, আর আত্মজ্ঞানের স্রোত ভেতর থেকে প্রবাহিত হয়। ভাষা কথা বলার একটি উপায় বা যন্ত্র মাত্র, ব্যবহারের মাধ্যম মাত্র। সেই ভাষাকেও আমরা অহঙ্কারের সাধনযন্ত্রে পরিণত করেছি। আমি বুঝতে পারি না—বলা থেকে একটা মস্ত বড় লাভ হয়। সেটা অহংমুক্তি বটে। অহঙ্কার থেকে আমরা মুক্ত হয়ে যেতে পারি, ছাড়া পেতে পারি, আর যার মাধ্যমে অহঙ্কার এত বর্ধিত হয় তা থেকে বেঁচে যেতে পারি।

আমি একথা মানি সাধারণ মানুষের কথার প্রয়োজন আছে, কথা ছাড়া তার ব্যবহার চলতে পারে না। বাক্যের ব্যবহার ছাড়া তার জীবনচর্যা অচল হয়ে যেতে পারে। বলতেই হয়, এ এক রকম কথা।

আব বলা আবশ্যক, বলাকে আমবা অনিবার্য বলে মেনে নিযেছি, বলাতে আমবা প্রাথমিকতা আবোপ কবেছি, এ সব অন্য বকম কথা। এই দু বকম কথাব মধ্যে অনেক তফাৎ। কেননা যখন বলাকে আমবা প্রাথমিকতাব গুরুত্ব দিই, তাকে অনিবার্য বলে মেনে নিই, তখন আমাদেব মানসিক ক্ষমতা কমে যায, ক্ষীণ হযে যায। যে কথা মনেব দ্বাবা বলা যায সে কথা বলতে আমবা অসমর্থ হযে পডি। মনেব শক্তিব বড অন্তবায এসে যায।

আধুনিক প্যাবাসাইকোলজিস্টবা টেলিপ্যাথিব প্রযোগ কবছেন। টেলিপ্যাথিব অর্থ বিচাবসংপ্রেষণ। একটি লোক হাজাব ক্রোশ দূবে আছে। তাব সঙ্গে কথা বলতে হবে। কি ভাবে তা সম্ভব হতে পাবে? আজ তো টেলিফোন এবং বেতাব যন্ত্র হযেছে। ঘবে বসে লোকে হাজাব ক্রোশ দূবে থাকা নিজেব লোকেব সঙ্গে কথা বলছে। প্রাচীনকালে এসব যন্ত্র ছিল না, তখন লোকে দূবে অবস্থিত মানুষেব সঙ্গে কথা বলত কি কবে? তাবা টেলিপ্যাথি বা বিচাব-সংপ্রেষণ দ্বাবা আলাপ কবত। প্রাচীনকালে টেলিপ্যাথি বলে কোনও কথা ছিল না। ঐ কথাটি ইংবেজি কথা। সে সমযে প্রচলিত শব্দ ছিল বিচাব-সংপ্রেষণ। তাব অর্থ—এক জাযগায বসে নিজেব বিচাব হাজাব ক্রোশ দূবে প্রেবণ কবা। যথা—এক যোগী ছিলেন। তাঁব শিষ্য পাঁচ হাজাব মাইল দূবে ছিল। যোগী তাকে কিছু বলতে চেযেছিলেন, তাব সঙ্গে আলাপ কবতে চেযেছিলেন। এখন তিনি কি কবে বাক্যালাপ কবলেন? তখনকাব দিনে আধুনিক যন্ত্রপাতি ছিল না। কিন্তু তখন বিচাব-সংপ্রেষণেব সাধনা কবা হত। এই সাধনায সুদক্ষ ব্যক্তি ধ্যান মুদ্রায স্থিত হযে আপন বিচাবেব তবঙ্গ অভীষ্ট স্থানে সংপ্রেষিত কবতেন। বিচাবেব তবঙ্গ শক্তিশালী হযে যে সুদূব স্থানে সাধক তাঁব চেতনা পৌঁছতে চান সেখানে পৌঁছে যেত। সেখানে কোনও ব্যক্তিব মস্তিষ্ক চেতনা-প্রাপকেব কাজ কবত। সেই ব্যক্তি সেই বিচাব তবঙ্গকে ধাবণ কবত আব তাব মাধ্যমে জানতে পাবত

কে কি কথা বলছে। আবার যদি তার উত্তর দেওয়ার প্রয়োজন হতো তবে সে নিজে ধ্যানস্থ হয়ে যেত এবং ধ্যানযোগে বিচারতরঙ্গ গুরু বা ইষ্ট ব্যক্তিকে পৌঁছে দিত। এই ভাবে বিচার জানানো হতো। এই ছিল বাক্যালাপ করার পদ্ধতি। এই ছিল বিচার সংপ্রেষণের মাধ্যম, আর তার জন্যই মানসিক ক্ষমতার বিকাশের প্রয়োজন হতো। সাধকরা মানসিক ক্ষমতা বাড়ানোর চেষ্টা করতেন।

আমরা অতিরিক্ত কথা বলার অভ্যাস করে ফেলে মানসিক ক্ষমতাকে ক্ষীণ করে ফেলি, হারিয়ে ফেলি। আজকাল মানসিক ক্ষমতা বিকশিত করার কোনও চেষ্টা নেই। তারও দুটি কারণ আছে। এক কারণ, আমরা বলাকেই প্রাথমিক অধিকার বা প্রাধান্য দিয়েছি। পত্র দ্বারাও আমরা কিছু কিছু বলার কাজ করে থাকি। আজকাল নানা রকম যন্ত্রপাতি বা কর্মসাধনোপায় উদ্ভাবিত হয়েছে, তার ফলে মানসিক ক্ষমতার কোনও প্রয়োজন অনুভূত হয় না। যখন আমাদের মানসিক ক্ষমতার ওপরে বিশ্বাস নষ্ট হয়ে যায় তখন আমরা ভাষা-প্রয়োগের প্রয়োজন অনুভব করি। যদি আমরা কথা না বলে আমাদের মানসিক ক্ষমতা বিকশিত করি তবে এ রকম হওয়া সম্ভব যে, না বলা কথা আমরা বুঝতে পারব। 'গুরোস্তু মৌনং ব্যাখ্যানং শিষ্যাস্তু ছিন্নসংশয়াঃ।' যে গুরুর আত্মশক্তি প্রবল তিনি মৌন ভাবে সমাসীন থাকেন। নানা প্রকার সন্দেহ নিয়ে শিষ্যরা আসে। গুরুর পাশে বসে, গুরুর সান্নিধ্য প্রাপ্ত হয়। তার সমস্ত সংশয়ের নিরসন হয়ে যায়, তাদের সমাধান হয়ে যায়। তারা আপনা-আপনি তাদের প্রশ্নগুলির উত্তর পেয়ে যায়। কারণ কি? তখন মনের ভাষা চলতে থাকে। মন নিজের কাজ করে, সন্দেহ মিটে যায়। কাজ সমাপ্ত হয়ে যায়। দিগম্বরগণ বলেন, তীর্থঙ্কর কথা বলেন না, শ্বেতাম্বরগণ বলেন যে তীর্থঙ্কর কথা বলেন। আমি শাস্ত্রীয় আলোচনার মধ্যে যাব না। দিগম্বরগণ বলেন—তীর্থঙ্কর কথা বলেন না। কেবল ধ্বনি নির্গত হয়। আমার এ কথা বৈজ্ঞানিক মনে হয়। এ কথা বিশেষ বিজ্ঞানসম্মত।

তাঁরা কথা বলেন না, কিন্তু যা বলতে চান সে সব কিছু সবার কাছে পৌঁছে যায়। সেখানে কেবল ধ্বনি হয়, কিন্তু কোন ভাষার প্রয়োগ হয় না। কিন্তু যত লোক সেখানে উপস্থিত থাকে তারা ঐ ধ্বনি আপন আপন ভাষায় বুঝে নেয়। শ্বেতাম্বররা বলেন, তীর্থঙ্কর এক ভাষায় কথা বলেন। যে হিন্দি জানে সে হিন্দিতে সে কথা বোঝে, যে সংস্কৃত জানে সে সংস্কৃত ভাষায় বোঝে, যে প্রাকৃত ভাষা জানে সে প্রাকৃত ভাষায় বোঝে। যে হিন্দি জানে সে বোঝে তিনি হিন্দিতে কথা বলছেন, সংস্কৃতজ্ঞ মনে করেন তিনি সংস্কৃতে কথা বলছেন, আবার প্রাকৃতজ্ঞ মনে করেন, তিনি প্রাকৃত ভাষায় কথা বলছেন। মানুষ বোঝে তিনি মানুষের ভাষায় কথা বলছেন, পশুরা ভাবে তিনি পশুর ভাষায় কথা বলছেন। তাঁর ধ্বনি ও বাণী মানুষ বুঝতে পারে, পশুও বুঝতে পারে, আবার দেবতারাও বুঝতে পারেন। এ কেমন করে সম্ভব হয়? সেখানে কি কোন অনুবাদক বসে থাকে? না, কোনও অনুবাদক থাকে না। এটা স্বাভাবিক পরিণতি। একে এই ভাবে ব্যাখ্যা করা যায় যে, তা ধ্বনি মাত্র এবং ঐ ধ্বনির বিভিন্ন ভাষায় রূপান্তর হয়। আর শ্রোতারা তা নিজ নিজ ভাষায় গ্রহণ করে। বক্তার কথা বলার কোন প্রয়োজন হয় না। তিনি যা বলতে চান তা ঐ ধ্বনির মাধ্যমে বলেন। মনোবর্গনার পুদ্গল এত শক্তিশালী হয় যে তা বিভিন্ন ভাষায় রূপান্তরিত হয়ে নিজের কাজ করে।

ভাষা প্রয়োগ না করার আরও একটি মূল্যের কথা আমি বলব। তা হল আমাদের অনির্বচনীয়তার সিদ্ধান্ত। ভারতের প্রায় সমস্ত দর্শন শাস্ত্রেই এই কথাটি ব্যবহৃত হয়েছে। বেদান্তে বলা হয়েছে, ব্রহ্ম অনির্বচনীয়। ব্রহ্মকে ভাষায় প্রকাশ করা যায় না। তার কোনও ব্যাখ্যা করা সম্ভব নয়। বৌদ্ধ দর্শনে অনির্বচনীয়তার বহুল প্রয়োগ হয়েছে। বুদ্ধকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল—পরলোক কি? বুদ্ধ বলেছিলেন—অনির্বচনীয়, তাকে কথায় প্রকাশ করা যায় না। আত্মা কি? পুনর্জন্ম আছে, কি নেই? বুদ্ধ বলেছেন—অনির্বচনীয়, তাকে

ভাষায় বর্ণনা করা সম্ভব নয়। কথায় প্রকাশ করা যায় না। যতগুলি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন করা হয়েছিল সবার উত্তরেই তিনি বলেছিলেন, অনির্বচনীয়। তিনি বলেছিলেন ঐ সব বিষয়কে কথায় ব্যাখ্যা করা যায় না। মহাবীর বলেছেন—পূর্ণ সত্য অব্যক্ত, কথায় তাকে প্রকাশ করা সম্ভব নয়, কেননা বস্তু অনন্তধর্মা। বস্তুতে অনন্ত ধর্ম আছে। আমরা কি করে অনন্ত ধর্মের কথা বলতে সক্ষম হব? আমরা আপন ভাষায় এক ক্ষণে এক ধর্মের প্রতিপাদন করতে পারি। শেষ পর্যন্ত অনন্ত ধর্ম চাপা পড়ে। এই পরিস্থিতিতে আমরা অনন্ত ধর্ম কি করে প্রতিপাদন করতে সমর্থ হব? সেজন্য বলা হয়েছে, বস্তু অবক্তব্য অর্থাৎ ভাষার অতীত। সমস্ত বস্তুর স্বরূপ কথায় প্রকাশ করা যায় না। এক ধর্মের কথা বলা সম্ভব। অনন্ত ধর্ম অনির্বচনীয়। অনন্ত সত্য অবক্তব্য। অখণ্ড সত্য অবক্তব্য। সম্পূর্ণ সত্য অবক্তব্য। এ বেশ ভাল হয়েছে। আমরা ভ্রান্তিতে বা অসত্যেও আবদ্ধ হই না। অনন্তধর্মা বস্তুকে যাঁরা জেনেছেন তাঁরাও তাকে ভাষায় প্রকাশ করতে পারেন না। আর যখন তাঁরা ভাষা প্রয়োগ করেন তখন এক ভ্রান্তি উৎপন্ন হয়। কেবলজ্ঞানীই বল, সর্বজ্ঞই বল, পরমাত্মাই বল, যা কিছু বল, তাঁরা পূর্ণকে জানেন, কিন্তু তাঁরা যা কিছু বলেন তা অপূর্ণ হয়ে যায়। তাঁরা অপূর্ণ কথা বলবেন। আমরা আবার সে কথা আরও খণ্ড খণ্ড করে বলব। তাকে আমরা খণ্ড খণ্ড করে বিতরণ করব। আমরা একটি কথা গ্রহণ করব, আর আগ্রহ শুরু হয়ে যাবে। তার ফল এই দাঁড়াবে: আমরা যা জেনেছি তাকে আমরা সত্য বলব, আর তোমরা যা বলবে তাকে অসত্য বলব। এই ভাবে সত্য এবং অসত্যের ঝটাপটি শুরু হয়ে যায়। বিবাদ আরম্ভ হয়। তর্কাতর্কি শুরু হয়। এই পরস্পরের মত খণ্ডন এবং পরস্পর দূষণে কোনও কিছু বস্তু থাকে না। বিবাদেরও কোনও তাৎপর্য থাকে না। যে যা বলে সে শুধু আংশিক তত্ত্ব। আমরা অংশকে পূর্ণ বলে মেনে নিই। আর এই অংশকে সত্য বলে মেনে নেওয়া থেকে বিবাদ শুরু হয়ে যায়। বাক্‌যুদ্ধ শুরু হয়ে যায়। সিদ্ধান্তের লড়াই শুরু হয়ে

যায়। লড়াইয়ের একমাত্র কারণ অপূর্ণকে ভাষায় প্রকাশ করা উচিত নয়, কিন্তু আমরা তাই করে থাকি। যদি লোকে মৌন থাকে, শব্দও থেমে যায়, জ্ঞানীও মৌন থাকেন, এবং বলেন, আমি পূর্ণকে জেনেছি, কিন্তু তাকে ভাষায় প্রকাশ করতে পারি না, তাহলে লড়াই থেমে যায়। কিন্তু ঐসব জ্ঞানী লোক অনুকম্পাবশত অল্প কিছু বলেন। সম্পূর্ণ বলা তাঁদের সম্ভব হয় না। তাঁরা অল্প যা কিছু বলেন তার জন্য লড়াই আরম্ভ হয়ে যায়। তাঁরা যদি পুরো বলতেন তবে লড়াই হতো না।

পাঁচটি শিশু আছে, পাঁচটি লাড্ডু আছে। সবাইকে একটি একটি করে লাড্ডু দেওয়া হল। সবাই সমান ভাগ পেল। কোনও লড়াই হবে না। পাঁচটি শিশু আছে, আর একটি লাড্ডু আছে। আপনি লাড্ডুটি টুকরো টুকরো করে সবাইকে এক একটি টুকরো দিলেন। লড়াই শুরু হয়ে যাবে। শিশুরা বলতে আরম্ভ করবে—ওকে বেশি দিয়েছেন, আমাকে কম দিয়েছেন। ওকে অনেক দিয়েছেন, আমি অতটা পাই নি। যেখানে ভাগ অনেক, আর বিভাজ্য বস্তু কম, সেখানে বিবাদ হয়, লড়াই হয়।

সেই রকম আমাদের আগ্রহ অনন্তকে জানার, সম্পূর্ণ সত্যকে জানার, অখণ্ড সত্যকে জানার। তা আমরা পুরোপুরি পাই না। আমরা জানতে পারি ছোট একটি অংশ, অনন্তের এক খণ্ড। আমরা ঐ খণ্ডকে আয়ত্ত করে, তাকে পেয়ে, অখণ্ডের জন্য লড়াই করতে শুরু করি। ঐ লড়াই কখনও শেষ হয় না। লোকে যদি কথা না বলে তবে ভাল হয়। অন্তত তারা যদি সত্য সম্বন্ধে কোনও কথা না বলে, কেবল ব্যবহারের সম্পূর্তির জন্য কথা বলে, তবে লড়াই হতে পারে না। সত্যের সম্বন্ধে কিছু না বলাই অসত্য থেকে রক্ষা পাবার সবচেয়ে ভাল উপায়। কিন্তু এ রকম হতে পারে না। জ্ঞানী ব্যক্তিরা অনুকম্পা করেন, দয়া করেন যাতে অজ্ঞ লোক সম্পূর্ণ জ্ঞান লাভ করতে না পারলেও অন্তত অল্প কিছু জানুক। এই অনুকম্পা ভাব হয়ে পড়ে, কারণ সেটাই বিবাদের পথ খুলে দেয়। আজকাল পরিস্থিতি এ রকম

দাঁড়িয়েছে যে লোকে সত্যকে জানুক বা না জানুক, তারা সত্যের জন্য বিবাদ করতে প্রস্তুত হয়।

কথা না বলার একটি মহৎ উপকারিতা—সত্যকে সুরক্ষিত করা। কথা না বললে সত্য সম্পূর্ণভাবে সুরক্ষিত হয়। অবক্তব্য, অনির্বচনীয় অব্যাকৃত—এই কথাগুলি সত্যকে সুরক্ষিত করে। এক জন বলে, 'অস্তি' অর্থাৎ আছে। আর একজন বলে, 'নাস্তি' অর্থাৎ নেই। দুই কথারই দুটি দিক আছে। বিবাদের পরিস্থিতি এসে যায়। মহাবীর বলেছেন, 'যে অস্তি বলে সেও ঠিক বলে না, আর যে নাস্তি বলে সেও ঠিক বলে না।' দুজনের কথাই ঠিক হতে পারে যদি দুজনেই আপন আপন বক্তব্যের সঙ্গে অপেক্ষা যোগ করে দেয় আর বলে যে, এই দৃষ্টি-কোণ থেকে এটা হয় আর অন্য দৃষ্টিকোণ থেকে এটা হয় না। স্যাদস্তি, স্যান্নাস্তি। যখন স্যাদস্তি বললেও কাজ হয় না আবার স্যান্নাস্তি বললেও কাজ হয় না। তখন স্যাদ্ অবক্তব্য বলা হয়। আমরা যেন একথা মেনে চলি যে সত্যের সম্পূর্ণ সত্যের স্বরূপ কথায় প্রকাশ করা সম্ভব নয়। সত্যের প্রকৃতি এরকম, সত্যের স্বভাব এরকম, এ কথা বলা চলে না। আমরা যা করছি সেটি সত্যের অংশ মাত্র। এক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে বলা যায় যে, আমরা আমাদের দৃষ্ট অংশ মাত্র সত্য ভাষায় প্রকাশ করতে গিয়ে অখণ্ড সত্যের প্রতি কখনও কখনও অন্যায় করে বসি। এ কথা মানা প্রয়োজন, তুমি শুধু বলবে যে পূর্ণ সত্যকে ভাষায় প্রকাশ করা যায় না। তা বোবার কণ্ঠস্বরের মত গূঢ় অপ্রকাশ্য। তার স্বাদ অবর্ণনীয়।

আমি এই বুঝি যে ভাষা প্রয়োগ না করা, মৌন থাকা সত্যের সুরক্ষার সবচেয়ে সুদৃঢ় এবং প্রবল উপায়। আমি মৌনের মূল্যই কিছুটা বর্ণনা করলাম। আমরা যেন মৌনের মূল্য বুঝি, যেন শুধু ভাষা প্রয়োগের মূল্যই না বুঝি। না বলারও যে মহৎ মূল্য আছে সেটা অনুভব করি, এবং বলা ও না বলার মধ্যে একটা সামঞ্জস্য স্থাপন করি। ভাষাপ্রয়োগবহুল সমিতির মহত্ত্ব বোঝার সঙ্গে সঙ্গে

যেন বাক্‌গুপ্তির তাৎপর্যও অনুভব করি। এই দুটি দিক সমভাবে বুঝতে পারলে এই সাধনার মর্ম গ্রহণ করা সম্ভব হবে এবং নিজের আন্তরিক জ্ঞানকে প্রকটিত করা সম্ভব হবে।

৭

চিন্তাশূন্যতার মূল্য

জলাশযেব ধাবে গিযে কলসী ভবতি কবে জল নিযে আসে এমন বহু লোক পাওযা সম্ভব। নদী বা পুকুবেব পাডে গিযে তাবা যত খুশি জল নিযে আসে। কিন্তু নদীব গভীবে ডুব দিতে পাবে এমন লোক খুবই কম পাওযা যায। পুকুব বা সাগবেব গভীবতায ডুব দিতে পাবে এমন লোকেব সংখ্যা খুব কম। তীবে দাঁডিযে থাকাব লোকই মেলে অনেক বেশি।

চিন্তাব ঘডা হাতে এমন লোক বহু পাওযা যায। তাবা চেতনাব সামান্য পবিমাণ অংশ পেযেছে, এবং চিন্তা কবে, দেখে ও জেনে তা মনেব আধাবে সঞ্চয কবেছে। কিন্তু চেতনা-রূপ সমুদ্রে অবগাহনকাবী লোক মেলে খুবই কম। কাবও ডুব দেবাব সাহস হয না। তাদেব ভয হয পাছে তাবা তলিযে যায। ডুব দিতে বা তলদেশে নেমে যেতে তাদেব সাহসে কুলায না। কেউ সে সাহসই কবে না। যেখানে অনন্ত গভীবতা সেখানে যেতে তাবা ভয পায। আত্মাব অন্তহীন গভীবতায তথা অখণ্ড চেতনা-রূপ সাগবে ডুব দিতে সাহস কবে এমন লোক খুব কমই আছে। কিন্তু এ কথা নিছক সত্য যে তাতে ডুব না দিলে বাঞ্ছিত বস্তু পাওযা যায না। যে লোক সমুদ্রেব তীবে দাঁডিযে থাকে

সে পাড়ে বা আশপাশে যা পড়ে থাকে তাই পায়। নদী বা পুকুরের পাড়ে দাঁড়িয়ে থাকলে লোকে অল্পবিস্তর জল পেতে পারে। সাগরতীরে যে দাঁড়িয়ে থাকে সে হয়তো কিছু ঝিনুক পেতে পারে, কিন্তু তার গভীরতর কোনও অনুভূতি সম্ভবপর নয়। সমুদ্রের তলদেশে যে সব মণিমুক্তা পড়ে আছে ডুব না দিলে তা পাওয়া যায় না। যার ডুব দেবার সাহস আছে, গভীর তলদেশে যাবার ধৈর্য আছে সে সত্যিসত্যিই কিছু না কিছু পেয়েছে। আমরা চিন্তার অর্থ বুঝি, চিন্তার কি মূল্য তাও বুঝি, আর চিন্তার ঘড়া হাতে নিয়ে নিজের কাজে চালিয়ে যাই। আমরা এক সীমা বেঁধে নিয়েছি যে যা কিছু সেই কলসীতে ধরে তাই সব কিছু। তারপরেও যে কিছু থাকতে পারে সে কথা আমাদের কল্পনাতেই আসে না। প্রকৃতপক্ষে কল্পনা করা সম্ভবও নয়। যে মানুষ সীমার ভেতরে আবদ্ধ সে অসীমের নাগাল পায় না। সীমাই সীমা বেঁধে দেয় এবং অসীমের দিকে যেতে দেয় না। আমাদের বুদ্ধির এক সীমা আছে, তথা মনেরও এক সীমা আছে। কাজেই তারা আমাদের অসীমের দিকে নিয়ে যেতেপারে না। মনের দ্বারা যা জানা গিয়েছে, বুদ্ধির দ্বারা আমরা শুধু তাই জানতে পারি। যা ইন্দ্রিয় দিয়ে জানা গিয়েছে তাই মন দিয়ে জানতে পারি। যা স্থূল, ইন্দ্রিয় শুধু তাই জানতে পারে। শব্দ, রূপ রস, গন্ধ, স্পর্শ এই সব স্থূল বস্তুকে ইন্দ্রিয় জানতে পারে। এই সমস্ত বস্তুর আধারে, ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তুর আধারে মন কিছুটা এগিয়ে যায়। ঐ সমস্ত কাঁচা মাল বা র-মেটিরিয়াল নিয়ে ইন্দ্রিয় কিছু কিছু তৈরি করে, বুদ্ধি তাতে কিছুটা সংযোগ করে, আর বিবেকও কিছুটা করে এবং নির্ণয়ও করে। এইখানেই আমাদের সীমানা সমাপ্ত, আমাদের গ্রহণ করার সীমানা সমাপ্ত। এই সব জ্ঞান কোন মতেই কোরা জ্ঞান নয়। আমরা কখন 'কোরা' জ্ঞান লাভ করতে পারি? 'কোরা' জ্ঞান কি করে লাভ করতে হয় তা আমরা জানিই না, কেননা, ইন্দ্রিয়, মন আর বুদ্ধির সীমার মধ্যে বিশুদ্ধ বলে কোন বস্তুই নেই। সব কিছুই মিশাল, সব কিছুই ভেজাল। যখনই কোন কিছু তাদের আওতায়

আসে অমনি মিশ্রণ শুরু হয়ে যায়। রাগের জল এসে তাতে মেলে, দ্বেষের জল এসে তাতে মেলে, আরও নানা রকম ময়লা এসে তাতে মেশে। কোথায় প্রিয়তার প্রভাব এসে সংযুক্ত হয়, কোথাও বা অপ্রিয়তার ভাব জড়িত হয়। কোথাও ইচ্ছা সংযুক্ত হয়, কোথাও বা ঘৃণা এসে মেশে। এই চিন্তার সীমার মধ্যে আমরা চিন্তাকে খুবই মূল্য দিয়ে থাকি। কিন্তু তাকে আমরা যতটা মূল্যবান মনে করি আসলে তা ততটা মূল্যবান নয়। অচিন্তনের মূল্য বুঝতে পারি না বলে আমরা চিন্তাকে এত মূল্য দিয়ে থাকি। চিন্তা না করা এবং বিচার না করার মূল্য আমরা জানি না বলেই আমরা চিন্তা ও বিচারের অধিক মূল্য দিই, তাতে অধিক মহত্ত্ব আরোপ করি। যেদিন আমরা অতল গভীরতার মধ্যে ডুব দিতে পারব সেদিন আমরা না চিন্তা করব, না বিচার করবার অর্থাৎ অচিন্তনের মূল্য বুঝতে পারব, মহত্ত্ব অনুভব করতে পারব, সেদিন আমাদের জীবনে বিরাট ঘটনা। ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধির সীমানা অতিক্রম করে, পৃথিবীর গুরুত্বাকর্ষণকে অতিক্রম করে যদি আমরা আকাশপথে এগিয়ে যাই তবে আমরা এক বিচিত্র ভারহীনতার অনুভূতি পাই। সেখানে ভার নেই, উদ্বেগ নেই, সময়ের বন্ধনও নেই। সময়ের গতি সেখানে মন্থর হয়ে যায়। আমরা এই রকম অবস্থিতির মধ্যে চলে যাই। এই রকম অবস্থায় আমরা অনুভব করতে পারি পৃথিবীর গুরুত্বাকর্ষণে আবদ্ধ মানুষের চেয়ে ঐ আকর্ষণের বন্ধন থেকে মুক্ত মানুষের তফাৎ কত বেশি হতে পারে।

আমরা যদি জীবনে অচিন্তনের ক্ষণগুলি উপলব্ধি করতে পারি তবে বিচারের স্থিতি ও নির্বিচারের স্থিতির, তথা চিন্তনের ক্ষণ ও অচিন্তনের ক্ষণগুলির মধ্যে ব্যবধান কতটা তা বুঝতে পারব। চিন্তনের গুরুত্বাকর্ষণের সীমা অতিক্রম না করলে অচিন্তনের মহত্ত্ব বোঝা সম্ভবপর হয় না।

এই বন্ধন কিভাবে ছিন্ন করা যায়? এ এক মস্ত বড় প্রশ্ন। আমরা গুরুত্বাকর্ষণের পরিধি অতিক্রম করে কিভাবে যেতে পারি? কেননা আমরা শব্দ, রূপ ও শরীর দ্বারা পরিবেষ্টিত হয়ে আছি। আমাদের

চারদিকে যা কিছু আছে সব শব্দময়, রূপময় বা আকারময়। আমরা শব্দের দ্বারা এমনভাবে বেষ্টিত হয়ে আছি যে শব্দের কারাগারের প্রাচীর আমরা ভাঙ্গতে পারি না। আমরা রূপের দ্বারা এমনভাবে পরিবৃত যে তার পিঞ্জর থেকে আমরা কোন মতেই মুক্তি পেতে পারি না। বাঁধন এত কঠিনভাবে গেড়ে বসেছে যে বেরিয়ে আসার কোনও পথই খোলা নেই বা তার কোনও সুযোগও নেই। আমাদের চারপাশে শব্দ আর শব্দ, কোলাহল আর কোলাহল, আকারের জটিলতার পর জটিলতা, আকৃতির পর আকৃতি কেবল ঘুরে ঘিরে বেড়াচ্ছে। এই সব শব্দ, রূপ আর আকৃতি আমাদের এমন অতল গহ্বরে ডুবিয়ে দিয়েছে যে শরীর ছাড়া আর কোনও কিছু আমাদের চোখেই পড়ে না। শরীর স্বয়ং এক আকার। আমরা তার মধ্যে আবদ্ধ হয়ে আছি। আমরা শুধু শরীরই দেখতে পাই। তার বাইরে কোনও কিছুই আমরা দেখতে পাই না। শরীরের সঙ্গে প্রাণ, প্রাণের সঙ্গে মন, আর মনের সঙ্গে বুদ্ধি সংযুক্ত হয়ে আছে। তার ফলে এমন এক বলয় বা বৃত্ত তৈরি হয়েছে যার বাইরে যাবার কোনও পথই আমাদের নেই। সুতরাং আমরা ঐ বলয়ের মধ্যেই ঘুরতে ফিরতে থাকি। কখনও বুদ্ধি থেকে মনে চলে আসি, কখনও বা মন থেকে ইন্দ্রিয়ে চলে আসি, কখনও ইন্দ্রিয় থেকে প্রাণে, প্রাণ থেকে শরীরে যাই। আবার উল্টো পথে আমাদের যাত্রা শুরু হয়। শরীর থেকে প্রাণে পৌঁছই, প্রাণ থেকে ইন্দ্রিয়ে, ইন্দ্রিয় থেকে মনে, মন থেকে বুদ্ধিতে ফিরে আসি। এই ভাবে বলয়ের সঙ্গে সঙ্গে আমরা ঘুরতে ফিরতে থাকি, আর এই বলয়ের কোন আদিও নেই, অন্তও নেই। তার কোনও বেরোনর পথ নেই, কোথাও ফাঁক নেই। কেবল চক্কর দিতে থাকে, বন বন করে পাক খেতে থাকে। কলুর বলদের মত ঘানির চার দিকে পাক খেতে থাকাই আমাদের কাজ হয়ে পড়ে। এই চক্র ভেদ না করা পর্যন্ত অচিন্তন সম্বন্ধে কোনও কথাই আমাদের বোধগম্য হতে পারে না। অচিন্তনের কথা বোধগম্য না হলে শুদ্ধ চেতনার গূঢ় অর্থ বোধ হয় না, আত্মাকে জানা বা তার

পবিচয পাওযা সম্ভবপব হয় না। আত্মাকে ঘিবে হাজাব হাজাব তর্ক বচিত হযেছে। আস্তিকগণ তাব অস্তিত্ব সমর্থনে বহু যুক্তি উপস্থিত কবে, আবাব নাস্তিকবাও ঐ সব যুক্তিব খণ্ডনে বহু তর্কেব অবতাবণা কবে। মনে হয় উভয পক্ষই নিজ নিজ প্রচেষ্টায অসফল হযেছে। অস্তিকও তাব তর্ক দ্বাবা আত্মাব অস্তিত্ব প্রমাণ কবতে পাবে নি, আবাব নাস্তিকও তার তর্ক দ্বাবা আত্মাব অনস্তিত্ব প্রমাণ কবতে সক্ষম হয নি। ঐ বেচাবাবা চিন্তাব চক্রেব মধ্যেই পাক খাচ্ছে। তাবা সেই চিন্তাব বলয়েব মধ্যে ঘুবতে থাকে, যেখানে কখনও আত্মাব উপলব্ধি হয় না। যেখানে যা নেই সেখানে তা খোঁজা বৃথা। সেখানে তাকে সিদ্ধ বা অসিদ্ধ প্রমাণ কবাব প্রচেষ্টাও ব্যর্থ হয। সেখানে তাকে স্থাপিত কবাও সম্ভব নয, উত্থাপন কবাও সম্ভব নয। যদি কোনও ব্যক্তি ঐ চিন্তনেব উর্ধ্বে, ঐ শব্দজালেব, তর্কেব তথা চিন্তনেব উর্ধ্বে উঠে আত্মাকে সিদ্ধ কবাব প্রযত্ন কবতে চায তবে সে কখনও অসফল হয না। সত্যি সত্যিই আত্মাব স্থাপনা ও উত্থাপনা সেই সব ব্যক্তিবই ঘোষণা, যাঁবা শব্দ আব রূপ থেকে ওপবে উঠতে পেবেছেন, যাঁবা ঐ বলযকে বিদীর্ণ কবে বেবিযে আসতে পেবেছেন। যে লোক শব্দ আব রূপেব জালে আবদ্ধ থাকে সে লোক কখনও আত্মাকে জানতে পাবে না বা তাব পবিচয পায না। সে তাব স্থাপনাও কবতে পাবে না, উত্থাপনাও কবতে সক্ষম হয না।।

কথাটি খুব জটিলতাপূর্ণ। আমাদেব সামনে যা কিছু আছে সে সবই সাকাব। যাব আকাব নেই তাকে আমবা দেখতে পাই না। যা মূর্ত বা মূর্তিবিশিষ্ট তাই আমাদেব চোখেব সামনে আছে। যা অমূর্ত তা আমাদেব দেখাই দেয না। আমবা কি কবে জানব অমূর্ত কি, অনাকাব কি? সে কি অখণ্ড চেতনা? সে কি আত্মা? কেমন কবে তা জানব? তা জানাব কি উপায আমাব কাছে আছে? উপায আছে। এই দুনিযাতে কোন কিছুই নিরুপায নয। নিরুপায বলে কোনও কিছু হতেই পাবে না। দইযেব মধ্যে ঘি থাকে। মানুষ

উপায় বের করেছে। তাতে ঘোল আলাদা হয়ে যায়, আর মাখনও আলাদা হয়ে যায়। ফুলে সুগন্ধ আছে। মানুষ উপায় বের করেছে। তাতে সুগন্ধ আলাদা হয়ে যায়, ফুলও আলাদা থেকে যায়। আতর তৈরি হয়, সুগন্ধি পদার্থ তৈরি হয়। মানুষ আলাদা করতে, বিশ্লেষণ করতে জানে। মানুষ এও জানে যে আত্মাকে শরীর থেকে আলাদা করা যেতে পারে, শরীরকে চেতনা থেকে আলাদা করা যেতে পারে। এই নশ্বর থেকে অনশ্বর বা পরম তত্ত্বকে আলাদা করা যায়। তার উপায় আছে। উপায়ের কথা বলাও হয়েছে। নিজেকে দেখারও উপায় আছে। মানুষ নিজের মুখ দেখতে পায় না। তার উপায় বের হয়েছে। তার সামনে আয়না এসেছে। তাতে প্রতিবিম্ব দেখা যায়। আয়নাতে মানুষ নিজের মুখ দেখে না, শুধু তার প্রতিবিম্ব দেখে। মানুষ আয়নাও দেখে না, নিজের মুখও দেখে না। সে কেবল প্রতিবিম্ব দেখে। প্রতিবিম্ব তাকে বিশ্বাস করায় যে তার মুখ দেখতে ঐ রকম। প্রতিবিম্ব থেকে সে তার মুখের পরিচয় পায়। প্রতিবিম্ব দ্বারাই তার আত্মাকে জানা সম্ভব হতে পারে। আমরা আকাশ দেখতে পাই না, কারণ আকাশ অমূর্ত। কিন্তু তাকে দেখারও উপায় আছে। যে লোক ছায়া-পুরুষের সাধনা করে সে সূর্যের সামনে দাঁড়িয়ে নিজের ছায়াকে দেখে থাকে। নিজের ছায়া দেখতে দেখতে তার এমন অভ্যাস হয়ে যায় যে কিছুক্ষণ পরে যেমনই সে নিজের ছায়ার ওপরে ধ্যান কেন্দ্রিত করে এবং চোখ বন্ধ করে, আর তার পরে আকাশের দিকে তাকায় সে আকাশপটে হুবহু নিজের আকার দেখতে আরম্ভ করে। ছায়া-পুরুষ এমন এক দর্পণে পরিণত হয় যে আমরা ঐ প্রতিবিম্ব দ্বারা আকাশকেও দেখতে সক্ষম হই।

আত্মাকেও দেখা সম্ভব হতে পারে। তাকে দেখার উপায় হচ্ছে অচিন্তন, চিন্তা থেকে মুক্ত হওয়া, শব্দ থেকে মুক্ত হওয়া, রূপ থেকে মুক্ত হওয়া। তা কেমন করে সম্ভব হতে পারে? হ্যাঁ, তা সম্ভব। করার সাধনা প্রেক্ষা ধ্যানের দ্বারা করা যেতে পারে। নিজেকে

নির্দেশ বা উপদেশ দেওয়া যায়, 'দেখ আর জান'। সুষ্ঠুভাবে দেখ আর জান। তার সঙ্গে রাগ জুড়ে দিও না, দ্বেষ জুড়ে দিও না, প্রিয়-অপ্রিয় বোধও যোগ কোর না, যে জিনিস যেমন তাকে সেই রকম দেখবে। দেখার ক্রিয়া আর জানার ক্রিয়া—এগুলি আত্মার প্রতিবিম্ব। এ হল এক দর্পণ যাতে আত্মাকে দেখা যেতে পারে। এই প্রতিবিম্ব দ্বারা মানুষ আত্মার নাগাল পেতে পারে। জানা ও দেখাই হল আত্মার স্বরূপ। কেবল জানা আর দেখা। যে শুধু জানে আর দেখে, আর কিছুই করে না সেই আত্মার নাগাল পায়। আত্মাকে লাভ করার প্রকৃষ্ট মাধ্যম জ্ঞান ও দর্শন, অর্থাৎ জানা ও দেখা। শুধু জানা আর দেখা, তার সঙ্গে আর কিছু সংযুক্ত না করা। অন্য কিছুর সংযোগ করলেই মনের পরিধির ভিতরে ময়লা জমতে থাকে।

আপনি একটি ফুল দেখছেন, তার মিষ্টি সুগন্ধে আপনার মন লুব্ধ হয়েছে। আপনার মনে আকর্ষণ সৃষ্টি হয়েছে। আপনার জানা ও দেখা মনের সীমার অন্তর্গত হয়েছে। যে জিনিস যেমন শুধু তাই জানছেন না, তার প্রিয়তাকে জানছেন। আপনি তার আকর্ষণে আবদ্ধ হয়েছেন এবং আপনার জানা শেষ হয়ে গিয়েছে। আমরা সব সময় জানা ও দেখার সীমার মধ্যে থাকি না, আরও অন্য জিনিসের মধ্যে আবদ্ধ হয়ে পড়ি। যেখানেই বন্ধন তৈরি হয় সেখানেই আমরা আত্মা থেকে দূরে চলে যাই। যেখানে বিশুদ্ধ জানা ও দেখা ঘটে, সেখানেই তার সমাপ্তি ঘটে। যখন আমার শব্দের ওপরে উঠে যাই তখনই আমাদের আত্মার ঝলক বা জ্যোতির দর্শন ঘটে, আর ঐ ঝলক আমাদের নির্বিচারতার দিকে প্রেরণা দেয়। আত্মার ঝলক দর্শন না হলে নির্বিচারতার স্থিতি হতে পারে না। আত্মদর্শন ছাড়া তা হওয়া সম্ভব নয়।

পিণ্ডস্থ ধ্যানে শরীর ধ্যেয় হয়ে থাকে। পদস্থ ধ্যানে শব্দ ধ্যেয়, রূপস্থ ধ্যানে আকার ধ্যেয়। এই সব ধ্যানের ধ্যেয় আছে। চতুর্থ ধ্যান হল রূপাতীত ধ্যান। যেখানে রূপাতীত, ভাবাতীত স্থিতি লাভ ঘটে

সেখানে কোনও ধ্যেয় থাকে না। চিন্তনের ধ্যানই হচ্ছে ধ্যান, আর নির্বিচারতাই বাস্তবে সমাধি।

জৈন পরম্পরায় দুটি শব্দ প্রচলিত আছে—ধ্যান ও সামায়িক। সামায়িকও ধ্যান, কিন্তু তা এ ধ্যান থেকে অনেকটা ভিন্ন। কেননা, ধ্যানে দ্বিতীয় কারও সঙ্গে সম্বন্ধ স্থাপিত হয়ে থাকে। যখনই আমি বলি ধ্যান কর, তখনই প্রশ্ন হয়, কার ধ্যান করব? কিভাবে করব? কোথায় করব? কে করবে? ধ্যাতা আর ধ্যেয় আলাদা হয়ে যায়, ধ্যান পদ্ধতিও আলাদা হয়ে যায় এবং ধ্যানের সাধনাও ভিন্ন হয়ে যায়। ঐ সব কর্তা কর্ম আধার সবই ভিন্ন ভিন্ন হয়ে পড়ে। আপনি হয়তো জিজ্ঞাসা করবেন, কার ধ্যান করব? তখন বলতে হবে, এর ধ্যান করুন বা অমুক আকৃতির ধ্যান করুন, অথবা অমুক শব্দের ধ্যান করুন। ধ্যেয় বলে দিতে হয়। কোনও ধ্যেয়ের নির্দেশ না দেওয়া পর্যন্ত আপনি ধ্যান করতে পারবেন না। কিন্তু নির্বিচারতায় স্থিতি হলে এই সমস্ত প্রশ্নের সমাপ্তি ঘটে। দ্বিতীয়ের সমাপ্তি হয়ে যায়। দ্বিতীয় পক্ষ বলে আর কিছু থাকে না। তখন ধ্যাতা, ধ্যান এবং ধ্যেয় আর আলাদা থাকে না। যে ধ্যাতা, সেই ধ্যান, সেই ধ্যেয়, সেই ধ্যানের সাধনা, আবার সেই ধ্যানের আধার হয়ে থাকে। সব কারক এক হয়ে যায়। সব কারকের সমাপ্তি ঘটে। ভেদের অবসান হয়, অভেদ প্রাপ্তি হয়।

নির্বিচারতার স্থিতিতে কেবল সামায়িক হয়ে থাকে। সামায়িকের অর্থ, সময়ের মধ্যে হওয়া। সময়ের এক অর্থ আত্মা। আত্মাতে স্থিত হওয়াই সামায়িক। যে অবস্থা হলে এই স্থিতি হয় সে অবস্থা উপস্থিত হলে সব স্থিতির পরিসমাপ্তি ঘটে।

ভগবান মহাবীরকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল, 'ভন্তে, কে সামাই-এ? কে সামাইযস্স অটঠে?' [সামায়িক কি? সামায়িকের অর্থ কি?]

ভগবান বলেছিলেন—'আযা খলু সামাই-ত্র। আযা সামাইযস্স অটঠে।' ['গৌতম! আত্মাই সামায়িক। আত্মাই সামায়িকের অর্থ।']

সামায়িকের অর্থ আত্মায় স্থিত হওয়া। তথা নিজের মধ্যে স্থিত

হওয়া। যেখানে নিজের মধ্যে স্থিত হওয়ার কথা সেখানে ধ্যান করার কথা গৌণ হয়ে যায়। সামায়িকে আমরা কারও ধ্যান করি না, কেবল নিজের অস্তিত্বের মধ্যে নিমগ্ন থাকি। আর তাই হল নির্বিচারতার স্থিতি। যতক্ষণ আমরা নিজের মধ্যে না হই ততক্ষণ আমরা নির্বিচারতার কল্পনা করতে সমর্থ হই না, নির্বিচার হতে পারি না। প্রকারান্তরে বলতে হয়, কোনও না কোনও বিচার আমাদের ঘিরে থাকে, বিচারের দ্বন্দ্ব চলতে থাকে। যে আত্মায় স্থিতি থাকে সে শুধু জানা ও দেখার কাজ করে, আর কিছুই করে না। ঐ স্থিতিতে সামায়িক হয় আর নির্বিচারতা আসে। আমরা যদি নির্বিচার ধ্যানকে সামায়িক বলি তবে খুব ভাল হয়। শব্দের এই প্রয়োগ অতিশয়: সুষ্ঠু। ভগবানই এ শব্দের প্রয়োগ করে গিয়েছেন। তাই 'সামায়িক' কথাটির ব্যবহার ন্যায্য।

এক ব্যক্তি মুনির কাছে এসে বলল, 'সংসারে অনেক রকম দুঃখ আছে। সে সব দুঃখ থেকে কিভাবে মুক্তি পাওয়া যায়। আপনি তার উপায় বলে দিন।' সাধু বললেন, 'দেখ, এ প্রশ্ন বড় কঠিন। তুমি যখন জিজ্ঞাসা করেই ফেলেছ তখন উত্তর দিতেই হবে। তা না হলে উত্তর দিতাম না। এ প্রশ্ন খুবই জটিল। তোমাকে একটি উপায় বাতলে দিচ্ছি। যাও, এমন একজন লোকের অঙ্গরাখা নিয়ে এস যাকে জীবনে কখনও দুঃখ স্পর্শ করে নি। তার সেই অঙ্গরাখা গায়ে দাও, তোমার সব দুঃখ দূর হবে।'

সেই লোকটি বলল, 'আপনি খুব সোজা উপায় বলে দিলেন। আমি ঘুরে ঘুরে অঙ্গরাখা যোগাড় করব। কোনও দিন দুঃখ অনুভব করে নি এমন লোক মিলবেই।'

সে নিজের বাড়ি থেকে বের হল। সবার আগে সে পাশের বাড়িতে গেল। গৃহস্বামীকে বলল, 'আমি তোমার জামা নিতে এসেছি। কিন্তু জামা দেওয়ার আগে তুমি আমাকে বল, তোমার জীবনে কখনও দুঃখ এসেছে কিনা।' গৃহস্বামী বলল—'এই দুনিয়ায় বেঁচে থাকব অথচ

দুঃখ হবে না—এ কি রকম কথা বলছ? এই দুনিয়াতে এমন কোন লোক বেঁচে আছে যে জীবনে কোন দুঃখ অনুভব করে নি? আমি তো খুব দুঃখী। আমার অনেক টাকা আছে কিন্তু ছেলে নেই। এ কি দুঃখ নয়? এ তো খুবই বড় দুঃখ।'

সেই লোকটি বলল, 'তোমার জামা আমি চাই না।' সে আর একটি বাড়িতে গেল। জিজ্ঞাসা করল, 'তোমার তো কোনও দুঃখ নেই।' গৃহস্বামী বলল, 'তুমি দুঃখের কথা জিজ্ঞাসা করছ? এই ভাঙ্গা চোরা বাড়ি, ফুটো বাসনপত্র। এই ফাটাছেঁড়া কাপড়চোপড়। এর পরেও জিজ্ঞাসা করছ আমার দুঃখ আছে কিনা? আমি অত্যন্ত দুঃখী।'

সেই লোকটি বলল, 'বড় বাড়ি দেখে গেলাম সেখানেও দুঃখ, আবার ছোট বাড়ি দেখে গেলাম সেখানেও দুঃখ।'

সে আর এক বাড়িতে গেল। জিজ্ঞাসা করল, 'তোমার কোন দুঃখ নেই তো?' সে বলল, 'সংসারে থাকব আর দুঃখ থাকবে, না তাও কি সম্ভব? রোজ রোজ আমার স্ত্রীর সঙ্গে ঝগড়া, কলহ হয়। আমি দুঃখী।'

সে সেখান থেকেও ফিরে আসে। সে ঘুরতেই থাকে। অনেক দিন, অনেক মাস সে ঘুরে বেড়ায়। গাঁয়ে গাঁয়ে ঘুরে বেড়ায়। তার সঙ্কল্প ছিল যে সেই অঙ্গরাখা পেতেই হবে এবং দুঃখ থেকে মুক্তি পেতেই হবে। ঘুরতে ঘুরতে সে ক্লান্ত হয়ে পড়ল। তার মন নিরাশায় ভরে গেল। 'আমি দুঃখী নই' এ কথা বলতে পারে এমন লোক সে একটিও খুঁজে পেল না। ধনবান লোকও দুঃখী, গরীব লোকও দুঃখী। যার সন্তান আছে সেও দুঃখী, যার সন্তান নেই সেও দুঃখী। সে ক্লান্ত হল, হয়রাণ হল। অসফল হয়ে সে গুরুর কাছে গেল এবং বলল, 'মহারাজ, ঐ অঙ্গরাখা তো পাওয়া গেল না। আমি তো মনে করেছিলাম একদিন না একদিন আমি সফলকাম হবই। কিন্তু আমি মাসের পর মাস বৃথাই চেষ্টা করলাম। শেষ পর্যন্ত অসফল হয়ে আপনার কাছে ফিরে এলাম। এমন লোক পেলাম না যে বলতে পারে সে সুখী আর

যাব জামা পবে আমি দুঃখ থেকে মুক্তি পাব।'

গুরু বললেন, 'কত বড মুর্খ তুমি। তুমি এই সত্য জান না যে এই দুনিযায় যে জন্মেছে সে দুঃখ থেকে মুক্ত হতে পাবে না।'

সে তখন বলল, 'গুরুদেব। আপনি যখন এ সত্য জানতেন তখন কেন শুধু শুধু ঘুবিযে হযবাণ কবলেন? প্রথম দিনই তো এ কথা বলতে পাবতেন। আপনিই তো আমাকে মাসেব পব মাস ঘুবিযে মাবলেন। কেন এ বকম কবলেন?'

গুরু বললেন, 'সত্য দুষ্পাচ্য। কঠিন পবিশ্রম ছাডা সত্য পবিপাক হয না। আমি যদি প্রথমেই বলতাম যে এই দুনিযায যে-ই জন্মেছে সে-ই দুঃখ থেকে বাঁচতে পাবে না, দুঃখ থেকে মুক্ত হতে পাবে না, তাহলে সেই সত্য তোমাব বোধগম্য হতো না। এখন তুমি অনেক জাযগায ঘুবে এসেছ, অনেক কষ্ট কবেই ঘুবেছ। এবা। তুমি এই সত্য সহজেই বুঝতে পাববে যে এই দুনিযাতে কোনও লোকই দুঃখেব স্পর্শ থেকে বাঁচতে পাবে না। ঐ সত্য এতই অপাচ্য, এতই দুষ্পাচ্য যে প্রথম ক্ষণেই তা পবিপাক কবা সম্ভব হতো না।'

অনেক লোক জিজ্ঞাসা কবে—'নির্বিচাব কিভাবে হবে?' আমি যদি প্রথম দিনেই বলে দিতাম যে এইভাবে নির্বিচাব হতে পাবে তবে ঐ সত্য তোমাব পবিপাক হতো না। তোমাব বোধগম্য হতো না। প্রথমে তো তোমাকে জামাব খোঁজ কবতে হতো। ঘুবে ঘুবে বেডাতে হতো, বাডিতে বাডিতে গ্রামে গ্রামে যেতে হতো। সব কিছু দেখতে হতো। সব কিছু দেখে, চিন্তনেব সম্পূর্ণ প্রক্রিযাব পবে, বিচাবেব পথ সম্পূর্ণ অতিক্রম কবে, বিচাবেব ক্রিযা সম্পূর্ণ হলে এ কথা বুঝতে পাববে যে নির্বিচাবতাবও মূল্য আছে, আব এই ভাবেই নির্বিচাব হওযা যায। যত দিন পর্যন্ত এই বকম না হবে, যত দিন পর্যন্ত চিন্তনেব পবিক্রমা সম্পূর্ণ না হবে, যত দিন বিচাবেব পথে যাত্রা সম্পূর্ণ না হবে, ততদিন অচিন্তনেব কথা, চিন্তা না কবাব কথা তোমাব বোধগম্য হবে না, আব তাব মূল্যও তুমি বুঝতে পাববে না।

এই দুনিযায যাবা বাস কবে, যাবা শবীব, প্রাণ, মন আব বুদ্ধিব সীমাব মধ্যে বাস কবে তাবা কেউ নির্বিচাব হতে পাবে না। কাবণ মোহ, মাযা ও মমতাব সীমাব মধ্যে যাবা জীবন ধাবণ কবে তাবা দুঃখ থেকে মুক্ত হতে সক্ষম হয় না। সেই রকম বুদ্ধিব ও শবীবেব গণ্ডিব মধ্যে যাবা বাস কবে তাবা কেউ বিচাব থেকে মুক্ত হতে পাবে না। এই হল পবম সত্য। এই সত্য তখনই আমবা উপলব্ধি কবতে পাবব যখন আমবা অঙ্গবাখাব সন্ধানে গ্রাম থেকে গ্রামে ঘুবে বেডাব, বিচাবেব যাত্রা সম্পূর্ণ কবব, আব চিন্তনেব সম্পূর্ণ সম্পর্ক বুঝতে পাবব। তখনই এই কথা আমাদেব বোধগম্য হবে, তখনই আমবা এই সত্য জানতে পাবব, পবিচয কবতে পাবব, পবিপাক কবতে পাবব।

অচিন্তন ও নির্বিচাবতাব কথা বডই চিত্তাকর্ষক বলে মনে হয, কেন না আমবা সর্বদাই চিন্তনেব মধ্যে বেঁচে থাকি, আব তাব মধ্যেই জীবনকে অনুভব কবি। কিন্তু যখন আমাদেব সামনে অচিন্তনেব কথা, চিন্তা না কবাব কথা, বিচাবশূন্যতাব কথা হতে থাকে তখন সহজেই একটি আকর্ষণ সৃষ্ট হয এবং আমাদেব মনে হয ঐ ভাবে জীবন যাপনই শ্রেয। এ এক অভিনব ব্যাপাব। এও কি সম্ভব? লোকে চিন্তা আব বিচাব বাদ দিযে জীবন যাপন কবতে পাবে, এ আবাব কি বকম কথা? বিচাবেব প্রবাহ এত প্রবল আব তাব শৃঙ্খল এত দীর্ঘ যে কেউ তা ভাঙ্গতে বা ছিঁডতে পাবে না। একেব পর এক বিচাব আসে যায। কখনও তাব প্রবাহ রুদ্ধ হয না। সে সদা সর্বদা গতিশীল। তাব কোনও শেষ নেই। এই বকম পবিস্থিতিতে এটা কি সম্ভব, এই নির্বিচাবতাব কথা লোকে চিন্তা কবতে পাবে এবং সেই অনুসাবে জীবন যাপন কবতে পাবে? এ প্রশ্ন অত্যন্ত সহজ। এ বকম প্রশ্নও হয এবং আকর্ষণও সৃষ্ট হয। এই আকর্ষণেব আধাবে এ দিকে যত্নবান হই।

চিন্তনেব চেযে অচিন্তনেব মূল্য অনেক বেশি। এ কথাটি খুবই অর্থপূর্ণ। আমবা এ কথা জানি যে বেশি ভাবা বা চিন্তা কবা শুধু শক্তি ক্ষয কবা। প্রত্যেক কর্ম ও প্রবৃত্তি শক্তিকে ক্ষীণ কবে।

শরীরের কর্ম, বাণীর কর্ম, মনের কর্ম, চিন্তনের কর্ম ইত্যাদি প্রত্যেকে কর্মশক্তি হ্রাস করে। শরীরশাস্ত্রী বলেন যে, প্রত্যেক প্রবৃত্তির সঙ্গে সঙ্গে আমাদের দেহে বিষ উৎপাদিত হয়, শক্তি ক্ষীণ হয়। যে লোক বেশি চিন্তা করে তার রোগ হয়, মানসিক বিকৃতি ঘটে। বুদ্ধিজীবীদের শরীর বেশি পরিমাণে খারাপ হয়। তারা পেটের রোগে আক্রান্ত হয়। তার কারণ তারা অধিক ভাবে, অধিক চিন্তা করে। চিন্তা শরীরের ধর্ম হতে পারে। কিন্তু শরীরের ধর্ম হলেও তার একটা সীমা আছে। সীমার অধিক চেষ্টাও হানিকারক হয়ে থাকে।

অচিন্তন শরীরের ধর্ম নয়। অচিন্তন শব্দ ও রূপের কার্যও নয়। তা আত্মার ধর্ম, তার স্বভাব। যা স্বভাব তার দ্বারা শক্তি ক্ষয় হয় না। অচিন্তন আমাদের স্বভাব। আমরা অচিন্তনের অবস্থায় যখনই উপনীত হই বা থাকি তাতে আমাদের শক্তি ক্ষয় হতে পারে না। তাতে শক্তি বৃদ্ধি পাবে। চিন্তাতে ওজঃশক্তি নিঃশেষিত হয়, কারণ চিন্তার জন্য ওজঃশক্তির প্রয়োজন, ইন্ধনের প্রয়োজন। যাতে ইন্ধনের প্রয়োজন হয় তাতে ইন্ধন নিঃশেষিত হয়। অচিন্তনের জন্য প্রাণীজ ওজঃশক্তির কোন প্রয়োজন নেই। তার কারণ তা আত্মার স্বভাব, অখণ্ড চেতনার সহজ ধর্ম। এই কারণে তাকে জানা ও দেখার মধ্যে স্থিতি আছে। তার জন্য কোনও শক্তির অপব্যয় হয় না। ঐ সময় আমরা আপন মূল স্বভাবে অবস্থান করি।

চিন্তনের কাজ হল শক্তি ব্যয় করা। অচিন্তনের অবস্থার স্থিতিতে আমাদের শক্তি বাড়ে, কমে না। অচিন্তনে শক্তির বিস্ফোরণ হয়। আমাদের জানার শক্তি এত বেড়ে যায় যে চিন্তনের দ্বারা অতটা জানার ক্ষমতাও হয় না, জানতেও পারি না। আমাদের ক্ষমতা বেড়ে যায়। চিন্তনের দ্বারা সেইটুকু জানতে পারি যা আমাদের জানার সীমার মধ্যে আবদ্ধ। সীমার মধ্যে জানা সম্ভব হয়। জানার সীমার মধ্যে অবস্থিত নয় এমন বস্তুও অচিন্তনের দ্বারা আমাদের কাছে দৃশ্যমান হয়। তার দ্বারা দূরবর্তী বা ব্যবস্থিত বস্তুকেও জানা সম্ভব হয়, আবার

সূক্ষ্ম বস্তুকেও জানা সম্ভব হয়। এ সবই অচিন্তনের দ্বারা সম্ভব হয়। বস্তুত অচিন্তন খুবই মূল্যবান। তার মহত্ত্ব বুঝতে পারি। আমরা তার মূল্য নিরূপণও করেছি। কিন্তু প্রশ্ন হল, আমরা কি করে অচিন্তনের স্থিতিতে পৌঁছতে পারি। এখনই আপনি তাড়াহুড়ো করবেন না। এখনই নির্বিচারের কথা ভাববেন না। প্রথমে অভ্যাস করতে আরম্ভ করুন। ধ্যেয় নির্বাচন করুন এবং ঐ ধ্যেয়ের সঙ্গে চলতে থাকুন। এই ভাবে আপনার মনকে এক অভ্যাস দিন। ঐ প্রক্রিয়া দ্বারা আপনি উত্তীর্ণ হতে পারবেন, চলতে পারবেন। চলতে চলতে এমন অবস্থা আসবে যখন আপনার একাগ্রতা সাধিত হবে। আপনার অভ্যাস পরিপক্কতা লাভ করবে, আর আপনি অপ্রিয়তা ও প্রিয়তার মঞ্জিল খানিকটা পার হয়ে যাবেন। আপনি কেবল জানা এবং দেখার ক্ষমতা আয়ত্ত করবেন। এই অবস্থায় নির্বিচারতার কথা সহজে বোধগম্য হবে।

আমি শুরুতেই বলেছিলাম, লোকে যা দেখে তা ভাবে না, যা ভাবে তা দেখে না। দেখা ও ভাবা—এ দুটি একই সঙ্গে চলতে পারে না। যে জানে সে বিচার করে না। আর যে বিচার করে সে জানে না। ভাবা, দেখা, বিচার করা—এ সবই যান্ত্রিক প্রক্রিয়া, মস্তিষ্কের ক্রিয়া। এ সবই মস্তিষ্কের মাধ্যমে ঘটে।

দেখা ও জানা—এ যান্ত্রিক ক্রিয়া নয়। এ অখণ্ড চেতনার ক্রিয়া এবং স্বভাবত স্ফূর্ত হয়। এর উৎস বা উদ্গমস্থল অখণ্ড চেতনা, আত্মা। এ যান্ত্রিক ক্রিয়া নয়, মস্তিষ্কের ক্রিয়া নয়, এমন কি মনোদৈহিক ক্রিয়াও নয়। এর ফলে আমরা অখণ্ড চেতনার সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করি, তাতে ডুব দিই। এতে বিপদ হতে পারে। যার বিপদের ঝুঁকি নেওয়ার ক্ষমতা এসে যায় এবং যে মরতে সাহস সংগ্রহ করতে পারে সে-ই এ পথে অগ্রসর হতে পারে। যে মানুষ নিজের লক্ষ্যের দিকে অগ্রসর হতে চায় তাকে সবার আগে নিজেকে মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত করতে হবে। মরণের জন্য তৈরি না হওয়া পর্যন্ত অচিন্তনের কথা উঠতেই পারে না।

কোন কোন লোক ভয় পেয়ে যায়। ধ্যানের গভীরতায় যায়, তখন এক প্রকার বিচিত্র অনুভূতি হতে থাকে। তারা ভয় পেয়ে ধ্যান ছেড়ে দেয়। জিজ্ঞাসা করলে বলে, 'ধ্যানের গভীরতার মধ্যে গিয়েছিলাম। মনে হল যেন হৃদপিণ্ডের স্পন্দন বন্ধ হয়ে গিয়েছে।' এমন লোক অচিন্তনের মধ্যে ডুব দিতে পারে না।

আচার্য ভিক্ষু মহান সাধক ছিলেন। তাঁর সামনে এক লক্ষ্য ছিল। তিনি সর্বপ্রথম মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হলেন। শ্রীমজ্জয়াচার্য লিখেছেন, 'মরণের ধার শোধ চেয়ে নাও।' আচার্য ভিক্ষু মৃত্যুর জন্য' প্রস্তুত হয়ে শুদ্ধ মার্গ প্রাপ্ত হলেন। মরণের কথা না ভাবলে কোন লোক শুদ্ধ মার্গ প্রাপ্ত হতে পারেন না। শুদ্ধ মার্গ থেকে ভ্রষ্ট হওয়ার মার্গ অনেক পাওয়া যায়। যে ব্যক্তি মৃত্যুর জন্য সম্পূর্ণ প্রস্তুত হয়েছে সে-ই শুধু শুদ্ধ মার্গে পৌঁছনোর পথ খুঁজে পায়। সে এত সাহস সঞ্চয় করেছে যে তার বেঁচে থাকার আকাঙ্ক্ষাও নেই, মরণের ভয়ও নেই। ঐ লোক নির্বিচারতার স্থিতিতে পৌঁছতে আর চেতনার অতল গভীরতায় ডুব দিতে সক্ষম। ঐ ব্যক্তির অখণ্ড চেতনার রূপসাগরে ডুব দেওয়ার অধিকার আছে, তার জন্য আমরা সম্পূর্ণভাবে প্রস্তুত হয়ে না যেন ভাবার ভূমিকায় যাই, অচিন্তনের ভূমিকায় যাই। রূপ এবং আকৃতির সীমা অতিক্রম করে সেই স্থিতিতে চলে যাই যেখানে কোন শব্দ আমাদের প্রভাবিত করে না।

ধ্যান শব্দকে প্রভাবিত করে। রাজর্ষি প্রসন্নচন্দ্র ধ্যানস্থ অবস্থায় দণ্ডায়মান ছিলেন। একটি লোক এল। তাকে একটি কথা বলে রাজর্ষি রাজ্য ছেড়ে বনে গেলেন। রাজ্যের ভার ছেলেকে দিলেন। ছেলে খুবই ছোট ছিল। এই ছোট ছেলের কাঁধে রাজ্যের বিরাট ভার পড়ল। শত্রুরা রাজ্য আক্রমণ করল। তারা রাজ্য ধ্বংস করতে শুরু করল। তাতে অনেক শব্দ হল। কোনও ঘটনাই ঘটে নি। রাজর্ষি শুনলেন। শব্দ তাঁকে এতই প্রভাবিত করল যে ধ্যানে দণ্ডায়মান হয়েই তিনি যুদ্ধে লিপ্ত হলেন। যুদ্ধ আরম্ভ হয়ে গেল, তিনি

শত্রুকে পরাস্ত করতে লাগলেন। এই সময়ে এক লোক এল এবং ধ্যানস্থ রাজর্ষিকে দেখে বলল, 'কত বড় ধ্যানী। কত বড় ধ্যানী! কত বড় সাধক! অচল ধ্যানমুদ্রায় দাঁড়িয়ে আছেন।' রাজর্ষি এ কথা শুনলেন, তাঁর চেতনা মোড় নিল। যুদ্ধভূমি থেকে ধ্যানভূমিতে ফিরে এলেন। আবার ধ্যানের ধারা অখণ্ড প্রবাহে বইতে লাগল।

শব্দের পরিধির মধ্যে গতিশীল ধ্যান শব্দের দ্বারা প্রভাবিত হয়। ধ্যাতা কখনও লড়াই করতে লেগে যায়, কখনও বা আত্মসাধনার কথা ভাবতে লেগে যায়। সে রূপের দ্বারাও প্রভাবিত হয়।

অচিন্তনের স্থিতিতে যে প্রতিষ্ঠিত, সামায়িকে যে অবস্থান করে, যে আপন আত্মায় স্থিত, সে কখনও শব্দ দ্বারা প্রভাবিত হয় না। কখনও রূপের প্রভাবাধীন হয় না। তার শরীরের অভ্যাস হয় না, জীবনের আকাঙ্ক্ষা থাকে না, মৃত্যুর ভয় থাকে না। সে সব কিছুর অতীত হয়। পৃথিবীর গুরুত্বাকর্ষণ অতিক্রম করে তার আত্মা অন্তরীক্ষে চলে যায়। সেখানে তার ভাবের কোনও অনুভূতি হয় না।

লাড়নু শিবির

(২ মার্চ, ১৯৭৬ থেকে ১১ মার্চ, ১৯৭৬)

রাজলদেসর শিবির

(১ জানুয়ারি, ১৯৭৭ থেকে ৪ জানুয়ারি, ১৯৭৭)

৮

শরীর পরিচয়

সাধনার দৃষ্টিকোণ থেকে মস্তিষ্কের জ্ঞান আবশ্যক। মস্তিষ্কের জ্ঞান না থাকলে অনেক সাধনা সত্ত্বেও সাধক যথেষ্ট সফলতা লাভ করতে পারেন না।

মস্তিষ্ক তিন ভাগে বিভক্ত—বৃহৎ মস্তিষ্ক, মধ্য মস্তিষ্ক ও লঘু মস্তিষ্ক। মস্তিষ্কের গঠন অত্যন্ত জটিল। তা অসংখ্য প্রকোষ্ঠ দ্বারা রচিত এবং তার যন্ত্রপ্রণালী এত জটিল ও দুরূহ যে আজ পর্যন্ত তার সম্বন্ধে সম্পূর্ণ জ্ঞান লাভ করা সম্ভব হয় নি। বহুদিন ধরে এ বিষয়ে গবেষণা চলছে। হাজার হাজার বৈজ্ঞানিক এই অনুসন্ধানে নিযুক্ত আছেন। কিন্তু আজও এর কার্যপ্রণালী রহস্যাবৃত হয়ে রয়েছে। মস্তিষ্ক মানুষের সকল মনোবৃত্তি ও সংস্কারের মূল কেন্দ্র। শরীরশাস্ত্রীগণ অনেক কেন্দ্রের সন্ধান পেয়েছেন। সংবেদন, জ্ঞান, বাসনা প্রভৃতি মানসিক ক্রিয়ার কেন্দ্রের সন্ধান পাওয়া গিয়েছে। এই সমস্ত কেন্দ্রের সূক্ষ্মতাও এখন আমাদের বিদিত। তাদের চিকিৎসা, এমন কি তাদের পরিবর্তনও করা হয়।

আমাদের মস্তিষ্কে দুই প্রকার পদার্থ ও বর্ণ পাওয়া যায়। এক রকম দ্রব্য ধূসর বা হালকা হলুদ বর্ণের। তা বুদ্ধির ধারক। যে লোকের

ধূসব বস্তু অধিক পবিমাণে থাকে তাব জ্ঞানবাহী তন্তু সবল হয এবং বুদ্ধি প্রখব বা সতেজ হয। মস্তিষ্কেব অপব পদার্থটি শ্বেত বর্ণ, তা কর্ম-প্রেবণাব সূচক। মস্তিষ্কেব শ্বেত অংশ দ্বাবা ক্রিযা এবং ধূসব অংশ দ্বাবা বুদ্ধি নিযন্ত্রিত হয।

আমাদেব বৃহৎ মস্তিষ্ক থেকে অসংখ্য তাব বা সুতোব মত বস্তু বেবিযেছে। সেগুলি জ্ঞানবাহী ও গতিবাহীও বটে। ঐ তন্তুগুলি বৃহৎ মস্তিষ্ক থেকে বেবিযে লঘু মস্তিষ্কেব ভেতব দিযে সুষুম্নাশীর্ষ পাব হযে পৃষ্ঠবজ্জু বা মেরুদণ্ডেব মধ্যে যে সুষুম্না আছে সেখানে গিযেছে এবং সেখান থেকে সমস্ত শবীবে ছডিযে পডেছে। এক দৃষ্টিতে বলা যায মস্তিষ্ক শবীবেব নিযামক বা নিযন্ত্রণকর্তা। বৃহৎ মস্তিষ্ক, লঘু মস্তিষ্ক ও সুষুম্নাশীর্ষ—এই তিনটিই শবীবেব নিযামকতত্ত্ব।

মস্তিষ্ক জ্ঞানকেন্দ্র। তা চৈতন্যেব সবচেযে বড কেন্দ্র। সূক্ষ্ম শবীবেব মুখ্য প্রকাশ মস্তিষ্কেব মাধ্যমেই আমাদেব স্থূল শবীবে নেমে আসে। মস্তিষ্ক এক প্রকাব মধ্য-সেতু। স্থূল শবীব ও সূক্ষ্ম শবীবেব মধ্যে তা সেতুব কাজ কবে। সূক্ষ্ম শবীব থেকে অববোহী শক্তি বা চৈতন্য মস্তিকেব মাধ্যমে স্থূল শবীব বা জাগ্রত মনে নেমে আসে। অবচেতন মন ও চেতন মনেব কাজও তাব মাধ্যমে হয। এই কাবণে সাধকেব পক্ষে মস্তিষ্কেব জ্ঞান অত্যন্ত আবশ্যক। যদি আমি মস্তিষ্কেব ক্রিয়া ঠিকমত বুঝতে পাবি তবে আমাব পক্ষে জ্ঞানকেন্দ্রকে বিকশিত কবা সম্ভবপব। এথ আধাবেই সাধকগণ সহস্রাবেব পবিকল্পনা কবেছেন। তাঁদেব কল্পনা অনুযাযী আমাদেব মস্তিষ্কে সহস্রাব নামে এক চক্র বা চৈতন্যকেন্দ্র আছে। আমবা আমাদেব খুশিমত তাকে চক্র, বুদ্ধি বা অন্য কোনও নাম দিতে পাবি। তা একটি অতি বৃহৎ জ্ঞানকেন্দ্র বটে। তাকে বিকশিত কবতে পাবলে অতিবিক্ত জ্ঞানপ্রাপ্তি সম্ভবপব হতে পাবে। এ সামান্য কথা, তেমন বড ব্যাপাব কিছু নয। প্রত্যেক লোকই তা পবীক্ষা কবে দেখতে পাবে। যদি কোন লোকেব মনে হয তাব বুদ্ধি সঙ্কুচিত হযে যাচ্ছে, জ্ঞান মন্দীভূত হচ্ছে তবে সে দশ মিনিট

কাল নিজের মস্তিষ্কের তালুতে হলুদ রঙের ওপরে ধ্যান কেন্দ্রিত করুক। ধীরে ধীরে তার অনুভব হবে জ্ঞানের বিকাশ হচ্ছে, বুদ্ধি বৃদ্ধি পাচ্ছে। আপনি এই উপায় প্রয়োগ করুন, তখন নিজেরই বিশ্বাস হবে। এই প্রয়োগ দ্বারা বুদ্ধি প্রবল হতে পারে, চৈতন্যশক্তি পুষ্টি ও দৃঢ়তা লাভ করতে পারে, বিকশিত হতে পারে। একে সমগ্রভাবে উপাসনা করলে মানুষের মধ্যে অতিরিক্ত জ্ঞানের অবতরণ সম্ভব হতে পারে।

দুটি মুখ্য কেন্দ্র আছে—জ্ঞানকেন্দ্র ও কামকেন্দ্র। মস্তিষ্ক জ্ঞান-কেন্দ্র আর কটিদেশের আশপাশের স্থান কামকেন্দ্র।

মানুষ কামের উত্তেজনা দ্বারা অতিশয় অভিভূত। তার মধ্যে বিচিত্র প্রকার কামনা উৎপন্ন হয়, তার উত্তেজনা হয় এবং তার উত্তেজনা দীর্ঘকাল থাকে। ক্রোধ থেকেও উত্তেজনা হয়, কিন্তু তা মাঝে মাঝে হয়। অভিমান, লোভ ও মায়া থেকেও উত্তেজনা হয়, কিন্তু তাও সর্বদা হয় না। কিন্তু কামনার উত্তেজনা দীর্ঘকাল ধরে চলতে থাকে। এই উত্তেজনাই সবচেয়ে প্রবল ও তীব্র।

আমাদের শরীরের ওজঃ বা শরীরের বিদ্যুৎ কামকেন্দ্রের দিকে অধিক প্রবাহিত হলে কামকেন্দ্র পুষ্ট হয় এবং জ্ঞানকেন্দ্র ক্ষীণ হয়। আমাদের শরীরের সাবাংশ ওজঃ বা বিদ্যুৎ যদি জ্ঞানকেন্দ্রের দিকে প্রবাহিত হয় তবে জ্ঞানকেন্দ্র পুষ্ট হয় এবং কামকেন্দ্র ক্ষীণতা প্রাপ্ত হয়। এই দুটির মধ্যে সম্বন্ধ অতিশয় নিবিড়।

সাধনার অর্থ, কামকেন্দ্রস্থিত ওজঃশক্তিকে ওপরের দিকে প্রবাহিত করে জ্ঞানকেন্দ্রে নিয়ে যাওয়া যাতে জ্ঞানকেন্দ্রের সিঞ্চন, পোষণ ও পুষ্টি হতে পারে। সাধারণত মানুষ নিজের কামনা দ্বারা ধ্যানকেন্দ্রকে নিচের দিকে নিয়ে যায় এবং কামকেন্দ্রকে পুষ্ট করে। শরীরের গঠন সম্বন্ধে বোধ হবার পরে কামকেন্দ্রগত ওজঃশক্তিকে জ্ঞানকেন্দ্রে নিয়ে যাওয়া সম্ভব হয়। সাধনার দৃষ্টিকোণ থেকে আমাদের এ বিষয়ে যত্নবান হওয়া উচিত। তার সবচেয়ে প্রশস্ত পথ—সুষুম্না।

আমাদের শরীরে তিনটি প্রধান প্রধান পথ আছে—ডানে, বাঁয়ে

আব মাঝখানে। এই তিনেব মহত্ত্বেব কাবণ, তাদেব ভেতব দিযে প্রাণ-তবঙ্গ ওপবের দিকে যায। এগুলি প্রাণধাবা বা প্রাণতবঙ্গেব প্রবাহ-কক্ষ। তাই তাব মহত্ত্ব। তিনটিব মধ্যেই সুষুম্না আছে। তা সবচেযে বড এবং মহত্ত্বপূর্ণ প্রাণধাবাব প্রবাহকক্ষ। তাব ভেতব দিযে প্রচুব মাত্রায প্রাণধাবা ওপব দিকে যায। যোগেব ভাবায বাঁ দিকেব পথকে ইডা আব ডানদিকেব পথকে পিঙ্গলা বলে। মাঝখানকাব পথকে সুষুম্না বলা হয। পৃষ্ঠবজ্জু ছত্রিশটি হাড় দিযে গঠিত। তাব ভেতবকাব কোমল অংশ হল সুষুম্না কক্ষ। এব ভেতব দিযে প্রাণতবঙ্গ আসে ও যায। বাঁযেব পথ পৃষ্ঠবজ্জুব বাইবে নিচু থেকে আবম্ভ হযে ওপবেব দিকে যায এবং বাঁ দিকেব নাসাছিদ্রে এসে তাব শেষ হয। ঐ হল ইড়াব পথ। ডান দিককাব পথ পিঙ্গলাব পথ। পৃষ্ঠবজ্জু নিচে তাব আবম্ভ এবং ওপবে গিযে ডান দিকেব নাসাছিদ্রে তাব সমাপ্তি। মাঝখানকাব পথ সুষুম্নাব পথ। পৃষ্ঠবজ্জুব নিচ থেকে তাব আবম্ভ, আব মাস্তকে এসে তাব সমাপ্তি। এই তিন পথ আছে। দুটি যায নাসাছিদ্রে, আব একটি যায মাস্তকে। আমাদেব প্রাণধাবাকে বাম ও দক্ষিণেব পথে যেতে না দিযে মধ্যপথ দিযে চালনা কবাব চেষ্টা কবা উচিত। প্রাণেব তবঙ্গকে বেশি মাত্রায় প্রবাহিত কবতে হবে যাতে তা মাস্তক পর্যন্ত পৌঁছতে পাবে। দুটি পথ দিযে প্রবাহিত প্রাণধাবা মাস্তক পর্যন্ত পৌছয না। কেবল মাঝখানকাব পথ দিয়ে অর্থাৎ সুষুম্না দিযে প্রবাহমান প্রাণধাবা মাস্তক পর্যন্ত পৌছতে পাবে। মস্তিষ্কে প্রাণ-ধাবা নিযে যাওযাব অর্থ, জ্ঞানকেন্দ্রকে প্রাণধাবা দিযে পবিপূর্ণ কবা। এই দৃষ্টকোণ থেকে সুষুম্নাকে জানা, ঐ পথে প্রাণধাবাকে প্রবাহিত কবা, তাকে প্রাণ দিযে পবিপূর্ণ কবা, সাধনাব জন্য প্রযোজন। এই প্রযোজন মেটাবাব জন্য আমবা অনেক ক্রিযা কবে থাকি।

আমবা দীর্ঘশ্বাসেব অভ্যাস কবি। তাতে শাবীবিক লাভ হয। ফুসফুসে নির্মলতা আনা সম্ভব হয। প্রাণবাযু পূর্ণ মাত্রায ভেতবে চলে যায। কার্বন ডাই-অক্সাইড সম্পূর্ণভাবে তা থেকে বেব হযে যায।

আমাশযেবও নিবাময হয। সম্পূর্ণ উদব যন্ত্র শোধিত হয। এ সব শাবীবিক লাভ। কিন্তু লাভ হবে, কেবল এই উদ্দেশ্যে আমবা দীর্ঘশ্বাস অভ্যাস কবি না। যদি শুধু তাই উদ্দেশ্য হতো তবে তা আমাদেব স্বাস্থ্য নিকেতন হতো, সাধনা-নিকেতন হতো না। কিন্তু তা সাধনা-নিকেতন হলেও স্বাস্থ্যনিকেতন নয। আমবা আধ্যাত্মিক লাভেব জন্য দীর্ঘশ্বাসেব অভ্যাস কবি। দীর্ঘশ্বাসেব দ্বাবা সুষুম্নাব পথ উন্মুক্ত হয, বিদ্যুৎ তবঙ্গ প্রবল হয। কামাব হাপব চালনা কবে, তাব ফলে আগুন প্রবলভাবে জ্বলে ওঠে। দীর্ঘশ্বাসেব কাজও এই। তাব এমন ক্ষমতা যে তা সুষুম্নাব পথ খুলে দেয এবং তাব ভেতব দিযে প্রাণধাবাকে প্রবাহিত কবে। প্রাণধাবা ঐ পথে প্রবাহিত হযে মস্তিষ্কেব কেন্দ্রে পৌঁছে জ্ঞানকেন্দ্রকে পুষ্ট কবে। দীর্ঘশ্বাস অভ্যাস কবাব এই প্রযোজন। সেখানে পৌঁছতে পাবলে আমাদেব প্রত্যেক কাজেবই আধ্যাত্মিক প্রযোজন থাকে এবং তাব দ্বাবা অনুপ্রেবিত হযে আমবা ঐ সব কাজ কবে থাকি।

যে সাধক পূর্ণ একাগ্রতা, নিষ্ঠা এবং তন্ময়তাব সঙ্গে দীর্ঘশ্বাসেব প্রযোগ অভ্যাস কবে তাব প্রথম প্রথম অনুভূতি হয তাব পৃষ্ঠবজ্জুব তাব ঝনঝন কবছে। তাব ভেতবে কাঁপনও শুরু হবে। একটু গভীবতায গিযে সে যদি অনুভব কবতে চেষ্টা কবে তবে তাব মনে হবে তাব পেছনে কিছু নডাচডা কবছে।

দ্বিতীয কথা—যখন সুষুম্নাব পথ খুলে যায তখন এক বিচিত্র শান্তি ও তন্ময়তাব অনুভূতি হয এবং সমস্ত শবীবে শীতলতা ব্যাপ্ত হয। মনে হয যেন গ্রীষ্মেব প্রখব তাপে উৎপীডিত কোনও পথশ্রান্ত পথিক গভীব ছাযাচ্ছন্ন কোন জাযগায এসে বসেছে।

তৃতীয কথা—দীর্ঘশ্বাসেব অভ্যাস পবিপক্ব হলে দশ-পনব মিনিট কাল অভ্যাস কবাব পব এক নির্বিচাব স্থিতি সঞ্জাত হয এবং সমস্ত সঙ্কল্প-বিকল্প বন্ধ হযে যায।

এ সবে কি হয? এ একটি প্রশ্ন বটে। এব উত্তব এই যে,

সুষুম্নাতে প্রাণধারা প্রবেশ করার ফলে এই সব ঘটে। যদি আমাদের শ্বাস ডান দিকের পথে প্রবাহিত হয় তবুও চঞ্চলতা আসবে। যখন আমাদের শ্বাস সুষুম্না বা মধ্যের পথ দিয়ে প্রবাহিত হতে থাকবে তখন সমস্ত চঞ্চলতা আপনা থেকেই শেষ হয়ে যাবে। ঐ চঞ্চলতা শেষ হওয়ার একটি প্রবল কারণ আছে। যদি আমরা শরীরশাস্ত্রীর দৃষ্টিকোণ থেকে এর গুরুত্ব দেখতে না পাই, তবে যোগসাধনার তথা অভ্যাসিকের দৃষ্টিকোণ থেকেও এর দ্বারা লাভবান হতে সক্ষম হব না। এই কারণে শরীর সম্বন্ধে সম্পূর্ণ জ্ঞান লাভ করা একজন শরীরশাস্ত্রীর পক্ষে যতটা গুরুত্বপূর্ণ, একজন যোগী বা সাধকের পক্ষেও ততটা গুরুত্বপূর্ণ।

এখন আমরা অন্যান্য চৈতন্যকেন্দ্রের আলোচনা করব।

মস্তিষ্কের একটু আগে আজ্ঞাচক্র অবস্থিত। ওটাও চৈতন্যের অতি বৃহৎ কেন্দ্র। এর ক্ষমতা প্রভূত। কোনও কোনও শরীরশাস্ত্রী তথা পরামনোবিজ্ঞানী একে এক রকম সর্বজ্ঞতার কেন্দ্র বলেছেন। একে আজ্ঞাচক্রও বলা হয়, আবার তৃতীয় নেত্রও বলা হয়। তা মস্তিষ্ক এবং তালুর নিচে, ভ্রূর নিকটে গভীরতায় অবস্থিত। পাশ্চাত্য দেশের সাধকরা একে 'থার্ড আই' নাম দিয়ে এর সম্বন্ধে অনেক চর্চা করেছেন এবং এ বিষয়ে অনেক বইও লেখা হয়েছে। এটিও চৈতন্যের এক কেন্দ্র। আমাদের শরীরের অনেক জায়গায় চৈতন্যকেন্দ্র আছে। আমাদের শরীরে যেখানে যেখানে চৈতন্যকেন্দ্র আছে, সেখানে সেখানে স্নায়ুগুলি বড় জালের মত তৈরি হয়েছে। ঐ স্নায়ুজালকে আমরা গ্রন্থি বলি, চক্র বলি বা অন্য কোন নামে অভিহিত করি। কিন্তু এ কথা সত্য যে আমাদের দেহের বিভিন্ন স্থানে বড় বড় চৈতন্যকেন্দ্র আছে। ঐ সব চৈতন্যকেন্দ্র স্থূল শরীরের অন্তর্ভুক্ত নয়। স্থূল শরীরে কেবল তাদের অভিব্যক্তি হয়। কিন্তু এই সমস্ত কেন্দ্র অতিশয় গভীরতায় সূক্ষ্ম শরীরে অবস্থিত আছে। এ রকম হওয়া সম্ভব যে আমাদের শরীর-পর্যাপ্তিতে ঐ সব চৈতন্যকেন্দ্র আছে। সূক্ষ্ম শরীরে তো ঐ কেন্দ্রগুলি নিশ্চিতভাবে অবস্থিত। শরীরের প্রতিবিম্ব শরীর পর্যাপ্তিতে পড়ে,

এবং শরীর পর্যাপ্তির ছায়া স্থূল শরীরে পড়ে—এই রকম এক চিন্তাধারা প্রচলিত আছে।

আজ্ঞাচক্র এক শক্তিশালী চৈতন্যকেন্দ্র। কোনও লোক জিজ্ঞাসা করে, চেতনাকে জাগিয়ে তোলার কোনও পথ পাওয়া যায় কিনা। বাস্তবে কোন পথ আছে, কিংবা তা কল্পনা মাত্র? পথ অবশ্যই আছে, কিন্তু খুঁজে বের করবে কে? আমাদের অধ্যবসায় এবং প্রয়াসের ওপরে এই পথ পাওয়া নির্ভর করছে। পথ কঠিন নয়। নিশ্চয়ই পথ আছে —অবশ্যই আছে। তার অস্তিত্ব অনুভূত সত্য। তা কল্পনা মাত্র নয়। আমি মনে করি, কোনও সাধক যদি তিন ঘণ্টা ধরে আজ্ঞাচক্রে মন কেন্দ্রিত করে রাখতে পারে, যদি সে একাগ্র হয়ে থাকতে পারে, তবে দশ দিন বাদে সেই সাধক কখনই বলবে না যে চেতনার জাগরণের কোন পথ নেই। দেখতে হবে তিন ঘণ্টার মধ্যে কোনও বিকল্প না আসে। এটি অবশ্য কঠিন কথা। সাধারণত এক-দুই মিনিট বা পাঁচ-দশ মিনিট কালও মনকে এক ধারায় চালিত করা কঠিন, একই স্থানে এক নাগাড়ে তিন ঘণ্টা মনঃসংযোগ করে রাখা অত্যন্ত দুষ্কর বটে। যে সাধক দশ-পনর মিনিট পর্যন্ত একাগ্রভাবে অবস্থানের অভ্যাসে পৌঁছে যায় সে অনুভব করতে পারে যে, যদি কোনও লোক তিন ঘণ্টা ধরে একাগ্রতায় অবস্থিত থাকতে পারে সে অবশ্যই পথের সন্ধান পেয়েছে এবং বৃথা ইতস্তত ভ্রমণ থেকে মুক্তি পেয়েছে। তার আর গুরু বা উপদেশকের প্রয়োজন হয় না। কিন্তু তাঁর এতটা শ্রদ্ধা, তন্ময়তা ও সামর্থ্য থাকা প্রয়োজন যাতে লক্ষ্যস্থলে পৌঁছে তিনি সাধনায় সিদ্ধি লাভ করতে পারেন।

অনেকে মনে করে যারা ধ্যান করে তারা কর্মহীন ভাবে থাকে, এবং অকর্মণ্য হয়ে যায়। তাদের নিষ্কর্মা বলা হয়। ধ্যানকালে এত পরিমাণ শক্তি প্রয়োগ করতে হয় যে ধ্যানভাসী অনেক সময়ে নিজ শরীরের ওপরে বলপ্রয়োগ করে। ফলে শরীরে কঠিন ব্যাধি উৎপন্ন হতে পারে। ধ্যানকালে ওজঃ বা শারীর-বিদ্যুৎ ব্যয়িত হয়। তার

ফলে মস্তিষ্কের এতটুকু শ্রম হলে মনে হয় মাথা গরম হয়ে গিয়েছে। এরকম অনুভূতির কারণ মস্তিষ্কের ওজঃ বা বিদ্যুৎশক্তি অতিরিক্ত পরিমাণে ব্যয় হয়। এ রকম অবস্থায় কেন মাথা গরম হয়? তার কারণ, যতটা ওজঃশক্তি বা বিদ্যুৎ আছে তার উপযোগিতা আমরা অধিক মাত্রায় ব্যয় করি। তার ফলে তা এত বেশি জ্বলতে আরম্ভ করে যে আমাদের মাথা গরম হয়ে যায়, চুল্লির মত জ্বলতে থাকে। যে অবয়বের ওজঃ আমরা উপযোগ হিসাবে ব্যয় করি তাতে উত্তাপ উৎপন্ন হয়।

ধ্যানকালে ওজঃশক্তির অধিক ব্যয় হয়। মনকে একাগ্র করার জন্য বহু চেষ্টা করতে হয়। এ প্রয়াস প্রবল হলে ওজঃশক্তির ব্যয় বৃদ্ধি পায়। প্রয়াস না করলে নির্বিকার স্থিতি পাওয়া সম্ভবপর নয়। যদি আমাদের প্রযত্ন সফল হয়, ওজঃশক্তি সম্পূর্ণভাবে প্রয়োগ করি, তবে লক্ষ্যপ্রাপ্তির সম্ভাবনা বৃদ্ধি পায়।

তৃতীয় চৈতন্যকেন্দ্র—কণ্ঠ। যোগের ভাষায় একে বিশুদ্ধিচক্র বলে। একে বিকশিত করলে বাসনাসমূহের ওপরে নিয়ন্ত্রণক্ষমতা পাওয়া যেতে পারে। নিয়ন্ত্রণ নয়, আমি ভুল করছি। নিয়ন্ত্রণক্ষমতা পাওয়া তেমন বড় কথা নয়। প্রযত্ন ব্যতীত আমরা নির্বিচার হতে পারি না। বড় কথা হল, বাসনাকে নির্মল ও উদাত্ত করা। বিশুদ্ধিচক্র বিকশিত হলে আমাদের বৃত্তিগুলি স্বাভাবিকভাবে শান্ত হয়ে যায়।

চতুর্থ চৈতন্যকেন্দ্র—নাভিচক্র। এটি হল অগ্নির স্থান। এখানে অনেক তাপ, অনেক তেজস্বিতা অবস্থিত। যেখানেই উত্তাপ সেখান থেকেই তা অন্য সমস্ত বস্তুতে তেজ সংক্রমিত করে। এই চক্রে যদি একাগ্রভাবে ধ্যান কেন্দ্রিত করা যায় তবে বৃত্তিগুলি, তথা বাসনাগুলির তেজ বৃদ্ধি হয়। তেজস্বিতার ফলে সমস্ত বস্তু প্রবল হয়ে উঠে।

বিশুদ্ধিচক্র ও নাভি চক্র—এই দুয়ের মধ্যে পারস্পরিক সম্বন্ধ আছে। কোন লোক নাভিচক্রকে জাগ্রত করে যদি বিশুদ্ধিচক্রকে জাগ্রত না করে তবে তার কঠিন পীড়া উৎপন্ন হয়। দুই চক্রকেই এক সঙ্গে জাগ্রত করতে হয়। যদি তা করা যায় তবে তেজস্বিতা

বৃদ্ধি পায়, শক্তি সঞ্চিত হয়, বৃত্তিসমূহ শান্ত হয়।

এক মস্ত বড় চৈতন্যকেন্দ্র হল—হৃদয়। মস্তিষ্কের স্থান প্রথম, আর হৃদয়ের স্থান দ্বিতীয়। এ একটি অত্যন্ত মহত্ত্বপূর্ণ স্থান। এ সম্বন্ধে একটি অত্যন্ত পুরনো বিবাদ আছে—আত্মা মস্তিষ্কে, না হৃদয়ে অবস্থিত। আয়ুর্বেদ গ্রন্থ লিখেছে, 'হৃদয়ং চেতনাধিষ্ঠানং'—হৃদয়ে চেতনার অধিষ্ঠান। 'চৈত্য পুরুষ', 'হৃদয় পুরুষ' এই সমস্ত কথা হৃদয় সম্বন্ধে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। 'থারে ঘট মে রাম বিরাজে'—এই ঘট রামের বাসস্থান বটে। রাম, আত্মা বা প্রভুর অবস্থান ঘটে হৃদয়ে। হৃদয় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ স্থান। জীবনের দিক থেকেও হৃদয়ের স্থান মহৎ বা প্রধান। হৃদয় থাকলে জীবন থাকে, হৃদয় না থাকলে জীবনও থাকে না। হৃদয়ের স্পন্দন বন্ধ হলে জীবন শেষ হয়ে যায়। শরীর-তন্ত্রের সঞ্চালক রক্ত। রক্তই জীবন। রক্ত থাকলে জীবন থাকে। রক্তের সঞ্চালক হৃদয়। হৃদয়ে রক্ত প্রবাহিত হয়। ফুসফুসে তার শুদ্ধি হয়, তারপর সেখান থেকে তা সমস্ত শরীরে ছড়িয়ে পড়ে। রক্তই জীবন, আর তাকে সমস্ত শরীরে প্রসারিত করে হৃদয়। এই হল হৃদয়ের গুরুত্বের কারণ। ওটা আমাদের ভাবপক্ষও বটে। যদি মস্তিষ্ক জ্ঞান-পক্ষ হয় তবে হৃদয় ভাবপক্ষ।

হৃদয় চেতনার অতিশয় বৃহৎ কেন্দ্র। সাধনার দৃষ্টিকোণ থেকে তা অত্যন্ত মহত্ত্বপূর্ণ। যে সাধক এই চক্রের উদঘাটন করে এবং তাকে জাগ্রত করে, সে বাহ্য জগতের বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে ভেতরের জগতে প্রবেশাধিকার পায়।

আমাদের শরীরে এই রকম অনেক চৈতন্যকেন্দ্র আছে। কোন কোন যোগী বলেছেন চৈতন্যকেন্দ্র ছটি, কেউ বলেছেন সাতটি, আবার কেউ বলেছেন নটি। আমি মনে করি চৈতন্যকেন্দ্রের সংখ্যা এই সংখ্যাগুলির চেয়ে বেশি। প্রধান প্রধান কেন্দ্রের নামগুলি গোনা হয়েছে। সেগুলি ছাড়া আর যে সব ছোটখাটো চৈতন্যকেন্দ্র আছে সেগুলি গোনা হয় নি। প্রকৃতপক্ষে তাদের সংখ্যা অনেক।

চৈতন্যকেন্দ্রের অর্থ—মর্মস্থান। ভারতীয় আয়ুর্বেদের পুরস্কর্তাগণ (অগ্রণীরা) সত্তরটি মর্মস্থানের কথা বলেছেন। চীন দেশে প্রচলিত আকুপাংচার নামক চিকিৎসাপদ্ধতিতে সাতশ' মর্মস্থানের কথা স্বীকৃত হয়েছে। শরীরে এই রকম সাত শ' বিন্দু বা মর্মস্থান আছে যেখানে চৈতন্যের প্রবাহ সমধিক। এই সমস্ত মর্মস্থানকে উত্তেজিত করে অনেক রকম রোগ নিরাময় করা যায়। এভাবে অসাধ্য রোগের চিকিৎসা হচ্ছে।

'মর্ম' কথাটির অর্থ রহস্য বা গোপন। মর্মস্থান কথাটির অর্থ গূঢ়তার বা গোপনতার স্থান। এই সব মর্মস্থানে চেতনার বিশেষ ধরনের অভিব্যক্তি হয়। প্রয়োজন বোধ করলে যে কেউ এক, দুই, তিন বা চারটি মর্মস্থান স্পর্শ করে পরীক্ষা করে দেখতে পারেন। তাহলে বিশেষ উপলব্ধি হবে। চীন দেশে চিকিৎসকের দৃষ্টিকোণ থেকে মর্মস্থানের সন্ধান করা হয়েছে। সাধনার দিক থেকে তার অনেক মহত্ত্ব আছে। মর্মস্থান ও চৈতন্যকেন্দ্র সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করেছি। ঐ প্রকার মর্মস্থান আরও থাকতে পারে।

আরও এক চৈতন্যকেন্দ্রের কথা আলোচনা করব। পৃষ্ঠরজ্জুর নিচের স্থানকে মূলাধার বলা হয়। তা চৈতন্যের কেন্দ্র বিশেষ। সাধনার দিক থেকে তার তাৎপর্য অত্যন্ত মহত্ত্বপূর্ণ এবং তা বিদ্যুৎ কেন্দ্রও বটে। আমাদের সমস্ত শারীরিক ওজঃশক্তির তা সঞ্চয়গৃহ। সেখান থেকে ওজঃশক্তির প্রসারণ ঘটে। এখানে বিদ্যুৎ উৎপন্ন হয় এবং সেখান থেকেই তার বিস্তার ঘটে।

আপনারা জানতে চান যে ধ্যানকালে আপনাদের মন একাগ্র হয়েছে কিনা। এ বিষয়ে পরীক্ষা করার একটি কষ্টিপাথর আছে। যখনই মন একাগ্র হবে নিচের স্নায়ু ওপর দিকে উঠতে থাকবে। ঊর্ধ্বাকর্ষণের অনুভূতি আপনার সহজভাবেই হতে থাকবে। যদি এ রকম অনুভূতি হতে থাকে তবে জানবেন আপনার মন একাগ্র হয়েছে বা হচ্ছে। যদি এ রকম অনুভূতি না হয় তবে আপনার মন একাগ্র হয় নি বা হচ্ছে না। তা চঞ্চলভাবে ঘুরে বেড়াচ্ছে। মনের একাগ্রতার সঙ্গে নিচেকার

স্নায়ুসমূহেব নিবিড সম্বন্ধ আছে। মন একাগ্র হতে বা কেন্দ্রিত হতে থাকলে নিচেব স্নায়ু আপনা আপনি ওপব দিকে উঠতে আবম্ভ কববে। যেমন যেমন একাগ্রতা বাডতে থাকবে তেমনি সঙ্কুচিত হতে থাকবে। সব কিছু সঙ্কুচিত হতে থাকবে। তাব অর্থ, যে বিদ্যুৎ সঞ্চিত আছে তা ওপব দিকে উঠছে। বিদ্যুতেব ধাবা ওপবেব দিকে প্রবাহিত হতে আবম্ভ কবেছে, ওপবেব দিকে যাবাব জন্য তা পথ খুঁজতে আবম্ভ কবেছে।

এই এক কষ্টিপাথব। প্রত্যেক সাধক একে কাজে লাগাতে পাবেন, নিজেই পবখ কবে দেখতে পাবেন। কোন উপাযে মন একাগ্র হতে আবম্ভ কবলে নিচেব স্নায়ু সঙ্কুচিত হতে শুরু কবে। এই সঙ্কোচন একাগ্রতাব বিন্দুব সূচনা কবে। সাধনাব দিক এ কথা মানতে হবে যে, সাধক যে কোনও বকম সাধনা করুন না কেন নিচেকাব স্নাযুব সঙ্কোচ বা সঙ্কুচিত করা অবশ্য প্রযোজন। স্নায়ু যতটা সঙ্কুচিত থাকবে ওপব দিকে ততটা বিকাশ ঘটবে। ঊর্ধ্বীকবণ তথা উদাত্তকবণ ঘটবে। বিদ্যুতেব যে ধাবা নিচেব দিকে প্রবাহমান ছিল তাকে রুদ্ধ কবে ওপরেব দিকে প্রবাহিত কবা হযেছে। এব নাম সাধনা। এ এক বকম বিদ্যুতেব ধাবা বদলানো, তাব মোড ঘোবানোব উদ্যোগ। এই জন্য একে মূলবন্ধ বলা হয। মূল যতটা দৃঢ হয ওপবকাব সমস্ত অবযব ততটা দৃঢ হবে। বৃক্ষেব মূল দৃঢ এবং সুস্থ হলে তাতে পাতা, ফুল ও ফল ধরতে থাকবে। তাকে কেউ আব বাধা দিতে পাববে না। মূল যদি বিকৃত এবং অসুস্থ হয তবে বৃক্ষটি দীর্ঘকাল জীবিত থাকতে পাববে না, ধবাশাযী হবে।

সাধনাব দিক থেকে এই হল মূল স্থান। এ যদি সুস্থ হয তো সমস্ত বিকাশ সহজ সবল হযে যাবে। যদি আমবা এই কথাগুলি ঠিক মত বুঝে থাকি, যদি তাব তাৎপর্য হৃদযঙ্গম কবে থাকি, তবে ওপবকাব কেন্দ্রগুলিকে বিকশিত কবা আমাদেব পক্ষে সহজ হবে। ঐ সব কেন্দ্রেব বিদ্যুৎধাবা উপযুক্ত সিঞ্চন ও পোষণ পাবে। এই জন্য ঐ স্থানেব ওপবে ধ্যান কেন্দ্রিত কবা অতিশয আবশ্যক।

এই বার আমরা স্থূল শরীরের প্রসঙ্গ ত্যাগ করে সূক্ষ্ম শরীরের আলোচনা করব। সাধনার সঙ্গে সূক্ষ্ম শরীরের বিরাট সম্বন্ধ। দৃশ্য শরীর বা স্থূল শরীর পর্যাপ্ত নয়। তার সঙ্গে সূক্ষ্ম শরীর সংযুক্ত আছে। আমার বৃত্তি, আকাঙ্ক্ষা, বাসনা, সংস্কার প্রভৃতি সব কিছু স্থূল শরীরে প্রকট হয়, জাগ্রত মনে প্রকাশিত হয়। এ সব কোথা থেকে এল? এর স্রোতই বা কি? আমাকে তার খোঁজ করতে হবে। স্রোত কি, কোথা থেকে এল, এ সব খুঁজে বের করতে হবে। এই স্থূল শরীরে যদি এই স্রোতের উৎস না থাকে তবে এ সব কোথা থেকে আসছে? কার মাধ্যমে আসছে? মাধ্যম সম্বন্ধে আমি এর আগে আলোচনা করেছি। এর মাধ্যম হল মস্তিষ্ক। ঐ সমস্তই মস্তিষ্কের সাহায্যে নেমে আসে, কিন্তু তাদের মূল উৎপত্তিস্থল কোথায়? এই প্রশ্ন এখনও অবশিষ্ট আছে।

এর স্রোত হল—সূক্ষ্ম শরীর। আমরা তাকে দেখতে পাই না। বহু আবরণ আছে। আমরা শুধু স্থূল শরীরকেই দেখতে পাই। সাধকদের সূক্ষ্ম শরীর দর্শন করার জন্য প্রযত্ন করা আবশ্যক। সূক্ষ্ম শরীর দেখতে পাওয়া সম্ভব, তাকে অনুভব করা সম্ভব। আপনি নিজের সূক্ষ্ম শরীর দেখতে পেতে পারেন, আবার অন্যের সূক্ষ্ম শরীরও দেখতে পারেন। আপনার শরীরের চারদিকে প্রভামণ্ডল দেখা যেতে পারে, অন্য লোকেরও প্রভামণ্ডল দেখা যেতে পারে।

একটি ছোটখাটো প্রয়োগের আলোচনা করব। আপনারা একাগ্রতা অভ্যাস করেছেন। আপনার কাছে কোন লোক গেল। আপনি অনিমেষ দৃষ্টিতে এক মিনিট ধরে তার দিকে চেয়ে থাকলেন। তাকে দেখার পরে আপনি চোখ বন্ধ করলেন। আপনার চোখ দুটি বন্ধই থাকল। তার প্রতিমূর্তি আপনার সামনে থেকেই গেল। তার শরীর আপনি দেখছেন না। তার আকৃতি দেখছেন না। কিন্তু যে ব্যক্তিকে আপনি দেখছেন তার শরীর প্রমাণ প্রতিরূপ আপনার চোখের সামনে আসবে। আপনি সেই প্রকাশমূর্তির চারদিকে নীল, কালো বা সাদা রঙের যে বলয় আছে তা আপনি দেখতে পাবেন। এই প্রকার

একাগ্রতার সাধনা দ্বারা অন্য লোকের সূক্ষ্ম শরীর ও তার আভারলয় দেখতে পাওয়া সম্ভব। নিজের শরীরও দেখা সম্ভব হয়। ঐ ধ্যান এক বিশেষ বিন্দুতে কেন্দ্রিত হয়, তাতে এক বিশেষ ধরনের স্থিতি উৎপন্ন হয়। তখন সাধকের সামনে তাঁর শরীরের এক বিশেষ তৈজস-প্রকৃতিও প্রকটিত হয়। তিনি চোখ বুঁজে থাকলেও তাঁর অন্তর্দৃষ্টি দ্বারা তিনি তা দেখতে পান।

সূক্ষ্ম শরীর আর স্থূল শরীরের কি সম্বন্ধ তা জানা বিশেষ প্রয়োজন। সূক্ষ্ম শরীর কিভাবে স্থূল শরীরকে প্রভাবিত করে এবং স্থূল শরীর ও স্থূল মন কিভাবে জাগ্রত মনের সাধনার দ্বারা সূক্ষ্ম মনের প্রকম্পনের নাগাল পেতে পারে, এ সব বিষয় জানা অত্যন্ত আবশ্যক।

৯

প্রেক্ষা প্রয়োগ

দুটি তত্ত্ব কাজ করে—দেখা এবং জাগা। আমরা একই সময়ে দেখি ও জেগে থাকি। আমরা গভীর ভাবে চিন্তা করলে দেখতে পাব যে দেখা ও জাগা দুটি পৃথক কাজ নয়, দুটি একই কাজ। এ দুটিই প্রেক্ষাধ্যানে কাজ করতে থাকে। জাগা অর্থাৎ অপ্রমত্ত থাকা। এ মস্ত বড় কথা। 'সুত্তেসু যাবি পডিবুদ্ধজীবী।' ঘুমন্ত লোকের মধ্যে জেগে থাকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার। আমি যদি আর একটু গভীরে যাই তবে এই বচনের এই অর্থ হবে যে, ঘুমন্ত প্রবৃত্তিগুলির মধ্যে আমাদের জেগে থাকতে হবে। অর্থাৎ চেতনার এমন এক শিখা জ্বালাতে হবে যাতে বাতাসের ঝাপটা তাকে নেভাতে না পারে। হাওয়া বয়ে যাবে, ঝড় উঠবে, তুফান উঠবে, ঝঞ্ঝা আসবে, তবুও আমাদের অন্তরে এমন জ্যোতি, এমন শিখা জ্বেলে রাখতে হবে যাকে কোন কিছুই নেভাতে পারবে না। এর নাম সাধনা। এই হল সাধনার ফল। আমাদের ভেতরে এমন জ্যোতির্ময় শিখা প্রজ্জ্বলিত করতে হবে যাকে বিশ্বের কোনও শক্তিই নির্বাপিত করতে সমর্থ হবে না। বাইরে যাই হতে থাক ভেতরে এই জ্যোতি অনির্বাণ জ্বলতে থাকবে। এ শিখা কখনই খণ্ডিত হবে না। তারও এক সাধনা আছে। তা

প্রেক্ষার অভ্যাস, দেখার অভ্যাস। কেবল জানার সাধনা হয় না, করার সাধনা হয়। শুধু জেনে নেওয়া পর্যাপ্ত, করাও জরুরী বা গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার। কিছু কর। প্রয়োগ কর। প্রয়োগের জন্য, জাগ্রত থাকার জন্য কোন কথা গুরুত্বপূর্ণ।

আপন অস্তিত্ব থেকে শরীরকে ভিন্ন করে দেখতে হলে এক প্রয়োগ করতে হবে। আমরা যদি অভ্যাস করি তবে মৃত্যুকে দেখতে পাই। মৃত্যুকে দেখতে হলে, শরীর থেকে নিজের অস্তিত্বকে পৃথক করে দেখতে হলে তার জন্য প্রয়োগ আবশ্যক। সে হল জাগৃতির প্রয়োগ, অপ্রমাদের প্রয়োগ।

ক্ষুধা লাগে বলে আমরা খাই। ক্ষিদে লাগে শরীরের। আমার ক্ষিদে লাগে না। অন্য কোনও বস্তুর ক্ষুধা লাগে। যদি প্রাণশক্তি থাকে, যদি শরীর থাকে তবে ক্ষুধা লাগবেই। চেতনার ক্ষুধা বোধ হয় না। শরীরের খিদে পায় আর চেতনা দেখতে থাকে কিসে তার ক্ষুধা পায় আর কিসে ক্ষুধা পায় না। চেতনার স্থিতি যদি অভিব্যক্ত হয়, যদি তার জ্যোতি জ্বলে ওঠে, সে ক্ষুধাকে দেখে আর সঙ্গে সঙ্গে অনুভব করে, ক্ষুধাবোধ তার নয়, সে স্বয়ং তৃপ্ত, সদা তৃপ্ত, কখনও তার অতৃপ্তি নেই, ক্ষুধাবোধ নেই। এই স্থিতির অনুভূতিই প্রকৃতপক্ষে তপস্যা। চেতনাকে এভাবে জাগিয়ে তোলা যাতে সে দেখতে পাবে কার ক্ষুধা পেয়েছে—এ এক খুব বড় তপস্যা।

লোকে ঘুমোয়, শুয়ে থাকে, মূর্চ্ছিত হয়। আচার্য কুন্দকুন্দন একেবারে মর্মের কথা লিখেছেন। সে কথা বোঝা সহজ নয়। তিনি লিখেছেন, আহার বিজয়, নিদ্রাবিজয় এবং আসন বিজয় যে না জানে সে জৈনশাসন জানে না। সে ভগবান মহাবীরের বাণী বুঝতে পারে না, তাঁকে বুঝতে পারে না। এ তুচ্ছ কথা নয়, বিশেষ গুরুত্ব-পূর্ণ কথা। যে আহারবিজয়, নিদ্রাবিজয় ও আসনবিজয়ের তাৎপর্য বুঝতে না পারে সে জৈন শাসন বোঝে না, জানে না।

আহারবিজয়—সাধনার দিক থেকে এ একটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ

কথা। শরীর শরীরই বটে। আহার ছাড়া দেহ বাঁচতে পারে না। এই স্থিতিতে আহারবিজয় কি ভাবে? আহারবিজয় করতে না পারলে কেউ জৈন শাসন বুঝতে পারবে না। এ দুটি কথা পরস্পরবিরোধী বলে মনে হয়। বস্তুত তারা পরস্পর-বিপরীত নয়। তাদের মধ্যে সঙ্গতি আছে। যে ব্যক্তি ক্ষুধিত, খাইয়ে লোক ও চৈতন্যের প্রভেদ করতে না পারে সে আহারবিজয় করতে সমর্থ হয় না। যে আহারবিজয় করতে সক্ষম হয় না তাঁর অনবরত ক্ষুধা বোধ হয়। সে উপবাস করলেও তার নিরন্তর ক্ষুধার অনুভূতি হতে থাকে, আর ক্ষুধার অনুভূতি হতে থাকলে তাপের অনুভূতি কোথা থেকে হবে? কবে হবে? কি করে হবে? খাবেও না, না খাওয়ার জন্য সর্বদাই ক্ষুধার দ্বারা পীড়িত বোধ করবে না, তবেই হবে আহারবিজয়। যখন আমার এই ভেদ স্পষ্ট অনুভূতিতে আসবে যে, যার ক্ষুধা লেগেছে সে এবং আমি এক নয়, দুই ভিন্ন লোক, তখনই আমার আহারবিজয় সম্পূর্ণ হবে। আমার কখনও ক্ষুধা বোধ হতে পারে না, আমি কখনও ক্ষুধার দ্বারা পীড়িত বোধ করি না। এই তথ্য ভেদ প্রয়োগ দ্বারা স্পষ্টভাবে বোঝা যায়। আমরা যেন না খাই এবং না খেয়ে এই প্রয়োগ করি। ভগবান মহাবীর তপস্যা এবং উপবাসের ওপরে এত গুরুত্ব আরোপ করেছেন যে মনে হয় তপস্যাও তাঁর এক প্রয়োগ। উনি এক প্রয়োগ করেছেন যে, না খেয়ে স্থিতিতে অধিষ্ঠিত থেকে চৈতন্যকে কতটা অনুভব করা সম্ভব হয়, এবং ক্ষুধা দ্বারা যে সকল ব্যাধি হয়, ক্ষুধা থেকে সঞ্জাত সে সকল পীড়া থেকে নিজের অস্তিত্বকে কতটা পৃথক বা মুক্ত রাখা যায়। তপস্যা তাঁর এক প্রয়োগ। শুধু না খাওয়া, শুধু উপবাস করা তপস্যা নয়। নিরন্তর ধ্যান ও আমি খাই না এবং না খাওয়ার জন্য আমার কোনও কষ্ট হয় না, এই জাগরূকতা তার সঙ্গে সংযুক্ত হলে তপস্যা হয়। অনাহারকষ্ট কার হচ্ছে? এই কষ্ট কে অনুভব করছে? এই তথ্য সুষ্ঠু-ভাবে বোঝা তপস্যার এক প্রয়োগ। এই কথা যে লোক বুঝতে পারে সে আহারবিজয় করতে সমর্থ হয়। সে জৈন শাসনের মর্ম বুঝতে

সমর্থ হয়।

আমাদের দ্বিতীয় আলোচ্য বিষয় নিদ্রাবিজয়। যে নিদ্রাকে জয় করতে পারে না সে জৈন শাসন বুঝতে পারে না। শরীর আছে, সুতরাং এ সম্ভব নয় যে প্রত্যেক লোকই নিদ্রাকে জয় করবে। অকপটে স্বীকার করতে হয় যে কিছু লোক আছে, যাদের নিদ্রা হয় না বা খুব অল্প নিদ্রা হয়। সবাই ঘুমোয়। যাঁরা বড় বড় তপস্বী হয়েছেন তাঁরাও ঘুমোতেন। তা হলে এটা কি করে হতে পারে যে লোক নিদ্রা জয় করতে পারে নি সে জৈন শাসন বুঝতে সক্ষম হবে না?

'আচারাঙ্গ সূত্রে' একটি বচন আছে—'সুত্তেষু জাগরমাণে'—নিদ্রিত লোকের মাঝখানে যে জেগে থাকে অথবা যে নিদ্রিত অবস্থাতেও জেগে থাকে। মানুষ তিন প্রকার—সুপ্ত, জাগ্রত এবং সুপ্ত-জাগ্রত। সুপ্ত—যে নিদ্রিত, জাগ্রত—যে জেগে আছে, সুপ্ত-জাগ্রত—যে নিদ্রিত অবস্থাতেও জেগে আছে। মুনির এমন হওয়া উচিত যে সে নিদ্রিত হয়েও জেগে থাকবে। সে শুয়ে থাকে, ঘুমিয়ে থাকে, কিন্তু অনুভব করে, 'আমি জাগ্রত, আমি জেগে আছি।' এক মুহূর্তের জন্যও তার মনে হয় না যে সে ঘুমিয়ে আছে। প্রতি মুহূর্তে অনুভব হতে থাকে, 'আমি জেগে আছি।' এ খুব বড় সাধনা। যে ব্যক্তি এ রকম সাধনা করে থাকে সে ছয় ঘণ্টা অনবরত ঘুমিয়ে থাকলেও তার অনুভূতি হয় 'আমি জেগে আছি,' সে এক মহৎ উপলব্ধির অধিকারী হয়। অর্থাৎ স্থূল চেতনা ঘুমোয়, শরীর ঘুমোয়, কিন্তু যে জ্যোতি অন্তরের অন্তঃস্থলে প্রজ্জ্বলিত করা হয়েছে তা নিরন্তর জাগ্রত থাকে এবং অনুভব করে, 'আমি জেগে আছি।'

'সুত্তেসু যাবি পডিবুদ্ধজীবী'—সুপ্ত হয়েও প্রবুদ্ধ হয়ে জীবন ধারণ করুন, ঘুমিয়ে থেকেও জেগে থেকে বাঁচুন। যে এই সাধনা করেছে সে জৈন শাসনের মর্ম বুঝতে পেরেছে, সে নিদ্রাবিজয়ী হতে পারে। এরও প্রয়োগ হওয়া প্রয়োজন, অভ্যাস হওয়া প্রয়োজন। প্রয়োগ ও অভ্যাস ছাড়া কেউ নিদ্রাকে জয় করতে সক্ষম হয় না। আমরা

প্রতিদিন শোবার সময় সঙ্কল্প করব যে জাগ্রত থেকে ঘুমোব, নিদ্রিত অবস্থাতেও অপ্রমত্ত থাকব, সম্বিত থাকবে যে আমরা জেগে আছি।' এক দিনে কোনও নিষ্পত্তি হবে না। অনেক দিন ধরে প্রয়োগ করতে হবে। দীর্ঘ কাল অভ্যাস করতে হবে। আর দ্বিতীয় কোনও লোকের সঙ্গে এই প্রয়োগ সম্বন্ধে আমরা আলোচনা করব না। কারও সঙ্গে আলোচনা করলে সে বলবে, 'লোকটা কি রকম পাগল।' ঘুমিয়ে থেকেও জেগে থাকার কথা পাগলামি নয় তো কি? আপনি ঐ প্রয়োগ করতে থাকুন। এমন হতে পারে আপনার সফলতা লাভ করতে এক মাস, দু মাস, ছয় মাস, এমন কি পুরো এক বছর লাগতে পারে। এমন এক দিন আসবে যখন আপনি স্বয়ং অনুভব করবেন যে আপনি নিদ্রিত থেকেও সম্পূর্ণভাবে জাগ্রত আছেন, ঘুমিয়ে থেকেও আপনি জেগে আছেন। আমি এ কথা বলতে পারি না ছয় ঘণ্টা নিদ্রিত থাকার কালে পুরো ছয় ঘণ্টাই জাগ্রত অবস্থার স্থিতি হবে। কিন্তু আমি এটা বলতে পারি কিছু সময় এমন যাবে যে, আপনি নিদ্রিত থেকেও অনুভব করবেন আপনি জেগে আছেন।

আমি জাগ্রত থাকার বিষয়ে আলোচনা করলাম। এর পরে আমি ক্ষেত্রের, সেই সন্ধি-স্থলের কথা বলছি, যেখানে চেতন ও অচেতনের সঙ্গম হয়। চেতন এবং অচেতনের ঐ সন্ধিস্থল কি রকম হবে এটা বোঝা দরকার। কোন্ সে বিন্দু যেখানে এই দুয়ের মিলন হয়? আহার কার্যের সঙ্গে তুলনা করে এ বিষয় বোঝানো যেতে পারে। চেতনের ক্ষুধা লাগে না। চেতন আহার করে না। ভোজন চেতনের কাজ নয়। আহার প্রাণশক্তির কাজ। এ দিকে চেতনা আছে, অপর দিকে শরীর আছে, আর আছে সেই প্রাণের ধারা যার ক্ষুধা পায়, যে খায়।

চোখ দেখে। ইন্দ্রিয়গুলি আপন আপন কাজ করে যায়। ইন্দ্রিয়ের জ্ঞান বলে কিছু নেই। তাদের জানার শক্তি নেই। চেতনার চোখ নেই, আর তার চোখের কোন প্রয়োজনও নেই। যদি চেতনার

চোখের প্রয়োজন থাকত তাহলে বলতে হতো অশরীর একেবারে অন্ধ, কিছুই দেখতে পায় না। চেতনার কোন ইন্দ্রিয়ের প্রয়োজন নেই, আর ইন্দ্রিয়ের জানার, জ্ঞান লাভ করার কোনও ক্ষমতা নেই। কিন্তু এমন এক সন্ধিস্থল আছে যেখানে চেতনার প্রাণধারার বিন্দু এবং ইন্দ্রিয়ের প্রাণধারার বিন্দু মিলিত হয়। এই ইন্দ্রিয়ের বিন্দু এবং চেতনার বিন্দুর সন্ধিস্থলকে আয়ত্ত করার চেষ্টা কর। শ্বাস ও প্রশ্বাসের সঙ্গমস্থলকে আয়ত্ত কর। চেতনার শ্বাসের প্রয়োজন নেই। চেতনা এমন দীপ নয় যে তাতে তেল দিলে তবে জ্বলবে, তেল না ঢাললে জ্বলবে না, নিভে যাবে। চেতনা তো অখণ্ড জ্যোতি। সে আপনা আপনি জ্বলে। তার জন্য শ্বাসের প্রয়োজন হয় না। কিন্তু শ্বাসের প্রাণধারা আর চেতনার সঙ্গমস্থল বা সন্ধিস্থল আছে। তাদের মিলনবিন্দু আছে, তাকে আয়ত্ত কর। এই সব বিন্দু আমাদের জাগৃতির বিন্দু হতে পারে। যদি এই বিন্দুর ওপরে প্রয়োগ করা যায় তবে তা জাগৃতির একটি বিরাট বড় প্রয়োগ হবে, আর এই প্রয়োগের দ্বারা আমরা ঐ সূত্রকে সম্পর্ক করতে সমর্থ হব, আর শরীর এবং আত্মা ভিন্ন বস্তু—এই কথার অর্থ বুঝতে পারব। তা ছাড়া আমার এ কথা রটনা মাত্র থেকে যাবে। আমরা যখন চেতনা ও শরীরের মিলনবিন্দু ধরতে পারব তখনই আমরা তাদের ভিন্নতা বুঝতে পারব, তার আগে নয়।

সেই মহৎ মিলনবিন্দু হল—ভাষা। চেতনা কথা বলে না। যে কথা বলে সে চেতনা থেকে ভিন্ন। যে বিন্দুতে ভাষা এবং চেতনার সঙ্গম হয় সেটি একটি মহত্ত্বপূর্ণ বিন্দু। ভাষার মধ্যে যে শক্তি নিহিত থাকে সে শক্তি চেতনা থেকে আসে। উভয়ের সঙ্গমস্থলকে আমাদের বুঝতে হবে, তাদের মিলনবিন্দুকে আমাদের ধরতে হবে।

চেতনার সঙ্কল্প বা বিকল্পের প্রয়োজন নেই। তার ইচ্ছাও হয় না। চেতনার সঙ্কল্পও হয় না। ও সব কিছুই মনের কাজ। চেতনার মনকে প্রয়োজন নেই। কিন্তু চেতনা ব্যতীত মন নিষ্কর্মা হয়ে যায়। তার নিজস্ব এমন কোন ক্ষমতা থাকে না যে সে সংকলন করবে, ইচ্ছা

করবে, কল্পনা করবে অথবা সঙ্কল্প করবে। তারও এক মিলনবিন্দু আছে।

আহার, শ্বাস, ইন্দ্রিয়, ভাষা এবং মন—এই পাঁচ মিলনবিন্দুকে আমরা ধরব। নিদ্রা এবং জাগরণের মিলনবিন্দু আমরা আয়ত্ত করব এবং নিদ্রিত অবস্থার ভেতরে জেগে থাকব। এই দিকে আমার চেষ্টা চলতে থাকবে।

আমি পাঁচ-ছয় দিক থেকে আপনাদের প্রস্তুত করার চেষ্টা করেছি।

আমাদের যদি এই সব দিকে প্রয়োগ চলতে থাকে তবে এমন এক-দিন আসতে পারে, এমন এক ক্ষণ আসতে পারে যখন আমি অনুভব করতে সমর্থ হব যে আমার চেতনা এবং আমার শরীর দুটি পৃথক বস্তু। আমি এবং আমার শরীর দুটি পৃথক বস্তু। আমি এবং আমার দেহ দুটি আলাদা জিনিস। তা না হলে আত্মা ও শরীরের ভিন্নতার কথা, আত্মা আর দেহের পার্থক্যের কথা শুধু আমাদের মেনে নেওয়ার ব্যাপার, আমাদের ধারণার ব্যাপার হয়ে থাকবে। তার তাৎপর্য উপলব্ধি করতে আমরা সক্ষম হব না। ঐ কথা আমরা বারে বারে আবৃত্তি করতে থাকব, কিন্তু তার অর্থ বুঝতে পারব না।

এ সবই জাগৃতির সাধনা বা অপ্রমত্ত থাকার সাধনা। ভগবান মহাবীর বলেছেন—সর্বদা অপ্রমত্ত থাকবে। যার চেতনার দীপ সর্বদা প্রজ্জ্বলিত থাকে সে-ই শুধু অপ্রমত্ত থাকতে পারে। যখন চেতনার ওপরে কোন আবরণ পড়ে, মূর্চ্ছা এসে যায়, তখন চেতনা অপ্রসব হতে পারে না।

এক সুফি সন্ত ছিলেন রাবেয়া। তিনি রোদন করতেন এবং হাসতেন। দুই-ই এক সাথে চলতে থাকত। লোকে বলত, এ বড় অদ্ভুত কথা। কোন মানুষ যদি হাসতে থাকে তবে সে কাঁদে না। কেউ যদি কাঁদতে থাকে তবে সে হাসে না। কোন লোকই হাসা এবং কাঁদা এই দুই কাজ এক সঙ্গে করে না। সে যদি কাঁদে তো কাঁদতেই থাকে, আর যদি হাসে তো হাসতেই থাকে। কিন্তু এই

বাবেযা একই সাথে হাসতেন ও কাঁদতেন। প্রশ্ন হল : দুই কাজ, হাসা ও কাঁদা, এক সঙ্গে কেন? বাবেযাকে প্রশ্ন করা হয়েছিল। তিনি বলেছিলেন, 'তোমরা আমাকে বুঝবে না। আমি একই সঙ্গে দুই রকম কাজ করি, কিন্তু আমি পাগল নই। আমি দেখি পরমাত্মা সব জায়গায় ছড়িয়ে আছেন, তাঁর সত্য সব জায়গায় বিস্তৃত হয়ে আছে। এই দৃশ্য যখন দেখি তখন হাসি। আমার মনে হয় এই জগৎ কত সুন্দর ও রহস্যময়। তোমাদের যখন দেখি তখনই কাঁদতে থাকি, ভাবি, এত স্পষ্ট ভাবে তিনি দেখা দিচ্ছেন, কিন্তু তবু তোমরা তাঁকে দেখতে পাও না। তিনি এত স্পষ্ট ভাবে দেখা দিচ্ছেন, কিন্তু তোমরা অন্ধ হয়ে তাঁকে দেখতে পাও না। এই দেখে আমার কান্না পেয়ে যায়।'

আমাদেরও একই রকম অবস্থা হয়ে আছে। চেতনা থেকে শরীর আলাদা। এ দুটোই স্পষ্ট। চেতনা স্পষ্ট, তার অস্তিত্ব স্পষ্ট, তার কাজও স্পষ্ট। আবার শরীরও স্পষ্ট, প্রত্যক্ষ। কিন্তু আমরা এই পার্থক্যের বিন্দু ধরতে পারি না। আমি বলি কি মিলনবিন্দুকে ধর, সঙ্গমস্থলকে আয়ত্ত কর। কত স্থূল কথা। কিন্তু তবুও ধরতে পারি না। মিলনবিন্দু কোথায় তা উপলব্ধিতে আসে না। কোথায় বিচ্ছিন্নতা, এই স্থূল তথ্যও আমরা বুঝতে পারি না। যদি চেতন আত্মা আর অচেতন শরীরের সঙ্গমস্থল আমরা ধরতে পারি, সন্ধিস্থল জানতে পারি, মিলনবিন্দু বুঝতে পারি, তবে ঐ দুয়ের বিভিন্নতাও জানতে আমরা সফল হব।

যে মৃত্যুকে দেখতে পায় না, সে মৃত্যুভয়ে অত্যন্ত ব্যাকুল হয়। যখনই তাকে কেউ বলে, তোমার মৃত্যু হবে, সত্যি সত্যি সেই মুহূর্ত থেকে তার মৃত্যু শুরু হয়ে যায়, তার মনের ওপরে মৃত্যু নামতে শুরু করে। যখন মনে হয় মৃত্যু আসছে, তার সারা শরীর ভয়ে বিকৃত হয়ে যায়। শরীর শক্ত হয়ে যায়। শরীর কেন শক্ত হয়? সে মারা যাচ্ছে বলে নয়, মৃত্যুভয় তার শরীরকে শক্ত করে দেয়। উদ্বেগ এনে দেয়। মৃত্যুর প্রক্রিয়া এই—শরীরকে ঢিলে করে দেয়, শিথিল করে

দেয়, আর আমাদের চেতনা এমনভাবে তৈরি করব যে, আমাদের আত্মা শরীর থেকে আলগা হয়ে গেলেও মনে হবে কিছুই হয় নি। শরীর তো শিথিল হয়েছে। আর আমরা তো শুরু থেকে মরার জন্য প্রস্তুত হয়েছি। শরীর শিথিল হওয়ার অর্থ, মৃত্যুর জন্য তৈরি হওয়া। যে সর্বদা মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত থাকে তার শরীরে বিকৃতি হয় না, উদ্বেগ হয় না, ভয় হয় না। কোন কিছুই হয় না। এই জন্য জৈন আচার্যগণ মৃত্যু সম্বন্ধে অনেক কিছু লিখেছেন। মৃত্যু সম্বন্ধে একটি বই হল, 'মৃত্যু মহোৎসব।' মৃত্যু এক মহোৎসব। তা মহোৎসব, কিন্তু তুমি তা থেকে ভীত হও, এ কি রকম ব্যাপার। মহোৎসব হবে মঙ্গলগীত, প্রীতি, উল্লাস, আনন্দপূর্ণ আলাপ। কিন্তু ভয়ের কথা তো হতে পারে না। মৃত্যু মহোৎসব বটে। তা থেকে আবার ভয় কি?

জগদীশ কাশ্যপ নামে মস্ত বড় এক বৌদ্ধ জ্ঞানী ছিলেন। তাঁর সদ্য দেহাবসান হয়েছে। একবার তিনি এক পত্র দ্বারা আমাদের জানিয়েছিলেন, 'আমি অন্তিম সময়ে জৈন পদ্ধতিতে সমাধি মৃত্যুতে মরতে চাই। সেই জন্যে আপনি ঐ পদ্ধতি সম্পূর্ণ লিখে জানিয়ে দিন। কারণ মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হওয়ার যেরকম বিবরণ জৈন সাধনা পদ্ধতিতে দেওয়া হয়েছে সম্ভবত অন্যত্র তা দুর্লভ।'

জৈন সাধনায় মৃত্যুর জন্য প্রস্তুতি বার বছর আগে থেকে আরম্ভ হয়ে যায়। বার বছর আগে থেকে মৃত্যুর জন্যে প্রস্তুতি। অর্থাৎ মৃত্যু এমন একটি ঘটনা যার জন্যে প্রস্তুত হতে বার বছর লাগা উচিত। এ কথা যথার্থ।

আপনারা দেখে থাকবেন, ছোটখাটো অপারেশনের আগেও অনেক বড় প্রস্তুতি আবশ্যক হয়। অপারেশন হবে একটি অঙ্গের, কিন্তু তার জন্য ডাক্তারকে বেশ বড় ধরনের প্রস্তুতি নিতে হয়। এক অপারেশনের জন্যে কত ডাক্তার, কত নার্স, কত উপকরণ, কত যন্ত্র, কত ওষুধ তৈরি রাখতে হয়। তার কারণ, একটি অবয়বের অপারেশনের ফলে অন্যত্র কোন অবয়বের ওপরে প্রভাব পড়তে পারে। তাকে নিরাপদ রাখার

জন্য প্রস্তুত থাকতে হয়।

মৃত্যু সমস্ত শরীরের ওপরে অপারেশন। সমস্ত শরীর থেকে সম্পূর্ণ চেতনার নির্গমন, চেতনাকে সম্পূর্ণভাবে বিচ্ছিন্নকরণ—এ কত বড় অপারেশন। এর জন্য বার বছর ধরে প্রস্তুতি প্রত্যাশিত। একে সংলেখনা বলা হয়ে থাকে। সংলেখনার কাল—বার বছর। বার বছর আগে থেকে এভাবে নিজেকে প্রস্তুত করে নেওয়া হয় যাতে সাধনাপদ্ধতি সম্পূর্ণভাবে ফলপ্রদ হয়। বার বছর ধরে অনশন করতে হয়, তারপরে সমাধি-মৃত্যু। কত মহৎ প্রস্তুতি। কত সুন্দর ক্রমবিন্যাস। এ বিষয়ে কেন এত লেখা হয়েছে? কেন এত বলা হয়েছে? এর কারণ কি? আমরা কারণ বুঝে নিতে চেষ্টা করি। কারণ এই যে, মৃত্যু সব চেয়ে বড় মূর্চ্ছা। মৃত্যু সবচেয়ে বড় বেহুঁশ অবস্থা। এই বেহুঁশ হওয়ার মুহূর্তে যাতে আমাদের চেতনার দীপ নিভে না যায়, আমরা মূর্চ্ছিত না হই, আমরা জেগে থাকতে পারি, তার জন্য এই প্রস্তুতি। মৃত্যুর ক্ষণে যে জাগ্রত থাকে সে চিরকাল জেগে থাকে। যে মৃত্যুর মুহূর্তে জেগে থাকতে পারে সে চিরকালের জন্য অপ্রমত্ত স্থিতি লাভ করে, সর্বকালে জাগ্রত থাকে। এই রকম জাগৃতির ক্ষণের জন্য আমাদের সমস্ত প্রস্তুতি চলতে থাকে।

অপারেশনের সময় রোগীকে বেহুঁশ করবার জন্য তাকে ক্লোরোফর্ম শুঁকিয়ে দেওয়া হয়। আজকাল অন্য রকম উপায় অবলম্বন করা হয়। রোগীকে বিদ্যুৎ প্রয়োগ করে মূর্চ্ছিত করা হয় এই জন্য যে, ঐ অপারেশনের ভয়ঙ্কর যন্ত্রণা তার সহ্য হবে না। এতে যন্ত্রণার অনুভূতি হয় না। বিদ্যুৎ প্রয়োগের ফলে তার চেতনা লোপ পেয়ে যায়, সে শান্ত হয়ে যায়, আর খুব বড় অপারেশনও অত্যন্ত সহজভাবে সম্পন্ন হয়।

অপারেশনের জন্য মূর্চ্ছার অবস্থা আনতে হয় যাতে তার অপারেশনের জন্য কষ্টের অনুভূতি না হয়। সম্ভবত প্রকৃতি মেনে নিয়েছে যে, মৃত্যু মস্ত বড় অপারেশন, আর মূর্চ্ছা না হলে মানুষ কি করে যন্ত্রণা সহ্য করবে। এই কারণে মৃত্যুর পূর্বে কেউ দু ঘণ্টা, কেউ বা চার ঘণ্টা আগে,

কেউ বা দুদিন কিংবা চার দিন আগে বেহুঁশ হয়ে যায়, কেননা সমস্ত শরীরের ওপরে অপারেশন হচ্ছে, মৃত্যু আসছে। কেবল যে লোক জাগৃতির সাধনা করে সিদ্ধ হয়েছে সে-ই বেহুঁশ হয় না।

অপারেশনের আগে সবাইকে বেহুঁশ করা হয়। কেবল যে জাগৃতির সাধনায় সিদ্ধ হয়েছে তার কোন মূর্চ্ছাকারী ওষুধের প্রয়োজন হয় না, ইনজেকশনের প্রয়োজন হয় না বা বিদ্যুৎ প্রয়োগের কোন প্রয়োজন হয় না।

আমরা এ রকম দেখেছি। এক মস্ত বড় শ্রাবক ছিলেন। তাঁর নাম ছিল চাঁদমলজী বৈদ। তিনি রাজল দেশের অধিবাসী ছিলেন। তিনি অত্যন্ত আধ্যাত্মিক জ্ঞানসম্পন্ন লোক ছিলেন। তাঁর শরীরের কোন গুহ্য স্থানে অপারেশনের প্রয়োজন হয়েছিল। তিনি ধ্যানমুদ্রায় অবস্থিত হয়ে ডাক্তারকে বললেন, 'আপনার যা করার আছে তা করুন। যতটা করবার প্রয়োজন ততটাই করুন। আমি বসে আছি।' ডাক্তার বললেন, 'তা কেমন করে সম্ভব হবে? এত বড় অপারেশন। অচেতন না করে, মূর্চ্ছিত না করে এ কেমন করে হবে? আপনি এই কষ্ট কি করে সহ্য করবেন?' তিনি বললেন, 'আমি ধ্যানে বসে আছি। আপনি চিন্তা করবেন না। আপনার যা করার তাই করুন।' তাই করা হল। তিনি ধ্যানে বসে থাকলেন আর অপারেশন করা হয়ে গেল।

আমি স্বয়ং দেখেছি। যোধপুরে শ্রীকালুগণীর চাতুর্মাস ছিল। মুনি কুন্দনমলজীর অর্শের অপারেশন হওয়ার কথা ছিল। তিনি শুয়ে পড়লেন। তাঁর বড় ভাই মুনি চৌথমলজী আর মুনি মোহনলালজী অর্শ কাটতে শুরু করলেন। মুনি কুন্দনমলজী বললেন, 'সাধু ভাইসব, দেখো, পুরো লক্ষ্য রাখবে। কাজ অর্ধসমাপ্ত না থেকে যায়। যতটা কাটা দরকার সবটাই কেটে দেবে।' এও এক স্থিতি। মূর্চ্ছিত না হয়ে, জাগ্রত থেকে এই কষ্টের ধাক্কা সহ্য করা তখনি সম্ভব হয় যখন ভেতরে কিছু জেগে যায়।

কাশীর নরেশ সম্বন্ধে একটি গল্প বলছি। তাঁর অপারেশন হচ্ছিল।

ডাক্তারবা তাঁকে বেহুঁশ করার জন্যে ওষুধ শোঁকাতে চাইলেন। নরেশ নিষেধ করলেন। তিনি বললেন, 'আমার গীতা এনে দিন। আমি গীতা পড়তে থাকব আর আপনি আপনার কাজ করতে থাকবেন।' তিনি গীতা পড়তে আরম্ভ করলেন এবং এমন এক জগতে চলে গেলেন যেখানে তাঁর শরীরে কি ঘটছে তা তাঁর খেয়াল রইল না। আমরা অন্তরে এই রকম জ্যোতি জ্বেলে দিলে সেই আলো জ্বলার পরে শরীরে কি ঘটছে তা কিছুই জানতে পারি না। যা ঘটার তা ঘটে। এই জাগৃতির ক্ষণ আমাদের জীবনে এসে গেলে আমরা আর মূর্চ্ছিত হই না। মৃত্যুবিজয়ের এ এক বড় সাধনা। যে লোক মৃত্যুর মুহূর্তে মূর্চ্ছিত হয় না, যে জেগে জেগে মৃত্যুকে বরণ করে, সে সত্যিসত্যিই কিছু পেয়ে যায়।

আমাদের সঙ্ঘের একটি ঘটনার কথা বলছি। এক মুনি ছিলেন। তিনি একজন মস্ত বড় তপস্বী ছিলেন। তিনি ছাব্বিশ বছর ধরে তপস্যা করেছিলেন। প্রতি বছর তিনি মাসখমন করতেন। তিনি তেরাপন্থের চতুর্থ গণী শ্রীমজ্জয়াচার্যের বড় ভাই মুনি ভীমরাজের সঙ্গে থাকতেন। ভীমরাজজীর দেহাবসান হল। দাহসংস্কারের জন্য লোকে তাঁর দেহ নিয়ে যাওয়ার জন্য এল। তপস্বী মুনি অন্যান্য মুনিদের ডেকে বললেন, 'দেখ, আমি এত দিন যাঁর সাথে রইলাম তিনি আজ চলে গেলেন। তিনি যখন চলে গেলেন তখন আমার আর এখানে থাকার কি প্রয়োজন? সাধুগণ, তোমরা এই সব পুথিপত্র রক্ষা করবে। আমি চলে যাচ্ছি।' এই কথা বলে তিনি স্বর্গে গেলেন। তিনি মৃত্যুকে বরণ করে নিলেন। লোকে আগের দাহসংস্কার করে ফিরতে না ফিরতে আর এক মুনি চলে গেলেন। একে বলে ইচ্ছামৃত্যু, সঙ্কল্পমৃত্যু। যে সব লোক জাগ্রত অবস্থায় মারা যান তাঁদের এই রকম মরণ হয়, তাঁরা সম্পূর্ণ জাগরূক অবস্থায় মারা যান।

এক মস্ত বড় সাধক ছিলেন। তিনি বলেছেন, 'লোকে বেহুঁশ হয়ে মরে। আমি বেহুঁশ হয়ে মরব না। আমি চলতে চলতে মরব।' এক দিন তিনি দেখলেন মরণ আগতপ্রায়। সেই ক্ষণ যখন নিকটে এল

তখন তিনি ঘুমোতে আরম্ভ করলেন। নিদ্রিত অবস্থায় তিনি মরলেন। অনেক লোক বেহুঁশ অবস্থায় মারা যায়, কেউ ঘুমোতে ঘুমোতে মারা যায়। বসে বসে, দাঁড়িয়ে, চলতে চলতে অর্থাৎ জাগ্রত অবস্থায় মারা যায় এমন লোকের সংখ্যা কম। আচার্য ভিক্ষুর পদ্মাসনাবস্থায় মরণ হয়েছিল। তিনি সম্পূর্ণ জাগ্রত ছিলেন। প্রমাদগ্রস্ত অবস্থায় মরেন নি। তিনি 'সুত্তেষু যাবি পডিবুদ্ধজীবী' অর্থাৎ সুপ্ত লোকদের মধ্যে জাগ্রত অবস্থায় ছিলেন। সুপ্ত অবস্থাতেও জাগ্রত লোক ছিলেন। যে লোক জাগৃতি ও সুষুপ্তির বিন্দু ধরতে পারে সেই শুধু মরার সময়ে জাগ্রত থাকতে পারে।

আমাদের সাধনার অভ্যাস চলছে। এই সাধনার অভ্যাসকালে আমরা দেখার এবং জাগ্রত থাকার সঙ্কল্প করেছি। আমরা দেখি আর জেগে থাকি। দেখার এবং জেগে থাকার সঙ্কল্প করি। এই দেখার এবং জাগার সঙ্কল্প একদিন সেই জ্যোতিকে জাগিয়ে দেবে যাকে কোন ব্যাধি বা মরণের আগমন নিভিয়ে দিতে পারে না। তারা কখনও বেহুঁশ হবে না, প্রচণ্ড হবে না, তাদের জাগৃতি কখনও খণ্ডিত হবে না। কিন্তু আপনি সতর্ক থাকবেন, আপনার অন্তরে জ্যোতি জ্বলে ওঠার আগে আপনি ঘুমিয়ে না পড়েন। এ একটি সমস্যা। এই সমস্যা সম্বন্ধে যদি আমরা জাগরূক তা থাকি তবে ঐ স্থিতি আমরা লাভ করতে পারব না। এর জন্য খুব দৌড়ঝাঁপ করার দরকার নেই, এলোমেলো ভাবে ঘুরে বেড়ানোর দরকার নেই। কারও কাছে যাওয়ার কোন প্রয়োজন নেই। এ নিজেকেই করতে হবে। আমার নিজেরই আত্মাকে দেখতে হবে। সত্যকে আমার নিজেরই সন্ধান করতে হবে। এই হল পথ।

যে নিজেকে আত্মার কথা বলে সে আপনাকে আত্মা দেখাতে পারে না। আপনি নিজে চেষ্টা করলে আত্মার দেখা পেতে পারেন। আপনি দুনিয়ার কোন কোণে চলে যান, কেউ আপনাকে সত্য দান করতে পারবে না। সত্যের সন্ধান আপনার নিজেকেই করতে হবে। অন্য

লোক আপনাকে কোন সঙ্কেত বলে দিতে পাবে, ইশাবা কবতে পাবে। রাস্তা দেখিযে দিতে পাবে, কিন্তু তাবপবেব প্রচেষ্টা আপনাকেই কবতে হবে, আপনাকেই পথ চলতে হবে। সমস্তই আপনাব চেষ্টার ওপবে নির্ভব কবে, আপনাব নিষ্ঠাব ওপবে নির্ভব কবে, আপনাব একাগ্রতা এবং তন্ময়তাব ওপবে নির্ভব কবে। আপনি মূর্চ্ছা ভাঙ্গতে কতখানি সমর্থ হযেছেন, জাগৃতিব আলো কতখানি প্রজ্জ্বলিত কবতে পেবেছেন, আলোকে সেই বিন্দুব ওপবে কতটা নিযে যেতে পেবেছেন, যেখানে সে আলো নিবন্তব জ্বলে, কখনও নেভে না—এই সমস্ত কিছুব ওপবে নির্ভব কবে। পবিস্থিতিতেই সেই কথা সার্থক হবে—'ভাকণ্ড পক্ষী উহ্ চবপ্পমত্তো' অর্থাৎ ভাকণ্ড পাখিব মত সদা জাগৃত থাক। যদি আত্মাকে বক্ষা কবতে চান, নিজেকে বাঁচাতে চান তো জাগ্রত থাকুন।

ভগবান মহাবীবেব বাণীব সন্দর্ভ থেকে যে সত্য বুঝতে পেবেছি, অনুশীলন কবেছি, অভ্যাস কবেছি সেই সত্য মনে বাখতে হবে। আব এই অভ্যাসেব ধাবাকে সর্বদা প্রবহমান বাখতে হবে। আমাব বিশ্বাস, আমবা একদিন সেই জ্যোতিকে প্রজ্জ্বলিত কবতে পাবব যে জ্যোতিকে বোগেব ধাক্কা নেভাতে পাববে না, মৃত্যুব ভযঙ্কর ঝঞ্ঝা নেভাতে পাববে না।

১০

অনুপ্রেক্ষা

আমরা এতক্ষণ প্রেক্ষা ধ্যানের প্রয়োগ সম্বন্ধে আলোচনা করছিলাম। এই প্রেক্ষাধ্যানের পদ্ধতিতে আমরা তিনটি তত্ত্বকে অবলম্বন করে থাকি। সে তিনটি তত্ত্ব—শ্বাস, ধ্বনি ও শরীর। আমাদের শ্বাস সহজ এবং স্বাভাবিক, ধ্বনি স্বকৃত এবং কাল্পনিক, আর শরীর সহজ এবং স্বাভাবিক। আমরা স্বাভাবিককে অবলম্বন করি না, স্বকৃত এবং কল্পনাকে অবলম্বন করে থাকি। আমি মনে করি তার প্রয়োজন আছে, তাকে আমি অনাবশ্যক বলতে পারি না। আমরা মাঝে মাঝে এই তিন অবলম্বনের আলোচনা করে থাকি, আর আমরা যা করে থাকি তা বোঝার জন্য চেষ্টা করি। আজ আমরা ধ্বনির বিষয়ে আলোচনা করব। এই আলোচনা আমি ছোট একটি গল্প দিয়ে আরম্ভ করতে চাই।

কোন লোক পুকুরের ধারে বেড়াতে যেত। ওটা ছিল তার প্রতিদিনের নিত্যকর্ম। পুকুরের জলে তার প্রতিবিম্ব পড়ত। পুকুরে অনেক মাছ ছিল। একটি মাছ পুকুরের জলে মানুষটির প্রতিবিম্ব দেখত। সে দেখত—মাথা নিচে, পা ওপরে। একদিন দেখল, দু দিন দেখল, দশ দিন দেখল। তার ধারণা দৃঢ় হল। সে জানল যার

মাথা নিচে, পা ওপরে, সে মানুষ। একদিন লোকটি পুকুরের কিনারায় বেড়াচ্ছিল। মাছটি সেই সময়ে জলের ওপরে ভেসে উঠল। তখন সে দেখল লোকটার সব উল্টো, তার মাথা ওপরে আর পা নিচে। মাছটি ভাবল—সম্ভবত লোকটি শীর্ষাসন করেছে। তা না হলে মানুষ ও রকম হতে পারে না। যার মাথা নিচে, পা ওপরে সেই মানুষ। আজ আমি দেখছি এর মাথা ওপরে, পা নিচে। এ নিশ্চয়ই উল্টো বা বিপরীত ক্রিয়া করছে, শীর্ষাসন করছে। তার ধারণা দৃঢ় হয়ে গিয়েছিল।

ঐ মাছটিরই কেবল ঐ অবস্থা হয়েছিল তাই নয়। আমাদের সকলেরই ঐ অবস্থা। মাথা ওপরে, কিন্তু আমরা দেখি মাথা নিচে। পা নিচে, কিন্তু আমরা দেখি পা ওপরে। আমরা ধারণা করে থাকি যার পা ওপরে মাথা নিচে সে-ই মানুষ, আর যার মাথা ওপরে পা নিচে সে মানুষ নয়। এ আমাদের কল্পনার রচনা। এ রকম কত ধারণা আমরা উদ্ভাবন করি তা আমি বলতে পারব না। ঐ সবই মিথ্যা ধারণা। মিথ্যা ধারণা বিলোপ করার জন্য প্রেক্ষাধ্যান পদ্ধতিতে অনুপ্রেক্ষার অভ্যাস করা হয়। দুটি কথা আছে—প্রেক্ষা এবং অনুপ্রেক্ষা। আমি অনেক দিন থেকে ভাবছি, প্রেক্ষা কথাটির আগে 'অনু' কেন প্রয়োগ করা হয়েছে? এই বিষয়ে চিন্তা করতে করতে আমি একটা কথা বুঝতে পেরেছি—যা সত্য, তাকে দেখাই অনুপ্রেক্ষা। সত্যকে দেখ। নিজের ধারণার বশবর্তী হয়ে তাকে দেখ না। মাছের ধারণা হয়েছিল যার মাথা নিচে পা ওপরে সে-ই মানুষ। এই ধারণা অনুসারে সে মানুষকে দেখত। এই রকম স্বীয় ধারণা অনুযায়ী বস্তুকে দেখা অনুপ্রেক্ষা নয়। নিজের ধারণার বশবর্তী হয়ে কিছু দেখ না। সংস্কারের দৃষ্টিতে দেখ না। কাল্পনিক বুদ্ধিতে দেখ না। কেবল সত্যের দৃষ্টিতে সব কিছু দেখ। বাস্তবকে দেখ, যথার্থকে দেখ। যা সত্য, যে ঘটনা বাস্তবে ঘটছে তাকে দেখ। অনুপ্রেক্ষার অর্থ—সত্যের প্রতি অনুপ্রেক্ষা। অর্থাৎ সত্যের প্রতি, যথার্থের প্রতি অনুপ্রেক্ষা, বাস্তবের প্রতি অনুপ্রেক্ষা। ধার করা ধারণার অনুবর্তী হয়ে কোনও কাজ করো না,

যা ঘটনা, যা বাস্তব, বা সত্য, তাকে দেখ। এই রকম অনুপ্রেক্ষার তাৎপর্য, আমরা আমাদের মনগড়া ধারণাকে মন থেকে বহিষ্কৃত করে দিই। আপনি পূর্বের ধারণা ত্যাগ করুন এবং যা সত্য ও যথার্থ তাকে দেখুন। প্রেক্ষা ধ্যান পদ্ধতিতে এই অনুপ্রেক্ষার অভ্যাস করা যায়। অনুপ্রেক্ষা অভ্যাস করার কারণ, তদ্বারা আমরা সংস্কারকে, ধারণাকে ভঙ্গ করে যা বাস্তব সত্য তাকে দেখতে শিখি। এটা সবচেয়ে কঠিন সত্য। সবচেয়ে দুঃখের বিষয় যে, মানুষ সত্যকে দেখে না। সে সবার আগে স্বকীয় ধারণার চশমা মনের চোখে লাগিয়ে নেয়, তার পরে দেখা শুরু করে। যা দেখে তা যদি স্বীয় ধারণার অনুযায়ী হয় নি তবে তাকে দুমড়ে মুচড়ে নিজের মনের মত করে নেয়।

অনুপ্রেক্ষার সিদ্ধান্ত যথার্থভাবে সত্যকে দর্শন করার সিদ্ধান্ত। সত্যের কাছে নিজেকে সম্পূর্ণভাবে সমর্পণ কর। নিজের কোন ধারণাতে কোনও গুরুত্ব আরোপ করো না। যা সত্য তাকে গ্রহণ কর, স্বীকার কর। তার নাম অনুপ্রেক্ষা।

সমস্ত সংসার প্রকম্পনের সংসার, অর্থাৎ অত্যন্ত চাঞ্চল্যপূর্ণ। এটাই পরম সত্য। কেবল কম্পন, কেবল চঞ্চলতা, কেবল অস্থিরতা। প্রকৃতিতে এত আন্দোলন, এত চঞ্চলতা যে, তার কথা ভাবলে বিস্ময়ে চমকিত হতে হয়। এতই প্রচণ্ড আন্দোলন যে যদি তা দেখতে থাকি, শুনতে থাকি তা হলে আমার শারীরিক অস্তিত্ব সম্পূর্ণভাবে ব্যথিত হবে। আমাদের পক্ষে এটা মঙ্গল যে আমাদের কানের পর্দা এ ভাবে তৈরি যে সে সব প্রকম্পনের শব্দ গ্রহণ করতে পারে না। যদি মানুষ তাবৎ প্রকম্পন গ্রহণ করতে পারে তবে এক দিনেই সে খতম হয়ে যাবে। সে বেঁচে থাকতেই পারবে না। এই সংসারে এত ভয়ঙ্কর শব্দ হচ্ছে, এত ভীষণ ধ্বনি হচ্ছে যে তা শোনার ক্ষমতা আমাদের নেই। আমরা ঐ শব্দ শুনতে বা সহ্য করতে পারব না। আমরা অনেক কষ্টে কিছু ডেসিমেল পর্যন্ত শব্দ গ্রহণ করতে পারি, শুনতে পারি। এই দুনিয়ায় অনেক অনেক ধ্বনি হচ্ছে। আমরা ঐ সমুদয় ধ্বনি সহ্য

করতে অসমর্থ। আমরা যখন চিন্তা করি তখন এক প্রকম্পনের ধারা প্রবাহিত করি। আমরা কথা বললে এক প্রকম্পনের তরঙ্গ সঞ্চারিত হয়। আমরা চললে প্রকম্পন সৃষ্ট হয়। আজ যারা জীবলোকে বর্তমান আজ তারাই যে শুধু প্রকম্পনের বিস্তার করেছে তাই নয়। এই দুনিয়ায় যত লোক ছিল, হাজার হাজার বছর আগে যারা জীবিত ছিল, তারা এই দুনিয়ার ওপরে এমন এক বিশাল প্রকম্পনের জাল বিছিয়ে রেখেছে, আমাদের গুরুত্বাকর্ষণমণ্ডলের উপরিভাগে সেই প্রাচীন লোকেরা এমন বিপুল প্রকম্পনের জাল বিস্তার করে রেখেছে যে, আজ তার কোনও লেখাজোখা করা যায় না। তার হিসাব করাও কঠিন। কিন্তু আজকালকার বিজ্ঞানে লেখাজোখা করতে পারে না এমন কোন জিনিসই নেই। বিজ্ঞান সব গূঢ় রহস্য উদ্ঘাটনের চেষ্টায় নিযুক্ত আছে।

আজকাল কোন কোন বৈজ্ঞানিক ঐ প্রকম্পনের পরিমাণ নিরূপণের জন্য অনবরত চেষ্টা করে যাচ্ছেন। তাঁরা জানেন যে পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণমণ্ডলের উপরিভাগে হাজার হাজার বছর আগেকার লোকের চিন্তাসমূহের প্রকম্পন জমা হয়ে আছে, তারা যা বলেছিল তার প্রকম্পনও পুঞ্জীভূত হয়ে আছে। ঐ বৈজ্ঞানিকরা এমন এক উপায় অন্বেষণ করছেন, এমন যন্ত্র নির্মাণ করার চেষ্টা করছেন যার মাধ্যমে ঐ সমুদয় প্রকম্পনের পরিমাপ করতে সক্ষম হতে পারেন, প্রাচীন কালের সমস্ত চিন্তা ও বিচার বুঝতে পারেন, পড়তে পারেন। এই এই যন্ত্রের মাধ্যমে তাঁরা জানতে চান যে আজ মহাবীর, বুদ্ধ, যীশুখ্রস্টের যে সব বাণী জগতে প্রচলিত আছে সেগুলি যথার্থ কিনা, তাঁদের বাণী লোকে যে রকম উপলব্ধি করেছে সেটাই শুদ্ধ সত্য কিনা। তাঁরা জানতে চান মহাবীর, বুদ্ধ এবং খৃস্টের যে বাণী সাধুরা প্রচার করেছেন তাঁরা কি সেই সব কথাই বলেছিলেন। এই দীর্ঘ কালের মধ্যে তাঁদের ভক্তরা তাঁদের বাণীতে কোন কোন্ কথা জুড়ে দিয়েছেন, কোন্ কোন্ কথাই বা ছেড়ে দিয়েছেন, বৈজ্ঞানিকরা এই উপায়ে সে সমস্ত জানতে সমর্থ হতে পারেন। তাঁরা পরীক্ষা করে, যাচাই করে

ভালভাবে দেখতে চান কোন্ কথাই বা আসল বা মূল, আব কোন্ কথাই বা মিশ্রিত বা প্রক্ষিপ্ত। এই চেষ্টা চলছে। এ শুধু কল্পনাব ফানুস আকাশে ওডানো নয। এসব যথার্থ তথ্য। আজ বিজ্ঞান এতদূব এগিযে গিযেছে যে তাদেব পক্ষে কিছুই কল্পনাবিলাস মাত্র নয। বিজ্ঞান আজ আমাদেব কল্পনাকে সাকাব কবতে চলেছে। তাব কাছে সূক্ষ্মতম উপকবণ, সাধনেব যন্ত্র আছে।

আমি শুধু প্রকম্পন সৃষ্টি কবি তাই নয। সাবা দুনিযাব বাযু-মণ্ডলকে শুধু আমি প্রকম্পিত কবি না। অনাদি কাল থেকে বাযুমণ্ডল আন্দোলিত হচ্ছে, প্রকম্পিত হচ্ছে। আমাব দ্বাবা সৃষ্ট প্রকম্পন তাব সঙ্গে মিশে যাচ্ছে, বাযুমণ্ডলে জমা হচ্ছে।

এ অনেক পুবনো কথা। আমি 'বিশেষাবশ্যক ভাষ্য' নামে এক প্রাচীন গ্রন্থ পডেছিলাম। ঐ পুস্তকে এক জাযগায পডেছিলাম যে, আমবা যে নিঃশ্বাস ত্যাগ কবি তা সর্বত্র ছডিযে পডে। পাশে পুকুব থাকলে ঐ নিঃশ্বাস-বাযু পুকুবেব জলে ছডিযে পডে আব জলচব জীবদেব পীডা দেয, তাদেব ব্যাকুল কবে। যখন আমবা কাপড ছিঁডি তখন সূক্ষ্ম বোম হাওযায সব জাযগায ছডিযে পডে এবং চাবদিকে জীবকে আঘাত কবে। এ বকম লেখা আছে যে, সজীব বনস্পতিব ওপবে অনিমেষ ধ্যান কবা উচিত নয, কাবণ অনিমেষ ধ্যানেব সাথে সাথে আমাদেব দেহ থেকে যে চুম্বকীয বিদ্যুৎ নিঃসৃত হয তা সজীব চাবা গাছেব জীবনকে ক্লেশ দেয, তাব শবীবে পীডা সৃষ্টি কবে। এই কাবণে সেই পুস্তকে সজীব বস্তুব ওপবে ধ্যান কবতে নিষেধ কবা হযেছে। নিষ্প্রাণ বস্তুব ওপবে ধ্যান কবা উচিত। জৈন আগম গ্রন্থে বলা হযেছে মুনিদেব শুধু মাটিব ওপবে বসা উচিত নয, কাবণ শবীরেব গবমে মাটিতে জীবনেব পীডা হয। সেইজন্য সাধুদেব কখনও অনাচ্ছাদিত মত্তিকায উপবেশন কবা উচিত নয। কত সূক্ষ্ম নীতিবোধ বা বিবেচনাব কথা। কাপড ছেঁডাব সমযে যে সূক্ষ্ম বোম হাওযাতে উডে যায তাতে প্রাণীবা আঘাত পেতে পাবে, এই কথাব অর্থ বুঝতে পাবে এমন

লোক তখন ছিল না। কিন্তু যখন দেখি বিজ্ঞানের উপলব্ধি, গবেষণা ও অন্বেষণমূলক প্রবন্ধে এ কথা বোঝানোর চেষ্টা হয়েছে তখন আমাদের মনে হয় যে, আমাদের আচার্যগণ যা লিখেছেন তাঁরা নিঃসন্দেহে অতীন্দ্রিয় জ্ঞানের ক্ষমতায় লিখেছেন। তাঁরা দেখেছিলেন, তাঁরা প্রত্যক্ষ করেছিলেন, তাঁরা অনুভব করেছিলেন, এবং তাঁদের দৃষ্ট ও অনুভূত তথ্য নিজেদের আচারের মধ্যে গ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু সাধারণ মানুষের কাছে ঐ তত্ত্ব কঠিন এবং দুর্বোধ্য থেকে গিয়েছে। বাড়ির তেতলায় দাঁড়িয়ে এক ব্যক্তি নিচে দাঁড়ানো একজনকে বলল, 'ওহে, বাস আসছে, গাড়ি আসছে, অমুক লোক আসছে।' নিচের লোকটি বলল, 'তুমি মিথ্যা কথা বলছ। কোথায় বাস? কোথায় গাড়ি? অমুক লোকই বা কোথায়? কোন কিছুই তো দেখা যাচ্ছে না। তুমি মিথ্যা কথা বলছ।' ওপরের লোক যা বলেছে তাও যথার্থ, আবার নিচের লোকটি যা বলেছে তাও ঠিক। এ-ও মিথ্যা কথা বলছে না, অপরজনও মিথ্যা কথা বলছে না। উভয়ের দর্শনের মধ্যে যে ভিন্নতা তা হল, শুধু পৃষ্ঠভূমির প্রভেদবশত। তেতলায় দণ্ডায়মান লোকের দৃষ্টি বহু দূর পর্যন্ত যায়, তার ফলে সে বাস দেখেছে, গাড়ি দেখেছে এবং লোককে আসতে দেখেছে। নিচে মাটির ওপরে দণ্ডায়মান লোকের দৃষ্টি দূরে যায় না, তার ফলে সে বাসও দেখতে পায় না, গাড়িও দেখতে পায় না, মানুষও দেখতে পায় না। দুজনের জানাই ঠিক। কেবল দুজনের দেখার মধ্যে পৃষ্ঠভূমির ভেদ। যে বলছে, 'আমি দেখেছি', সে-ও সত্য কথা বলছে। আবার যে বলছে, 'আমি কিছুই দেখি নি', সে-ও সত্য কথা বলছে। দুজনের একজনও মিথ্যা কথা বলছে না। কেবল পৃষ্ঠভূমির প্রভেদ।

আমাদের পশ্চাৎভূমির তফাৎ হয়। যাঁরা অতীন্দ্রিয় জ্ঞানের গভীরতায় প্রবেশ করে চেতনার অন্তঃস্থলে গিয়েছেন তাঁরা যে সত্য উদ্‌ঘোষিত করেছেন, যে তথ্যের অভিব্যক্তি দিয়েছেন, যে রহস্য উদ্‌ঘাটিত করেছেন, যে সত্যের আবরণ উন্মোচন করেছেন, সবই আমরা

অস্বীকার করতে পারি, বলতে পারি ঐ রকম হয় না। কেননা যে পটভূমিকায় অবস্থিত থেকে তাঁরা ঐ সমস্ত তথ্য উদ্‌ঘোষিত করেছেন, ঐ সমস্ত সত্য প্রকাশিত করেছেন সেই ভূমিতে আমি পৌঁছতে পারি না। ঐ ভূমিকা অনেক উঁচু। আমরা নিচে ধরাতলে দাঁড়িয়ে আছি। ধরাতলে দণ্ডায়মান লোক ঐ সব সত্যকে অস্বীকার করতে পারে। বস্তুত তারা অস্বীকার করেও থাকে। ঐরূপ করাতে তার কোন ত্রুটি হয়েছে এ কথা বলা যায় না। কারণ সে যে পটভূমিতে অবস্থিত, যে ধরাতলপরে যে দাঁড়িয়ে আছে, যে মাটিতে দাঁড়িয়ে সে দেখছে, তাতে তার ঐ রকম বিচার হওয়াই সম্ভব, তা থেকে ভিন্ন কিছু দর্শন হতে পারে না। তার বিচার অন্য রকম কিছু হওয়া সম্ভব নয়। যদি আমার সামনে জানলা খোলা থাকে, আর আমি জানলায় দাঁড়িয়ে থাকি তবে আমি বাইরের সমস্ত দৃশ্য দেখতে পাব, বলতে পারব, আমি পাহাড় দেখেছি, গাছ দেখেছি, মন্দিরের ধ্বজা দেখেছি, বালুর টিলা দেখেছি। আমার ও কথা যথার্থ হবে, বাস্তবিক হবে। কিন্তু যে লোক জানলা থেকে নিচে বসে আছে, সে পাহাড় দেখতে পাবে না, গাছ দেখতে পাবে না, মন্দিরের ধ্বজা বা বালুর টিলা কিছুই দেখতে পাবে না। সে বলবে, ওসব কিছুই নেই। কোন কিছুই সে স্বীকার করবে না। তার এই অস্বীকৃতিতে তার কোন দোষ নেই।

আমরা যদি এই ভূমিকাভেদ বুঝে চলি তবে এ কথা আমাদের বোধগম্য হবে যে, সূক্ষ্ম জগৎ এবং স্থূল জগতের যে ভিন্ন ভিন্ন স্বীকৃতি এবং ধারণা তা অকারণ নয়। তার পেছনে কারণের দীর্ঘ শৃঙ্খল আছে। আমরা সেই কারণ উপলব্ধি করে অনুপ্রেক্ষার কাছে যেন নিজেকে সমর্পণ করে দিই। আমরা প্রেক্ষা ধ্যান প্রয়োগ দ্বারা, অভ্যাস দ্বারা এমন এক সংস্কার তৈরি করে নেব যে আমরা সত্যের কাছে আত্মসমর্পণ করতে পারব। ধারণার মধ্যে আমরা যাব না। তাকে হস্তক্ষেপ করতে দেব না। যে জিনিস যেমন, যে ঘটনা যেমনভাবে ঘটছে, যে জিনিস যেমন রূপে আমাদের সামনে আসছে, তাকে যদি তেমনি রূপে আমরা

স্বীকার করে নিই, তবে আমাদের সাধনামার্গ প্রশস্ত হবে, স্পষ্ট হবে। সাধনাতে বড় বাধা আসে অসত্য থেকে, মিথ্যা ধারণা থেকে, মিথ্যা কল্পনা থেকে। ঐ সবকে একেবারে ভেঙ্গে ফেলতে হবে। সব পুরনো ধারণাকে ভেদ করার জন্য নতুন ধারণা তৈরি করতে হবে, পুরনো সংস্কারকে দূর করার জন্য নূতন সংস্কার তৈরি করতে হবে। পুরনো কল্পনাকে দূরীভূত করার জন্য নতুন কল্পনা নির্মাণ করতে হবে। প্রশ্ন হচ্ছে, পুরনো সব কিছু ভেঙ্গে ফেললে তাদের জায়গায় নতুন সব কিছু নির্মাণ করা কেন। এ প্রশ্ন খুবই স্বাভাবিক। আমরা যেন এই কথা মেনে চলি যে আমাদের অন্তত সব পুরনো ধারণা, সংস্কার ও কল্পনা বর্জন করতে হবে। কিন্তু ভেঙ্গে ফেলার প্রক্রিয়া এত সহজ এবং সরল নয়। এর চারধারে এক বিশাল ব্যূহ ঘিরে আছে, তার সাথে আমাদের মোকাবিলা করতে হবে। এক সংস্কার ভাঙ্গার জন্য অন্য আর একটি নতুন সংস্কার রচনা করতে হবে। ক্রোধের সংস্কার ভাঙ্গতে হলে ক্ষমার সংস্কার গড়তে হবে। লোভের সংস্কার ত্যাগ করতে হলে সন্তোষের সংস্কার নির্মাণ করতে হবে। একটি সংস্কার ভাঙ্গতে হলে অন্য আর একটি সংস্কারে গড়া প্রয়োজন।

যাতে আমরা এক সংস্কার বর্জন করে অন্য আর একটি সংস্কার গড়তে পারি তার জন্য অনুপ্রেক্ষায় ধ্বনির প্রয়োগ করা হয়। এই পরিস্থিতিতে আমাদের ধ্বনির মহত্ত্ব নির্ণয় করা প্রয়োজন। ধ্বনি প্রকম্পন বটে। যেই আমরা কথা বলতে থাকি অমনি ধ্বনির তরঙ্গ উৎপন্ন হতে থাকে। ঐ তরঙ্গ বায়ুমণ্ডলে ছড়িয়ে পড়ে। উপরে ও নিচে, ডাইনে-বামে চারদিকে ধ্বনির প্রকম্পন ছড়িয়ে পড়ে। ঐ প্রকম্পন অন্য বস্তুসমূহকে আঘাত করে, তাদের প্রভাবিত করে। আপনার প্রভাব বিস্তার করে। আমরাও ঐ ভাবে প্রভাবিত হই।

এটা সংক্রমণের জগৎ। এই দুনিয়ায় কেউ নিজেকে সংক্রমণ থেকে রক্ষা করতে পারে না। রাশিয়ায় ক্রান্তি বা বিপ্লব হয়েছিল। লোকে বলে এ লেনিনের বিপ্লব, তাঁর সাথীদের বিপ্লব। কিন্তু রাশিয়ার

বৈজ্ঞানিকরা একটি নতুন কথা বলেন। তাঁরা বলেন, এ বিপ্লব লেনিনেরও নয়, তাঁর সঙ্গীদেরও নয়। সূর্যে বিস্ফোরণ হয়েছিল এবং তারই ফলে রাশিয়ায় এই বিপ্লব ঘটেছিল। এই বিপ্লবের মূল কারণ সূর্যমণ্ডলে বিস্ফোরণ, কোনও মানুষ এর কারণ নয়। মানুষ ক্রান্তির কারণ নয়। সূর্যে যখন যখন বিস্ফোরণ ঘটে তখন মানুষের মস্তিষ্ক বিশেষভাবে প্রভাবিত হয়। যে বছর সূর্যে ভয়ঙ্কর বিস্ফোরণ হয় সে বছর সারা পৃথিবীতে ভয়ঙ্কর মহামারী, ভীষণ ঝড়ঝঞ্ঝা, ভয়ানক ভূমিকম্প হয়। জাতিসমূহের মধ্যে ভয়ঙ্কর যুদ্ধ ও সংঘর্ষ হয়। এইভাবে সূর্যের বিস্ফোরণই এই সমস্ত যুদ্ধ, তুফান, মহামারী, বিপ্লব প্রভৃতি সংঘটিত করে, মানুষ করে না। আমরা অনেক বস্তুর দ্বারা প্রভাবিত হই। যা কিছু সংঘটিত হয় আমরা তার দ্বারা প্রভাবিত হই। আমরা অন্যকে প্রভাবিত করি এবং নিজে অন্যের দ্বারা প্রভাবিত হই।

এই সংক্রমণের জগতে কেউ সংক্রমণ থেকে বাঁচতে পারে না। কোথাও এমন কোন রক্ষাকবচ নেই যার বলে মানুষ ঐ সংক্রমণ থেকে নিজেকে রক্ষা করতে পারে।

ধ্বনি এক রকম কবচের কাজই করে। যাতে আমরা অন্যের দ্বারা কম প্রভাবিত হই সেজন্য আমরা ধ্বনির কবচ তৈরি করে নিতে পারি। রোজ পশ্চিমে রাত্রির সময় আসে আর আমাদের অনিত্য অনুপ্রেক্ষার ক্রম আরম্ভ হয়ে যায়। সব লোক তখন বসে এবং সঙ্কল্প করে যে, অনিত্য অনুপ্রেক্ষা করতে হবে। সব শান্ত এবং জাগ্রত। সব শান্ত এবং সচেতন। অনিত্য অনুপ্রেক্ষা আরম্ভ হয়।

আমাদের প্রথম সূত্র—ইমং শরীরং অণিচ্চং। এই শরীর অনিত্য। এই সূত্রের ধ্বনির সঙ্গে আমরা অনিত্য অনুপ্রেক্ষা আরম্ভ করি।

আমাদের দ্বিতীয় সূত্র—ইমং শরীরং চয়াবচয়ধম্মম্। এই শরীর চয়াবচয়ধর্মা। তার চয় বা সঞ্চয় হয়, অপচয় বা ব্যয় হয়। তা পুষ্ট হয়, ক্ষীণতা প্রাপ্ত হয়।

আমাদের তৃতীয় সূত্র—ইমং শরীরং বিপরিণামধম্মম্। এই শরীর

বিপরিণামধর্মা। এতে বিবিধ পরিণাম সংঘটিত হয়ে থাকে, নানাপ্রকার দৈহিক পরিবর্তন ঘটে। কখনও শীতলতা দ্বারা পরিবর্তন ঘটে, কখনও বা উত্তাপের দ্বারা, কখনও ভোজনের দ্বারা পরিবর্তন ঘটে। কখনও বা অন্য কোনও পুদ্গলের সন্তাপে হয়। কখনও রোগ থেকে পরিবর্তন ঘটে, কখনও বা আমার নিজের ভাবনা থেকে পরিবর্তন আসে। আমরা ধ্বনির মাধ্যমে এই বিভিন্ন রকম পরিবর্তনের অনুপ্রেক্ষা করতে পারি, দেখতে পারি, প্রত্যক্ষ করতে পারি। ধ্বনির সাথে সাথে সঙ্কল্পেরও বিকাশ হওয়া আবশ্যক।

আপনারা শুনে থাকবেন হিমালয় পর্বতের বরফের ওপরে নগ্ন সাধক উপবিষ্ট থাকেন। তাঁর চারদিকে শুধু বরফ আর বরফ। তিনি উত্তাপের প্রয়োগ শুরু করেন। এক ঘণ্টা যায়, দু ঘণ্টা যায়, তারপরে সাধকের দেহ থেকে ঘাম ঝরতে শুরু করে। বরফের ভেতরে ঘাম ঝরতে থাকে। এ প্রাকৃতিক ঘটনা নয়। যদি প্রাকৃতিক ঘটনা হতো তাহলে শুধু একজনের শরীর থেকে ঘাম চোয়াতো না, সকলের শরীর থেকেই চোয়াতো। কিন্তু একজনের শরীর থেকে ঘাম ঝরতে থাকে, আর সকলেই শীতে কাঁপতে থাকে। এ প্রাকৃতিক ঘটনা নয়। এ হল ধ্বনির প্রয়োগ, সঙ্কল্পের প্রয়োগ, সাধনার প্রয়োগ। এ হল ভাবনাত্মক পরিবর্তন, প্রাকৃতিক পরিবর্তন নয়।

গরমের দিন, ভয়ঙ্কর গরম পড়েছে, লু বইছে। সাধক শীতলতার ভাবনা করেন, শীতের সঙ্কল্প করেন। তাঁর শরীরে শীতলতা ব্যাপ্ত হয়ে যায়, তিনি শীতে কাঁপতে থাকেন। তিনি কম্বল গায়ে দেন, কিন্তু তবুও কাঁপুনি থামে না। এ পরিবর্তন প্রাকৃতিক নয়, ভাবনাত্মক।

অদ্যাপি জীবিত এক ব্যক্তি প্রতি শুক্রবার কল্পনায় ক্রুশবিদ্ধ হতো। তখন তার দু হাতে ক্ষত হতো, তা থেকে রক্ত ঝরত। বুক থেকেও রক্ত ঝরতে থাকত। শুধু শুক্রবারেরই এ রকম হতো। এ পরিবর্তন ভাবনাত্মক। সে লোকটি ত্রাণকর্তা খৃস্টের সঙ্কল্প করত, তার ফলে ঐ রকম ঘটনা ঘটত।

পা কাটে, পীড়া হয়। এখন পা কাটার সময় নয়, তবু আপনি

ভাবনাত্মক প্রয়োগ করে দেখুন। পা কাটুক বা না কাটুক, পায়ে ব্যথা হবেই। যদি ভাবনার ফলে ব্যথা হতে পারে, তবে ভাবনার ফলে ব্যথা সেরেও যেতে পারে। দু রকম ঘটনাই ঘটা সম্ভব।

শরীর বিপরিণামধর্মা বা পরিবর্তনশীল। তার নানা প্রকার অবস্থান্তর ঘটে। আমাদের দেখতে হবে কি কি কারণে এবং কি কি ভাবে শরীরের অবস্থান্তর ঘটে।

আমাদের চতুর্থ সূত্র—ইমং শরীরং জরামরণধর্ম্যম্। এই শরীর জরা-মরণধর্মা বটে। দেহের জরা হয়, মরণ হয়। আমরা তাকে অনুভব করি। আমরা যদি শরীরকে এত শিথিল করে দিই যে আমাদের মনে হয় আমরা মরণকে অনুভব করছি, তাহলে ঐ রকম অনুভূতি হয়। ঐ অনুভূতি হতে আরম্ভ করবে। তা প্রাকৃতিক পরিবর্তন নয়। মরণ সত্যিই ঘটছে না। ঐ পরিবর্তন ভাবনাত্মক। যে অবস্থা বহুদিন পরে ঘটার কথা, ভাবনাত্মক পরিবর্তন দ্বারা, ভাবনার অতিশয় তীব্রতা এবং সঘনতা দ্বারা আমরা সেই অবস্থা অনুভব করতে পারি।

এই অনিত্যের অনুপ্রেক্ষা বটে। যা ঘটছে, যা সংঘটিত করা হচ্ছে, আমরা তাই দেখি। এতে ধ্বনির বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ সংযোগ আছে। এই জন্য আমি ধ্বনির আলম্বন তথা কল্পনার আলম্বন মেনে নিয়েছি। আমরা একটি সীমা পর্যন্ত ধ্বনি এবং কল্পনার আলম্বন উপেক্ষা করতে পারি না। ঐ সীমা পর্যন্ত আমাদের মেনে নিতেই হয়।

অর্হের জপে লোকে ধ্বনির সঙ্গে অর্হের ভাবনা করে থাকে, আবার সূক্ষ্ম ধ্বনির সাথে অর্হের ভাবনা করে, অধিকন্তু অর্হের মানসিক ভাবনাও করে। প্রত্যেক স্তরে আলাদা আলাদা অনুভূতি হতে থাকে।

আমি একবার বলেছিলাম এই তীব্র ধ্বনি করে দেওয়া যাক। একবার ঐ প্রয়োগ স্থগিত করে দিই। কিছু লোক বলেছিল, ঐ প্রয়োগ চলাই প্রয়োজন, কারণ এটা ভাল লাগে, এতে একাগ্রতা সাধিত হয়, আর এটা স্বাভাবিক কথা। আমরা যেন মানুষের এই স্বভাব ভুলে না যাই এবং বহুকাল-প্রচলিত স্থূল আলম্বন ত্যাগ করে সূক্ষ্ম আলম্বন

গ্রহণ না করি, কারণ সহসা পরিবর্তন করলে বেশির ভাগ লোক সেটা গ্রহণ করতে পারবে না। প্রেক্ষা ধ্যানের পদ্ধতিতে এই বাস্তবিকতার ধ্যান রাখা হয়েছে যাতে সাধক স্থূল থেকে সূক্ষ্মের দিকে যায়। যে স্থূল দেখছে সূক্ষ্ম সম্বন্ধে কথা তার বোধগম্য হবে না। অনেকে অভিযোগ করছে সহজ শ্বাস আয়ত্তে আসছে না, প্রকম্পনের নাগাল পাচ্ছে না। এটা ঠিক কথা। শুরুতে ও রকম হবে না। আমাদের সতর্ক থাকতে হবে যে, যে লোককে আমরা সাধনার প্রেরণা দিই সে যেন সাধনাকালে ক্লান্তি বা বিরক্তি বোধ না করে, বা নিরাশও না হয়। যদি তার মনে নিরাশা এসে যায় তবে সে সাধনা করতে পারবে না। যদি সে ক্লান্ত বা বিরক্ত বোধ করে তবে সাধনায় ছেদ পড়বে এবং সে আর কখনও সাধনায় প্রবেশের নামও মুখে আনবে না। এইজন্য সাধকের যাতে ক্লান্তি বা বিরক্তি না আসে, যাতে সাধনার প্রতি সে আকৃষ্ট হয়, যাতে সাধনার প্রতি তার অনুরাগ ক্রমশ বৃদ্ধি পায় সে বিষয়ে দৃষ্টি রাখা আবশ্যক। এই জন্য শুরুতে স্থূল আলম্বনের আবশ্যকতা আমি মেনে নিয়েছি, যদিও আমাদের দেখতে হবে যে স্থূলেতেই আমাদের গতি রুদ্ধ হয়ে না যায়। তাকে সূক্ষ্ম পর্যন্ত পৌঁছতে হবে। কিন্তু সাধারণ মানুষ সহসা স্থূলকে অতিক্রম করে সূক্ষ্মে পৌঁছে যাবে এ কথা আপনারা কল্পনা করতে পারেন না। আরম্ভেই সোজাসুজি সূক্ষ্মে পৌঁছে যায় এরকম লোক বিরল।

এক সাধক তার গুরুর কাছে গিয়ে বলল, 'আমি সাধনা করতে চাই। আপনি আমাকে পথ দেখান। আমি কি করব তার নির্দেশ দিন।' গুরু শুনলেন। তিরস্কারের সুরে বললেন, 'তুমি কি করবে তা জিজ্ঞাসা করতে এসেছ? কেন দেখিয়ে দিচ্ছি না? তোমার কি চোখ নেই? কেন শুনতে পাচ্ছ না? তোমার কি কান নেই?' সাধক বলল, 'আমার চোখ আছে। আমি দেখতে পাই। কান আছে। আমি শুনতে পাই।' গুরু বললেন, 'আমাকে আবার কি জিজ্ঞাসা করছ? তোমার সামনে কি দেখতে পাচ্ছ?' 'পাহাড় দেখতে পাচ্ছি।'

'কি শুনতে পাচ্ছ?' 'ঝরণার শব্দ শুনতে পাচ্ছি।' 'তাহলে চলে যাও। পাহাড় দেখ, আর নির্ঝরের ধ্বনি শোন। এই হল সাধনা।'

সাধক চলে গেল। সে পাহাড় দেখতে থাকল। ধ্বনি শুনতে থাকল। এইভাবে দেখতে দেখতে, শুনতে শুনতে সে অন্তিম বিন্দুতে পৌঁছে গেল।

মূল কথা—দেখা। ইচ্ছা করলে আমরা শরীরকে দেখতে পারি, পাহাড় দেখতে-পারি, কোন ছবি দেখতে পারি। মূল মন্ত্র হল—দেখার অভ্যাস করা। দেখ এবং জান। আর কিছুই কোরো না। কেবল দেখ। দেখার সাথে আর কিছু জুড়ে দিও না। কেবল জান। জানার সঙ্গে অন্য কিছু জুড়ে দিও না। মূল কথা—জানা আর দেখা। ইচ্ছা করলে আমরা শরীর দেখতে পারি, শ্বাস দেখতে পারি। আবার প্রাচীরও দেখতে পারি। যাই দেখি তাতে কোন প্রভেদ হবে না। কিছুই বাবে আসবে না। দেখাই একমাত্র দ্রষ্টব্য ব্যাপার।

জৈন আগমে বলা হয়েছে মুনি যেন ভূমি দেখতে দেখতে চলেন। এটা পুরোপুরি ধ্যানের প্রক্রিয়া। তাকে গমন-যোগও বলা হয়। আমরা এ কথার অর্থ বুঝতে পারছি, কিন্তু এর পেছনে একটি মহৎ সত্য গোপন আছে। কোন লোক যদি অন্য কোন প্রকার সাধনা না করে, কেবল চলার সময়ে যদি দেখতে দেখতে চলতে থাকে, তবে ধ্যানের এক মহৎ সাধনা হয়ে যায়। ঐ সাধনা তাকে অনেক দূর এগিয়ে নিয়ে যাবে। উত্তরাধ্যয়ন সূত্রে বলা হয়েছে সাধক পথ চলতে চলতে যেন গমনময় হয়ে যায়। তার সমস্ত শরীর-তন্ত্র তাতে চলন্ত হয়ে যেন গতিতে পরিণত হয়। যে লোক গমন-যোগ অভ্যাস করে, দেখতে দেখতে চলতে থাকে মানুষ না বলে গতি বলা উচিত। তাকে গমন বলা উচিত। কেবল গমন। সে কোন মানুষ নয়, সে শুধু গমন। এবংভূত ন্যায়ের দৃষ্টিতে, শুদ্ধ ন্যায়ের দৃষ্টিতে যদি জিজ্ঞাসা করা যায়, ঐ লোককে তুমি কি বলবে? মানুষ বলবে? না, একেবারেই না। ও মানুষ কোথায়? ও তো গতি মাত্র, শুদ্ধ গতি। আর অন্য কিছুই

নয়। তাব না থাকে ইন্দ্রিযেব প্রযোগ, না থাকে মনেব প্রযোগ। তাতে পাঁচ প্রকাব ইন্দ্রিযেব বিষযও নেই, পাঁচ প্রকাব স্বাধ্যাযও নেই। কোন কথা নেই, জিজ্ঞাসা নেই, প্রশ্ন নেই, পুনবাবৃত্তি নেই। কোন অনুপ্রেক্ষাও নেই, ধর্মকথাও নেই। চোখেবও প্রযোগ নেই, কানেবও প্রযোগ নেই। দেখাও নেই, শোনাও নেই। যে ব্যক্তিব কোনও ইন্দ্রিযেব প্রযোগ নেই, মন এবং মস্তিষ্কেবও প্রযোগ নেই, ভাষাবও প্রযোগ নেই, সে তো কেবল গতি মাত্র। শেষ পর্যন্ত আব কিছুই থাকে না, থাকে শুধু গতি। ভাষা সমাপ্ত, মন সমাপ্ত, ইন্দ্রিযেব বিষয সমাপ্ত। শেষ পর্যন্ত থাকে শুধু গতি, কেবল গতি। সে লোক আব কিছুই দেখে না। কেবল ভূমি আব ভূমি দেখে। এই হল গমনযোগ।

আমি বলছি, আমবা যেন একটি মাত্র আলম্বন গ্রহণ কবি। আপনাবা যেন ধাবণা না কবেন কেবল শ্বাসই আলম্বন হতে পাবে। ঐ বকম ধাবণা কবলে অনুপ্রেক্ষা হবে না। যথার্থ বা সত্য ঘটনা সম্ভব হবে না। শ্বাসও এক আলম্বন। আপনি যদি কেবল গমনকেই আলম্বন বানিযে নেন তবে সেটা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ আলম্বন হতে পাবে। হবিভদ্র সুবী বলেছেন, 'সব্বোহবি ধম্মবাবাবো মোক্খেণ জীযণাযো জীযো'—মুক্তিদাতা, দুঃখ থেকে মুক্তিদাতা, এ সবই ধর্মেব ব্যাপার যোগ। এ অনেক গভীব তত্ত্বেব কথা। এই সব মুক্তিদাতা মহৎ সত্যেব উদ্‌ঘাটন কবেছেন। আমবা কোন কিছুকে যদি আলম্বন বানিযে নিই, শেষ পর্যন্ত তাই আমাদেব চবম আলম্বন হবে।

আমি অন্য এক আলম্বনেব কথা বলছি। কোন লোক ধ্যান কবে না, স্বাধ্যায কবে না, বা অন্য কিছু কবে না। সে যদি কেবল একটি কথা আঁকডে ধবে থাকে, 'আমি কেবল রুটিই খাব, আব কিছু কবব না', তবে আমাব মনে হয় তাব একটা ধ্যানেব ফল মিলে যাবে যে, আমবা তাব কল্পনাও কবতে পাবব না। সে চিন্তা কবে, 'আমি কেবল খাব, আব কিছুই কবব না।' কেবল খাওযাও খুব বড সাধনা হতে পাবে।

১১

রূপান্তরণের প্রক্রিয়া

এক গ্রামীণ শহরে এসে এক হোটেলে উঠল। রাত এল। তার ঘরে বাতি জ্বলছিল। শোবার সময় হল। সে ভাবল, বাতি নিভিয়ে দিই। সে বাল্‌বের কাছে গিয়ে ফুঁ দিল। আলো নিভল না। দু মিনিট পরে আরও জোরে ফুঁ দিল। তবুও দীপ নিভল না। আরও দু চার-বার ফুঁ দিল। কিন্তু আলো জ্বলতেই থাকল। হয়রাণ হয়ে আলো জ্বেলে রেখেই সে শুয়ে পড়ল। সকাল হল। হোটেলের বেয়ারা এল। গ্রামীণ তাকে বলল, 'ওহে, তোমাদের এ কি রকম দীপ? ফুঁ দিলেও নেভে না। এ দীপ অকেজো। আমায় সারা রাত আলোতে কাটাতে হয়েছে।' বেয়ারা বলল, 'মহাশয়। ও প্রদীপ নয়, বিদ্যুৎ। ফুঁ দিয়ে ও আলো নেভান যায় না।' সে সুইচের কাছে গেল, বোতাম টিপল, অমনি বিজলি বাতি নিভে গেল।

গ্রাম্য লোকটি জানত না বিজলি বাতি কিসে নেভে, বা কিসে জ্বলে। সে জানত যাই আলো তাই প্রদীপ, আর ফুঁ দিলেই তা নিভে যাবে। যতক্ষণ আমরা না জানি ততক্ষণ আমরা দীপ জ্বালাতেও পারি না, নেভাতেও পারি না। না জানলে কিছুই করা সম্ভব হয় না।

অনুরূপভাবে না জানলে আমরা কি করেই বা রূপান্তরিত হতে

পাবি? আমাদেব পবিবর্তিত বা রূপান্তবিত হবাব এ ছাড়া অন্য কোন উপায় নেই।

দ্বিতীয় কথা—জানাব পবে অভ্যাস কবা প্রযোজন। আমবা এই নিয়ম জানি যে আমবা নাসাবন্ধ্র দিযে শ্বাস নিই, আব সঙ্গে সঙ্গে আমাদের মনেব মধ্যে সঙ্কল্প চলতে থাকে, ভেতব পর্যন্ত পৌঁছয। আমবা এও জানি আমাদেব দ্বিতীয নাসাবন্ধ্র দিযে শ্বাস বেবিযে আসে, সঙ্গে সঙ্গে মনেব সঙ্কল্প চলতে থাকে, মনও সঙ্গে সঙ্গে চলতে থাকে। সাধনপদ্ধতিব পৌর্বাপর্ব আমবা জেনেছি এবং বুঝেছি। কিন্তু কার্যকালে আমাদেব মন প্রমাদে আচ্ছন্ন হয। সক্রিয়তা থাকে না। অপ্রমাদ থাকে না। জাগরূকতা থাকে না। কর্মণ্যতা থাকে না। শুধু জানলে কিছু হবে না, অভ্যাস কবতে হবে। আমবা যেমন জেনেছি পূর্ণ জাগরূকতাব সঙ্গে তা আমাদেব পুনঃপুনঃ অভ্যাস কবতে হবে। বাব বাব অভ্যাস কবলে আমাদেব কার্য সম্পন্ন হবে, আমাদেব অভ্যাস সফল হবে। সেই কাবণে ভগবান বলেছেন—'বিজ্জা চবণং পমোক্খো।' জ্ঞান ও আচবণ মিলিত হলে মানুষকে দুঃখ থেকে মুক্তি দিতে সক্ষম হয। জ্ঞান ছাড়া দুঃখ থেকে মুক্তি হয না, আব ক্রিযা ছাড়াও দুঃখ থেকে মুক্তি হতে পাবে না। যদি জ্ঞান অবশ্য প্রযোজন হয, তবে আচবণও অবশ্য প্রযোজন। আমবা অপ্রমাদেব জন্য কর্ম কবি, পূর্ণ জাগরূকতাব সাথে অভ্যাসেব পুনঃপুনঃ আবৃত্তি কবি। এই জন্য অপ্রমাদ অবশ্য প্রযোজন। আমবা যাতে বিজলি বাতিব সামনে গিযে ফুঁ না দিই সেজন্য আমাদেব জানা দবকাব। যেখানে ফুঁ দেওযাব কথা সেখানে যেন ফুঁ দিই, যেখানে বোতাম টেপাব কথা সেখানে যেন বোতাম টিপি। যে কাজ যেমন ভাবে কবাব কথা, সে কাজ তেমনি ভাবেই কবি। এ দুটি কাজ ঠিকমত হলেই আলো জ্বলবে, দবজা খুলে যাবে, জানলা খুলে যাবে। তা না হলে কোন কিছুই হবে না। আলোও জ্বলবে না, দবজাও খুলবে না, জানালাও খুলবে না।

যখন আমাদেব মনেব গভীবে আকাঙ্ক্ষা জাগে তখনই এ বকম হতে

পাবে। এ বকম গভীব আকাঙ্ক্ষা হবে যে আমাব ঐ কাজ কবা নিতান্ত আবশ্যক, ঐ বকম কবলে আমি নিজে ধন্য হব, উপকৃত হব, লাভবান হব। ওই বকম গভীব আকাঙ্ক্ষা বা অভীপ্সা উৎপন্ন হলে তাবই এ বকম হতে পাবে। গভীব আকাঙ্ক্ষা হলে আত্মাব নিবীক্ষণ হয।

আমবা প্রথম দিন থেকেই আবৃত্তি কবে যাচ্ছি, আত্মা দ্বাবা আত্মাকে দেখ। এব অর্থ—স্ব-দর্শনেব ভাবনা, নিজেকে নিজে দেখাব ভাবনা উৎপন্ন হোক। নিজে নিজেকে দেখলেই গভীব আকাঙ্ক্ষা উৎপন্ন হবে। আত্মাকে দর্শন, নিজেব অস্তিত্বকে দর্শন আব গভীব আকাঙ্ক্ষা—এগুলি যখন ঘটে তখন আমাদেব দৃষ্টিকোণেব পবিবর্তন হয। জীবন বদলে যায, তাব আগে দৃষ্টিভঙ্গি বদলে যায। দৃষ্টিব পবিবর্তন হলে জীবনেবও পবিবর্তন হয। দুনিযাতে যা আছে তাই আছে। ভাল হলে ভাল, মন্দ হলে মন্দ। যা আছে তাব আমবা কোন বকম অদলবদল কবতে পাবি না। দুনিযাতে এ সবই চলতে থাকবে। আজ পর্যন্ত তাব কেউ পবিবর্তন কবতে সমর্থ হয নি, ধ্বংস কবতে সক্ষম হয নি, নতুন কিছু নির্মাণ কবতেও সমর্থ হয নি। যা আছে তা চলছে, চলতে থাকবে। যে লোক নিজেব দৃষ্টি বদলাতে পাবে তাব জন্য দুনিযা বদলাতে পাবে। যে আপনার দৃষ্টিভঙ্গি বদলায না, দুনিযাও তাব জন্য কখনও বদলায না।

এক গুরু ছিলেন। তাঁব দুটি শিষ্য ছিল। তিনি তাদেব পবীক্ষা কবতে ইচ্ছা কবলেন। এক শিষ্যকে ডেকে জিজ্ঞাসা কবলেন, 'বল, জগৎ কেমন? তোমাব জগৎ কেমন লাগছে?' সে বলল, 'জগৎ খুবই মন্দ জাযগা। সব জাযগায অন্ধকাব আব অন্ধকাব। আপনিই দেখুন। একটি দিন হলে দুবাব বাত হয। দুই বাত্রিব মাঝখানে একটি দিন। শুরুতে বাত ছিল। শুধু আঁধাব আব আঁধাব। তাব পবে দিন এল। আলো হল, প্রকাশ হল। আবাব রাত এসে গেল, আঁধাবে সব ছেযে গেল। এক বাব আলো তো দুবাব আঁধাব। আঁধার বেশি, আলো কম। এই তো দুনিযা।'

আচার্য দ্বিতীয় শিষ্যকেও একই প্রশ্ন করলেন। সে বলল, 'গুরুদেব। জগৎ খুব ভাল জায়গা। কেবল আলো আর আলো। রাত গেল। আলোর প্রকাশ হল। সূর্যের আলো সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ল। আলোর আবির্ভাব হলে অন্ধকার চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে যায়। আলো সবার বন্ধ চোখ খুলে দেয়, যা সত্য তাকে প্রকটিত করে। যা অন্ধকারে আবৃত ছিল তাকে এক মুহূর্তে অভিব্যক্ত করে, অনাবৃত করে দেয়। যে জগতে এই রকম আলোর খেলা সে জগৎ কত সুন্দর আর লোভনীয়। আমি দেখেছি দিন এসে চলে যায়, রাত আসে, চলে যায়, আবার দিন আসে। এই ভাবে দুই দিনের মাঝখানে এক রাত। আলো বেশি, অন্ধকার কম। দু বার আলোর প্রকাশ, একবার আঁধার।'

প্রশ্ন একটি ছিল, উত্তরদাতা ছিল দু জন। তারা দু রকম উত্তর দিয়েছিল। এক জন বলেছিল, দুই রাতের মাঝখানে একটি দিন হয়। অপর জন বলেছিল, দুই দিনের মাঝখানে একটি রাত। রাত দুজনের পক্ষেই সমান ছিল, দিনও দুজনের পক্ষেই সমান ছিল। দিনেরও প্রভেদ ছিল না, রাতেরও প্রভেদ ছিল না। ছিল দৃষ্টিকোণের পার্থক্য, দৃষ্টিভঙ্গির প্রভেদ। একজন অধিক পরিমাণে আলোর খেলা দেখেছিল, সেই অনুসারে মূল্যাঙ্কন করেছিল। সে তার জালে আবদ্ধ হয়েছিল। তার মনে হয়েছিল, দুনিয়ায় অন্ধকারের চেয়ে বড় আর কিছুই নেই। সে আলোর চমক দেখতে পায় নি, তার মূল্য বুঝতে পারে নি।

এ হল সম্পূর্ণ দৃষ্টিকোণের পরিবর্তন। যদি আমরা চোখ বিশ্বের সৌন্দর্য এবং সত্যকে দেখতে আরম্ভ করি তবে সর্বত্র সত্য আমাদের দেখা দেবে, সৌন্দর্য দেখা দেবে। যদি আমাদের চোখ শুধু দুঃখ আর দুঃখ দেখতে থাকে তবে আমাদের আশেপাশে দুঃখ নাচতে থাকবে। সব কিছু দুঃখময় হয়ে যাবে।

আমরা পশ্চিম রাত্রিতেও নুপ্রেক্ষার অভ্যাস করি, অনুভব করি। শরীর অনিত্য, এই সত্য থেকেও আনন্দ অনুভব করি। শরীর চয়াপচয়-শীল। কখনও তার চয় অর্থাৎ বৃদ্ধি হয়, কখনও বা অপচয় অর্থাৎ ক্ষয়

হয়। কখনও তা পুষ্ট হয়, কখনও বা ক্ষীণ হয়। শরীর ক্ষীণ হলেও সত্যের বোধ হতে পারে। এই শরীর বিপরীতধর্মা, বিবিধ পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে তার গতি। কখনও তার ওপরে শীতের প্রভাব হয়, কখনও গ্রীষ্মের, কখনও বা ঝড় তুফানের। কখনও সে রোগ-যন্ত্রণা সহ্য করে, কখনও বা পরিস্থিতি দ্বারা পীড়িত হয়। কখনও এটা, কখনও ওটা ঘটিত হয়। এই দেহ অনেক, অনেক পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে যায়। রোগ আমাদের প্রিয় বস্তু নয়, কিন্তু রোগের সত্যতার অনুভূতি আমাদের প্রিয়। প্রকৃতপক্ষে রোগ আছে—এই সত্য আমাদেরকে সত্যের দিকে, যথার্থের দিকে নিয়ে যায়।

এই শরীরের মৃত্যু ঘটে। শরীরের বার্ধক্য হয়, মানুষ মারা যায়। মরণের অনুভব করাও অনেক বড় আনন্দ। আমরা অনিত্যের অনুপ্রেক্ষা দ্বারা জীবদ্দশায় মরণের অভিজ্ঞতা লাভ করি। আর যে লোক মরণের শিক্ষা পেয়েছে সে সমস্ত কঠিন সমস্যা উত্তীর্ণ হতে পারে। মরণ-ভয় দুনিয়ার সবচেয়ে বড় ভয়। মরণই হল অন্তিম ঘটনা।

আজ পর্যন্ত দুনিয়ার শাসককুল নানা ভাবে দণ্ডদানের উপায় উদ্ভাবন করেছেন। তাঁরা বহু বিচিত্র দণ্ডদানের কৌশলের আশ্রয় নিয়েছেন। বাঁধা, জেলে দেওয়া, হাতে হাতকড়া লাগান, পায়ে বেড়ি লাগান, মারা, পেটানো। তাঁদের হাতে চরম দণ্ড—ফাঁসি দেওয়া। এটিই অন্তিম দণ্ড।

যে লোক জীবিত অবস্থায় মরণ শিক্ষা করে, তার সঙ্গে সাক্ষাৎ করে, তাকে অনুভব করে, নিজের শরীর শিথিল করে সকল অবয়ব মৃতের অবয়বের মত করতে শিক্ষা করে—সত্যই সে লোক সকল সমস্যা, সকল প্রকার ভয়, সকল প্রকার বিঘ্নকে অবশ্যই অতিক্রম করতে পারে।

আমরা অনিত্যের অনুপ্রেক্ষা করে থাকি। ঐ অনুপ্রেক্ষাতে আমরা সত্যকে দেখি, আনন্দ নির্গলিত করি, আমাদের অন্তরের অন্তঃস্থলে যেতে প্রযত্ন করি এবং তার সাধনা করি। এ সবই দৃষ্টিকোণের পরিবর্তন। তাছাড়া যদি আমরা কাউকে বলি, মরণ অনুভব কর, তবে সে ভাববে, কি রকম মূর্খের মত কথা বলছে। বেঁচে থাকার কথা

বললে ভাল লাগতে পাবে, কিন্তু ও তো মবণেব কথা বলছে। বডই খাবাপ কথা। বাঁচাব কথা বেশ ভাল লাগে। কিন্তু মবাব কথা বড় মন্দ মনে হয। আমবা তাকে অলক্ষুণে কথা মনে কবি। অশুভ কথা বলে মনে কবি। কিন্তু সাধকবা এ বকম মনে কবেন না। তাঁবা মবাব কথা ভাল কথা মনে কবেন। এজন্য মবণকে তাঁবা নিজেদেব অভ্যাসেব অঙ্গীভূত কবে সাধনা কবেন। বস্তুত এই হল দৃষ্টিব পবিবর্তন।

দৃষ্টি বদলালে সব কিছুই বদলে যায। সাধনাব প্রথম সূত্র—দৃষ্টিব পবিবর্তন। রূপান্তবণেব প্রথম সূত্র—দৃষ্টিব পবিবর্তন। আমাদের সমস্ত রূপান্তব দৃষ্টিকোণেব পবিবর্তন দ্বাবা সাধিত হয। দৃষ্টিব পবিবর্তন হলে আভ্যন্তবীণ সমস্ত তত্ত্বেব পবিবর্তন শুরু হযে যায। রূপান্তবণেব প্রক্রিযা চলতে থাকে। তখন দুনিযাব দৃষ্টিতে অনেক উল্টো কথা আমাদেব কাছে ঠিক বলে মনে হতে শুরু কবে। দুনিযাব যে সব কথা ঠিক বলে মনে হয সেগুলি সাধকেব কাছে উল্টো লাগতে পাবে।

এক সাধক কনফুসিযসকে জিজ্ঞাসা কবেছিলেন—আমি কি কবে মনেব ওপবে সংযম প্রযোগ কবতে পাবব? কনফুসিযস মস্ত বড সাধক ছিলেন। তিনি মহান যোগী, দার্শনিক ও তত্ত্ববেত্তা ছিলেন। তিনি বলেছিলেন—আমি এ বিষযে সহজ সবল উপায, ছোট একটি সূত্র বলছি। তুমি কি কান নিযে শোন। সাধক উত্তব দিল—হ্যাঁ। কনফুসিযাস বললেন—তুমি যে কান দিযে শোন এ কথা মানতে পাবি না। তুমি মন দিযে শোন। একটা কাজ কব। আজ থেকে শুধু কান দিযে শুনতে শুরু কব। মন দিযে শোনা বন্ধ কবে দাও। তুমি জিহ্বা দিযে স্বাদ নাও এ কথা আমি মানতে পাবি না। তুমি মন দিযে স্বাদ নাও। আজ থেকে কেবল জিহ্বা দ্বাবা স্বাদ নেওযা আবম্ভ কব। মনেব দ্বাবা আস্বাদন কবা বন্ধ কব। তুমি চোখ দিযে কি দেখ, তুমি মন দিযে দেখ। আজ থেকে শুধু চোখ দিযে দেখা শুরু কব। আপনা আপনি মনেব ওপবে সংযম ক্ষমতা এসে যাবে।

কেবল কান দিযে শোনা, জিভ দিযে চাখা, চোখ দিযে দেখা—

রূপান্তরের একটি ছোট সূত্র। কিন্তু আমরা কেবল কান দিয়ে শুনি না, জিভ দিয়ে চাখি না, চোখ দিয়ে দেখি না। মন দিয়ে শুনি, চাখি, দেখি। যদি আমাকে প্রশ্ন করা হতো তবে আমি উত্তরের সঙ্গে আর একটু কথা জুড়ে দিতাম—আমরা সংস্কার দ্বারা শুনি, স্বাদ গ্রহণ করি, দেখি। আমরা পূর্ব ধারণাসমূহের বশবর্তী হয়ে এই সব করে থাকি।

মা ছেলেকে বলে—কিছু বোঝ না, তুমি নিরেট মূর্খ। ছেলে কান দিয়ে শোনে, মন দিয়ে শোনে, সংস্কার এবং ধারণা দিয়ে শোনে। কোন বিরোধী বা শত্রু ছেলেকে বলল—বুঝতে পারছ না? তুমি আকাট মূর্খ। এ কথাও সে কান দিয়ে শুনল, মন দিয়ে শুনল, সংস্কার দিয়ে শুনল, ধারণা দিয়ে শুনল। কানে দুটো আওয়াজই সমান লাগল। চাই মা বলুক, তুমি মূর্খ, চাই শত্রু বলুক, তুমি মূর্খ—দুটো কথার আওয়াজই সমান। কানের কাছে দুজনের দ্বারা ব্যবহৃত শব্দ এবং তাদের ধ্বনির কোন প্রভেদ নেই। শোনাতেও কোন প্রভেদ নেই। কিন্তু মনের দিক থেকে ধারণার এত পার্থক্য হবে যে মায়ের কথা প্রিয় লাগতে পারে, কিন্তু দুশমনের কথা আগুনের মত গায়ে জ্বালা ধরাতে পারে। বিরোধীর কথায় ছেলেটি এত কুপিত হয়ে যাবে যে তাতে কখনও কখনও বিরাট অনর্থকারী ঘটনাও ঘটে যেতে পারে।

এই প্রভেদ কেন হয়? যদি শুধু কান দিয়ে শোনা হতো তবে দুজনের কথার কোন তফাৎ হতো না, কারণ দুজনের কথার ধ্বনি এবং শব্দাবলী সমান। দুজনের কথার প্রভেদ এই জন্য হয়েছে যে শ্রোতা শুধু কান দিয়ে শোনে নি, সে সংস্কার দিয়ে, মন দিয়ে, তথা পূর্ব ধারণা দিয়ে শুনেছে।

কনফুসিয়স ঠিকই বলেছেন, কান দিয়ে শোন, মন দিয়ে শোনা বন্ধ কর। কেবল জিভ দিয়ে চাখ, মন দিয়ে চাখা বন্ধ কর। কেবল চোখ দিয়ে দেখ, মন দিয়ে দেখা বন্ধ কর। আপনা আপনি সংযম এসে যাবে।

এটি রূপান্তরণের মস্ত বড় সূত্র। সাধারণ মানুষের কাছে এ কথা

ছলনাপূর্ণ ও দুর্বোধ্য মনে হতে পারে কিন্তু সাধকের পক্ষে তা গভীর তাৎপর্যপূর্ণ। আমরা যেন ইন্দ্রিয়গুলিকে তাদের কাজ করতে দিই এবং মনকে তার আপন কাজ করতে দিই, সংস্কার এবং পূর্ব ধারণাসমূহকে আপন আপন কাজ করতে দিই। তাদের কাজের সঙ্গে আমরা যেন কিছু জুড়ে বা মিলিত করে না দিই।

কেন অসংযম হয়? কান, মন, সংস্কার এবং ধারণা এক ধারায় মিলিত হয়। তাদের এক ধারায় মিলিত হওয়ার ফলে অসংযম উৎপন্ন হয়। অসংযম কানে নয়, চোখে নয়, জিভেতে নয়। তারা যে যেমন আছে সেই ভাবেই আমাদের দেখা দেয়। তাতে কোন প্রিয়তাও নেই, অপ্রিয়তাও নেই। কোন রাগও নেই, কোন দ্বেষও নেই। যে যেমন সে ঠিক তেমনি আকৃতি এবং বর্ণ নিয়ে আমাদের চোখের সামনে আসে, আর চোখ তাকে তেমনি ভাবেই গ্রহণ করে। যদি মনে কারও ওপরে প্রিয়তা বা কারও ওপরে অপ্রিয়তার ভাব আসে তাতে বেচারি চোখের কি দোষ? তার কোন দোষ নেই। ও তো প্রণালী মাত্র। তা দিয়ে নোংরা জল প্রবাহিত কর, নির্মল জল ওর ভেতর দিয়ে নিয়ে যাও। যা কিছু প্রবাহিত কর। সে তো মাধ্যম মাত্র। তার কোনও দোষ নেই। প্রিয়তা বা অপ্রিয়তার ভাব, রাগ বা দ্বেষ—এ সবই আসে মনের পথ দিয়ে, সংস্কারের তথা ধারণার পথ দিয়ে। আমাদের মনে যে লোকের সম্বন্ধে যে ধারণা জমে আছে, যে চোখে আমরা তাকে দেখেছি তদনুসারে আমাদের দেখার সঙ্গে সূক্ষ্ম ভাবে ধারণার তরঙ্গ তথা আমাদের মনের তরঙ্গ এসে মিলিত হয়। তার পরে আর চোখের কোন কাজ থাকে না। তার পরে আমরা চোখ দিয়ে দেখি না। দেখি সংস্কার দিয়ে, ধারণা দিয়ে, তথা মন দিয়ে।

প্রতিসংলীনতা তথা সংযমের এই হল অতিশয় মহত্ত্বপূর্ণ সূত্র—ইন্দ্রিয়ের কাছ থেকে ইন্দ্রিয়ের কাজ নাও, অন্য কোন কাজ নিও না। এই হল সংযমের সূত্র।

আমি রূপান্তরণের সূত্রের আলোচনা করছি। আমরা অবশ্যই

বদলাতে চাই। প্রত্যেক মানুষই যে বদলাতে চায় সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। যে ক্রোধপ্রবণ, সে চায় তার স্বভাব বদলাতে। যে পরনিন্দাপরায়ণ, সে চায় তার স্বভাবের পরিবর্তন করতে। যে খাদ্য-লোলুপ, সে-ও চায় আপন স্বভাবের পরিবর্তন। তারা মন থেকে ইচ্ছা করুক বা বাধ্য হয়ে করুক, তারা সবাই পরিবর্তন চায়।

কিন্তু বাস্তবে কারও অভ্যাস বা স্বভাব বদলায় না। খুব কম লোকেই নিজে নিজের স্বভাব পরিবর্তিত করতে পারে। তারা জানে ঐ সব কাজ খারাপ। তারা ঐ সব কাজ খারাপ বলে মানে। তারা ঐ সব অভ্যাস ছাড়তে বা বদলাতে চেষ্টা করে। কিন্তু তারা সেগুলি ছাড়তে বা বদলাতে সক্ষম হয় না। কেন? ঐ রকম হয় কেন? এ একটি মস্ত বড় প্রশ্ন। এর উত্তর দিতে অন্তরের গভীরতায় নামতে হবে। আমি এ কথা স্বীকার করি যে সাধনার অন্যান্য সফলতার মধ্যে এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ সফলতা যে, আমরা এ প্রশ্নের উত্তর পেতে সক্ষম হই। লোকে পরিবর্তিত হতে চায় অথচ তারা বদলাতে পারে না কেন? এই প্রশ্নের উত্তর সাধনার ভূমিকা ছাড়া অন্য কোথাও পাওয়া সম্ভব নয়। একমাত্র সাধনার ভূমিকাতেই আমরা এই প্রশ্নের সমাধান করতে পারি।

আমরা শ্বাসের প্রয়োগ করে থাকি। শ্বাসকে ভেতরে নিয়ে যাবার চেষ্টার সঙ্গে সঙ্গে মনকেও ভেতরে নিয়ে যাবার চেষ্টা করি। কেন এ রকম করি? আমরা কেন একাগ্রতার অভ্যাস করে থাকি? এ কথা আমাদের বুঝতে হবে। আমরা কাজ করে চলি, কিন্তু কেন করি?

আমাদের দুই শরীর আছে—স্থূল শরীর আর সূক্ষ্ম শরীর। আমাদের চেতনার অনেক স্তর। এক হল মনের চেতনা, অর্থাৎ চেতনার মানসিক স্তর। আর একটি অধ্যবসায়ের স্তর। মন এক, অধ্যবসায় অনেক। অধ্যবসায়ের অর্থ, সূক্ষ্ম চেতনা। সূক্ষ্ম চেতনার স্তর অসংখ্য। তা অতিশয় গভীরতায় প্রতিষ্ঠিত। আমাদের স্থূল মনের কাছে তা প্রীতিকর নয়, আমাদের জাগ্রত মনের পক্ষে তা

প্রীতিকর নয়। তৎক্ষণাৎ আমরা প্রভাবিত হয়ে পড়ি আর চিন্তা করি যে, এসব ত্যাগ করতে হবে। মনে মনে ত্যাগের সঙ্কল্প করি। মনে করুন, আমরা চা পান করার অভ্যাস ত্যাগ করার সঙ্কল্প করলাম। যখনই সকাল হল, জলখাবারের সময় এল, চা মাথায় চড়ে বসল। মাথায় চেপে বসে চলতে আরম্ভ করে। চা পানের জন্য আকুলতা বাড়তে থাকে। চা পানের অভ্যাস ত্যাগ করার ইচ্ছা হয়েছিল। কিন্তু চা আমাদের সামনে এলে আমরা ভাবি, যাক গে, আজ তো খাই। কাল থেকে ছাড়ব। একদিনে কি যাবে আসবে? পরের দিন চা এলে একই প্রশ্ন ওঠে এবং মন একই ভাবে সমাধান করে। এই রকম দিনের পর দিন চলতে থাকে।

রাজা ভ্রমণে বেরিয়েছেন। তিনি এক বাগানে এলেন। মন্ত্রী তাঁকে সাবধান করবার জন্য বললেন, 'মহারাজ। আপনি আম গাছের তলায় বসবেন না। আপনার আম খাওয়া নিষেধ, এমন কি আম গাছের তলায় বসাও নিষেধ। বৈদ্য বলেছেন আপনি আম খেলে বাঁচবেন না, মরে যাবেন। আপনি যদি আম হাতে নেন তবে মনে করবেন যে সাক্ষাৎ মৃত্যুকে হাতে নিয়েছেন। আপনার পক্ষে আমের অর্থ মৃত্যু।'

রাজা মনে মনে চিন্তা করলেন—এ কি রকম বৈদ্য? এত কড়া? এত নিষেধ! আম গাছের ছায়া বেশ ঘন। আম গাছের নিচে বসতে কি দোষ আছে? আম খাওয়াতে দোষ হওয়ার সম্ভাবনা থাকতে পারে, আম গাছের ছায়াতে কোন দোষ থাকতে পারে না। রাজা আম গাছের ছায়ায় বসলেন। পাকা আমের গন্ধে তাঁর মন ভরে গেল। তাঁর জিভে জল এসে গেল। এই সময়ে দমকা হাওয়ার স্রোত এল। গাছ থেকে একটি আম রাজার কোলে পড়ল। রাজা সেটা ছুঁলেন, হাতে তুলে নিলেন। শুঁকলেন। তার মনমাতানো রঙ আর মিষ্ট গন্ধ। মন্ত্রী বললেন—মহারাজ! ও আপনি কি করছেন? আপনি কি নিজের মৃত্যু ডেকে আনছেন? আমটি দূরে ছুঁড়ে ফেলে দিন। রাজা

হাসতে হাসতে বললেন—তুমি তো বড়ই অবিশ্বাসী। দেখাতে আর শোঁকাতে বিপদ কোথায়? আমি এটি খাব না। রাজা আমটি বার বার শুঁকতে লাগলেন। মন মিষ্ট গন্ধে ভরে গেল। শুঁকতে শুঁকতে তিনি আমটিকে চুষতে লাগলেন। বড়ই মিষ্ট রস। মন্ত্রী তাঁর হাত চেপে ধরলেন। রাজা বললেন—মন্ত্রী, বৈদ্যরা অনেক ভয় দেখায়। একটি ভাল আম চুষলে মানুষ কি করে মরে যেতে পারে? আমি তো শুধু শুঁকছি, খাচ্ছি না। তুমি চিন্তা করো না। মন্ত্রী নিষেধ করতে লাগলেন, আর রাজা গোটা আমটি চুষলেন। কিছু দিন পরে রাজা রোগগ্রস্ত হয়ে মারা গেলেন।

লোকে জেনেশুনেও ছাড়তে পারে না কেন? হাত থেকে পড়ে যাওয়া কাঁচের গ্লাসের মত তোমাদের সঙ্কল্প ভেঙ্গে যায়, চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে যায়। তার কারণ ঐ সমস্ত সঙ্কল্প আমাদের স্থূল চেতনার স্তরে, আমাদের জাগ্রত মনের স্তরে ঘটে। সঙ্কল্প করে জাগ্রত মন, আর বিঘ্ন আসে অন্য কোন জায়গা থেকে। ব্যাধি কোন এক জায়গায়, আর আমরা চিকিৎসা করি অন্য কোন জায়গায়।

এক জনের চোখে ব্যথা শুরু হল। সে বৈদ্যর কাছে গেল। বৈদ্য বললেন—এই বড়ি নাও। এটিকে ঘসে চোখে কাজলের মত লাগিয়ে দিও। দুদিন পরে বৈদ্য রোগীর বাড়িতে এলেন। তিনি দেখলেন রোগী বড়িটি ঘসছে পিঠের ওপরে। বৈদ্য জিজ্ঞাসা করলেন—তুমি কি করছ? ঐ ওষুধ তো চোখের জন্য। তুমি ওটা পিঠে লাগাচ্ছ কেন? সে উত্তর দিল—কি করব? প্রথম দিন চোখে কাজলের মত লাগিয়েছিলাম, কিন্তু খুবই জ্বালা করল। তখন আমি ভাবলাম, যাক গে। চোখে যদি না সয়, তবে পিঠে ঘসে দিই। কি আর তফাৎ হবে।

আমরাও ঠিক এই রকম করে থাকি। কোথায় রোগ হয়, আর কোথায় আমরা ওষুধ লাগাই। ব্যাধি সূক্ষ্ম চেতনায়, কর্ম শরীরে তথা বাসনা শরীরে, আর আমরা চিকিৎসা করি স্থূল মনের, জাগ্রত মনের, তথা স্থূল শরীরের। এই মনের ঐ কাজ নয়। যেখানে সমস্ত আকাঙ্ক্ষা

এবং বাসনাব বাস, যেখানে তাদেব স্রোত বযে যাচ্ছে, তাব নাম অধ্যবসায। অধ্যবসায মলিন হতে পাবে, আবাব নির্মলও হতে পাবে। অধ্যবসাযেব মলিনতা বা নির্মলতাব আধাবে ভেতবেব সব কিছু কাজ চলে। আমবা কেবল স্থূল মনেব পবিচর্যা কবতে থাকি, জাগ্রত মনেব সেবা কবতে থাকি। সাবা জীবন আমবা পবিচর্যা কবে চলি। কিন্তু বোগ কখনও নিবাময হয় না। আমবা ভাবি, এত চেষ্টা কবাব পবেও বোগেব শেষ হল না। যে গ্রামীণ ফুঁ দিযে বিজলি বাতি নেভাতে চেযেছিল আমবা ঠিক তাব মত। ফুঁ দিলে বিজলি বাতি নিভবে না। বোগ সাববে না।

আমবা যেন শ্বাসেব সঙ্গে সঙ্গে মনকেও ভেতবে নিযে যাই, যাতে অবচেতন মনেব দুযাব খোলা সম্ভব হয, স্থূল শবীব এবং সূক্ষ্ম শবীবেব মধ্যে যে প্রাচীব আছে তা ভাঙতে পাবি, তাদেব মাঝখানে এমন এক দুযাব বানাতে পাবি যা দিযে সোজাসুজি স্থূল মন থেকে সূক্ষ্ম মনে, স্থূল শবীব থেকে সূক্ষ্ম শবীবে চলে যেতে পাবি। আমবা যদি মধ্যবর্তী প্রাচীব ভাঙতে পাবি, মধ্যবর্তী দুযাব খুলতে পাবি তবে তা সাধনাব এক বিবাট বড উপলব্ধি হবে।

এই দবজা খোলাব যে সাধনা তাব নাম একাগ্রতা। দূবত্বকে অতিক্রম কবাব সাধনাব নাম একাগ্রতা। আমবা যত বেশি একাগ্রতাব অভ্যাস কবতে পাবব তত বেশি পরিমাণে আমবা এই ব্যবধান দূব কবতে সমর্থ হব। যেমন যেমন আমাদেব একাগ্রতা বৃদ্ধি পাবে তেমন তেমন আমাদেব স্থূল মন নিষ্ক্রিয হযে যাবে আব সূক্ষ্ম মনেব কাজ কবাব সুযোগ মিলবে। সূক্ষ্ম মন সক্রিয হবে। দবজা খুলে যাবে। যেমন আমাব বিচাবশূন্যতা বৃদ্ধি পাবে তেমন এত জোবে ধাক্কা লাগবে যে সূক্ষ্ম মনেব দবজা খুলে যাবে। যখন আমবা শ্বাসেব গতি বুঝতে পাবব, শ্বাসেব গতি মৃদু কবতে পাবব, তখন ঐ মৃদু শ্বাস এত শক্তিশালী হযে যাবে যে তাব ধাক্কায সেই দবজা খুলে যাবে। আমাদেব স্থূল জগতেব বিশ্বাস, যা স্থূল তা অতিশয-শক্তিশালী। কিন্তু সূক্ষ্ম জগতেব

বিশ্বাস এব একেবাবে বিপবীত। যা সূক্ষ্ম তাতেই শক্তি। আধুনিক আণবিক তত্ত্ব এই কথাব সত্যতা প্রমাণ কবে দিযেছে। আজকাল এই বিশ্বাস হযেছে যে, স্থূলে কোন শক্তি নেই, শক্তি সূক্ষ্মতায। এক প্রাচীন শ্লোকে এই তথ্যেব সুন্দব অভিব্যক্তি বযেছে—

হস্তী স্থূলবপুঃ স চাঙ্কুশবশঃ কিং হস্তিমাত্রঙ্কুশঃ ?
দীপে প্রজ্বলিতে, বিনশ্যতি তমঃ কিং দীপমাত্রং তমঃ ?
বজ্রেনাপি হতাঃ পতন্তি গিবযঃ কিং বজ্রমাত্রো গিবিঃ ?
তেজো যস্য বিবাজতে স-বলবান্ স্থূলেষু কঃ প্রত্যযঃ ?

[হাতি বিশালদেহ, কিন্তু অঙ্কুশেব বশ। তবে কি হাতি অঙ্কুশ-মাত্রিক, অর্থাৎ হাতিব শক্তিব মাপ কি অঙ্কুশেব দ্বাবা হবে ? দীপ জ্বললে অন্ধকাব দূবীভূত হয, তবে কি অন্ধকাব দীপমাত্রিক ? বজ্রেব দ্বাবা আহত হযে পাহাড ভেঙ্গে পডে, তবে কি পাহাড বজ্রমাত্রিক ? যাতে তেজ নিহিত আছে সেই বলবান, স্থূলে কোনও প্রত্যয নেই।]

হাতি মস্ত বড, কিন্তু সে ছোট্ট জিনিস অঙ্কুশেব অধীন। দীপ জ্বললে অন্ধকাবেব সমাপ্তি ঘটে। কিন্তু দীপ থেকে অন্ধকাব কত বিশাল। দীপ ছোট জিনিস, অন্ধকাব মস্ত বড জিনিস। কিন্তু অন্ধকাব বেশি শক্তিশালী নয, দীপ বেশি শক্তিশালী। পর্বত অতিশয উচ্চ, বিবাট জিনিস। বজ্র ছোট জিনিস। কিন্তু বজ্র পর্বতকে চূর্ণবিচূর্ণ কবে ফেলতে পাবে। শক্তি স্থূল আধাবে থাকে না, সূক্ষ্ম আধাবে থাকে। শক্তি বড জিনিসে থাকে না, ছোট জিনিসে থাকে। যাব তেজ আছে সে বলবান। আকাবে ছোট হলে কি আসে যায ?

স্থূল হওযা, বিবাট বড আযতনেব হওযা, কোন বিশেষ মহত্ত্বেব সূচক নয। আজকাল সূক্ষ্মেব শক্তিতে প্রত্যয বেডে চলেছে।

কাজেই আমাদেব স্থূল শবীব থেকে সূক্ষ্ম শবীবেব দিকে যাওযাব জন্য বিশেষ প্রযত্ন কবতে হবে। আমবা যেন স্থূল চেতনা থেকে সূক্ষ্ম চেতনাব দিকে যাই। সূক্ষ্ম শবীবকে, সূক্ষ্ম চেতনাকে জাগিযে তুলি। এই জন্যই আমাদেব সমস্ত প্রক্রিযা তথা অভ্যাসেব প্রযোজন।

আমরা আজকের দিনে যে প্রযত্ন করছি সে শুধু অন্ধকারে ঢিল ছোঁড়া নয়। আমরা জেনে এবং বুঝে চেষ্টা করব। আমাদের পক্ষে তার নিশ্চিত প্রয়োজন আছে। আমরা জানি কেন আমরা ঐ রকম প্রযত্ন করি। তার পেছনে আছে আমাদের এক গভীর প্রয়োজন, সেটি হল—আমরা যেন শ্বাসের আলম্বন, তথা এক স্থূল আলম্বন নিয়ে চলি। স্থূল আলম্বনের সাহায্যে, শ্বাসের সাহায্যে মনকে এমনভাবে তৈরি করে নিই যাতে মন ভেতরে যায়, গভীরে অবতরণ করে। মনের এই গভীরতায় অবতরণ করার অভ্যাস আমাদের হারিয়ে গিয়েছে। আমরা এই শ্বাসের আলম্বন দ্বারা আবার মনের সেই স্বভাব তৈরি করছি, মনের সংস্কার উৎপন্ন করছি। তার পরিণাম এই হবে যে ভেতরে যেতে থাকলে, দেখতে থাকলে এবং গভীরে অবতরণ করলে এমন এক ধাক্কা লাগবে যে, স্থূল চেতনা এবং সূক্ষ্ম চেতনার মধ্যবর্তী সেই দুয়ার খুলে যাবে। তখন আমরা জানতে পারব অভ্যাস বদলানো যায়, স্বভাব বদলানো যায়, দোষের যে স্রোত বয়ে যাচ্ছে তাকে রোধ করা যায়। দোষের জড় উজাড় হয়ে গেলে দোষের সমাপ্তি ঘটে। স্থূল মনে বার বার সঙ্কল্প আবৃত্তি করার কোন প্রয়োজন হয় না।

১২

স্থূল থেকে সূক্ষ্মে

সত্যের সন্ধান। কথাটি বড় প্রিয়। 'সত্য' কথাটি নিজেই বড় প্রীতিকর। কিন্তু সত্যের সন্ধান বিশেষ জটিল ব্যাপার। সত্য যখন এত বড়, এত বিরাট তখন তার সন্ধান নিশ্চয়ই সামান্য ছোটখাটো ব্যাপার নয়। আমরা সত্যের অন্বেষণ করার সঙ্কল্প করেছি। আমাদের মনে সত্যান্বেষণের ভাবনা জেগেছে। আমরা সঙ্কল্প গ্রহণ করেছি। কারণ সত্যের সন্ধান না করলে, যথার্থকে না বুঝলে, কোন লোক ঠিক কাজ করতে পারে না। পৃথিবীতে যত উচিত কাজ হয়েছে সে সবই সত্যের সন্ধানের পরে হয়েছে। যেখানে সত্যের চর্চা হয় না সেখানে সব কাজই ভ্রান্তিপূর্ণ হয়ে থাকে। আমরা অল্প সময়ের মধ্যে সত্যের স্বরূপ উপলব্ধি করব, এ কি সম্ভব? সত্য অত্যন্ত মহৎ বস্তু এবং তার সন্ধান পেতে হলে বিশেষ প্রযত্ন করা প্রয়োজন। যদি আমাদের অভ্যাস ভ্রান্তিহীন হয়, আমরা যা কিছু করি তা যদি প্রমাদমুক্ত হয়, যদি তার প্রতি আমাদের নিষ্ঠা থাকে, যদি আমরা সত্যের সাথে সাথে চলি, তবে আমরা সত্যের স্বরূপ অবশ্যই সন্ধান করতে পারব।

শুরুতেই আমরা বৃহৎ এবং বিরাট সত্যের সন্ধান করতে যাব না। কিন্তু আমরা সেই পরিমাণ সত্যের অবশ্য সন্ধান করব যে পরিমাণ

আমাদের সাধনার সহযোগী হতে পারে এবং যার আধারে আমরা বিনা নৈরাশ্যে, বিনা বাধায়, সাধনার পথে এগিয়ে যেতে পারব। এই পরিমাণ সত্য আমাদের জানতে হবে, খোঁজ করতে হবে। এই পরিমাণ সত্যও যদি খোঁজ করা না যায় তবে সাধনার পথে এগিয়ে যাওয়া যাবে না। পদে পদে বাধা আসবে—সন্দেহের বাধা, অবিশ্বাসের বাধা, মুর্খতার বাধা। আমরা না ভেবেচিন্তে, না বুঝেসুঝে কাজ করে চলি, ফলে কিছুই মেলে না। এই সমস্ত বাধা পদে পদে আসতে থাকে, তার কারণ যে সত্যের অনুভূতি, যে পরমার্থের সাধনা আপনার হওয়া উচিত তা হয় নি। তার জন্য আপনার মনে ঐ রকম তীব্র প্রেরণা আসা সম্ভব নয়।

একশ' ডিগ্রি উত্তাপে জল বাষ্পে পরিণত হয়। তার কম উত্তাপে জল বাষ্পে পরিণত হয় না। জলকে বাষ্পে পরিণত করতে হলে তাকে একশ' ডিগ্রি উত্তাপ পর্যন্ত পৌঁছতে হবে। ঐ তাপমাত্রায় না পৌঁছনো পর্যন্ত ঐ পরিবর্তন ঘটবে না। সেই রকম সত্যের যতটা উত্তাপ, যতটা তাপমাত্রা প্রয়োজন, সেই পরিমাণ তাপমাত্রা আমাদের মিললে তবেই আমাদের পরিবর্তন সম্ভব হয়। তখনই শুধু ঐ পরিবর্তন সম্ভব হয়। তা না হলে সম্ভব হয় না।

সাধনার পথে বহু বাধা আসে। সে সমস্ত বাধা আসে আমাদের শরীর থেকে। শুধু স্থূল শরীর থেকে বাধা আসে তাই নয়, সূক্ষ্ম শরীর থেকে বাধা আসে। সাধনার পথে কিছু দূর অগ্রসর হওয়ার পরে সবার থেকে বড় বাধা আসে আমাদের বিদ্যুৎ শরীর থেকে, তৈজস শরীর থেকে।

তৈজস শরীরের, তথা বিদ্যুৎ শরীরের চমকপ্রদ শক্তি আছে। তার নানা রকম বাহাদুরি দেখানোর ক্ষমতা আছে।

আমরা কলকাতায় গিয়েছিলাম। সেখানে এক বিজ্ঞানকক্ষের সামনে গেলাম। বন্ধ দরজা আপনা আপনি খুলে গেল। ভেতরে গেলাম, বিজলি বাতি জ্বলে উঠল। পাখা চলতে লাগল। কিন্তু

ভেতরে কেউ ছিল না। কোন লোক ঐগুলিকে সঞ্চালিত করে নি। ঐ সবই আপনা আপনি চলেছে। এই হল বিদ্যুতের বাহাদুরি, বিজলির কেরামতি। আমাদের তৈজস শরীরের ঐ রকম বহু কেরামতি আছে। লোকে বলে—ইনি সিদ্ধিপ্রাপ্ত সাধক, কারণ এঁর চেহারায় জ্যোতি আছে। এত জ্যোতি যে মনে হয় তেজ যেন ঠিকরে পড়ছে। এত বড় সাধক যে তিনি মাটি থেকে ওপরে উঠে যান। এত বড় সাধক যে হাত থেকে বিভূতি ঝরে পড়ছে। এত বড় সাধক যে হাত বাড়ালেই মিষ্টি, আতর, ফল সব এসে যায়। মিষ্টি খাও, আতর লাগাও, ফল খাও। এ সবই আমাদের তৈজস তথা বিদ্যুৎ শরীরের কেরামতি। এ সবই আমাদের প্রাণশক্তির চমৎকারিতা, আমাদের বিদ্যুৎ এবং তৈজস শরীরের খেল। সাধক এই সবে আবদ্ধ হয়ে পড়ে। আমি এ কথা বলতে চাই না যে এগুলি বিস্ময়কর নয়। আমি বলতে চাই যে এগুলি আধ্যাত্মিক ব্যাপার, কেননা এগুলি স্থূল শরীরের দ্বারা সংঘটিত নয়। কিন্তু এগুলি আশ্চর্যজনক নয়।

আমাদের সাধনার সূত্র—রাগস্স দোসস্স য সংখএণং এগন্ত মোক্খং সমুবেই মোক্খং—রাগ এবং দ্বেষ ক্ষীণ হলে মোক্ষ মিলে যায়। আমরা যে মোক্ষপ্রাপ্তির সাধনা করি, যে বীতরাগতার সাধনা করি, তাতে রাগ এবং দ্বেষ ক্ষীণ হলে তবে মুক্তি হওয়া সম্ভব। আমাদের রাগ ও দ্বেষ ক্ষীণ হওয়া প্রয়োজন। এর নাম আধ্যাত্মিকতা। একেই চেতনার জাগরণ, তথা আত্মার উৎক্রমণ বা উৎক্রান্তি বলে। এতে আত্মার সমস্ত মলিনতা দূর হয়। চেতনা নির্মল হয়, আত্মার সঙ্গে সাক্ষাৎকার হয়। এরই নাম অধ্যাত্মের সাধনা। একেই বলে নির্বাণ বা মোক্ষের সাধনা।

এই সাধনার মাঝখানে বহু জটিলতাপূর্ণ তথা কুটিলতাপূর্ণ বাধা আসে। তাতে সাধকের পথ বদলে যায়। তারা বাহাদুরির খেলায় নেমে পড়ে। তাঁর প্রতি সহসা লোকের আকর্ষণও হয়। কিন্তু লোকের আকর্ষণ থেকে বোঝা যায় না সাধকের রাগ-দ্বেষ ক্ষীণ হয়েছে কিংবা হয় নি। সাধকের রাগ-দ্বেষ ক্ষীণ হয়েছে কিনা সে বিষয়ে জনতার

কোন মাথাব্যথা নেই। তাতে তাদের কোন লাভ নেই। জনতা দেখে, সাধক ভূমি থেকে ওপরে উঠতে পারেন কিনা, সন্তান দিতে পারেন কিনা, ধন দিতে পারেন কিনা, অদৃশ্য হতে পারেন কিনা, আকাশে উড়তে পারেন কিনা, হাতের ইশারায় বাঞ্ছিত বস্তু নিয়ে আসতে পারেন কিনা, লোহাকে সোনায় পরিণত করতে পারেন কিনা। যদি সাধক এই সব কাজে নিপুণ হন তবে হাজার লোক তাঁর প্রতি আকৃষ্ট হবে। তাঁর প্রতি লোকের আকর্ষণ বাড়তে থাকবে। সমস্ত আকর্ষণ হল ভেল্কিবাজিতে। রাগ-দ্বেষ ক্ষীণ হওয়া বা কমে যাওয়া সম্বন্ধে কারও কোন আকর্ষণ নেই।

বিজলিতে চমৎকারিত্ব আছে। লোকের তার ওপরে আকর্ষণ আছে। তা থেকে আলো পাওয়া যায়, গরম ও ঠাণ্ডা হাওয়া পাওয়া যায়। আরও নানা কাজ বিদ্যুতের দ্বারা হয়। তার প্রতি লোকের প্রচণ্ড আকর্ষণ।

আমাদের শরীরও একটি বিজলি ঘর। তা সম্পূর্ণভাবে একটি বৈদ্যুতিক যন্ত্র। আমরা চিন্তা করলে আমাদের মস্তিষ্কে বিদ্যুৎ উৎপন্ন হয়। আমরা শান্ত অবস্থায় থাকলেও বিদ্যুৎ তৈরি হয়। ধ্যানের সময়ে পর্যন্ত বিদ্যুৎ জন্মায়। প্রবৃত্তি কম করলেও আমাদের মস্তিষ্কে বিদ্যুৎ জন্মায়, আলফা কিরণ উদ্ভূত হয়। চিন্তা করার সময়ে আলফা কিরণ উৎপন্ন হয় না, শান্ত অবস্থায় তার উদ্ভব হয়। ধ্যানের অবস্থায় আমাদের মস্তিষ্কে বিজলি তৈরি হয়, কিংবা আমরা যখন সহজ শান্ত অবস্থায় থাকি তখন আমাদের দেহে বিদ্যুতের তরঙ্গ জন্মায়, এটা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন নয়। ঐ সবই বিদ্যুৎ। অনেক লোকে বলে, 'আজ বিশেষ শান্তির অনুভূতি হচ্ছে।' আমি বুঝতে পারি, ঐ অনুভূতিও কোন আধ্যাত্মিক অনুভূতি নয়। শান্তির অনুভূতি হয়েছে—তার অর্থ, আপনার মস্তিষ্কে আলফা কিরণের তরঙ্গ প্রবাহিত হয়েছে এবং তার ফলে আপনার শান্তি মিলেছে।

এক বৈজ্ঞানিক একটি গবেষণামূলক প্রয়োগ করলেন। তিনি

মাটিব ওপবে তামাব জাল বিছালেন এবং তাব ওপবে একটি লোককে বসিযে দিলেন। ঐ লোকটিব শবীবে তিনি তামাব তাব লাগিযে দিলেন এবং তাঁব শবীবেব ধনাত্মক ও ঋণাত্মক বিদ্যুতেব সংযোগ কবে দিলেন। লোকটি শান্ত হযে গেল। তাব অপূর্ব শান্তিব অনুভূতি হল। সম্ভবত সে তখন চিন্তা কবে, নিবন্তব ধ্যানমগ্ন লোক কত দীর্ঘকাল ধ্যান কবলে তবে এই শান্তিব স্থিতিতে পৌঁছতে পাবে। আপনি জিজ্ঞাসা কবতে পাবেন, যখন তামাব তাব থেকে এত শান্তি মেলে তখন আমবা তাবেব প্রযোগই কবব। একেবাবে শান্ত হযে যাব।

সাল্টাব নামে এক আমেবিকান বৈজ্ঞানিক এই বিষযে অনেক প্রযোগ কবেছেন। তাঁব মনে এক বিকল্প চিন্তা এল। মানুষ ধ্যান কবলে শান্ত হযে যায। তবে কি মানুষেব মস্তিষ্কে আলফা কিবণেব তবঙ্গ উদ্ভূত হয, পশুব মস্তিষ্কে হয না? জানোযাবেব মাথায কি আলফা তবঙ্গ তৈবি হয না? এই বিকল্প চিন্তা মনে আসতেই তিনি প্রযোগ শুরু কবে দিলেন। একথা স্বীকাব কবতে হয যে, সহজ শান্ত ভাব থেকে আলফা তবঙ্গ উৎপন্ন হয। কিন্তু ঐ তবঙ্গ অন্য ভাবে তৈবি কবা যায না। কিন্তু যখন কোন যোগী বা ধ্যানী ধ্যানেব প্রযোগ দ্বাবা আলফা কিবণেব তবঙ্গ সৃষ্টি কবেন তখন বৈজ্ঞানিকবা এবং চিকিৎসকবা আশ্চর্য হযে যান। দিল্লি মেডিক্যাল ইনস্টিটিউটেব একদল ডাক্তাব পবীক্ষা কবে দেখেছেন, ধ্যানী নিজেব ইচ্ছায আলফা তবঙ্গ সৃষ্টি কবেন বা তাকে বোধ কবেন। আবাব উৎপাদন কবেন, আবাব বোধ কবেন। সেই সব বিজ্ঞানীদেব জানা ছিল না, প্রযত্ন দ্বাবা আলফা তবঙ্গ সৃষ্টি কবা সম্ভব হয। প্রথমে তাঁবা স্বীকাব কবেন নি। শুরুতে তাঁবা মনে কবেছিলেন যে, মস্তিষ্কে আলফা তবঙ্গ সহজভাবে উৎপন্ন হয। সাল্টাবেব মনে প্রশ্ন জেগেছিল, জানোযাবও কি ধ্যান কবতে পাবে? তাদেব মস্তিষ্কেও কি আলফা তবঙ্গ উৎপন্ন হতে পাবে? তাদেব মস্তিষ্কে কি আলফা তবঙ্গ উৎপন্ন কবা যেতে পাবে? তিনি একটি বিডালেব ওপবে পবীক্ষা কবলেন। একটি বিডালকে অনাহাবে বেখে

তাকে বিদ্যুতের শক বা ধাক্কা দেন। যেমন যেমন বিড়ালের ওপরে বিদ্যুৎ প্রয়োগ করা হল তেমন তেমন সে শান্ত হয়ে গেল, আর তার মস্তিষ্কে আলফা তরঙ্গ উৎপন্ন হল। আলফা তরঙ্গ উৎপন্ন হওয়ার পরে বিড়ালটিকে দুধ এবং মিষ্টি খেতে দেওয়া হল। বিড়ালটি দুধ এবং মিষ্টি খেল। এই পালা চলতে থাকল। প্রতিদিন আলফা তরঙ্গ উৎপন্ন হওয়ার পরে বিড়ালটির দুধ ও মিষ্টি মিলতে লাগল। কিছুদিন পরে বিড়াল এই কথা বুঝে গেল যে, শান্ত এবং স্থির হয়ে গেলে দুধ এবং মিষ্টি মেলে। সে শান্ত থাকতে আরম্ভ করল, ধ্যান শুরু করল। যখন তার খাওয়ার ইচ্ছা হয় তখন সে একেবারে শান্ত হয়ে চোখ বন্ধ করে দাঁড়িয়ে থাকে। আলফা তরঙ্গ উৎপন্ন হতে থাকে। তার মিষ্টি আর দুধ মিলে যায়। ঐ বিড়াল ধ্যান করতে, শান্ত হতে শিখে গেল।

এ থেকে এই তথ্য নির্গলিত হয় যে, শান্ত বৃত্তি দ্বারা আপনার মস্তিষ্কে আলফা তরঙ্গ উৎপাদন করা সম্ভব হয়। তা বিদ্যুতেরই চমক, কোনও আধ্যাত্মিক বিষয় নয়। এ এক পরিণাম। যখন আমরা শান্ত থাকি, শরীর শিথিল হয়, উত্তেজনা থাকে না এবং মৌন থাকি, তখন ঐ শান্ত অবস্থায় আলফা তরঙ্গ উৎপন্ন হয়। আমাদের শরীরের ঘর্ষণজাত বিদ্যুৎ এবং মস্তিষ্কের ধারাবাহিক বিদ্যুৎ—এই দুই প্রকার বিদ্যুৎ নিরন্তর সঞ্চরমান এবং তারা এত রকম ক্রিয়া করতে থাকে যে, সাধনার পথে চলতে চলতে তার মাঝে বিড়ালের জগতের অবস্থা এসে যায়। ঐ রকম অবস্থায় আমরা ভেবে বসি যে আমরা অনেক শান্তি প্রাপ্ত হয়েছি। লোকে পাঁচ-দশ দিন শিবিরে থাকে। আমি তাদের বলতে শুনেছি—'আহা, আমরা কত আনন্দে আছি। আমরা কত শান্তি পাচ্ছি।' শিবির শেষ হলে তারা যখন আবার আপন আপন ব্যক্তিগত জীবনের কর্মকাণ্ডের মধ্যে এসে পড়ে, তখন তাদের আবার ক্রোধ করতে দেখা যায়, লড়াই করতে দেখা যায়, গালাগালি দিতে দেখা যায়। তাদের শান্তির অনুভূতি কোথায় যায়, কোথায় অদৃশ্য হয়ে

যায়, তার পাত্তাও পাওয়া যায় না। এই পরিস্থিতি থেকে এই কথাই সুস্পষ্ট হয় যে ঐ আনন্দের তথা শান্তির অনুভূতি ভ্রম মাত্র ছিল। তা কেবল উপরিগত ভাসা ভাসা অনুভূতি ছিল। ঐ রকম অনুভূতি সম্বন্ধে আমাদের সাবধান থাকা প্রয়োজন, কারণ তা কেবল ওপরের ব্যাপার।

প্রবৃত্তির দ্বারা চালিত হয়ে আপনাকে বহু পরিশ্রম করতে হয়। আপনার শরীর ক্লান্ত হয়। আপনি বিশ্রাম করেন এবং ক্লান্তির স্থিতি-কালে গভীর নিদ্রায় গভীর মগ্ন হয়ে থাকেন। এক বা দু ঘণ্টা বাদে আপনি যখন জাগেন তখন আপনি অনুভব করেন আপনার শরীর সতেজ হয়েছে এবং আপনি অনেক শান্তি পেয়েছেন। এ স্বাভাবিক ব্যাপার। মানুষ যখন প্রবৃত্তির ক্ষণে পৌঁছয়, বিশ্রামের ক্ষণে পৌঁছয়, তখন সে শান্তি অনুভব করে। এ কোনও মৌলিক কথা নয়। মূল কথা হল, যেখান থেকে শান্তির ওঠা উচিত, সেখান থেকেই যেন ওঠে। এর জন্য অন্য প্রযত্নের প্রয়োজন আছে, কিছু করার প্রয়োজন আছে। শান্তির তত্ত্ব, বিদ্যুতের তত্ত্ব অনেক গুরুত্বপূর্ণ তত্ত্ব। শান্তির অনুভূতি হয়, আরও অনেক বিচিত্র অনুভূতি হয়। এ সব কিছু ব্যর্থ নয়। আমি এ সব বিষয়কে নিরর্থক বলি না। মধ্য মার্গ রূপে, মধ্য বিশ্রাম রূপে এরও উপযোগিতা আছে। কিন্তু আমরা যেন এ রকম ভুল না করি যে এই অবস্থা আমাদের অন্তিম লক্ষ্য, আমাদের অন্তিম গন্তব্যস্থল, আমাদের সাধনার অন্তিম সাধ্য। আমাদের দৃষ্টি সুস্পষ্ট হওয়া প্রয়োজন।

লোকে শক্তিপাতের কথা জানে। শক্তিপাত কি? তা বিদ্যুতেরই কেরামতি। যে লোক আপনার শক্তি বা আপনার বিদ্যুতের বিকাশ করতে সমর্থ হয়েছে সে-ই শুধু অন্যের দেহে শক্তিপাত করতে পারে। তিনি অপর লোকের মাথায় হাত রাখেন এবং নিজের ঊর্জা বা বিদ্যুৎ-শক্তি তার মধ্যে সংক্রমিত করেন।

কোন কিছু দেওয়ার জন্য আমাদের দুটি উপায় বা সাধনযন্ত্র আছে, হাত আর পা। গ্রহণ করার মহৎ সাধন মাথা। মাথাই সংগ্রহ করে।

হাতের আঙ্গুল আর পা দেয়, মস্তিষ্ক গ্রহণ করে। পুরনো পদ্ধতি অনুসারে শিষ্য গুরুর নিকটে এসে তাঁর পায়ে মাথা ঠেকায়। সে বিদ্যুৎ নিতে চায়। গুরুর চরণ বিদ্যুৎ দিতে থাকে এবং তিনি যদি শিষ্যের মাথায় হাত রাখেন, তবে দু দিক দিয়ে তিনি শিষ্যকে বিদ্যুৎ দিতে থাকেন—হাত থেকে এবং পা থেকে। হাত থেকে শিষ্যের মস্তিষ্কে বিদ্যুৎ প্রবাহিত হতে থাকে, পা থেকেও তার মস্তিষ্কে বিদ্যুৎ সঞ্চারিত হতে থাকে। দু দিক থেকেই শিষ্যের বিদ্যুৎপ্রাপ্তি হতে থাকে। মাথা বিদ্যুৎ গ্রহণ করার সবচেয়ে মহৎ সাধন। তা দু দিক থেকে প্রবাহিত বিদ্যুৎ গ্রহণ করতে থাকে। আমরা আচার্যের বন্দনা করি, আর তাঁর পায়ে আমাদের মাথা রাখি। আচার্য নিজের হাত শিষ্যের মাথায় রাখেন। এদিকে পা থেকে বিদ্যুৎ দিচ্ছেন, ওদিকে হাত থেকে বিদ্যুৎ দিচ্ছেন। মাথা দুদিক থেকে আগত বিদ্যুৎ গ্রহণ করতে থাকে। এই বিদ্যুতে চমৎকারিতা আছে, শক্তি আছে। তার উপযোগিতাও আছে। এ কথা বলা চলে না যে তা সব রকমেই উপযোগবিহীন। কিন্তু এই শক্তিপাত আধ্যাত্মিক উপলব্ধি নয়। এই ব্যাপারের মূল তত্ত্ব উপলব্ধি করতে হবে যে রাগ ও দ্বেষ ক্ষীণ না হলে, আধ্যাত্মিকতার বিকাশ না হলে, চেতনা নির্মলতা লাভ না করলে, বিকারের শেষ হবে না এবং বৃত্তিসমূহের পরিবর্তন হবে না। যা থেকে পরিবর্তন আসার কথা, তা ঘটবে না। এ থেকে শুধু মধ্য পথে স্থিত কতকগুলি তত্ত্বের সন্ধান পাওয়া যেতে পারে।

সাধনার প্রারম্ভেই আমাদের এই সত্য বুঝতে হবে, যাতে আমরা তৈজস শরীরের তথা বিদ্যুৎ শরীরের চোখ ঝলসানো দীপ্তিতে, তার চমৎকারিত্বে বিভ্রান্ত হয়ে তাকেই আধ্যাত্মিক তত্ত্ব বলে মনে না করে বসি, তাকে সাধনার উপলব্ধি বলে না মনে করি। তা মানসিক সাধনার উপলব্ধি মাত্র। একে যেন আমরা রাগদ্বেষের ক্ষীণতা থেকে, বীতরাগতা থেকে উদ্ভূত উপলব্ধি বলে মনে না করি।

আমরা কোন বস্তুর পরিবর্তন চাই। সে বিষয়ে আমরা যেন বার বার

সুষ্ঠু ভাবে ভেবে দেখি। 'অপ্পনা সচ্চমে সেজ্জা মেত্তি ভূত্রস্থ কপুঁত্র'—আমাদের সত্যকে জানতে হবে, নিজেকে এমনভাবে পরিবর্তিত করতে হবে যাতে শত্রুতার ভাব একেবারে নষ্ট হয়ে যায়। এই লোককে আমি শত্রু মনে করি। নিজের ভুল, নিজের দোষ অন্যের ঘাড়ে চাপিয়ে দিয়ে মনে করি সে আমার অনিষ্ট করেছে, সে আমার এই রকম ক্ষতি করেছে। এই রকম শত্রুতার ভাব যেন আমাদের মনে বাসা না বাঁধে। সে নিজেও কিছু অনিষ্ট করেছে, কিছু দোষ করেছে, এ কথা কেউ মানতে চায় না। সমস্ত কিছু দোষ আমরা অন্যের ঘাড়ে চাপিয়ে দিই। পাথর কি রকম এবড়ো খেবড়ো, আমার ঠোকর লেগে গেল। আমার ভুলের জন্য আমার ঠোকর লেগেছে, এ কথা আমরা কখনও স্বীকার করব না। আমরা বলব পাথর ঠিক জায়গায় ছিল না, সেই জন্য আমার ঠোকর লেগেছে। দরজা ছোট, সেই জন্য আমার মাথায় চোট লেগেছে। কিন্তু দরজা ছোট জেনেও আমি নিচু হই নি বা মাথা নোয়াই নি, সেই জন্য আমার মাথায় আঘাত লেগেছে—এ রকম ভাবে কেউ চিন্তা করে না। ও আমার সঙ্গে এই রকম ব্যবহার করেছে, ঐ রকম ব্যবহার করেছে, আমার বন্ধুকে বিগড়ে দিয়েছে, তাকে ভুল বুঝিয়েছে—এই রকম ভাবে আমরা সমস্ত দোষ অন্যের ঘাড়ে চাপাই। আমরা অন্যের দোষ দেখি, আর অন্যকে দোষী সাব্যস্ত করে নিজেকে দোষের ভাগী হওয়া থেকে বাঁচাই। কিন্তু যারা সত্যের সন্ধান করেছে বা এখনও করছে, তারা অন্যের ওপরে দোষারোপ করে না। তারা এ কথা স্বীকার করে যে তাদের নিজেদের মধ্যে ভ্রান্তি নানা প্রকার বিকৃতি উৎপাদন করছে। সেই জন্য তারা যাতে অপ্রমত্ত থাকতে পারে, জাগ্রত থাকতে পারে, সর্বদা সজাগ থাকতে পারে, তার জন্য প্রযত্ন করতে থাকে।

আমার বিবেচনায় শত্রুতার অর্থ শুধু এই নয় যে অন্য কোন লোকের ওপরে বিদ্বেষ থাকবে, আর মিত্রতার অর্থও এই নয় যে শুধু অন্য কোন লোকের প্রতি আমার প্রেম থাকবে। শত্রুতার অর্থ, নিজের কর্তব্যপালনে ভুল করে অন্যের কর্তব্যে অবহেলা লক্ষ্য করা। এ এক

রকমের শত্রুতা। পাথরের সঙ্গেও আমাদের শত্রুতা হয়ে যায়। আমরা পাথরকেও গাল দিতে আরম্ভ করি। পাত্রটি জলে পরিপূর্ণ ছিল। তাকে এক হাতে ওঠালাম। পাত্রটি ফেটে গেল। কিন্তু জলে ভর্তি পাত্র এক হাত দিয়ে ওঠালে সেটি ফেটে যাবে, এ সত্য আমরা খুঁজে পাই না। এ কথা আমরা চিন্তাই করব না। আমরা বলব পাত্রটি এত কাঁচা ছিল যে সেটি ফেটে যাবে না তো কি হবে? এ তো ঐ রকম পাত্রের অবশ্যম্ভাবী পরিণাম। নিজেকে কর্তব্যপালনে ত্রুটির দোষ থেকে বাঁচানোর জন্য এই রকম কথাবার্তাও এক রকম অন্যের প্রতি শত্রুতা। অপর বস্তু সজীব বা নির্জীব যাই হোক না কেন, মিত্রতার অর্থ শুধু তার প্রতি প্রেম বা প্রীতি নয়। প্রেমও মিত্রতা বটে। কিন্তু বাস্তবে মিত্রতার অর্থ, সবার অস্তিত্ব স্বীকার করা, যে যেমন তাকে সেই ভাবে স্বীকার করা, কারও ওপরে কিছু আরোপ না করা। এর নাম মিত্রতা। একেই 'অনাশাতনা' বলে। জৈন সাহিত্যের একটি গুরুত্বপূর্ণ শব্দ—আশাতনা। জীবের আশাতনা হয়, অজীবেরও আশাতনা হয়। বাড়িঘরের আশাতনা হতে পারে, কাপড়চোপড়েও আশাতনা হতে পারে। সব কিছু জিনিসেরই আশাতনা হতে পারে। আমাদের পক্ষের ব্যাপক মনোভাব হল, আমরা সত্যের সন্ধান করব, সবার সাথে মিত্রতা করব। অর্থাৎ যে যেখানে যেমন আছে আমরা তাকে তার সেই সহজ ভাবেই স্বীকার করে নেব এবং কারও ওপরে কিছু আরোপ করব না। এই হল সত্য। এই সত্য আমাদের উপলব্ধি করতে হবে। এই সত্য গ্রহণ না করতে পারলে কোন রকম সাধনা করা সম্ভব নয়।

এক সাধক আছেন। যদি তিনি দু ঘণ্টা ধরে ধ্যান করেন, মৌন থাকেন, কিন্তু অন্যের মধ্যে নানা দোষ দেখতে পান, তবে আমার বিবেচনায় তিনি আধ্যাত্মিক সাধনায় নিরত নন। তিনি প্রকৃতই ধ্যান এবং মৌন সাধনায় ব্যাপৃত নন। তাঁর দৃষ্টি অন্যের ওপরে। এ থেকে তিনি কি পেয়েছেন? নিজের ভেতরে তিনি কিসের সন্ধান করেন? তাঁর ভেতরে এতে কি পরিবর্তন হয়? সাধনার দ্বারা কিছু বদলানো

উচিত, পবিবর্তন হওযা উচিত। কিন্তু পবিবর্তন কেন হয না?

তাব একটি কাবণ, আমাদেব সমস্ত শবীব প্রকম্পিত। আমবা অনেকবাব অনুপ্রেক্ষা কবি, এই কথা বাবে বাবে আবৃত্তি কবি— 'প্রকম্পনকে, শবীবে নিবন্তব ঘটিত প্রকম্পনকে, দেখ।' মাথা থেকে পা পর্যন্ত আমাদেব শবীব প্রকম্পনেব পুলিন্দা। প্রকম্পন আব প্রকম্পন, কেবল প্রকম্পন। আমাদেব ভাগ্য ভাল যে আমবা সব প্রকম্পন দেখতে পাই না। সমস্ত কিছু প্রকম্পিত হচ্ছে, কোন কিছুই শক্ত নয। হাডগুলি এত ফাঁপা যে তাব ভেতব দিযে যে কোন কিছুই বেবিযে যেতে পাবে।

গৌতম ভগবান মহাবীবকে জিজ্ঞাসা কবেছিলেন, 'ভন্তে! কে বদলায?'

ভগবান বলেছিলেন, 'যা অস্থিব তাই বদলায। যা স্থিব তা বদলায না। যখন জীব যৌবন প্রাপ্ত হয তখন তাব সমস্ত অবযব বদলায।' হাত বদলে যায, পা বদলে যায, সব কিছু বদলে যায। এই পবিবর্তন কেন হয? এব উত্তব: দেহ অস্থিব, কম্পনেব অধীন। শুধু কম্পন ছিল বলে পবিবর্তন হযেছে। কম্পন যদি না হতো তবে পবিবর্তন হতো না। সমস্ত কিছু কম্পনেব ব্যাপাব। বোগ কেন হল? কম্পন ছিল, সেই জন্য বোগ হল। কম্পন না থাকলে বোগ হতো না। স্থিব বস্তুব কখনও কোন ব্যাধি হতে পাবে না। অস্থিব বস্তুতেই ব্যাধি হয। কম্পন থেকে বোগ হয, কাবণ কম্পন থেকে বদলানোব ক্ষমতা আসে। সব কিছু বদলায, বদলাতে পাবে, আব যা বদলায তাব পক্ষে সে পবিবর্তন ভালও হতে পাবে, মন্দও হতে পাবে। সুন্দবও হতে পাবে, অসুন্দবও হতে পাবে, মিষ্টও হতে পাবে, কটুও হতে পাবে। যা বদলায তাব নানা প্রকাব পবিবর্তন হতে পাবে।

আমাদেব গোটা শবীব প্রকম্পনেব পুলিন্দা। যা কিছু আমাদেব দৃষ্টিগোচব হয এবং যা কিছু আমাদেব দৃষ্টিব বহির্ভূত সব কিছু প্রকম্পন। আমি কথা বলছি, কথাব সাথে সাথে শব্দেব তবঙ্গ এত বেগে ছুটে

যায় যে মনে হয় দশটি সাপ এক সাথে বেগে ধাবিত হচ্ছে। কিন্তু বিনা মাধ্যমে, খালি চোখে আমরা ঐ সব তরঙ্গ দেখতে পাই না। ব্যাঙ্গালোরে ডঃ বিশ্বেশ্বরায়া সায়েন্স ইনস্টিটিউটে গিয়ে আমি এক যন্ত্রের সামনে দাঁড়িয়ে কিছু কথা বলি। ঐ যন্ত্রের ওপরে ঐ শব্দের তরঙ্গ এত বেগে ছুটতে লাগল যে মনে হল পঞ্চাশটি সাপ দৌড়চ্ছে। সবই প্রকম্পন আর প্রকম্পন। আমাদের শরীর প্রকম্পনময়, এই সত্য যেন আমরা ঠিক মত উপলব্ধি করি। আমাদের শরীরের যত কিছু পরিণাম, যত কিছু পরিবর্তন হয় সে সব কিছুই প্রকম্পনের দ্বারা ঘটে থাকে।

আমি এই সত্য হৃদয়ঙ্গম করেছি যে প্রকম্পনের পরিবর্তন করা সম্ভব। অর্থাৎ প্রতিরোধ থেকে প্রকম্পন উৎপন্ন হতে পারে। যেমন, বিচারের তরঙ্গ এক প্রকারের প্রকম্পন। এক রকম বিচার চলতে থাকে আর প্রকম্পন চলতে থাকে, তার তরঙ্গ চলতে থাকে। আমরা ভাবনা করি, বিরোধী তরঙ্গ উৎপাদন করি। আগেকার তরঙ্গের সঙ্গে তার সংঘাত হয়। সে তরঙ্গ এত শক্তিশালী যে আগেকার তরঙ্গের সমাপ্তি ঘটায়। এ সবই আমরা প্রকম্পনের ফলে করি।

'ইমং শরীরং অনিচ্চ'—এ শরীর অনিত্য, এ কথা আমি বার বার বলে চলেছি। লোকে জিজ্ঞাসা করে, এ দিয়ে কি হবে? আমরাও এ কথা দশ-বিশ মিনিট বার বার আবৃত্তি করি, কিন্তু তাতে কি হবে? এর মর্ম আপনারা এখনও বুঝতে পারবেন না। আপাতত এই কথাগুলি নিষ্ঠার সঙ্গে বার বার আবৃত্তি করতে থাকুন। সঙ্কল্প করুন যে এই কাজ করতেই হবে এবং এই রকম করা ভাল, হিতকর, কল্যাণকর। ঐ রকম করে কি হবে সে কথা ধীরে ধীরে আপনাদের বোধগম্য হবে। আপনারা শুরু থেকে স্বীকার করে বসে আছেন, শরীর স্থির, নিত্য। এই ধারণা আমাদের সংস্কারে পরিণত হয়েছে। তার নিজের প্রকম্পন এবং তরঙ্গ আছে। ঐ প্রকম্পন-তরঙ্গকে প্রতিহত করতে হলে বিরোধী তরঙ্গের প্রয়োজন। আপনি 'ইমং শরীরং অনিচ্চ'—এই বাক্যটি আবৃত্তি করতে থাকুন। দশ-বিশ মিনিট ধরে আবৃত্তি করে যান।

এ থেকে বাচিক বা বচন থেকে উদ্ভূত তরঙ্গ সৃষ্ট হয়। সঙ্গে সঙ্গে আপনি ভাবনা করতে থাকেন। ভাবনা থেকে প্রকম্পন উৎপন্ন হয়। যেমন যেমন 'ইমং শরীরং অনিচ্চ' এই ধ্বনি এবং ভাবনা শক্তিশালী হয়ে যাবে এবং তার তরঙ্গ প্রবল হবে তেমন তেমন তা পূর্বগত সংস্কারের তরঙ্গকে সমাপ্ত করে দেবে, বিনষ্ট করে দেবে। যদি এই কথা আমাদের বোধগম্য হয় তবে 'ইমং শরীরং অনিচ্চ'—এই কথা বারে বারে আবৃত্তি করতে করতে আমাদের বিরক্ত হওয়ার বা নিরাশ হওয়ার কোন কারণ থাকবে না। আমরা কথা বলে প্রকম্পন সৃষ্টি করি। কিন্তু ঐ প্রকম্পন ততটা কার্যকরী হয় না। সেই জন্য বার বার বলা হয়েছে, মনকে একাগ্র কর, মনকে সঙ্গে সঙ্গে জুড়ে রাখ, তন্ময়তা অভ্যাস কর। তার অর্থ, নিছক কথার প্রকম্পন ততটা কার্যকরী হয় না। যখন তার সাথে ভাবনার প্রকম্পন সংযুক্ত হয় তখন তা অত্যন্ত শক্তিশালী হয়। ঐ শক্তিশালী প্রকম্পন আগেকার প্রকম্পনকে বাতিল করে দেয়।

প্রকম্পনকে বোধ করা সম্ভব। আমি নির্বিচার ধ্যানের কথা বলছি। শরীরকে স্থির কর, কায়োৎসর্গ কর, শরীরকে ঢিলে কর, মৌন থাক, আর মনকে শান্ত কর। কুম্ভক করে মনকে নির্বিকল্প কর। কোন কল্পনাবিলাস করবে না। এই রকম করলে প্রকম্পনকে বোধ করতে পারা যায়। প্রকম্পন বোধ করা অত্যন্ত প্রয়োজন, আর তাকে বোধ করলে তা যত ক্ষীণ হয়, তার যত ধাক্কা লাগে, তা আমরা কল্পনাও করতে পারব না। চলতে চলতে যে গতি সহসা রুদ্ধ হয় তাকে সামলানো বড় মুশকিল। যে লোক দ্রুত বেগে চলছে সে হঠাৎ একেবারে থামতে পারে না। তাকে প্রথমে তার গতিবেগ কমিয়ে দিতে হবে, পরে এক সময় আসবে যখন সে থামতে পারবে। সেই রকম তেজী গাড়ি থামানোর জন্য হঠাৎ পুরো ব্রেক কষলে দুর্ঘটনা ঘটে। প্রথমে গতি মন্থর কর, তার পরে ব্রেক কর। চলতে চলতে আমরা যদি বিচারের ওপর পুরো ব্রেক লাগাই, শ্বাসের ওপরে হঠাৎ ব্রেক লাগাই,

তাকে একবারে থামতে যাই, তবে এমন বিস্ফোরণ হবে যে তাতে পুঞ্জীভূত সংস্কার ধ্বংস হবে। প্রকম্পনের বোধ এক সত্য। প্রকম্পন বোধ সম্ভব।

আমি ছোট ছোট কথার উল্লেখ করছি। এগুলি ছোট ছোট সত্য। সেগুলি বুঝতে পারলে সাধনার ওপরে আমাদের নিষ্ঠা বেড়ে যাবে। অভ্যাসের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের জাগরূকতা বৃদ্ধি পাবে।

আপনাকে বলেছি, শ্বাসের মোড়ের ওপরে লক্ষ্য রাখুন। আমরা যখন পুরো শ্বাসের সাথে মনকে নিয়ে চলেছি তখন শ্বাসের মোড়ের ওপরে ধ্যান কেন্দ্রিত করার কথা কেন? এই কথা আপনি বুঝবেন যাতে আপনার মন এত সংবেদনশীল হয় বহু ছোট তত্ত্বেরও অবধান তা করতে পারে।

সাধারণ ক্যামেরা আপনার ফোটো বা প্রতিচ্ছবি তুলতে পারে। কিন্তু ধরুন আপনি কোন জায়গায় দু ঘণ্টা বা দশ মিনিট বসে রইলেন, তারপরে উঠে চলে গেলেন। তখন আপনার ছবি তুলতে হবে। ঐ সাধারণ ক্যামেরায় সে ছবি তোলা যাবে না। তার জন্য সংবেদনশীল বা অনুভূতিসম্পন্ন ক্যামেরা প্রয়োজন, এমন ক্যামেরা যাতে মানুষ কোথাও অবস্থান করার পরে সেখান থেকে চলে গেলেও তার ছবি উঠতে পারে। তার কারণ মানুষটির আকৃতির পরমাণু সেই জায়গায় সঞ্চিত থাকে। ঐ রকম ক্যামেরা দ্বারা চোর ধরা যেতে পারে, আরও অনেক রকম জিনিসের সন্ধান করা যেতে পারে, অনেক কিছু কথার পাত্তা পাওয়া যেতে পারে। ঐ সব কাজ করার জন্য ক্যামেরায় বিশেষ সূক্ষ্ম ব্যবস্থা থাকা আবশ্যক। আমাদের মন সম্বন্ধেও ঐ একই বক্তব্য। আমাদের মনের সংবেদনশীলতা যত বৃদ্ধি পাবে তত আমরা সূক্ষ্ম কথা ধরতে পারব।

যে সমস্ত প্রয়োগ দ্বারা মনকে ছোট বিন্দুকে গ্রহণ করতে সক্ষম করা যায় সে সমস্তই হল মনকে সংবেদনশীল করার প্রক্রিয়া। আপনি সম্পূর্ণ নাসাগ্রে আপনার শ্বাসের প্রকম্পন দেখুন। এই প্রক্রিয়া চলতে

চলতে আপনি এক সময় নির্দেশ পাবেন। নাসাগ্রের নিচে নাসাগ্রের এক আঙ্গুল পরিমিত স্থানে মনকে কেন্দ্রিত করুন এবং সেখানে প্রকম্পন লক্ষ্য করুন। আপনি হয়তো ভাবছেন, যখন সম্পূর্ণ নাসাগ্রের প্রকম্পন দেখছি তখন এক বিন্দুতে ঘটিত প্রকম্পন দেখাতে কি প্রভেদ হবে? এক আঙ্গুল পরিমিত স্থান কেন দেখব? এর উত্তর সুস্পষ্ট। যে মন সম্পূর্ণ নাসাগ্রের প্রকম্পন দেখছে তাকে এক বিন্দুতে এক আঙ্গুল পরিমিত স্থানে কেন্দ্রিত করার অর্থ, সেই মনের সংবেদনশীলতা বেড়ে গিয়েছে, তার ক্ষমতা বেড়ে গিয়েছে।

এই সব ছোট ছোট জিনিস কিভাবে আমাদের মনে পরিবর্তন নিয়ে আসে, কিভাবে আমাদের শারীরিক ক্রিয়াকলাপে পরিবর্তন ঘটায়, কি করে আমাদের ধারণা ও সংস্কারসমূহের উদ্ভব করে এবং কি করে আমাদের ভেতরকার পুঞ্জীভূত সংস্কারকে উন্মূলিত করে, আপনারা যদি বুঝতে পারেন তবে সাধনার দ্বারা আপনাদের যা পাওয়া উচিত, যা আপনাদের অভীষ্ট, তাই পাবেন।

রাজা একটি লোকের ওপরে প্রসন্ন হয়ে বললেন, 'কিছু চাও। তুমি যা চাইবে তাই তোমাকে দেব।' লোকটি একটু অদ্ভুত ধরনের ছিল। সে ধন বা প্রভুত্ব চাইল না। সে বলল—'রাজন। আপনি যখন দান করতে চান তখন আমাকে শান্তি দান করুন। আমি শান্তি চাই, অন্য কিছু চাই না।' রাজা চিন্তা করলেন, 'আমি একে শান্তি দেব কোথা থেকে? আমি নিজেই অশান্ত, আমি কোথা থেকে একে শান্তি এনে দেব?' তিনি এক সন্ন্যাসীর কাছে গিয়ে বললেন, 'গুরুদেব। কৃপা করুন। আমাকে লজ্জা থেকে বাঁচান। আমি একটি লোকের প্রার্থনা পূরণ করার কথা দিতে সে বলল, 'আমাকে শান্তি দিন।' আমার কাছে তো শান্তি নেই, আমি তাকে কোথা থেকে শান্তি দেব। এখন আপনি আমাকে দয়া করুন।'

সন্ন্যাসীর নিজের শান্তি ছিল, কাজেই তিনি রাজাকে শান্তি দিতে পেরেছিলেন। রাজা সেই লোকটিকে ডেকে তাকে শান্তির উপায় বলে

দিলেন। সে শান্তি পেল।

সাধনা থেকে যে ক্ষমতা, যে পুরস্কার পাওয়া যায় তা অন্য কিছু থেকে পাওয়া যায় না। স্থূল শরীর ও স্থূল চেতনা থেকে পাওয়া যায় না, স্থূল কর্ম থেকে পাওয়া যায় না। সূক্ষ্ম চেতনা এবং সূক্ষ্ম জগতের স্তরে পৌঁছতে পারলে তবে তাকে পাওয়া সম্ভব হয়। কথা হচ্ছে' সেখানে পৌঁছতে হবে। আমরা যদি কোন স্থূল স্তরে থেকে যাই তবে ঐ অবস্থা প্রাপ্ত হব না। সেই জন্য আমরা সাধনার মাধ্যমে স্থূল শরীর এবং স্থূল চেতনাকে অতিক্রম করে সূক্ষ্ম শরীর ও সূক্ষ্ম চেতনা পর্যন্ত পৌঁছনোর চেষ্টা করি। সেখানে পৌঁছলে আমাদের অভীষ্ট পূরণ হবে।

১৩

অধ্যাত্মের রহস্যের সন্ধান

আমরা কোন লোকের সঙ্গে বিশ বছর বাস করেও তাকে সম্পূর্ণ জানতে এবং চিনতে না-ও পারি। দূরের মানুষকে জানা কিছুটা সহজ। কিন্তু যে লোকের সঙ্গে বাস করি তার পরিচয় পাওয়া বেশ কঠিন।

অধ্যাত্ম বিষয় আমাদের এত নিকট, এত অন্তরঙ্গ, তাই এত রহস্যাবৃত। কিন্তু ঐ রহস্য উদঘাটন ছাড়া আমাদের কোন গত্যন্তর নেই। আজ পর্যন্ত দুনিয়াতে যত বিকাশ হয়েছে সে সবই অধ্যাত্মের রহস্য উদঘাটন দ্বারা সম্ভব হয়েছে। ভৌতিক বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে বিজ্ঞানীরা রহস্য উদঘাটন করছেন, আর এখন তাঁরা আণবিক বিস্ফোরণের ভূমিকা পর্যন্ত পৌঁছেছেন। মানসিক জগতে মনোবিজ্ঞানীরা অনেক অনেক রহস্য উদঘাটন করে অবচেতন মনের ভূমিকা পর্যন্ত পৌঁছে গিয়েছেন। অন্য অনেক ক্ষেত্রে যখনই রহস্যের আবরণ উন্মোচন সম্ভব হয়েছে তখনই নতুন শক্তির প্রবাহ মানুষের আয়ত্তে এসেছে। আর, শক্তিস্রোতের উপলব্ধি রহস্যের উদঘাটন ছাড়া সম্ভব নয় এবং শক্তি-স্রোতের উপলব্ধি না হলে এই সংসারে বিকাশ হতে পারে না। আজ-কালকার ভৌতিক জগতের সমস্ত বিকাশ বিদ্যুৎ এবং ইন্ধনের ওপরে নির্ভরশীল। পেট্রোলের কোন সমস্যা হলে পৃথিবীর সমস্ত রাষ্ট্র

টলমল করে, দারুণ দুর্ভাবনায় পড়ে। তাদের সমস্ত শক্তিস্রোত শুকোতে আরম্ভ করে। আপনি কল্পনা করুন সারা দুনিয়াতে পেট্রোল নেই, বিদ্যুৎ নেই, আণবিক ইন্ধন নেই। তা হলে কি এই ভৌতিক বিকাশ টিঁকে থাকতে পারবে? কখনই তা সম্ভব নয়। এই সবই বিদ্যুতের আধারে সংঘটনশীল। আমাদের এ কথা ভুললে চলবে না যে, আমাদের শক্তির বিকাশের একটি উৎস হল বিদ্যুৎ। যেমন আধুনিক সমস্ত ভৌতিক বিকাশ বিদ্যুতের ওপর নির্ভরশীল তেমনি অধ্যাত্ম শক্তির বিকাশও বিদ্যুতের ওপর নির্ভরশীল। এই হল অধ্যাত্মের রহস্য।

আমাদের শরীর বিদ্যুতের শরীর। এই বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা করার প্রয়োজন নেই। জৈন দর্শনবিদ ভালভাবেই জানেন যে, আমাদের সমস্ত অভিব্যক্তি তৈজস শরীরের মাধ্যমেই হয়। তৈজস শরীর ছাড়া শরীরের সঞ্চালন সম্ভব নয়। তৈজস শরীর বিনা কেউ কথা বলতে পারত না, অঙ্গুলিহেলন করতে পারত না, শ্বাস নিতে পারত না, খেতে পারত না, খাদ্য পরিপাক করতে পারত না। আমাদের সমস্ত ঊর্জা বা শক্তি তৈজস শরীরের মাধ্যমে প্রকট হয়। এই বিদ্যুৎমণ্ডল, বিদ্যুৎ শরীর এবং তৈজস শরীর—এ সবই মনুষ্যদেহে শক্তির অবতরণের এবং অধ্যাত্মের কাছে পৌঁছবার জন্য একটি দুয়ার। তৈজস শরীর দ্বারা আমরা যে শক্তি আয়ত্ত করি তা আজকালকার জগতে বিস্ময়কর বটে। প্রাচীন সাহিত্যে এই সমস্ত শক্তিকে 'লব্ধি' বলা হয়েছে। এগুলিকে 'যোগজ বিভূতি'ও বলা হয়েছে। এই সমস্ত লব্ধি, ঋদ্ধি, যোগজ বিভূতি তৈজস শরীরের মাধ্যমে পাওয়া যায়।

জৈন আগম প্রজ্ঞাপনায় দু রকম মানুষের বর্ণনা পাওয়া যায়—ঋদ্ধিপ্রাপ্ত আর ঋদ্ধিবিহীন মানুষ। যে মানুষ ঋদ্ধি পেয়েছে, বিশেষ শক্তি উপলব্ধি করেছে, সে ঋদ্ধিপ্রাপ্ত মানুষ। তার শক্তিসমূহ যথার্থই বিস্ময়কর।

অধ্যাত্মের আলোচনার প্রারম্ভে বাহ্য বস্তু এবং অধ্যাত্মের মধ্যে আমাদের একটি ভেদরেখা অঙ্কিত করতে হবে। প্রাচীন আচার্যগণ

একটি ভেদরেখা নির্দিষ্ট করেছেন। ভগবান মহাবীর বলেছেন—যে মানুষ অধ্যাত্মকে জানে আর যে বাহ্যকে জানে, সে অধ্যাত্মকে জানে। এর তাৎপর্য এই যে, আমাদের দুই স্থিতি প্রকট—এক বাহ্য জগতের এবং অপরটি অধ্যাত্ম জগতের। একটি আমাদের বাইরের সংসার। অপরটি আমাদের ভেতরের সংসার। বাইরের সংসারের নাম সমাজ, ভেতরের সমাজের নাম ব্যক্তি। সময় সময় আমরা বাহ্য জগতের সঙ্গে সংযুক্ত হই। তার অর্থ, অন্য লোকের সঙ্গে আমাদের সংযোগ হয়। ঐ লোকের সঙ্গে আমাদের সম্বন্ধ স্থাপিত হয়। আমরা সমাজ হয়ে যাই। ব্যক্তি সমাজে পরিণত হয়। যখন আমরা একলা থাকি, কারও সঙ্গে আমাদের সংস্রব থাকে না, আমাদের একাকীত্ব সুরক্ষিত থাকে তখন সমাজ হয়ে যাই না, তখন আমরা ব্যক্তি থাকি। আমাদের সামাজিক জীবনও আছে, আবার ব্যক্তিজীবনও আছে। ব্যক্তি জীবনে সংঘটনশীল ব্যাপারগুলি ভিন্ন প্রকারের হয়।

আমরা দু রকম জীবন যাপন করে থাকি—বৈযক্তিক বা ব্যক্তিগত জীবন এবং সামাজিক জীবন। আমাদের জীবন দু রকম মান-বিশিষ্ট। আমাদের বৈযক্তিক জীবন আধ্যাত্মিক বা আন্তরিক জীবন। আর সামাজিক জীবন আমাদের বাইরের জীবন। এ জীবন আমরা সাধারণত বাইরের জগতে যাপন করি। আমরা দু রকম জীবন যাপন করি এবং দুয়েরই রহস্যের সন্ধান করি। বাহ্য জগতের বা সমাজজীবনের, তথা আন্তরিক জগতের বা ব্যক্তিগত জীবনের ঘটনাবলীর ব্যাখ্যা করি।

অন্তর্জগৎ চেতনার জগৎ, কেবল চেতনার জগৎ। সেখানে শুধু চেতনা থাকে, আর কিছুই থাকে না। তাকে আমরা শক্তি, জ্ঞান বা অন্য যে নামই দিই না কেন, তা বিশুদ্ধ চেতনা মাত্র। ঐ চেতনায় যা আছে তা আনন্দও বটে, শক্তিও বটে, জ্ঞানও বটে। কিন্তু মোটের ওপর তা বিশুদ্ধ চেতনা, তা ছাড়া আর কিছুই নয়।

বাইরের জগৎ বৈচিত্র্যের জগৎ। সেখানে অনেক পদার্থ, অনেক

জিনিস। সেগুলি অণু-পরমাণুর দ্বারা সংঘটিত। অন্তর্জগতে আছে শুধু চেতনা, আর কোন কিছুই নয়।

একটি চেতনার জগৎ, অপরটি পদার্থের জগৎ। যখন আমরা চেতনার জগতের দিকে অগ্রসর হই তখন আমরা যেখানে পৌঁছতে হবে বলে বিচার করি, সে-ই আমাদের অভ্যাস। চেতনা থেকে বিচ্যুত হয়ে, অন্যের সঙ্গে মিলিত হয়ে আমরা যা কিছু করি সেই আমাদের ভৌতিক বা বস্তু জগৎ।

রহস্যের সন্ধানের জন্য আমাদের কিছুটা গভীরতার মধ্যে যেতে হবে। কখনও কখনও কোন কিছু ঘটে আর রহস্য উদ্‌ঘাটিত হয়। কখনও কখনও কোন নিমিত্ত থাকে না, কিন্তু অনায়াসে অতল গভীরতায় ডুব দেওয়ার সুযোগ ঘটে যায়, আর রহস্য প্রকাশিত হয়।

আপনারা রহস্য উদ্‌ঘাটনের সিদ্ধান্ত জানেন এবং অনেক ঘটনার কথাও শুনেছেন।

একটি লোক পাহাড়ের পাশে বসেছিল। সেখানে একটি ঝরণা বয়ে যাচ্ছিল। সেখানে এক হরিণী এল। সে অনেকক্ষণ তার একটি পা জলে ডুবিয়ে রাখল। আর এক দিন এল। তার পরে তৃতীয় এবং চতুর্থ দিনও এল। চারদিন সে খোঁড়াতে খোঁড়াতে এল, পঞ্চম দিনে সে পা সোজা করে চলতে লাগল। সেই লোকটি ভাবল—হরিণীটি কেন রোজ আসে? সে বিচার করল। হরিণীর পা দেখল। তার পা জখম ছিল। হাড় ভেঙ্গে গিয়েছিল। দু-চারদিন জলের উপচার প্রয়োগের ফলে তার পা ঠিক হয়েছিল।

লোকটি এই উপচার আয়ত্ত করল। প্রাকৃতিক চিকিৎসা আরম্ভ হল। জলের এবং মাটির উপচার শুরু হল।

একটি লোক বসে ছিল। সে দেখল একটি বাচ্চা শুয়ে আছে। তার শ্বাস ফুলে উঠছিল। তার গভীর শ্বাস পড়ছিল। পেট ফুলে ছিল, আর শরীর ব্যথায় কুঁকড়ে যাচ্ছিল। সে লা-লা-লা করে এক অব্যক্ত শব্দ করছিল। লোকটি চিন্তা করল। সে ভাবল যে ঐ ধ্বনির সাথে

সাথে একটা কিছু হচ্ছে। সে তার প্রয়োগ করল। ধ্বনি-চিকিৎসার বিকাশ হল। লোকটি শব্দের উচ্চারণ দ্বারা ধ্বনি-চিকিৎসার বিকাশ ঘটাল। এই পদ্ধতি দ্বারা রোগ নিরাময় হল।

একটি লোকের মাথায় অত্যন্ত ব্যথা হয়েছিল। সে বৈদ্যের কাছে গেল। অনেক চিকিৎসা করাল। কিন্তু সবই ব্যর্থ হল। সে জীবন সম্বন্ধে উদ্বিগ্ন হল। তার জীবন দুঃসহ হয়ে উঠল। একবার কোন একটি মানুষের সঙ্গে তার লড়াই হল। তার শত্রু বেগে এসে তাকে বাণ মারল। তার পায়ে লাগল। বাণটি পায়ে বিদ্ধ হওয়া মাত্র তার মাথার ব্যথা একেবারে সেরে গেল। সে আশ্চর্য হয়ে গেল। সে চিন্তা করল—এত উপচার প্রয়োগেও আমার ব্যথা সারে নি, আর একটি তীর লাগতেই তা একেবারে সেরে গেল। মনে হচ্ছে আমার মাথায় কোন কালেই কোন ব্যথা ছিল না। এ রহস্য বুঝতে পারলাম না। সে বৈদ্যের কাছে গেল। নিজের দীর্ঘ কাহিনী তাকে শোনাল। বৈদ্যও বিস্মিত হয়ে গেল। সে ঐ রকম প্রয়োগ শুরু করল। আর একটি লোকের মাথায় ব্যথা হল, তাকে সে তীর মারল। তার ব্যথা সেরে গেল। তৃতীয়, চতুর্থ, পঞ্চম লোকের ওপরে একই প্রয়োগ করল এবং তাদের মাথা ব্যথা সেরে গেল। তখন এই তথ্য স্থাপিত হল যে, মাথার ব্যথা হলে পায়ের বিশেষ স্থানে বাণ বিদ্ধ করলে মাথার ব্যথা সেরে যাবে। এই প্রয়োগের নাম আকুপাংচার চিকিৎসা পদ্ধতি।

আমাদের শরীর বিদ্যুতের শরীর। তাতে বিদ্যুতের প্রাধান্য। আমরা মানি বা না মানি বিদ্যুতের ভারসাম্যের অভাবে যে শরীরে অনেক রোগ হয় এটা অত্যন্ত সুস্পষ্ট তথ্য। তৈজস শরীর অস্থির হলে তাতে নানা প্রকার বিকৃতি সঞ্জাত হয়। যদি আমরা তৈজস শরীরের সমুচিত ব্যবস্থা করি, বিদ্যুতের ভারসাম্য স্থাপন করি, তার সমতা আনি, তবে আমরা নিজে নিজে অনেক কিছুরই সমাপ্তি ঘটাতে পারি, অনেক পরিস্থিতির মীমাংসা আমরা নিজেরাই করতে পারি।

আমি এই সমস্ত আলোচনা এইজন্য করছি যে রহস্যের সন্ধান না

করলে, রহস্য উদ্‌ঘাটন না করলে এই দুনিয়ায় বিকাশ সম্ভব হবে না, শক্তির উপলব্ধি হবে না। প্রাচীন আচার্যগণ অনেক রহস্যের সন্ধান করতেন। আজ আমরা যদি কোন সিদ্ধান্ত বুঝতে পারি কিছুকাল পরেই আমরা তা বিস্মৃত হই। সব কিছু ভুলে যাই। ভুলে যাওয়ার ফলে আমরা ঐ সমস্ত রহস্যের ঠিকমত ব্যাখ্যা করতে পারি না, এবং তাদের প্রয়োগ করতে পারি না।

এই প্রসঙ্গে আমি একটি ঘটনার আলোচনা করব। আমি সত্য একটি কথা পড়েছি—উত্তর দিকে মাথা দিয়ে বা দক্ষিণ মুখে পা রেখে শোয়া উচিত নয়। এই বচন আমাদের দেশে প্রচলিত আছে। কেউ কেউ এ বচন অন্ধ বিশ্বাস বলে মনে করে। তারা বলে—শয়নকালে আমরা পা দক্ষিণ, উত্তর, পশ্চিম বা পূর্ব যে দিকেই রাখি না কেন, তাতে কি পার্থক্য হয়? কোন না কোন দিকে মাথা তো রাখতে হবে। কিন্তু আজকাল প্রত্যেক জিনিসের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা প্রস্তুত করা হচ্ছে। বিজ্ঞানের রহস্য উদ্‌ঘাটনের পরে ব্যাপার এই রকম দাঁড়িয়েছে যে, কোন লোক যদি কোন বিশ্বাসকে অন্ধ বিশ্বাস বলে তবে সে নিতান্ত দুঃসাহসী। আগেকার দিনে এ রকম বলা চলত, আজকাল আর চলে না। সম্প্রতি আমি এই বিশ্বাসের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা পড়ে বিস্মিত হয়েছি।

আমাদের শরীরে দু রকম বিদ্যুৎ আছে—পজিটিভ ও নেগেটিভ। এক হল ধনাত্মক, অপরটি ঋণাত্মক। চোখ, কান, নাক, মাথা, মুখ প্রভৃতি শরীরে ওপরের অংশে আছে ধনাত্মক বিদ্যুৎ। আর পা, জঙ্ঘা প্রভৃতি শরীরের নিচের অংশে আছে ঋণাত্মক বিদ্যুৎ। ব্যক্তি ব্রহ্মাণ্ড থেকে, জগৎ থেকে পৃথক নয়। যখন জগতের সঙ্গে তার সম্বন্ধ স্থাপিত হয় তখন সে সমাজে পরিণত হয়। আমরা বাতাবরণের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে এ জগতে বাস করি। পরিস্থিতিরও প্রভাব আছে। আমরা এই সব কিছুর দ্বারা প্রভাবিত হই।

পৃথিবীর দুটি দিককে ধ্রুব বলে মানা হয়—উত্তর ও দক্ষিণ। উত্তরে

যে ধ্রুব সেখানে অফুরন্ত বিদ্যুৎভাণ্ডার আছে। সেখানে এতই বিজলির প্রকাশ যে সেখানে গেলে মনে হয় শত শত সূর্যের উদয় হয়েছে। এমন চোখ-ধাঁধানো আলো। অন্ধকারের কোন পাত্তাই নেই। দক্ষিণী ধ্রুবতে সম-পরিমাণ বিদ্যুৎ আছে। উত্তরের ধ্রুবতে ধনাত্মক বিদ্যুৎ, দক্ষিণের ধ্রুবতে ঋণাত্মক বিদ্যুৎ। যখন লোকে উত্তর দিকে মাথা দিয়ে শোয় তখন দক্ষিণের দিকে তার পা থাকে। দক্ষিণের দিকে থেকে যে বিদ্যুতের প্রবাহ আসে সেটি ঋণাত্মক। মানুষের পায়ের বিদ্যুৎও ঋণাত্মক। দুই ঋণাত্মক বিদ্যুৎ যেখানে মিলিত হয় সেখানে প্রতিরোধ ঘটে, সংঘর্ষ হয়। একই ভাবে যখন ধন বিদ্যুতের সঙ্গে ধন বিদ্যুৎ মিলিত হয় তখন প্রতিরোধ ঘটে। ফলে একে অন্যের সহায়ক না হয়ে পরস্পরকে পরাস্ত করতে প্রয়াস করে। সেই জন্য যে লোক দক্ষিণদিকে পা রেখে শোয় তার ঋণাত্মক বিদ্যুতের সঙ্গে দক্ষিণী ধ্রুব থেকে আগত ঋণাত্মক বিদ্যুতের সংঘর্ষ লাগে। ঐ রকম পরিস্থিতিতে লোকের মনে নানা রকম দুশ্চিন্তা উপস্থিত হয়, সে খারাপ খারাপ স্বপ্ন দেখে, তার শরীরে নানা রকম রোগ ও বিকৃতি উৎপন্ন হয়। সেই কারণে বৈজ্ঞানিকরা প্রতিপন্ন করেছেন, দক্ষিণ দিকে পা রেখে ঘুমোনো উচিত নয়। তা থেকে শারীরিক ও মানসিক উভয় প্রকার রোগ হতে পারে।

আমরা যেন একথা ভুলে না যাই যে রহস্য উদ্‌ঘাটনের পরে যে তত্ত্ব আমরা বুঝতে পারি এবং সত্য বলে দেখতে পাই এবং যার ওপরে আমাদের যথার্থ বিশ্বাস উৎপন্ন হয় তা শুধু মেনে নেওয়া থেকেই হয় না।

এখন আপনাদের অধ্যাত্ম-রহস্য বোঝানোর জন্য এই সন্দর্ভের অল্প আলোচনা করতে চাই।

ধর্মের মূল সূত্র—পাপ কোরো না, পাপ থেকে নিজেকে রক্ষা কর। কিন্তু কিভাবে নিজেকে বাঁচাতে পারবে, সেই হল প্রশ্ন। মন কত চঞ্চল, শরীর কত চঞ্চল। বাণী কত চঞ্চল। তা ঐ সব থেকে কিছু না কিছু পাপ হয়ে যায়। আমি পাপ থেকে কিভাবে আত্মরক্ষা করব? পাপ থেকে বাঁচার কি উপায় আছে? অধ্যাত্মের রহস্য উদ্‌ঘাটন ছাড়া অন্য

কোন উপায়ে তা সম্ভব নয়. ঐ প্রশ্নের সমাধান সম্ভব নয়। মানুষ পাপের হাত থেকে বাঁচতে পারে এ কথা অনেকে মানতে পারে না। তাদের প্রশ্ন—যে দুনিয়াতে পাপ করার জন্য অনবরত হাজার হাজার প্রেরণা আসছে, সেই দুনিয়াতে বাস করে লোকে কি করে পাপের হাত থেকে আত্মরক্ষা করতে পারে।

ভগবান মহাবীর এ বিষয়ে উপায় নির্ধারণ করার প্রসঙ্গে বলেছেন—এক কচ্ছপ ছিল। যখন কোন সঙ্কটজনক পরিস্থিতি উপস্থিত হতো—পাখিতে তাকে ছোঁ মেরে নিয়ে যেতে গেল, শিয়াল প্রভৃতি পশু তাকে খেতে চেষ্টা করল, কোন রকম নিরাপত্তার অভাব বা ভয় উপস্থিত হলে—সে তৎক্ষণাৎ নিজের খোলের মধ্যে চলে যেত প্রকৃতি তাকে এমন একটি খোল দিয়েছিল যা তার ঢালের মত কাজ করত। প্রাচীন-কালে যখন তলোয়ার আর ঢাল নিয়ে যুদ্ধ হতো তখন যোদ্ধা নিজের হাতে ঢাল রাখত। খোলটি কচ্ছপের পক্ষে সেই ঢাল হয়েছিল। কচ্ছপ নিজের খোলের মধ্যে চলে গেলে সব রকমে সুরক্ষিত হতো। আমাদের কি এমন কোন খোল আছে যেখানে পৌঁছলে আমরা পাপ থেকে মুক্তি পাব? আমাদের মনে বাসনা ফুলে ফেঁপে উঠছে। আমাদের ওপরে বাসনা, ক্রোধ তথা আবেগের আক্রমণ হচ্ছে। এমন কোন উপায় আছে কি যার দ্বারা এই সব আক্রমণ থেকে বাঁচা যায়? হাঁ, উপায় আছে। ভগবান বলেছেন—কচ্ছপ যেমন বাইরের আক্রমণ থেকে বাঁচার জন্য নিজের খোলের ভেতরে চলে যায় তুমিও তেমনি অধ্যাত্মের ভেতরে চলে যাও। সব আক্রমণ থেকে বেঁচে যাবে। অধ্যাত্মের ভেতরে চলে যাও, চেতনার ভেতরে চলে যাও। ভেতরে চলে যাও, অন্দরে প্রবেশ কর, তা হলে সুরক্ষিত হবে। যত দিন মন বাইরে ঘুরে বেড়াবে, তত দিন পর্যন্ত বাসনা ও আবেগ ফুলে ফেঁপে উঠবে। যে সমস্ত পরিস্থিতি চিন্তা, ভয় এবং দুঃখ উৎপন্ন করে সে সবই মনকে ফুলিয়ে-ফাঁপিয়ে দেয়। তুমি ভেতরে চলে যাও, চেতনার জগতে চলে যাও, চেতনার নৈকট্য লাভ কর, সম্পূর্ণভাবে নিরাপদ, সম্পূর্ণভাবে

সুরক্ষিত হবে। কোন বিপদ নেই, কোন ভয় নেই। সে এক জ্বলন্ত শক্তি। এ শক্তি তুমিও অনুভব করতে পার।

এক রকম কথা মানতেই হয়। আমার এক রকম কথা মানার প্রয়োজন নেই, কিন্তু অনুভব করা সম্ভব। অধ্যাত্ম-কথা শুধু মেনে নেওয়ার জিনিস নয়। আপনারা যদি চান তবে আজই এই অবস্থার নির্ণয় করতে পারেন, আজ রাতেই শোবার পর পরই এ সম্বন্ধে অনুভব করতে পারেন। আপনার মনে কোন বিচার আসতে পারে, তার বিকল্প আসতে পারে, অনেক খারাপ চিন্তা মনের ভেতর থেকে ঠেলে উঠতে পারে। আপনি তৎক্ষণাৎ নিজের অন্তরে চলে যান, মনের ভেতরে প্রবেশ করুন। আপনার মনে হবে আপনি যেন অন্য এক জগতে এসে পৌঁছেছেন আর সমস্ত বিকার, বিকল্প ও চিন্তা বাইরের জগতে থেকে গিয়েছে। আর তারা আপনাকে আক্রমণ করতে পারবে না। একেই বলে প্রেক্ষা ধ্যান। এর অর্থ—আপনি নিজেকে দেখতে আরম্ভ করুন। যে মুহূর্তে আপনি নিজেই নিজেকে দেখতে আরম্ভ করবেন, চেতনার ক্ষেত্রে চলে যাবেন সেই মুহূর্তে আপনি বাসনা, ক্রোধ ইত্যাদির আক্রমণ থেকে মুক্ত হবেন। আর কোন কিছুর আক্রমণ হতে পারবে না।

অধ্যাত্মের সাহায্যে আমরা এই সব আক্রমণ থেকে বাঁচতে পারি। আমরা অধ্যাত্মের চর্চা করি তার কারণ অধ্যাত্মই আমাদের এই সব বাইরের আক্রমণ থেকে বাঁচাতে পারে, আর এই সব প্রভাবের বশবর্তী হওয়া থেকে রক্ষা করতে পারে। আজ আমরা অধ্যাত্ম থেকে খানিকটা দূরে চলে গিয়েছি। আজ আমাদের পথ দেখানোর কেউ নেই। অধ্যাত্মের রহস্যও আমাদের অজানা হয়ে গিয়েছে। এর কারণ কি? যা ঘটেছে তা এই—

একটি লোক পথ চলছে। পায়ের আঘাতে জীব মরে যাচ্ছে। আমরা বলি—জীবহিংসা হল। ঐ লোক অনেক প্রাণী মেরে ফেলল, জীবহিংসা করল। এই আমাদের বিচার, ব্যবহারের বিচার, বাইরের

দুনিযাব বিচাব। ভগবান মহাবীব এবং কোন কোন মনস্বী আচার্য এ কথা স্বীকাব কবেন না। তাঁবা এই কথা বলেছেন—অধ্যবসায থেকে বন্ধন হয। এক অধ্যবসায, অপব ঘটনা। দুটো দুই জিনিস। অধ্যবসায় অন্তর্জগতেব বিচাব, ঘটনা বাহ্য জগতে ঘটে। আচার্য ভিক্ষু বলেছেন, যে হত্যা কবে সে হিংসক। যে মাবে অর্থাৎ যাব মাবাব জন্য অধ্যবসায আছে সে হিংসক। জীব বেঁচে থাকল কি মাবা গেল তাব সঙ্গে হিংসাব কোন সম্বন্ধ নেই। জীবেব বেঁচে থাকা কোন দযাব ব্যাপাব নয, জীবেব মৃত্যুও কোন হিংসাব ব্যাপাব নয। জীব মরুক বা না মরুক, সেটা গৌণ ব্যাপাব, অন্য ব্যাপাব। হত্যা কবাব যে সঙ্কল্প, অধ্যবসায এবং তাব পবিণাম, সেই হল মুখ্য কথা। হিংসা হল হত্যাব জন্য অধ্যবসায, কোন জীবেব মৃত্যুব ঘটনা নয। অধ্যবসাযেব জগতে পৌঁছে যখন আমবা বহস্যসমূহ দেখি তখন আমাদেব সমস্ত সাধনপদ্ধতি পবিবর্তিত হযে যায। তাবপব আমবা আব ঘটনাকে মুখ্য বস্তু বলে মেনে কাজ কবি না, অন্তবকে প্রধান মনে কবে আচবণ কবতে থাকি।

সামাজিক জীবন একটা দিক। আন্তবিক জীবনই সামাজিক জীবন সম্বন্ধে নির্ণযেব আধাব। এই কাবণে বলা হয, দিন বা বাত্রি যে কালই হোক, কেউ দেখুক বা না দেখুক, তাতে কোন পার্থক্য হয না। যে স্থিতিতে দেখা বা না দেখাব মধ্যে কোনও প্রভেদ থাকে না, সে হল আন্তবিক ক্ষেত্রে স্থিতি। ব্যবহাবেব জগতে প্রভেদ আসে। যে ব্যবহাবেব নিযম অনুযাযী চলে সে আচবণ কবাব আগে দেখবে আলো না অন্ধকাব আছে, কেউ দেখছে কিংবা দেখছে না। এই বিচাবেব আধাবে তাব আচবণ ঘটবে, সে পদক্ষেপ করবে।

স্বপ্ন কেন আসে? আমবা কেন ঘুমেব মধ্যে স্বপ্ন দেখি? মনস্তাত্ত্বিকদেব ব্যাখ্যা হল, আমাদেব মনেব দমিত বাসনাদি যখন আমাদেব জাগ্রত অবস্থায প্রকট হবাব সুযোগ পায না তখন তাবা স্বপ্নেব ভেতবে প্রকটিত হয। সেই জন্যই ঘুমেব ভেতবে স্বপ্ন আসে। একটা সীমা পর্যন্ত এ কথা ঠিক বটে। কখনও কখনও এমন হয যে,

শোবাব সময যে কথা মনে থেকে যায স্বপ্নে সেই কথা আমাদেব সামনে দৃশ্যমান হয। অধ্যাত্ম-বহস্যেব এটি একটি বড সত্য। ক্রোধ আসে। সে পর্যন্ত পৌঁছে আপনাব স্থিতি বিনষ্ট হয। তাব কোন ওষুধ নেই। তাকে নিযন্ত্রণ কবা যায না। ব্যবহাবেব দিক দিযে এ কথা তো ঠিকই বটে। আমি আপনাদেব সর্বদা ব্যবহাব থেকে মুক্ত থাকতে বলছি না। আমাদেব নিযন্ত্রণ কবাব শক্তি আছে, আমাদেব বিবেক আছে। আমবা বাহ্য জগতে জীবন ধাবণ কবি, এই জন্য আমাদেব ব্যবহাবকেও মেনে চলতে হয। কিছু নিযন্ত্রণ হয, দমনও হয, ওষুধও দেওযা হয। কিন্তু অধ্যাত্মেব চর্চাব সময এসব কথা বলতে কোন সঙ্কোচ হওযা উচিত নয। কাবণ এ শুধু ব্যবহাবেব কথা, অধ্যাত্মেব কোন কথা নয। অধ্যাত্মেব কথাব মূল পর্যন্ত যেন পৌঁছই।

সমস্ত সমস্যাব মূল—বাগ এবং দ্বেষ। প্রচলিত ভাষায বলা যায—হিংসা। পবিগ্রহই বল, অ-ব্রহ্মচর্যই বল, চুবিই বল আব মিথ্যাভাষণই বল—এসব কিছুকেই আমাদেব আচার্যগণ হিংসা বলে স্বীকাব কবেছেন। উলটো দিক থেকে দেখলে বলা যায অহিংসা ছাডা কোন মহাব্রত হয না। দুটি কথাব মধ্যে দুনিযাব সব কিছু এসে যায—হিংসা এবং অহিংসা। অহিংসা কি? বাগ-দ্বেষ প্রভৃতিকে উৎপন্ন হতে না দেওযাব নাম অহিংসা। আপনি অহিংসাব কথা, অহিংসাব ঘটনা হিংসাব সঙ্গে এক কবে দেখবেন না। ঘটনাব শেষ কবে ফেলাব চেষ্টাও কববেন না। যে ক্ষণে বাগ উৎপন্ন হয সেই ক্ষণকে লক্ষ্য করুন। যে ক্ষণে বাগ উৎপন্ন হয প্রকৃতপক্ষে সে-ই হল জাগ্রত থাকাব সময।

প্রেক্ষা ধ্যানেব সূত্র হল—অপ্রমাদ ও জাগরূকতা। কি বিষযে জাগরূকতা? অতীতেব সম্বন্ধে জাগরূক থাকাব কোন প্রযোজন নেই। ভবিষ্যৎ সম্বন্ধেও জাগরূক থাকাব কোন প্রযোজন নেই। বর্তমান ক্ষণ সম্বন্ধে জাগ্রত থাক। বর্তমান ক্ষণ সম্বন্ধে জাগরূক থাকাব তাৎপর্য: যে কোন বীজ পাওযা গেলে তা বর্তমান ক্ষণেই বপন কবতে হবে। পবে ফল আসবে, পবিণাম আসবে, মহীরুহ জেগে উঠবে। সে বৃক্ষকে

আপনি উপড়াতে পারবেন না। আপনি ফলাগম রোধ করতে পারবেন না। আপনি শুধু লক্ষ্য করুন, বীজ বপন করা হয়েছে কিংবা হয় নি। বর্তমান কালের যে ক্ষণে বীজ উপ্ত হয়েছে সেই ক্ষণ সম্বন্ধে আমরা জাগরূক থাকব। সেটি রাগের তথা দ্বেষের ক্ষণ। ঐ রাগের ও দ্বেষের বীজ যে মুহূর্তে বপন করা হয় সেই মুহূর্তে আমি যদি জাগরুক না থাকি তবে পরিণাম-বিষয়ে সজাগ থাকার কোন অর্থ হবে না। অধ্যাত্মের সূত্র থেকে তার যে এক বড় রহস্য প্রতিপন্ন করা হয়েছে সেটা হল—রাগের তথা দ্বেষের ক্ষণ হল হিংসার ক্ষণ। অ-রাগ ও অ-দ্বেষের ক্ষণ অহিংসার ক্ষণ।

বহু বিচিত্র ঘটনা ঘটে থাকে। মনের মধ্যে কোন বিকল্প চিন্তা উঠল, এক বিচার মনে এল। তাকে উপেক্ষা কর। তার পরিণাম এই হবে যে, ঐ বীজ যখন উপ্ত হবে এবং ঐ বীজ যখন বড় হবে, অর্থাৎ বৃক্ষে পরিণত হবে তখন নিশ্চিতভাবে নিজের পরিণাম নিয়ে আসবে। আমরা যেন দুনিয়ার ঘটনাবলী দেখি। পঞ্চাশ-ষাট বছর পর্যন্ত যে যশস্বী থেকেছে, যার জীবনের পূর্ব অংশ তেজস্বিতা ও যশের আলোকে উদ্ভাসিত হয়েছে, সে যখন জীবনের উত্তরাংশে পৌঁছয় তখন তার পতন হয়, সে বিনাশ প্রাপ্ত হয়। এ রকম কেমন করে সম্ভব হয় ভেবে আমরা আশ্চর্য হই। যে লোক পঞ্চাশ-ষাট বৎসর যশস্বী এবং তেজস্বী জীবন যাপন করেছে তার জীবনের পরের দিক কেমন করে পতনের দিকে যেতে পারে? আমরা সাধারণত এর ব্যাখ্যা করতে পারি না। কিন্তু ঐ রকম ঘটনার পেছনে কোন কারণ অবশ্যই আছে। কিন্তু আমরা যদি মনের গভীরতায় এ বিষয়ে সূক্ষ্ম ভাবে চিন্তা করি তবে এই তথ্য স্পষ্ট হবে, যে বীজ বপন করা হয়েছিল, তার প্রায়শ্চিত্ত করা হয় নি, এখন তা বৃক্ষে পরিণত হয়েছে, তার ফলে শেষের ঘটনা ঘটেছে।

মনে রাগ এবং দ্বেষের যে সংস্কার উৎপন্ন হয় তাকে ধুয়ে পরিষ্কার করে ফেলা, পরিবর্তন করা তার প্রায়শ্চিত্ত। এই প্রায়শ্চিত্ত করলে আর ঐ সব সংস্কার উপদ্রব করবে না। বীজকে নষ্ট করে দিলে তা

থেকে বৃক্ষ উৎপন্ন হবে না। প্রাযশ্চিত্ত না কবলে বীজ অঙ্কুবিত হওযাব এবং বেড়ে উঠাব সুযোগ পাবে। কালে কালে তা বৃক্ষে পবিণত হবে, তাব শিকড ছড়িযে পডবে। তখন তাকে আব বশ কবাব উপায থাকে না। তাব যে কষ্টদাযক ফল তা আমাদেব ভোগ কবতে হয। কিন্তু আমবা ঘটনাকে মুখ্য মেনে ব্যবহাবেব চালনা কবি না, পবন্তু অন্তবকে মুখ্য মেনে ব্যবহাবেব চালনা কবি।

অধ্যাত্মেব অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বহস্য এই যে, বাগেব এবং দ্বেষেব বীজ যে ক্ষণে উপ্ত হয সেই ক্ষণ সম্বন্ধে আমাদেব জাগরূক থাকতে হয।

আমবা অহিংস। আমবা অত্যন্ত স্থূলভাবে মেনে নিযেছি যে, কাউকে না মাবাব নাম অহিংসা। কিন্তু বাগ ও দ্বেষেব বীজ যদি মনেব ভেতবে উপ্ত হয তবে কি কবে অহিংসা হবে? ব্যবহাবেব জগতেব কথা তো ঠিকই। কোন লোক যদি কাউকে হত্যা না কবে তবে সে আইনেব কবলে পডবে না। আইন তাকে অভিযুক্ত কববে না, তাকে বিবক্ত কববে না, কেননা সে এমন কোন কাজ কবছে না যাতে সে আইনেব আওতাব মধ্যে আসে। আইনেব সূত্র—কাজ। এমন কাজ যা আইনেব গণ্ডিব মধ্যে আসে। অধ্যাত্মেব সূত্র—অধ্যবসায। কাজ হোক ছাই না হোক অধ্যবসায মাত্র দাযিত্ব হযে যায। এই বকম অধ্যবসায, সঙ্কল্প, বিচাব তথা পবিণাম হিংসাপ্রধান। ঐ বকম ভাব মনে এলে আপনি যদি কিছু না কবেন তবে আপনি হিংসাব বন্ধনে আবদ্ধ হন। আপনি নিজেকে এভাবে প্রস্তুত কবতে পাবেন—আমি তো কোন কিছু কবি নি, তবে আমি ঐ ঘটনাব জন্য দাযী হব কেন? অধ্যাত্ম এ কথা স্বীকাব কবে না আপনি ক্রিযা-রূপে কিছু কবেন নি। সে এই নির্ণযে পৌছতে চায যে, আপনি ঐ রূপ চিন্তা কবেছেন কিংবা কবেন নি। ঐ বকম চিন্তারূপ ক্রিয়া কবেছেন কিংবা কবেন নি। চিন্তাব আধাবে, পবিণাম এবং অধ্যবসাযেব আধাবে অধ্যাত্মেব সমস্ত বিচাব হয, আইনেব সমস্ত বিচাব হয কার্যেব আধাবে। যদি আমবা এই কথা ঠিকমত বুঝতে পাবি তবে জাগরূকতাব ক্ষেত্র মুক্ত হযে যায,

জাগরূকতার সীমা বেড়ে যায়। আবার আমরা মূল সম্বন্ধে যতটা জাগরূক হই পরিণাম সম্বন্ধে ততটা জাগরূক হই না। যখন আমাদের মন প্রমাদ দ্বারা কিছুটা আচ্ছন্ন হয় তখন আমাদের জাগরূকতা পরিস্থিতি তথা পরিণামের ওপরে নিবদ্ধ হয়। আমরা ভাবতে থাকি—ও আমার বিরুদ্ধে অভিযোগ করেছে, ও আমার সঙ্গে এই রকম ব্যবহার করেছে, ও আমাকে অপমান করেছে। আমাদের সমস্ত চিন্তা বাহ্য জগতের দিকে যায়। আমরা চিন্তা করে দেখি না এতে রাগ ও দ্বেষের মুহূর্ত কি ভাবে উজ্জীবিত হয়। অর্থাৎ আমরা অধ্যাত্ম থেকে বিচ্যুত হয়ে বাইরের বিচারের দিকে চলে যাই।

ভগবান মহাবীর এক গুরুত্বপূর্ণ সূত্র দিয়েছেন—সমস্ত দায়িত্ব আত্মার। তিনি কখনও বলেন নি যে আত্মা ছাড়া মানুষের কোন শত্রু বা মিত্র আছে। তিনি বলেছেন, আত্মাই মানুষের মিত্র। কিন্তু মিত্রের খোঁজ কেউ করে না। তিনি কখনও বলেন নি, অন্য কেউ তোমাদের বন্ধনদশায় নিয়ে যায়। ঐ বন্ধন এবং বন্ধনমুক্তির দায়িত্ব, ঐ পুণ্য এবং পাপের দায়িত্ব, ঐ সুখ ও দুঃখের দায়িত্ব—এ সমস্ত দায়িত্ব আত্মার। সব কিছু কর্মের কর্তা আত্মা। সব কিছু দায়িত্ব আমাদের ওপরে ন্যস্ত, অধ্যাত্মের এই গভীর তত্ত্বে কি আমরা পৌঁছনোর চেষ্টা করি? আমরা হামেশাই প্রত্যেক ব্যাপারের দায়িত্ব অন্যের ওপরে আরোপ করি এবং যখন অন্যের ওপরে দায়িত্ব আরোপ করি না তখন আমাদের মন হতবুদ্ধি হয়ে যায়। আমরা এখানে সেখানে খোঁজ করি অমুক এ রকম করেছে, অমুক ঐ রকম করেছে। ঐ রকম করে আমরা নিজেদের হালকা বোধ করি, আর ভাবি এ রকম কাজই চলছে। কিন্তু অধ্যাত্মের রহস্য এ থেকে ভিন্ন। অধ্যাত্মের গুরুত্বপূর্ণ তত্ত্ব: কেউ কারও জন্য দায়ী নয়। আপনাদের আত্মার, আপনাদের অধ্যবসায়ের সমস্ত কিছু ঘটনার জন্য চূড়ান্ত দায়িত্ব।

আমি আপনাদের কাছে অধ্যাত্মের রহস্য বিষয়ে দু-তিন রকম আলোচনা উপস্থিত করেছি। ঐ আলোচনার জন্য অনেক বিস্তার

প্রযোজন। কিন্তু আমি তা সংক্ষেপে বিবৃত কবেছি। যদি এই দু-তিন বহস্যের উদঘাটন আমাদেব মনে হওয়া সম্ভবপব হয, আমাদেব জীবনে হওযা সম্ভব হয, তবে আব কোন বহস্যেব সন্ধানেব প্রযোজন নেই। আজ আমি যে সব আলোচনা কবেছি সেই সব বহস্যেব সন্ধান সকলে কবে। আমাদেব তীর্থঙ্কবগণ, আমাদের আচার্যগণ ঐ সব তত্ত্বেব খোঁজ কবেছেন। তাঁদেব বাণীব সাবাংশ আমি আপনাদেব কাছে বিবৃত কবেছি।

আপনাবা একটু একটু স্মবণ বাখবেন। এই সব বহস্যেব ওপবে আমাদেব ধ্যান কেন্দ্রিত হোক, আব নতুন নতুন বহস্যেব সন্ধানেব জন্য ব্যাকুলতা, ভাবনা এবং শ্রদ্ধা আপনাদেব মনে জেগে উঠুক। আমাব মনে হয আমাদেব পুরুষকাব যদি এই দিকে এগিযে যেতে থাকে, তবে এই সংসাবে ক্লেশভোগকাবী লোক বহু শাবীবিক ব্যাধি এবং মানসিক সংকট থেকে বাঁচতে পাবে এবং কচ্ছপেব রীতি অনুসবণ কবে এ বকম খোল তৈবি কবতে পাবে যে, সমস্ত আক্রমণ থেকে বেঁচে সে নিজেকে সুবক্ষিত মনে কবতে পাবে।

১৪

অধ্যাত্ম ও ব্যবহার

কোন কাজে প্রবৃত্ত হওয়ার পূর্বে তার উদ্দেশ্য সম্বন্ধে সুস্পষ্ট ধারণা করা আবশ্যক। বিনা প্রয়োজনে মূর্খ ব্যক্তিও কোন কাজে প্রবৃত্ত হয় না। এ জন্য প্রয়োজন কি, তা স্পষ্ট করে প্রকাশ করতে হয়। প্রাচীন কালে গ্রন্থরচনার প্রারম্ভে মঙ্গলাচরণ করা হত এবং উদ্দেশ্য ও সম্বন্ধ কি তা বলা হতো। এখনও সেরকম করা আবশ্যক। আমরা যা করতে যাচ্ছি, তার উদ্দেশ্য পরিস্ফুট করতে হবে। যদি আত্ম-সাধনা, ধ্যান বা সমাধির জন্য প্রচেষ্টা করতে চাই তবে সেগুলির উদ্দেশ্য সম্বন্ধে আমাদের অবহিত হতে হবে। কেন আমরা এই রকম চেষ্টা করব? এই প্রকার প্রচেষ্টার দ্বারা আমরা কি হতে চাই?

দু রকম স্থিতি আছে। এক স্থিতি হল 'হয়েছে', আর অপরটি হল 'হতে যাচ্ছে'। 'কি হয়েছে' তা প্রকৃতিবাদী দর্শন, বর্ণন ও নিরূপণ করে। কিন্তু আচার শাস্ত্র বা আচার বিজ্ঞানের প্রতিপাদ্য হল 'কি হতে চাই?' যেখানে মূল্যের প্রশ্ন ওঠে, সেখানে হওয়ার ব্যাপারে জিজ্ঞাসা আসে 'কি হতে চাই?' প্রতিটি ব্যক্তির পক্ষে কি হওয়া উচিত? সমাজের কি হওয়া উচিত? যেখানে হওয়ার কথা আসে, সেখানে মূল্য-বোধের বিকাশ হয়, আচার শাস্ত্রের বিকাশ হয়। হওয়ার কথার সঙ্গে

'আমাকে কি হতে হবে'—এই প্রশ্ন স্বভাবতই জড়িত থাকে। 'কেন হতে চাই'—এই বিষয়েও ধারণা স্পষ্ট হয়ে যায়।

জৈন আগমে দুইটি শব্দ ব্যবহৃত হয়—'সংজ্ঞোপযুক্ত' এবং 'নো-সংজ্ঞোপযুক্ত'। চেতনা দুই প্রকারের হয়—সংজ্ঞোপযুক্ত চেতনা, আর নো-সংজ্ঞোপযুক্ত চেতনা। চেতনাতে যখন সংজ্ঞা থাকে তখন তাকে সংজ্ঞোপযুক্ত চেতনা বলে, আর চেতনা যখন সংজ্ঞাকে অতিক্রম করে তখন তা হয় নো-সংজ্ঞোপযুক্ত চেতনা। বীতরাগ নো-সংজ্ঞোপযুক্ত, তার ক্ষেত্রে বা তার চেতনাতে কোন সংজ্ঞা থাকে না। বীতরাগ সংজ্ঞাতীত চেতনার অর্থ হল—বিশুদ্ধ চেতনা, কেবল চেতনা। যে চেতনার সঙ্গে সংজ্ঞা মিশ্রিত থাকে, যে চেতনা সংজ্ঞার দ্বারা প্রভাবিত হয়, যে চেতনা সংবেদনাত্মক হয়—তাকে সংজ্ঞোপযুক্ত চেতনা বলা যায়। সংজ্ঞা দশ প্রকার, যথা—

১। আহার সংজ্ঞা	৬। মান সংজ্ঞা
২। ভয় সংজ্ঞা	৭। মায়া সংজ্ঞা
৩। মৈথুন সংজ্ঞা	৮। লোভ সংজ্ঞা
৪। পরিগ্রহ সংজ্ঞা	৯। লোক সংজ্ঞা
৫। ক্রোধ সংজ্ঞা	১০। ওঘ সংজ্ঞা

আমাদের সাধনার একমাত্র উদ্দেশ্য হল চেতনা থেকে এইসব সংজ্ঞাকে বহিষ্কৃত করা, অর্থাৎ বীতরাগ হয়ে যাওয়া। এই আমাদের অধ্যাত্ম-সাধনার উদ্দেশ্য। চেতনার সাথে যে সংবেদন যুক্ত আছে, যে সংজ্ঞা জড়িত আছে, তাদের নির্মূল করা—এই আমাদের স্পষ্ট লক্ষ্য। এই কাজের দ্বারা কোন চমকপ্রদ শক্তি অর্জন করা আমাদের উদ্দেশ্য নয়, উদ্দেশ্য কেবল নিজের চেতনাকে সংশোধন ও পরিমার্জন করা—পরিষ্কার করা। যখন ব্যক্তির চরিত্র পরিমার্জিত ও পরিষ্কৃত হয়, তখন তার বিকাশ আরম্ভ হয়ে যায়। তবে কি আমরা আহার করব না? আহার-সংজ্ঞাকে সমাপ্ত করার অর্থ কি এই? নিশ্চয়ই নয়। শরীর থাকতে এটা সম্ভবই নয় যে আমরা আহার করব না। আহার না করলে

সাধনার সামর্থ্যও থাকবে না। সাধনার জন্য শরীর যদি প্রয়োজনীয় হয়, তবে শরীরের জন্য আহারও প্রয়োজনীয়। আহার ত্যাগ করা সম্ভব নয়, কিন্তু আহারের প্রতি আসক্তি বা বাসনা ত্যাগ করা সম্ভব।

এই সব সংজ্ঞার মধ্যে এমন কিছু আছে যাতে নির্মল জলে খানিক কাদা মিশে যায়। জল স্বভাবতই নির্মল, কিন্তু তাতে ধুলো পড়লে, আবর্জনা জমলে, তা ময়লা হয়ে যায়। চেতনা স্বভাবতই শুদ্ধ, কিন্তু তাতে বিভিন্ন সংজ্ঞা এসে যুক্ত হয়, ফলে তা বিকৃত হয়ে যায়।

ময়লা জল পরিষ্কার করা যায়। পরিষ্কার করার অনেক পদ্ধতি প্রচলিত আছে। প্রাচীন কালে ঐ রকম অনেক পদ্ধতি ছিল। ময়লা জল নির্মল হতে পারে। জল স্বভাবত স্বচ্ছ ও নির্মল। তার নির্মলতা একেবারে নষ্ট করা যায় না। যে আবর্জনা জলে মিশেছে তা দূর করা যায়। আবর্জনা দূর করে দিলেই জল আগের মত নির্মল হয়ে যায়।

আমাদের চেতনা নির্মল। তার নির্মলতার সমাপ্তি বা বিনাশ নেই। তবে চেতনার এই অবস্থান্তর ঘটতে পারে যে, যখন তাতে সংজ্ঞার আবর্জনা এসে জোটে, সংবেদনের মালিন্য এসে লাগে, তখন তা মলিন ও অপরিচ্ছন্ন হয়ে যায়। তখন চেতনা আবৃত হয়ে যায়, তার স্বচ্ছতা আর থাকে না। যেমন ময়লায় আবৃত হলে দর্পণ অন্ধ হয়ে যায়। তখন তার প্রতিবিম্ব গ্রহণ করার ক্ষমতা কমে যায় বা একেবারে লোপ পায়। কিন্তু ঐ দর্পণকে পরিষ্কার করলেই তার ক্ষমতা আবার প্রকট হয়, তা প্রতিবিম্ব গ্রহণ করতে সক্ষম হয়।

সংজ্ঞার সংস্পর্শে চেতনা ধোঁয়াটে ও অস্পষ্ট হয়ে যায়, মলিন হয়ে যায়। চেতনাকে নির্মল করা, তাকে তার প্রকৃত অবস্থায় এনে কেবল চেতনারূপে প্রতিষ্ঠা করা—এই হল আমাদের সাধনার উদ্দেশ্য।

সাধনার রহস্য হল কেবল জানা। তা এখনও লাভ করা সম্ভব। কেবলজ্ঞান অর্থাৎ কোরা জ্ঞান শুধু জ্ঞানই, তার মধ্যে সংবেদনের সংস্পর্শ নেই। আপনি ইচ্ছা করলেই এর অভ্যাস করতে পারেন। আপনি কেবলজ্ঞানের অবস্থায় এসে কেবলজ্ঞানী হয়ে যেতে পারেন।

কেবলজ্ঞানকে সাধনার অন্তিম স্তর, সাধনার চরম লক্ষ্য বলা হয়; আবার কেবলজ্ঞান সাধনার প্রথম চরণও বটে। যতক্ষণ কেবল জ্ঞানের অভ্যাস না হবে ততক্ষণ সাধনার ক্ষেত্রে অগ্রসর হওয়ার অধিকার পাওয়া যাবে না। সাধনার ক্ষেত্রে প্রবেশ করা আমাদের পক্ষে তখনই সম্ভব হবে যখন আমরা কেবলজ্ঞান অভ্যাস করতে ব্রতী হই। যা আদিতে, অন্তেও তাই। আদিতে যে কেবলজ্ঞান সাধন, অন্তে সেই কেবলজ্ঞান নিজেই সাধ্য।

উপাদান উপাদানই থাকে। উপাদানের মধ্যে প্রথমে যা হয়, অন্তেও তাই থাকে। কোন পার্থক্য হয় না। আমাদের চেতনা যদি কেবল চেতনা না হয় তবে আমরা কখনও কেবলজ্ঞান প্রাপ্ত হব না। কেবলজ্ঞান তখনই প্রাপ্ত হওয়া যায় যখন আমরা প্রথম ক্ষণেই তাকে প্রাপ্ত করে নিতে পারি। প্রথম ক্ষণের কেবলজ্ঞানই অন্তিম ক্ষণের কেবলজ্ঞান রূপে দেখা দেয়। সাধনার প্রথম ক্ষণেই যদি কেবল-জ্ঞানের সন্ধান না মেলে তবে সাধনার কোন ক্ষণেই—তা লক্ষ বৎসর-ব্যাপী সাধনা হোক না কেন—কেবলজ্ঞান লাভ করা যাবে না। সাধনার প্রথম ক্ষণেই তাকে লাভ করতে হবে, তবেই অন্তিম ক্ষণে তাকে লাভ করতে পারব।

কুম্ভকার একটি ঘড়া বানাল। ঐ ঘড়া যদি প্রথম ক্ষণেই ফেটে না যায় তবে আর কখনও ফাটবে না। একটি শিশু জন্মাল। সে যদি প্রথম ক্ষণেই মরে না যায় তবে আর কখনও সে মরবে না। সে অমর হয়ে গেল, কখনও সে মরবে না। যার প্রথম ক্ষণে বিনাশ ঘটে নি তার আর কখনও বিনাশ ঘটবে না। প্রথম ক্ষণেই যার সমাপ্তি ঘটে নি, কখনও তার সমাপ্তি ঘটানো যাবে না। প্রথম ক্ষণেই যদি কেবলজ্ঞান না হয়, তবে আর কখনও কেবলজ্ঞান হবে না। বাস্তবিক পক্ষে কেবলজ্ঞান হল কোরা জ্ঞান। এই জ্ঞানের সঙ্গে সংবেদন মিশ্রিত নেই। যখন আমরা সাধনার এরকম স্তর প্রাপ্ত হব তখন আমরা কেবলজ্ঞানের স্থিতি পর্যন্ত পৌঁছতে পারব।

প্রাণকে সংবেদন-শূন্য করা, সংজ্ঞার প্রভাব থেকে মুক্ত করা, যোগ-সংযোগ থেকে মুক্ত করা—এই হল আমাদের সাধনার উদ্দেশ্য। প্রশ্ন হতে পারে, এমন করা কি করে সম্ভব হতে পারে? এই বিষয়ে আমি কিছু বিচার করতে চাই।

যোগ-সংযোগ থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য লোকোত্তর চিত্ত গঠন করতে হয়। আমাদের চিত্ত দুই প্রকারের—লৌকিক চিত্ত, আর লোকোত্তর চিত্ত। যে চিত্ত সংজ্ঞার ফাঁদে পড়েছে, সংবেদনার সঙ্গে জড়িত হয়ে গেছে, তা-ই হল লৌকিক চিত্ত। যে চিত্ত পূর্বোক্ত দশটি সংজ্ঞাকেই অতিক্রম করেছে—তাদের বন্ধন থেকে মুক্ত হয়েছে—তাই হল লোকোত্তর চিত্ত। যিনি লোকোত্তর চিত্ত লাভ করেছেন, তিনি নো-সংজ্ঞোপযুক্ত হয়ে গেছেন। একই শক্তি দুই ক্ষেত্রেই কাজ করে। যে ঊর্জা, যে প্রাণ ও যে শক্তি লৌকিক চিত্তে কাজ করে, সেই ঊর্জা, সেই প্রাণ ও সেই শক্তি লোকোত্তর চিত্তেও কাজ করে।

শরীরের দুটি মুখ্য কেন্দ্র আছে। তাদের একটি কাম-কেন্দ্র, অপরটি জ্ঞান-কেন্দ্র। নাভির নিচে যে স্থান তা কাম-কেন্দ্র বা বাসনা-কেন্দ্র। মস্তিষ্ক হল জ্ঞান-কেন্দ্র। আমাদের শরীরে ঊর্জার একই প্রবাহ আছে। যে স্থানে মন যাবে ঊর্জাও সেই স্থানে যাবে, প্রাণও সেই স্থানে যাবে। যদি আমাদের মন, আমাদের চিন্তন কাম-কেন্দ্রের দিকে অধিক পরিমাণে আকৃষ্ট হয়, তবে ঐ কেন্দ্রের বল ও শক্তি বাড়বে, ঐ কেন্দ্র সমৃদ্ধ হতে থাকবে। প্রকৃতির এই অমোঘ নিয়ম যে, যা কিছু সিঞ্চন লাভ করবে তা-ই পুষ্ট হবে। যা সিঞ্চন পায়না তা শুকিয়ে যায়, নষ্ট হয়ে যায়। যা সিঞ্চন পায় তা বাড়ে ও সমৃদ্ধ হয়। আমাদের ঊর্জার সিঞ্চন যে কেন্দ্র লাভ করবে সে কেন্দ্র অবশ্যই পুষ্ট হবে, বাড়বে এবং সমৃদ্ধ হবে, তা সে কাম-কেন্দ্রই হোক বা জ্ঞান-কেন্দ্রই হোক। যদি এই সিঞ্চন নিচের দিকে, কাম কেন্দ্রের দিকে, যায়, তবে আমাদের ঊর্জার প্রবাহ ঐ দিকেই ঘুরে যাবে। আমাদের সমস্ত প্রাণশক্তি ঐ দিকেই প্রবাহিত হতে আরম্ভ করবে। ফলে কাম-কেন্দ্র বলবান হতে

থাকবে, আর জ্ঞান-কেন্দ্র দুর্বল হয়ে পড়বে। এই হল লৌকিক চিত্তের প্রক্রিয়া। লৌকিক চিত্তের কাজই হল, সর্বদা কামনাকে পুষ্ট করা, সেচন দিয়ে কাম-কেন্দ্রকে বলবান করা। আমরা ভালরূপেই এটা জানি যে, আমাদের জীবনে কামনার আকর্ষণ যতটা প্রবল আর কোন আকর্ষণই ততটা প্রবল নয়। মনোবৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে ঐ আকর্ষণ নিরন্তর স্থায়ী। ক্রোধের আবেগ কখনও কখনও হয়, লোভের চেতনাও কখনও কখনও প্রকাশ পায়, কিন্তু কামের চেতনা নিরন্তর থাকে। যখন আমাদের চেতনা কাম-কেন্দ্রের দিকে অধিক পরিমাণে প্রবাহিত থাকে, তখন সহজেই জ্ঞান-কেন্দ্রের শক্তি ক্ষীণ হতে আরম্ভ করে। সাধনার দ্বারা এই অবস্থার পরিবর্তন করতে হবে। যে সাধক নিজের জ্ঞানের বিকাশ চায়, নিজের শক্তির অভিব্যক্তি চায়, নির্মলতা চায়, তাকে অবশ্যই চেতনার প্রবাহকে ওলটাতে হবে, ঘোরাতে হবে। অর্থাৎ তাকে ওপরের দিকে মনকে তুলে আনতে হবে।

ওপরে দেখ—ওপরের দিকে তাকাও। এর এই অর্থ করা যেতে পারে যে, মোক্ষের দিকে তাকাও। কিন্তু মোক্ষ অনেক দূরে। অত দূরে আমরা কেন যাব? কাছে যা আছে, তাই আমরা দেখব, কিন্তু মনের গতি ফেরাব মস্তিষ্কের দিকে। গতিকে এভাবে বদলে দেব। প্রাণধারার প্রবাহকে ঘুরিয়ে দেব, তার গতিকে বদলে দেব। তাকে ওপরের দিকে, জ্ঞান-কেন্দ্রের দিকে, চালিত করব। তখন জ্ঞান-কেন্দ্র প্রাণধারা থেকে সিঞ্চন পাবে। সিঞ্চন পেলেই জ্ঞানকেন্দ্র পুষ্ট হবে, আমাদের সাধনা সহজেই সফলতার দিকে অগ্রসর হবে। জ্ঞানকেন্দ্র তখনই পুষ্ট হয় যখন আমাদের ঊর্জা জ্ঞানকেন্দ্রে প্রবাহিত হয়। ঊর্জার এই যে ঊর্ধ্বগতি, তাকেই কুণ্ডলিনীর জাগরণ বলা যায়, বিশিষ্ট জ্ঞানের উপলব্ধি বলা যায় বা ঐ রকম অন্য কিছুও বলা যায়। জ্ঞানের সকল কেন্দ্র মস্তিষ্কে আছে। আবার শক্তির সমস্ত স্রোতও ঐ মস্তিষ্কে আছে।

শরীর শাস্ত্রের দিক দিয়ে দেখলে দেখা যায় যে, মস্তিষ্কই সমস্ত শরীর-তন্ত্রের সঞ্চালন করে। পায়ে একটা ছোট কাঁটা ফুটল, ফলে

পায়ে ব্যথা হল, কাঁটা যে ফুটেছে তার অনুভব হল। আর অমনিই হাত এগিয়ে এল পায়ের সাহায্যে। কিন্তু কেন এমন হল? কাঁটা ফুটলেই আমাদের নাড়ি-মণ্ডল বা নাড়ি-সংস্থান সক্রিয় হয়ে ওঠে, আর মস্তিষ্ক পর্যন্ত এই সংবাদ পৌঁছে দেয় যে, পায়ে কাঁটা ফুটেছে। মস্তিষ্ক তৎক্ষণাৎ আদেশ দেয়, কাঁটা বের করে দাও। এই আদেশ হাত পর্যন্ত আসে, আর তখন হাতের আঙুল এগিয়ে এসে পায়ের কাঁটা বের করে দেয়। এই সমস্ত সঞ্চালনই মস্তিষ্ক থেকে হচ্ছে। ওটাই সঞ্চালনের মুখ্য কেন্দ্র। মস্তিষ্কের ওপর ধ্যান যতই কেন্দ্রিত হবে, মস্তিষ্কের বিকাশ ততই ঘটতে থাকবে। আমরা তার খুব কম অংশের বিকাশই করতে পেরেছি। এর কারণও স্পষ্ট। আমাদের যতটা শক্তি আছে, আমাদের যতটা ক্ষয়োপশম ক্ষমতা আছে, তা আমরা কাজে লাগাতে পারি না। আমাদের ক্ষয়োপশম ক্ষমতার সামান্য অংশই কাজে লাগে, বাকিটা পড়েই থাকে।

বিজ্ঞানের ভাষায় বলা যায় যে, মস্তিষ্কের যত ক্ষমতা আছে তার ব্যবহার আমরা করতে পারি না। ক্ষমতার শতকরা সামান্য অংশই আমরা ব্যবহার করতে সমর্থ হই। তার কারণ মস্তিষ্কের যে প্রকোষ্ঠ-গুলি খুললে অতিরিক্ত চেতনা আমাদের কাজে আসতে পারে, সেই প্রকোষ্ঠগুলি খোলার কোন প্রয়াসই আমরা করি না। আমাদের এই অসামর্থ্যের হেতু এই যে, আমাদের চেতনার সকল প্রবাহ নিচের দিকেই চলেছে। সেজন্য সাধনার এক মহৎ উদ্দেশ্য হল কাম-কেন্দ্রের দিকে প্রবাহিত মনের ধারাকে, কাম-কেন্দ্রের দিকে প্রবাহিত মনের ঊর্জাকে, মোড় ঘুরিয়ে ওপরের দিকে নিয়ে যাওয়া। এটি একটি শ্রেষ্ঠ সাধনা।

আমাদের মনে নানা সংজ্ঞা উৎপন্ন হয়। আহারের সংজ্ঞা উৎপন্ন হয়, মৈথুনের সংজ্ঞা উৎপন্ন হয়। এদের উৎপত্তির কি কারণ? শাস্ত্রে প্রত্যেক সংজ্ঞার উৎপত্তির চার চারটি কারণ আছে বলা হয়েছে। তাদের মধ্যে একটি কারণ খুবই গুরুত্বপূর্ণ। সেই কারণ হল—স্মৃতি। বার বার আহারের স্মৃতি, বার বার ভয়ের স্মৃতি, বার বার মৈথুনের স্মৃতি, বার বার

কামের স্মৃতি মনে উদয় হচ্ছে, আর সঙ্গে সঙ্গে ঐ সব সংজ্ঞা উত্তেজিত হয়ে উঠছে, উদ্বেল হয়ে যাচ্ছে। বার বার স্মরণ করা, বার বার চর্চা করা, বার বার আপনার প্রাণশক্তিকে সংজ্ঞার দিকে প্রবাহিত করে দেওয়া—এই হল সংজ্ঞার উদ্দীপনের পথ। সংজ্ঞা উদ্দীপ্ত হওয়ার কারণ ঘটেছে, আমরা চেতনাকে তার দিকে নিয়ে গিয়েছি, তাই তার উদ্বেল হয়ে ওঠার সুযোগ মিলেছে। যদি চেত না তার দিকে না যেত তবে তার উদ্বেল হওয়ার কারণ ঘটত না। এজন্য মহর্ষিগণ গভীর চিন্তা করে বলেছেন, সাধক যেন 'বিকথা' না করে। এ অতি গূঢ় তাৎপর্যপূর্ণ কথা। সাধক চর্চা করতে পারে, কিন্তু তার 'বিকথা' করা উচিত হবে না। কারণ তার মন যদি বিকথায় আসক্ত হয় তবে তারা সমস্ত প্রাণ-ধারাই ঐদিকে প্রবাহিত হতে আরম্ভ করবে। তাহলে সাধনার ক্রম স্তব্ধ হয়ে যাবে। সে জন্য ঊর্জাকে কোন দিকে বইয়ে দিতে হবে, সে বিষয়ে আমাদের ধ্যানকে কেন্দ্রিত করতে হবে।

সাধনার দৃষ্টিতে জাগরণের সূত্র খুবই গুরুত্বপূর্ণ। জাগরণের অর্থ হল—প্রবহমান ঊর্জার প্রতি জাগরূকতা। অর্থাৎ, ঊর্জার প্রবাহ কোন্ দিকে চলেছে? যদি প্রবাহ নিচের দিকে চলতে থাকে, তবে তার মোড় ঘুরিয়ে তাকে ওপরের দিকে নিয়ে যাওয়া।

সংজ্ঞা দশটি। তাদের মধ্যে আটটি সংজ্ঞার অর্থ স্পষ্ট। যথা—আহার সংজ্ঞা, ভয় সংজ্ঞা, মৈথুন সংজ্ঞা, পরিগ্রহ সংজ্ঞা, ক্রোধ সংজ্ঞা, মান সংজ্ঞা, মায়া সংজ্ঞা আর লাভ সংজ্ঞা। এগুলি সহজেই বোঝা যায়। বাকি দুইটি সংজ্ঞা লোক সংজ্ঞা আর ওধ সংজ্ঞা। এদের সম্বন্ধে কিছু জানা দরকার।

'লোক' শব্দের অনেক অর্থ আছে। তাদের মধ্যে এক অর্থ, শরীর। সুতরাং লোক সংজ্ঞার অর্থ দাঁড়াল, দেহাসক্তি। কেবল মানুষের নয়, প্রত্যেক প্রাণীরই দেহাসক্তি থাকে। শরীরের প্রতি তার নিবিড় সম্বন্ধ থাকে। প্রত্যেক প্রাণীই শরীরকে বাঁচাতে প্রযত্ন করে। কিন্তু সাধকের কাছে শরীর বাঁচানোর প্রশ্নই মুখ্য নয়। শরীরকে ঠিকমত রক্ষা করা

আবশ্যক বটে। কিন্তু তা মুখ্য উদ্দেশ্য নয়। তাকে প্রথম স্থান দেওয়া যায় না, দ্বিতীয় স্থান হয়ত দেওয়া যায়।

লোক-সংজ্ঞার আর এক অর্থ, লৌকিক মান্যতার ধারণা দিয়ে মগজ ভরে দেওয়া। অনেক রকম মান্যতা মাথায় ঢুকিয়েছি। সে জন্য চেতনার বিকৃতি প্রবল হয়েছে। এখানে একটা ছোট কথা বলি। লোক-প্রচলিত বিশ্বাস অনুসারে আমরা ধরেই নিয়েছি যে, স্বভাবকে বদলান যায় না। এই ধারণাই আমাদের দৃঢ় হয়েছে। ফলে, আমাদের চেতনায় এক ছিদ্র হয়েছে, আর ছিদ্রপথে বিষ প্রবেশ করে চেতনার সঙ্গে মিশে গিয়েছে। এখন আমরা কিছু করতেই আর সক্ষম নই, কারণ আমাদের দৃঢ় নিশ্চয় হয়েছে যে, স্বভাব বদল করা সম্ভব নয়। সে জন্যই একটা গভীর অর্থপূর্ণ কথা মনে রাখতে হয়—কোন বিষয়ে ধারণা করার পূর্বে সেই বিষয়ের প্রকৃত তত্ত্ব বুঝতে হয়। কারণ যে ধারণা একবার হয়ে যায়, তা আর ছাড়তে চায় না, আমরা ঐ ধারণার দ্বারা আবদ্ধ হয়ে যাই। চেতনার সমস্ত প্রবাহ তখন বিপরীতমুখী হয়ে যায়।

একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নের বিষয় হল—সংকল্পের স্বতন্ত্রতা বা স্বাধীনতা। আমরা কি সংকল্প করার ব্যাপারে স্বাধীন? এই প্রশ্ন নিয়ে ভারতীয় ও পাশ্চাত্য দর্শনে যথেষ্ট চিন্তন ও মনন করা হয়েছে।

পশ্চিমে তিন প্রকার মতবাদ চলিত আছে, যথা—

১। নিয়তিবাদ।

২। আত্মবাদ।

৩। আত্ম-নিয়তিবাদ।

প্রথম বাদ—নিয়তিবাদ। নিয়তিবাদী মনে করে যে মানুষ যন্ত্রবৎ। যে রকম পরিস্থিতি হয়, যে রকম বাতাবরণ হয়, মানুষকে তদনুসারেই কাজ করতে হয়। সে সর্বদাই যন্ত্রবৎ পরিচালিত হয়। মানুষের নিজের কোন স্বাধীন সংকল্প নেই। এই হল নিয়তিবাদী ধারা।

দ্বিতীয় হল আত্মবাদী ধারা। ঐ মতবাদ অনুসারে সংকল্প করার

বিষয়ে মানুষের স্বাধীনতা আছে। মানুষ পরিস্থিতির দাস নয়, সে পরিস্থিতির দ্বারা প্রভাবিত হয় না।

তৃতীয় হল আত্ম-নিয়তিবাদী ধারা। আত্ম-নিয়তিবাদীর মত এই যে, নিয়তি সত্য হতে পারে, কিন্তু আমাদের পরিস্থিতিতে নিয়তি কোন বাধার সৃষ্টি করতে পারে না। আমরা পূর্ণভাবেই স্বাধীন, সর্বদাই স্বাধীন।

আমরা কি সংকল্প করার ব্যাপারে পরাধীন? আমরা কি যন্ত্রের তুল্য? আমরা কি পরিস্থিতির দাস? অথবা, আমরা কি পূর্ণভাবে স্বাধীন? কোন পরিস্থিতিই কি আমাদের ওপর প্রভাব বিস্তার করতে পারে না?

আমরা যদি যন্ত্রবৎ হই, আর সমস্ত ব্যাপারই যদি নিয়তির দ্বারা সঞ্চালিত হয়, তবে আমাদের বুঝতে হবে যে, স্বভাব বদল করা সম্ভব হবে না। যদি আমাদের স্বভাব নিয়ত হয়, তবে তাকে বদলানোর জন্য কোন সংকল্প বা পুরুষার্থের প্রয়োজন আমাদের থাকে না। আমাদের সকল প্রযত্নই ব্যর্থ হবে।

কিন্তু আমি এ কথা স্বীকার করি না। আমি মানি যে স্বভাবকে বদলানো যায়। সংজ্ঞোপযুক্ত চেতনাকে নো-সংজ্ঞোপযুক্ত করে নেওয়া যায়। সকল সংজ্ঞারই পরিসমাপ্তি ঘটানো যায়। যখন এ সব কিছুই হতে পারে, তখন 'স্বভাবকে বদলানো যায় না'—এই কথাটি আপনা আপনি অর্থশূন্য হয়ে পড়ে। স্বভাব বদলায়, স্বভাবকে বদলানো যায়।

আমি এটা মানি যে আত্মার কিছু অন্তর্নিহিত বিশেষত্ব আছে। বাহ্য পরিস্থিতি বা বাতাবরণ কিছু প্রভাব বিস্তার করতে পারে বটে, কিন্তু আত্মার অন্তর্নিহিত শক্তি এতই প্রবল যে, যখন তা জাগ্রত হয় তখন বাহ্য প্রভাব শূন্য হয়ে যায়, নির্মূল হয়ে যায়—তার অস্তিত্ব পর্যন্ত থাকে না।

আমরা বাহ্যের দ্বারা তখনই প্রভাবিত হই যখন আমাদের কষায় সংজ্ঞা প্রবল হয়। এক শ্রেণীর সংজ্ঞাকে কষায় সংজ্ঞা বলে। এই

এই শ্রেণীতে চারটি সংজ্ঞা আছে—ক্রোধ সংজ্ঞা, মান সংজ্ঞা, মায়া সংজ্ঞা, এবং লোভ সংজ্ঞা। এই চার সংজ্ঞার সাধারণ নাম কষায় সংজ্ঞা। যখন এদের প্রাবল্য হয় তখন আমাদের ওপর বাহ্য পরিস্থিতির প্রভাব এসে পড়ে, আর যখন এরা প্রবল থাকে না তখন বাহ্য-পরিস্থিতির প্রভাব তীব্র হয় না। ঐ প্রভাব তখন ক্ষীণ হয়ে যায়। আগমে এই তথ্য এই ভাবে বোঝানো হয়েছে। এক দেওয়ালে দুটি মাটির গোলা ছুঁড়ে মারা হল। একটি গোলা ছিল ভিজে মাটির, আর একটি ছিল শুকনো মাটির। যেটি ভিজে ছিল সেটি দেওয়ালে আটকে গেল, আর যেটি শুকনো ছিল সেটি নিচে মাটিতে পড়ে গেল। ভিজে আটকে গেল, আর শুকনো নিচে ঝরে পড়ল। যদি দেওয়াল ভিজে হয় তবে অবশ্যই তাতে ধুলো লেগে যাবে। যদি তা শুকনো হয় তবে ধুলো নিচে ঝরে পড়বে, তাতে লেগে থাকবে না। কষায় চেতনা যেন ভিজে। ঐ চেতনা যখন প্রবল হয় তখন বাহ্য পরিস্থিতি প্রবলরূপে প্রভাব বিস্তার করে, আর যখন তা প্রবল থাকে না তখন বাহ্য বাতাবরণও প্রভাব দেখাতে পারে না। আকাশ সর্বদা আকাশই থাকে। তাকে কিছুই প্রভাবিত করতে পারে না। বৃষ্টি হোক, শিলাপাত হোক, আঁধি আসুক, তুফান চলুক, বিদ্যুৎ চমক দিক, আরও যা কিছু হোক—আকাশ যেমন ছিল তেমনই থাকে। আকাশ বৃষ্টিতে ভেজে না, শিলাতে খণ্ড-বিখণ্ড হয় না, আঁধারে ধোঁয়াটে হয় না, বিদ্যুতে জ্বলে ওঠে না। রৌদ্রের তেজ যতই হোক না কেন, আকাশ কখনও গরম হয় না। যত বরফই পড়ুন না কেন, আকাশ কখনও ঠাণ্ডা হয় না।

চেতনা যদি বিশুদ্ধ হয় তবে বাইরে যা কিছু ঘটুক না কেন, ব্যক্তির ওপর কোন প্রভাব পড়ে না। চেতনাতে সংজ্ঞার লোপ পড়েছে, তাই তাতে বাইরের ব্যাপারের ছাপ পড়ে—বাইরের ব্যাপার তাতে আটকে যায়। তখন উত্তেজনা বাড়তে থাকে।

এই তথ্য আমাদের স্পষ্টভাবে বুঝতে হবে যে, মান্যতার ওপর নির্ভর করে আমরা যেন নিজেদের ধারণাগুলি গড়ে না তুলি। এই লোক

সংজ্ঞাকেও আমাদের ছাড়তে হবে।

সংজ্ঞাকে যদি একটিমাত্র শব্দের দ্বারা বুঝতে চাই, তবে সেই শব্দ হবে—মূর্চ্ছা। যেমন আমাদের ভয়ের মূর্চ্ছা, কামের মূর্চ্ছা, কষায়ের মূর্চ্ছা, পরিগ্রহের মূর্চ্ছা ভাঙ্গতে হয়, তেমনই আমাদের লোক মূর্চ্ছা, লৌকিক ধারণার মূর্চ্ছা ভাঙ্গতে হবে। এই মূর্চ্ছা প্রবল হয়। যত দিন এই মূর্চ্ছা দূর না হবে, ততদিন অন্য সমস্ত মূর্চ্ছাকে ভাঙ্গার প্রয়োজন সিদ্ধ হবে না। আমরা নিজের মান্যতার জালে জড়িয়ে পড়েছি। যার চিন্তাশক্তি কম সে অতি শীঘ্রই এই জালে জড়িয়ে পড়ে। এই বিপদের ঘাঁটি পার হতে হবে, লোক সংজ্ঞার পরিসমাপ্তি ঘটাতে হবে।

আর এক সংজ্ঞা আছে—ওঘ সংজ্ঞা, অর্থাৎ সামূহিক চেতনা বা প্রবাহপাতী চেতনা। লোকে বলছে—'ভয়ের কারণ কি? সবার যা ঘটছে আমাদের অবশ্যই তাই ঘটবে।' এই হল প্রবাহবাহী চেতনা। এক প্রবাহের সঙ্গে নিজেকে জুড়ে দিলাম, আর সেই সুযোগে নিজের মন্দ আচরণকে প্রবাহবাহী চেতনার দ্বারা সংরক্ষণ করলাম। 'যা সবার ভাগ্যে ঘটে তাই আমার ভাগ্যে ঘটবে, ভাবনার কোন কারণ নেই'—এই রকম চিন্তা কিন্তু অত্যন্ত বিপজ্জনক চেতনা। আমরা যখন এই চেতনার জালে আবদ্ধ হই তখন বেরিয়ে আসা খুবই কঠিন হয়।

এই মূর্চ্ছাকে ভাঙ্গতে না পারলে আমরা সাধনার ক্ষেত্রে প্রবেশ করতেই পারব না। এটা খুবই আবশ্যক যে এই মূর্চ্ছা ত্যাগ করে আমরা নিজের ব্যক্তিত্ব গঠন করি, অর্থাৎ শুদ্ধ চেতনা নির্মাণ করি।

ব্যবহারিক মনোবিজ্ঞান শাস্ত্রের এক বৈজ্ঞানিক বলেছেন—'আমাকে একটা শিশু দাও, আর বল, তুমি তাকে কি বানাতে চাও। তুমি চাও তো আমি তাকে ডাকাত বানিয়ে দেব, তুমি চাও তো আমি তাকে মহাত্মা বানিয়ে দেব। যেমন চাও, তেমন বানাব। কারণ আমি পরিস্থিতিকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারি, আর এই পরিস্থিতির ওপরই ব্যক্তির চরিত্র গঠন নির্ভর করে, ব্যক্তি ভাল বা মন্দ হয়ে গড়ে উঠে।'

এ রকম ঘোষণা লোকের কাছে অদ্ভুত মনে হতে পারে। তবে

শুধু আশ্চর্যজনক নয়, এ ঘোষণা সুখদায়কও বটে। যদি কোন ব্যক্তির হাতে এমন ক্ষমতা এসে যায় যে, সে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করে লোককে যেমন ইচ্ছা তেমনই বানাতে পারে, তবে সংসারে পরমাত্মা কল্পনা করার স্থলই আর থাকে না। পরমাত্মাকে মানার কোন আবশ্যকতাই থাকে না, কারণ ঐ বৈজ্ঞানিক তো স্বয়ং পরমাত্মা বনে গিয়েছেন।

বৈজ্ঞানিক তো ঘোষণা করলেন। লোকেও তা শুনল। কিন্তু কিছুই হল না। মানুষ বানানো সম্ভব হল না। কেবল বাহ্য পরিস্থিতির সাহায্যে মানুষ গড়ার কথা যখন ওঠে তখন আমরা এই সত্য ভুলে যাই যে, যদি কোন মানুষের স্বকীয় কোন বৈশিষ্ট্যই না থাকে তবে সে মানুষ মানুষই নয়। সে চেতনাবান প্রাণীই নয়। সে যন্ত্র মাত্র।

এও আমাদের বুঝতে হবে যে, যদি কোন সাধক ঘোষণা করেন তাঁর কাছে কোন শিশুকে রাখলে তিনি যেমন চাওয়া যাবে তেমন করেই তাঁকে মানুষ করে দেবেন, তবে তিনি অসম্ভব কথা বলছেন। এ খুবই কঠিন ব্যাপার, কারণ পরিস্থিতির দ্বারা যেমন ব্যক্তিকে গড়া যায় না, তেমনই কেবল সাধনার দ্বারাও সে কাজ করা সম্ভব হয় না। আমাদের দেখতে হবে কোন ব্যক্তির কতটা আন্তরিক ক্ষমতা আছে, অর্থাৎ কার কতটা ক্ষয়োপশম ক্ষমতা আছে। এই এক কথা। দ্বিতীয় কথা এই যে, আমাদের দেখতে হবে কোন ব্যক্তি সাধনার কতখানি অবসর লাভ করছে, কি প্রকার বাতাবরণ আর পরিস্থিতির মধ্যে কালাতিপাত করছে। একদিকে আন্তরিক ক্ষমতা, অন্যদিকে বাতাবরণ ও পরিস্থিতি— এই উভয়ের উপযুক্ত সংযোগ হলেই চেতনা নির্মলীকরণের কাজ অগ্রসর হতে পারে। এই দুটির কোন একটির ত্রুটি থাকলে, প্রযত্ন করা সত্ত্বেও সফলতা হবে না। যদি এই তথ্য মনে রেখে চলি তবে সাধনার প্রতি, সাধনার উদ্দেশ্যের প্রতি, আমাদের দৃষ্টি কখনও আচ্ছন্ন বা অস্পষ্ট হবে না এবং আমরাও ধীরে ধীরে অগ্রসর হতে পারব।

ধ্যেয় যদি স্পষ্ট না হয়, শক্তি যদি অল্প হয়, অথচ মনে যদি অনেক কিছু করার চিন্তা থাকে, তা হলে সম্ভবত মাঝপথেই বিভ্রান্ত হয়ে

ঘুরে বেড়াতে হবে।

একটা সুন্দর কাহিনী আছে। এক শেঠের দুই ছেলে ছিল। শেঠ ভাবল, কাকে আমার উত্তরাধিকারী করি। সে পরীক্ষা করার ইচ্ছা করল। তার প্রচুর বিত্ত ছিল। সে দুই ছেলেকেই পাঁচ লাখ করে টাকা দিয়ে বলল, 'যাও, আমি তোমাকে টাকা দিলাম। রাজ্যের প্রত্যেক শহরে একটা করে পাকা বাড়ি বানাও, আর তিন মাসের মধ্যেই আমাকে খবর দিও। ছেলেরা চলে গেল। ঐ রাজ্যে অনেক শহর ছিল। সময় পূর্ণ হল। তিন মাস কেটে গেল।

এক ছেলে ফিরে এল। তাকে শ্রান্ত-ক্লান্ত ও দুর্বল দেখাচ্ছিল। শেঠ জিজ্ঞাসা করল—'পাকা বাড়ি বানিয়েছ?' ছেলে বলল—'কয়েকটি শহরে বানিয়েছি। কি করে সব শহরে বানাব? আপনি যে টাকা দিয়েছিলেন তা তো তিন-চারটি পাকা বাড়ি করতেই ব্যয় হয়ে গিয়েছে।'

অপর ছেলেটিও ফিরে এল। তাকে খুব প্রসন্ন দেখাচ্ছিল। শেঠ জিজ্ঞাসা করল—'কতগুলি পাকা বাড়ি বানিয়েছ?' সে বলল—'বাবা, সব শহরেই পাকা বাড়ি করেছি।' তাই শুনে শেঠ জিজ্ঞাসা করল—'কত ব্যয় হল?' ছেলে বলল—'ব্যয় কিছুই হয় নি। পাঁচ লাখ টাকা ধরাই আছে।' শেষ জিজ্ঞাসা করল—'তা হলে কি করে করলে?' তখন ছেলে উত্তর করল—'সব শহরেই আমি মিত্র করেছি। এমন গভীর মিত্রতা করেছি যে, মিত্রদের সব বাড়িই আমার নিজের বাড়ি হয়ে গিয়েছে। যখন ইচ্ছা তখনই সেই সব বাড়িতে যেতে পারি।'

এই কাহিনী থেকে আমরা এই বুঝি যে, শক্তির ব্যবহার আমরা করতে পারি, কিন্তু তার আগে আমাদের শক্তি কতখানি তা ওজন করে বুঝতে হবে, এবং কি ভাবে ঐ শক্তির ব্যবহার হবে তাও ভাবতে হবে। যদি নিজের শক্তির পরিমাণ সম্বন্ধে সঠিক বোধ থাকে তবে প্রত্যেক স্থানেই পাকা বাড়ি করা সম্ভব হতে পারে। আর শক্তির যদি ঠিক আন্দাজ করতে না পারি, নির্ণয় করতে না পারি, তবে সামান্য কয়টি পাকা বাড়ি বানাতেই আমাদের ধন ফুরিয়ে যাবে।

১৫

শরীর ও তার বিশিষ্ট কেন্দ্র

আমাদের উপর, মধ্য ও নিচ—এই তিন মুখ্য ভাগ আছে। এই তিন ভাগেই শক্তির স্রোত প্রচ্ছন্ন আছে। শরীরশাস্ত্রজ্ঞগণ শরীরকে এক বিশেষ কোণ থেকে দেখেছেন। সেই কোণ সর্ববিদিত। কিন্তু যোগাচার্যগণ শরীরকে আর এক কোণ থেকে দেখেছেন। তাঁরা বলেছেন—শরীরে কতগুলি মুখ্য কেন্দ্র, চৈতন্য-কেন্দ্র, জ্ঞান-কেন্দ্র আছে। ঐ কেন্দ্রগুলিকে জাগ্রত করতে পারলে, সক্রিয় করতে পারলে, শক্তির স্রোত প্রবাহিত হয়, আর শক্তির বিশেষ অনুভব হতে আরম্ভ করে। ভগবান মহাবীর আচারাংগ সূত্রে বলেছেন—'আয়তচক্খু লোকবিপস্সী', 'লোগস্স অহে ভাগং জাণই, উড্ঢং ভাগং জাণই, তিরিয়ং ভাগং জাণই' —যে আয়তচক্ষু হয়, সংযতচক্ষু হয়, যে লোকদর্শী হয়, যার উন্মীলিত-চক্ষু এক বিন্দুতে স্থির থাকে, সেই লোকদর্শী ঊর্ধ্বলোক, মধ্যলোক, অধোলোক—তিন লোকই দেখতে পায়।

আমাদের শরীরই লোক। বস্তুকে পুরুষের মাধ্যমে বা লোকের মাধ্যমে বোঝানো প্রাচীন পদ্ধতি। জৈন পরম্পরায় লোককে বোঝানোর জন্য লোক-পুরুষের কল্পনা করা হয়েছে। পুরুষের সাথে লোকের তুলনা করা হয়েছে। পুরুষের শরীরের তিন ভাগ আছে—ঊর্ধ্বভাগ, মধ্যভাগ

ও অধোভাগ। সেই রকম লোকেরও তিন ভাগ হয়—ঊর্ধ্বভাগ, মধ্যভাগ ও অধোভাগ। এখানে লোকের অর্থ—শরীর, পুরুষ-শরীর। পুরুষ-শরীরের তিন ভাগের ওপরই ধ্যান করা যায়। ভগবান মহাবীর শরীরের তিন ভাগের ওপরই ধ্যান করতেন। প্রথম ভাগ হল—কপাল, মস্তিষ্কের ওপর অংশ, মুখ্য মস্তিষ্ক—এই ভাগই হল ধ্যানের মুখ্য কেন্দ্র, শক্তির মুখ্য কেন্দ্র। দ্বিতীয় ভাগ হল ভ্রূকুটি বা আজ্ঞাচক্র। তৃতীয় ভাগ বিশুদ্ধি চক্র, যা কণ্ঠমণির স্থান। এ ছাড়া চতুর্থ ভাগ আছে—মনঃচক্র। আমাদের গলার সোজা নিচে নাভির বার আঙ্গুল ওপরে যে স্থান আছে, তাই হল মনঃচক্র। জৈন পরম্পরায় এই প্রসঙ্গে 'রুচক প্রদেশের' কথা বলা হয়েছে। এই প্রদেশ এমন যে এর ওপর কোন আবরণ নেই, তা নিরাবরণ। এ যদি অনাবৃত না থাকে তবে চৈতন্যের হেরফের হয়ে যায়। জীব আর জীব থাকতে সমর্থ হয় না। যোগের আচার্যগণ মনঃচক্রের আটটি দল স্বীকার করেছেন। এই দিক থেকে রুচক প্রদেশের সঙ্গে এর তুলনা করা হয়েছে। এই হল মনঃচক্র। এর থেকে অল্প দূরে হৃদয়ের যে স্থান তাও গুরুত্বপূর্ণ। এই স্থান আমাদের ঊর্ধ্ব শরীরের চৈতন্যের এক বিশেষ কেন্দ্র।

মধ্য শরীরের মুখ্য কেন্দ্র—নাভি। নাভি শক্তিশালী কেন্দ্র। নাভি আর তার দু দিকের ভাগই খুবই শক্তিশালী।

আমাদের শরীরের অধোভাগে অনেক গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র আছে। মেরুদণ্ডের নিচে যে বাঁক ('কার্ভ') আছে, মেরুদণ্ড যেখানে শেষ হয়, সেখানে যে মাংসপিণ্ড আছে, তাকে কুণ্ডলিনীর স্থান বলা হয়। সেখানেই প্রাণধারা উৎপন্ন হয়, বিদ্যুৎ উৎপন্ন হয়। এই স্থান জেনারেটরের কাজ করে, এখান থেকেই সমস্ত শরীরে বিদ্যুৎ সরবরাহ হয়। এই স্থান মেরুদণ্ডের অন্তিম প্রান্ত। তার পরে আসে জননেন্দ্রিয়ের স্থান, আর তারও পরে পায়ের আঙ্গুল। অধো শরীরের—অধোলোকের—এগুলিই মুখ্য স্থান।

শরীরে এই সবই চেতনার মুখ্য কেন্দ্র। আমাদের কোন্ কেন্দ্রকে

জাগ্রত করতে হবে, সক্রিয় করতে হবে. তা নির্ভর করবে আমাদের লক্ষ্যের ওপর। প্রশ্ন হবে, কেন্দ্রকে জাগ্রত করার পদ্ধতি কি? এক সরল পদ্ধতি হল, আপনি যে কেন্দ্রকে জাগ্রত করতে চান, সক্রিয় করতে চান, তার ওপর মনকে একাগ্র করুন। মন যতই একাগ্র হবে ততই ঐ কেন্দ্র জাগ্রত হবে, সক্রিয় হয়ে উঠবে। যে ব্যক্তি বার বার বাসনার কথা চিন্তা করে, তার বাসনা-কেন্দ্র. জননেন্দ্রিয়ের স্থান সক্রিয় হয়ে যাবে। যে ব্যক্তি জ্ঞান লাভ করতে চায়, সে যদি তার সমগ্র মন মস্তিষ্কের মধ্যভাগে একাগ্র করে তবে তার জ্ঞান-কেন্দ্র সক্রিয় হয়ে যাবে। যে ব্যক্তি পবিত্রতা লাভ করতে চায়, পবিত্র হতে চায়, সে বিশুদ্ধি-চক্রের ওপর মনকে বারে বারে একাগ্র করুক। এর ফলে বাসনার সংস্কার ক্ষীণ হবে, আর পবিত্রতা আসতে থাকবে। যে প্রাতিভ জ্ঞান চায়, কি ঘটতে যাচ্ছে তা আগেই জেনে নিতে চায়, সে আপন মন আজ্ঞাচক্রের ওপর কেন্দ্রিত করুক। ঘটনার পূর্বাভাস পাওয়া সম্ভব হবে। আমাদের এরকম ভিন্ন ভিন্ন প্রয়োজন থাকতে পারে। এটা সত্য যে, যার প্রতি আমরা বেশি মনোযোগ দেব, তা আমাদের প্রতি অনুকূল হয়ে যাবে। আমরা লৌকিক ব্যবহারেও সর্বদা অনুভব করেছি যে, যে ব্যক্তিকে আমরা বেশি পছন্দ করি, যার সম্বন্ধে আমরা ভাল ভাব পোষণ করি, যাকে আমরা বেশি ভালবাসি ও স্নেহ করি, যার সঙ্গে সর্বদা সম্বন্ধ রাখতে চেষ্টা করি, সেই ব্যক্তি সহজেই আমাদের হয়ে যায় ও আমাদের প্রত্যেক ইচ্ছা পালন করতে যত্নবান হয়। সেই ভাবে যে জ্ঞানতন্তুকে আমরা প্রশিক্ষিত করি তা নিশ্চিতরূপে আমাদের আদেশ পালন করে। সেই জ্ঞানতন্তু আমাদের আদেশ পালন করে না, যার সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক স্থাপিত হয় নি, যাকে আমরা প্রশিক্ষিত করি নি বা যার সঙ্গে আমাদের মন সংযুক্ত হয় নি। প্রাকৃতিক চিকিৎসা বা মানসিক চিকিৎসার একটা মুখ্য সিদ্ধান্ত এই যে, যদি তোমার অন্ত্র ঠিকমত কাজ না করে তবে বার বার অন্ত্রের ওপর মন কেন্দ্রিত কর ও তাকে আদেশ দাও তা যেন ঠিকমত কাজ করে। অল্প সময়ের মধ্যেই

অন্ত্রের মধ্যে যে জ্ঞানতন্তু আছে তা তোমার আদেশ মেনে নেবে ও ঠিক কাজ করতে আরম্ভ করবে। যখন আমরা জ্ঞানতন্তুগুলিকে উপেক্ষা করি তখন তারাও উদাসীন থাকে ও কোন সহযোগিতা করে না। যখন আমরা তাদের ওপর সাপেক্ষ হই, তাদের অপেক্ষা রাখি, তখন তারাও সক্রিয় হয়ে ওঠে এবং আমাদের অপেক্ষিত কাজ করতে তৎপর হয়। এ সবই আমাদের উপেক্ষা আর অপেক্ষার ওপর নির্ভর করে। জ্ঞানতন্তুর শক্তির বা সহযোগিতার কোন ন্যূনতা হয় না। যে ব্যক্তি প্রাণশক্তি বা তৈজসকে প্রবল করতে চায় সে ব্যক্তিকে মেরুদণ্ডের নিচে অবস্থিত মাংসপিণ্ডের ওপর ধ্যান কেন্দ্রিত করতে হবে। প্রাণধারার প্রবলতা সাধনের পক্ষে ঐ স্থান খুবই উপযুক্ত।

এখন আমি নিচের দিকে যাব। পায়ের বুড়ো আঙ্গুলেরও যথেষ্ট মূল্য আছে। সেখানে প্রাণের সীমা। যে প্রাণের প্রবাহ নাসাগ্র থেকে চলতে আরম্ভ করে তা পায়ের বুড়ো আঙ্গুলে এসে সমাপ্ত হয়। যে ব্যক্তির মনে আপনার শক্তি ও বীর্যকে সুরক্ষিত করার চিন্তা আছে, সে যেন পায়ের বুড়ো আঙ্গুলে ধ্যান কেন্দ্রিত করে। যোগে এক প্রক্রিয়া নির্দিষ্ট আছে। যে ব্যক্তি বীর্যদোষগ্রস্ত, তার সম্বন্ধে বলা হয়েছে, সে যেন সরলভাবে শয়ন করে এবং শায়িত অবস্থায় শরীরকে একটু ওপরের দিকে তুলে পায়ের বুড়ো আঙ্গুলের ওপর মনকে একাগ্র করে, ধ্যানকে কেন্দ্রিত করে। এই মুদ্রায় দুই-এক মিনিট থাকতে হয়। দিন কয়েক এই মুদ্রা অভ্যাস করলেই রোগমুক্ত হবে।

এই কটি মুখ্য কেন্দ্র, যেখানে মনকে নিয়োজিত করলে আমরা লাভবান হতে পারি। আধুনিক শরীরশাস্ত্রে কতকগুলি নতুন গ্রন্থির, নতুন গ্ল্যানডের, উল্লেখ করা হয়েছে। সেগুলিও আমাদের বুঝতে হবে, সেগুলি থেকেও যথাসম্ভব লাভ আদায় করতে হবে।

আমাদের শরীরের চক্র আছে, সাত-আটটি গ্রন্থি আছে, কমল আছে। যোগের ভাষায় আমরা শুনি, আমাদের শরীরে ছয়টি চক্র আছে, সাত-আটটি গ্রন্থি আছে, আর হৃদয়-কমল, নাভি-কমল প্রভৃতি

কমল আছে। শরীর শাস্ত্রের দৃষ্টিতেও কতকগুলি গ্রন্থি প্রতিপাদিত হয়েছে, কতকগুলি কমলও নির্দিষ্ট হয়েছে। তবে, এ সব শব্দ বিভ্রান্তির সৃষ্টি করতে পারে, তাই এগুলি আমাদের বুঝতে হবে। এই যে সব কেন্দ্র নির্দিষ্ট আছে—মুখ্য কেন্দ্র আছে, সেখানে প্রাণতন্তু অনেকটা জড়িয়ে পড়েছে, এঁকে-বেঁকে গিয়েছে। প্রাণের ধারা সেখানে সোজা চলতে পারে না, তাকে ঘুরে যেতে হয়, চেষ্টা করে যেতে হয়। সেজন্যই ঐগুলিকে 'গ্রন্থি' বলা হয়েছে। জট-পাকানো পথ বলে ওদের গ্রন্থি বলা হয়েছে, চক্র বলা হয়েছে। এর উদ্দেশ্য এই বোঝানো যে, সেখানে গতি চক্রাকার ও ঘূর্ণমান, সহজ বা সরল নয়। সেজন্য 'চক্র' শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। 'কমল' শব্দটি প্রতীকাত্মক। কমল এমন বিচিত্র বস্তু যা বিকশিত হয়, আবার শুকিয়ে সঙ্কুচিত হয়ে যায়। যার সঙ্কোচ ও বিস্তার আছে, যাতে সঙ্কোচ ও বিকাশের শক্তি আছে, তাকেই কমল বলা যায়। এখানে রূপক অর্থে 'কমল' শব্দের প্রয়োগ। এর অভিপ্রায় এই যে, যদি আপনারা ঐ সব ধ্যান কেন্দ্রের ওপর ধ্যান কেন্দ্রিত করে ঐগুলিকে সক্রিয় করে তোলেন, তবে ঐগুলি সহজ ও সরল হয়ে যাবে, এবং আপনাদের প্রাণধারা সোজা পথে প্রবাহিত হওয়ার সুযোগ পাবে। আর যদি আপনারা ঐ কেন্দ্রগুলিকে উপেক্ষা করেন, তাদের ওপর ধ্যান কেন্দ্রিত না করেন, তবে তারা সরল হবে না, সঙ্কুচিতই থাকবে এবং তার ফলে আপনাদের প্রাণধারা সোজা রাস্তা না পেয়ে এঁকে-বেঁকে চলার চেষ্টা করতে বাধ্য হবে।

এখন এই তিনটি কথাই স্পষ্ট হল যে, আমাদের শরীরে গ্রন্থি আছে, চক্র আছে, কমল আছে। কমলের মত কিছু দেখতে না পেয়ে আধুনিক কালের ডাক্তার বলেন—'আমরা গোটা শরীরটাই কেটে-কুটে দেখেছি, শরীরের প্রতিটা অণুই বিশ্লেষণ করেছি, কিন্তু কোথায়, কমলের তো দেখা পাই নি। কোথায় আজ্ঞা চক্র, কোথায় বিশুদ্ধ চক্র ইত্যাদি—কই, এসব কিছুই তো দেখা যায় নি।' স্বীকার করতেই হবে, ডাক্তার ঐ রকম কিছু দেখতে পান নি। তবে, আজ্ঞা চক্র থাক বা না থাক,

বিশুদ্ধি চক্র থাক বা না থাক, এখন যে 'পিনিয়াল' আর ঐ রকম অনেক গ্রন্থি—অনেক 'গ্ল্যান্ড'—সম্বন্ধে কথা বলা হচ্ছে, তুলনাত্মক দৃষ্টিতে সেগুলিকে দেখলে যোগশাস্ত্রের প্রতিপাদন ও শরীরশাস্ত্রের প্রতিপাদনের মধ্যে যে বিশেষ ভেদ আছে এমন বোধ হবে না।

প্রশ্ন হতে পারে, আমরা মনকে কোথায় লাগাব? ধ্যানকে কোথায় কেন্দ্রিত করব? এর উত্তর আপনাদের ওপরই নির্ভর করে। আপনাদের লক্ষ্য কি? আপনারা কি চান? আপনাদের প্রাপ্তির বিষয় কি? যদি ধ্যানের নির্মলতা সাধন আপনাদের লক্ষ্য হয়, তবে আপনাদের ধ্যান-কেন্দ্রের ওপর ধ্যান করতে হবে। আচার্যগণ কিছু কিছু ব্যবস্থা দিয়েছেন। আমরা 'ণমো অরহং তাণং'—এর ধ্যান কোথায় করব? অর্হতের ধ্যান কোথায় করা উচিত? তাঁরা বলেছেন, শ্রেষ্ঠ যে জ্ঞান-কেন্দ্র, সেটাই অর্হৎ ধ্যানের স্থান।

কেন্দ্রগুলি স্থূলভাবে দুটি ভাগে বিভক্ত—জ্ঞান-কেন্দ্র আর বাসনা-কেন্দ্র। যখন আমাদের প্রাণধারা তথা মনের গতি নিচের দিকে যায়, তখন বাসনা-কেন্দ্র সক্রিয় হয়, তীব্র হয় ও জাগ্রত হয়। জ্ঞান-কেন্দ্র দুর্বল হয়ে যায়। আবার যখন আমাদের প্রাণধারার—তথা মনের—গতি ওপরের দিকে ওঠে, তখন আমাদের জ্ঞান-কেন্দ্র সক্রিয় হয়, তীব্র হয়-ও জাগ্রত হয়। বাসনা-কেন্দ্র ক্ষীণ হয়ে যায়। অর্হতের স্থান হল—মস্তিষ্ক। যদি আমরা মস্তিষ্কে অর্হতের ধ্যান করি, তবে আমরা জেনে বা না জেনে জ্ঞান-কেন্দ্রের জাগরণ করতে থাকি। জ্ঞান-কেন্দ্র জাগ্রত হয়ে যাবেই। এই হল জ্ঞান-কেন্দ্রকে সক্রিয় করার উপায়। আচার্যরা বলেছেন—অর্হতের ধ্যানের সঙ্গে সঙ্গে শ্বেত বর্ণের ধ্যানও কর। মস্তিষ্কের যে অগ্রভাগ, সেখানে এক রকম পদার্থ আছে। তার রঙ মেটে—খানিকটা হলদে, খানিকটা সাদা। সেখানে শ্বেতবর্ণের (ধূসরের) ধ্যান লাভপ্রদ। তাতে সেখানকার পরমাণুগুলি সহজ শক্তি প্রাপ্ত হয়। মস্তিষ্ক আপনা-আপনি শক্তিশালী হয়ে যায়। আমাদের জ্ঞান-কেন্দ্রের তন্তুগুলি সক্রিয় হয়ে জেগে ওঠে।

'ণমো সিদ্ধাণং'-এর ধ্যানের স্থান ললাট—আজ্ঞাচক্র। এর বর্ণ—রক্ত। আজ্ঞাচক্র আমাদের সমস্ত সক্রিয়তাকে উৎপন্ন করে। শরীরের ওপর নিয়ন্ত্রণ রাখা—জ্ঞানাত্মক নিয়ন্ত্রণ রাখা—এই চক্রের প্রধান কাজ। লাল বর্ণ প্রচুর উত্তেজনা, সক্রিয়তা ও গতি উৎপাদন করে। যে ব্যক্তি দীর্ঘকাল ধরে লাল রঙের ধ্যান করে তার বিপদও হতে পারে। লাল বর্ণ থেকে অতিরিক্ত উষ্মা উৎপন্ন হয়। তাতে বিপদের সৃষ্টি হতে পারে। রক্তের সমস্ত সক্রিয়তাই লাল রঙের কারণে।

এখন প্রশ্ন, 'ণমো আয়রিয়াণং'—এর ধ্যান কোথায় করব? আচার্য আচারের প্রতীক। আচারের অর্থ—পবিত্রতা। পবিত্রতার স্থান হল, গলার পাশ। সেখানে যদি আমরা ধ্যান কেন্দ্রিত করি তো আমাদের আচারের ভাবনা সহজেই আসবে, আমাদের পবিত্রতা জাগ্রত হবে। সেখানে আমাদের হলদে রঙের ধ্যান করতে হবে। পীত বর্ণ ভাবনাকে বেগবতী করে। 'অ্যানাটমি' শাস্ত্র অনুসারে, শরীরের আভ্যন্তরীণ স্রাব সর্দি, গর্মি প্রভৃতি নিয়ন্ত্রণ করে। যার শরীরের স্রাব কম হয়, সে ব্যক্তি অসময়েই বুড়ো হয়ে যায়, ক্ষীণ হয়ে যায়। তার শরীরের উপচয় বন্ধ হয়ে যায়। যার শরীরে স্রাব যথোচিত হয়, তার শরীরের সুসমঞ্জস বিকাশ হয়। এই স্রাবই আমাদের শরীরের ওপর নিয়ন্ত্রণ করে, আমাদের গ্রন্থিগুলির নিয়ামক তত্ত্বই এই স্রাব। পীত বর্ণের সঙ্গে, 'ণমো আয়রিয়াণং'—এর ধ্যান এই নির্দিষ্ট স্থানে করতে হয়। পীত বর্ণ সদ্-ভাব ও আচারের পুষ্টিসাধক হয়। যে ব্যক্তি পীত বর্ণের ধ্যান করে সে ব্যক্তি যেমন জ্ঞানের বিকাশ সাধন করে, তেমনই পবিত্র ভাবনার বিকাশেরও পোষকতা করে। আপনারা দেখবেন যে, পবিত্র ভাবনার প্রতীক রূপে যেখানে রঙের নির্বাচন করা হয়েছে সেখানেই পীত রঙকে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে—পীত বর্ণকে মুখ্য স্থান দেওয়া হয়েছে।

'ণমো উবজ্ঝায়াণং'—এই উপাধ্যায়ের ধ্যান করার স্থান—মনঃ-চক্র। কেউ কেউ মনে করেন, এই ধ্যানের স্থান—হৃদয়। এ নিয়ে অনেক মীমাংসা হয়েছে। মোট কথা, এটা হৃদয়-স্থানের ব্যাপার নয়,

এর স্থান মনঃচক্র। মনঃচক্রের ওপর উপাধ্যায়ের ধ্যান করতে হয়। প্রাচীনকালে একে হৃদয়-চক্র বলে মানা হতো। উপাধ্যায়ের ধ্যান নীল বর্ণের সঙ্গে করতে হয়। নীল বর্ণ খুবই গুরুত্বপূর্ণ। আপনাদের মনে উত্তেজনা হয়েছে, জটিলতা হয়েছে। আপনারা ঐ উত্তেজনা ও জটিলতাকে প্রশমন করতে নিজেদের অসমর্থ বোধ করেছেন। ঐ অবস্থায় আপনারা বিশ মিনিট ধরে নীল আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকুন। অবশ্য ঐ সময়ের আকাশ যেন স্বচ্ছ ও নিরাবরণ থাকে। আকাশ দেখতে থাকলে অল্প সময়ের মধ্যেই আপনার মনের উত্তেজনা কমে যাবে, চিন্তা মিটে যাবে, জটিলতা হ্রাস পাবে। নীল বর্ণের প্রধান কাজ—মনকে শান্ত করা, উত্তেজনাকে কমিয়ে দেওয়া। রোগী যখন খুবই উত্তেজিত হয়, যখন তার ঘুম কিছুতেই আসে না, তখন তাকে নীল রঙের জল পান করানো হয়। এতেই তার উত্তেজনা কমে—ঘুম আসতে থাকে। রোগীর ছটফটানি ও কষ্টের উপশম হয়।

'গমো লোএ গব্ব্ সাহুণং'। মুনির স্থান—চরণ। পায়ের অঙ্গুষ্ঠের স্থানের খুব মহত্ত্ব আছে। সেখানকার বর্ণ—কৃষ্ণ, অর্থাৎ কালো। কালো বর্ণের নিজস্ব এক অর্থ আছে। এর থেকে অবশোষণের ক্ষমতা হয়, যার ফলে বাইরের কোন প্রভাব ভেতরে যেতে পারে না।

এই হল পাঁচটি স্থান ও পাঁচটি বর্ণ। যে আচার্যরা এই স্থান ও বর্ণগুলির ব্যাখ্যা করেছেন, তাঁরা শরীরের গঠনপ্রণালীর সঙ্গে সম্পূর্ণ পরিচিত ছিলেন। তাঁর জানতেন, কোন্ স্থানে কোন্ বর্ণের ওপরে ধ্যান করলে কোন শক্তি জাগ্রত হয়। স্থান ও বর্ণের পরিকল্পনা এই ভিত্তিতে করা হয়েছিল যে সেখানে কেন্দ্র সক্রিয় হতে পারে ও তার শক্তির বিকাশ হতে পারে। আপনারা স্মরণ রাখবেন এ সবই মত-বাদের কথা, বিজ্ঞানের কথাও বটে। শরীরের কেন্দ্রগুলি কিভাবে জাগ্রত করা যায়, সে বিষয়ে জৈন আচার্যরা নিজেদের ভঙ্গিতে এই সব পদ্ধতি সম্বন্ধে অনেক চিন্তা করেছেন।

জৈন পরম্পরায় 'এগ পোগ্গল নিরিট্ঠদিট্ঠি' আর 'নাসাগ্গ

নিবিট্‌ঠদিট্‌ঠি'—এক পুদ্গলেব ওপব দৃষ্টিকে কেন্দ্রিত কবাব বা নাসাগ্রেব ওপব দৃষ্টিকে কেন্দ্রিত কবাব কথা এসে যায। প্রশ্ন হতে পাবে, নাসাগ্রেব ওপবই দৃষ্টিকে কেন্দ্রিত কবতে হবে কেন? যে কোন স্থানেই তো দৃষ্টিকে স্থিব কবা যায। আসলে, তাৎপর্যটা কি? দৃষ্টিকে কেন ভ্রূকুটিব ওপব স্থিব কবব? অন্যত্রও তো স্থিব কবতে পাবি। উত্তবে বলতে হবে, এ সবেব পেছনেই গভীব অর্থ আছে, বহস্য আছে। অমুক স্থানেব ওপব কেন্দ্রিত হলে, অমুক অমুক তন্তু সক্রিয হয, জাগ্রত হয। শবীবেব দিক থেকে দেখলেও, এইসব স্থানেব মহত্ত্ব আছে। আধ্যাত্মিক বা যৌগিক দৃষ্টিকোণ থেকে দেখলে, এই সব স্থানেব মহত্ত্ব আবও ভাল কবে বোঝা যায। শবীবশাস্ত্রেব দৃষ্টি দৈহিক স্বাস্থ্যতেই সীমিত। জ্ঞানেব বিকাশ কবা, পবিত্রতাব বিকাশ কবা—এগুলি যোগেব দৃষ্টিকোণ থেকে কবণীয কাজ। শবীবেব অমুক অমুক স্থানকে জাগ্রত কবলে জ্ঞান বাড়ে, পবিত্রতা আসে—এই দৃষ্টি যোগ-শাস্ত্রীয, শবীবশাস্ত্রীয নয। শবীব অস্থি, মাংস, মজ্জা দিযে গঠিত—কেবল এই দৃষ্টিতেই আমবা শবীবকে দেখব না। দেখাব আব একটা কোণও আছে। মজ্জা একটি ধাতু, কিন্তু তাব কাজ কি? শবীবশাস্ত্রজ্ঞ এই প্রশ্নেব উত্তব দেবেন। জ্ঞানেব কেন্দ্র হল মস্তিষ্ক। মস্তিষ্ক জ্ঞান ও ক্রিযা—দুটিকেই নিযন্ত্রণ কবে। এখানে পৃষ্ঠবজ্জুও মস্তিষ্কেব সহাযতা কবে। এই বিষযে শবীবশাস্ত্রজ্ঞেবা অনেক বিচাব কবেছেন। যাঁবা ডাক্তাবি পডছেন, ডাক্তাব হচ্ছেন, তাঁবা এই সব কথা সূক্ষ্মভাবেই জানেন। কিন্তু মস্তিষ্কেব অতিবিক্ত অন্য কেন্দ্রকে সহযোগীরূপে বিকশিত কবলে আমাদেব ভাবপক্ষ, জ্ঞানপক্ষ ও ক্রিযাপক্ষেব কোন কোন চেষ্টা সফল হযে ওঠে—তা এঁদেব জানাব বিষয নয। অবশ্য আজকাল তাঁবাও এই ক্ষেত্র নিযে কাজ কবতে আবম্ভ কবেছেন। আগে তো এই ক্ষেত্র তাঁদেব পক্ষে একেবাবে অবরুদ্ধ ছিল।

আমি সূক্ষ্ম শবীবেব কথা ছেডে দিযেছি। ঐ শবীবকে সক্রিয কবাব উপাযও আছে। এখানে সে বিষযেব আলোচনা কবব না।

স্থূল শরীরের সঙ্গে আমাদের নিকট সম্বন্ধ। কি উপায়ে ঐ শরীরের মুখ্য কেন্দ্রগুলিকে সক্রিয় করা যায়, তার সংক্ষিপ্ত আলোচনা করলাম। যদি আমরা এই বিষয়ে মনোযোগ দিই তবে নিজেদের ভাবনা অনুসারে অমুক অমুক কেন্দ্রকে সক্রিয় করে লাভবান হতে পারব।

রাজগড় শিবির

(৭ জুন, ১৯৭৩—১৭ জুন, ১৯৭৩)

হিসার শিবির

(২ অক্টোবর, ১৯৭৩—৯ অক্টোবর, ১৯৭৩)

১৬

শরীর বোধের অপেক্ষা

সেদিন ছিল দীপাবলী। এক ব্যক্তি আসছিল। রাস্তায় আর এক ব্যক্তির সঙ্গে তার দেখা হল। দ্বিতীয় ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করল, 'কোথা থেকে আসছ?' প্রথম ব্যক্তি উত্তর দিল, 'বাজার থেকে।' 'কি এনেছ বাজার থেকে?' 'দীপ এনেছি।' প্রথম ব্যক্তির হাতে দীপ ছিল, অর্থাৎ মাটির এক আকারবিশেষ ছিল। কিন্তু মাটির তো দীপ হয় না। দীপ তাকেই বলে যা প্রকাশমান—যার আলো আছে, দীপ্তি আছে। যা প্রকাশমান নয়, তা দীপ নয়। অথচ ওই মাটির পাত্র ছাড়া কেবল সলতে আলো দেয় না, দীপ হয় না। যখন মাটির পাত্রে তেল ভরা হয়, সলতে তেলে ভেজে, তখনই দীপ্তি হয়। পাত্র ছাড়া কেবল সলতে বা কেবল তেল কিছু করতে পারে না, সলতে ও তেল একত্রেও কিছু করতে পারে না। আধারই যেন স্বয়ং দীপ হয়ে গেল। তাই সাধারণ লোকের ভাষায়, সলতে দীপ নয়, যা তার আধার তাই দীপ।

আমাদের ঠিক এই রকম অবস্থা। আমাদের চেতনার প্রকাশ আমাদের শরীরেই প্রকট হয়। শরীর বাদ দিয়ে চৈতন্য প্রকট হতে পারে না। সেজন্য শরীরও আত্মা হয়ে যায়। প্রাচীন সাহিত্যে চেতনাকে

আত্মা বলা হয়েছে, আবার শরীরকেও আত্মা বলা হয়েছে। চৈতন্যের যোগ আছে বলেই শরীরকে আত্মা বলা হয়েছে। আত্মাকে পুদ্গলও বলা হয়েছে। শরীর তো পৌদগলিক, তাকেও আত্মা বলা হয়েছে। এখানে আমি ভেদ-বিজ্ঞানের দিক থেকে কথা বলছি। আত্মা ও পরমাত্মা অভিন্ন, কিন্তু তাদের ভিন্ন মনে করা হয়েছে। আত্মা আর শরীর ভিন্ন, কিন্তু তাদের অভিন্ন মনে করা হয়েছে। এর কারণ এই যে, শরীরের শক্তি আর আত্মার শক্তি—এই দুই শক্তির মধ্যে নিবিড় সম্বন্ধ আছে। শরীরের শক্তি ছাড়া আত্মার শক্তি কার্যকর হয় না। আবার আত্মার শক্তি ছাড়া শরীরের যন্ত্র সঞ্চালিত হতে পারে না। যেমন আগেই বলেছি, দীপের যদি পাত্র না থাকে তবে আলো পাওয়া যাবে না। বাল্‌ব নেই, কেবল বৈদ্যুতিক কারেন্ট আছে, তাতে আলো হবে না। অভিব্যক্ত হওয়ার জন্য আলোর বা দীপ্তির এক আবরণ প্রয়োজন। শরীর বিনা চৈতন্যের প্রকাশ অভিব্যক্ত হতে পারে না। চোখের গোলক যদি ঠিক না থাকে তবে লোকে দেখতে পায় না। চোখই যে দেখে, তা নয়। চোখ অভিব্যক্তির এক মাধ্যম মাত্র। কিন্তু গোলক ছাড়া চোখ দেখতে পায় না। চোখ আর তার গোলক—এই দুয়ের মধ্যে সম্বন্ধ অতি গভীর।

আমরা যখন সাধনার কথা মনে রেখে চিন্তা করি, তখন শরীরকে অনেক অভিশাপ দিই, গাল দিই। তবে শরীর যদি গালির যোগ্য হয় তবে প্রশংসার যোগ্যও বটে। যদি শরীর না থাকত তবে আমাদের এই জগৎও বস্তুহীন হতো। কোন কিছুই ব্যক্ত হতো না, সারা জগৎ অব্যক্তই থেকে যেত। সাধনার দৃষ্টিতেও শরীরের যথেষ্ট গুরুত্ব আছে। শরীর নশ্বর বটে, কিন্তু সমস্ত শক্তিকে শরীরই অভিব্যক্তি দেয় ও আমাদের সামনে উপস্থাপিত করে। আপনারা যা দেখছেন কেবল সেটাই শরীর নয়, সেটা স্থূল শরীর মাত্র। সেই শরীরও শক্তিশালী, কিন্তু অন্য যেসব শরীর আছে তাদের সঙ্গে তুলনায় কম শক্তিশালী। সেই সব অন্য শরীর হল—সূক্ষ্ম শরীর। নাস্তিকরাও এই শরীরের মধ্যে আত্মার

সন্ধান করতে চেষ্টা করেছেন। রাজা প্রদেশী চোরের শরীর টুকরো টুকরো করে কেটে আত্মার সন্ধান করেছেন। কিন্তু আত্মার দেখা মেলেনি। আজকের বৈজ্ঞানিকরাও স্থূল শরীরকে মুখ্য মনে করে আত্মার সন্ধানে ব্যাপৃত হয়েছেন। তাঁরা মৃত্যুর পূর্বে জীবন্ত শরীরের ওজন নিয়েছেন, আবার মৃত্যুর পরে মৃত শরীরের ওজন নিয়েছেন। তাঁদের উদ্দেশ্য, দুই শরীরের ওজনের মধ্যে কোন পার্থক্য হয় কিনা, তা নির্ধারণ করা। যদি ওজন কমে যায়, বুঝতে হবে কোন বস্তু শরীর থেকে বের হয়ে গিয়েছে। আর সেটাই হবে আত্মা। যদি দুই ক্ষেত্রে ওজনের কোন পার্থক্য না হয়, বুঝতে হবে কিছুই বের হয়ে যায় নি। যা আগে ছিল এখনও তাই আছে। এই ধরনের অনেক পরীক্ষাই করা হয়েছে। কিন্তু এ সবই খুব স্থূল ব্যাপার। আত্মা এখন কোথায়? এখন যা দেখছি তা তো স্থূল শরীর। সেটা প্রথম দরজা মাত্র। তার আগে আছে সূক্ষ্ম শরীর। সূক্ষ্ম শরীর দু প্রকার—বৈক্রিয় আর আহারক। এরা স্থূল শরীর অপেক্ষা সূক্ষ্ম। বৈক্রিয় শরীরের ক্রিয়া নানা রূপে প্রকট হয়। আমাদের স্থূল শরীরের ক্রিয়া একই, অর্থাৎ তা এক রূপেই দেখা যায়। স্থূল শরীর রূপ বদল করতে পারে না। কিন্তু বৈক্রিয় শরীরের এমন শক্তি আছে যে তা নানা ভাবে রূপ বদল করতে পারে। যদি আবশ্যক হয় তো এই শরীর একটা পদ্মফুলের সমান হতে পারে, আবার প্রয়োজন হলে বিষ্ণুকুমারের মত লক্ষযোজন বিস্তৃত রূপ ধারণ করতে পারে। প্রয়োজন থাকলে না আবার পশু-পক্ষীর রূপও ধারণ করতে পারে। এই সূক্ষ্ম শরীর এইভাবে নানা রূপ ধারণ করতে সমর্থ।

আর এক আছে আহারক শরীর। এই শরীরও সূক্ষ্ম। এই শরীর বিচারের—অর্থাৎ চিন্তা ভাবনার—সংবাহক। আমার মনে চিন্তা হল, অমুক ব্যক্তির সঙ্গে মিলতে হবে, অমুক ব্যক্তির সঙ্গে কথাবার্তা বলতে হবে। কিন্তু সে ব্যক্তি এখানে নেই, অনেক দূরে কোথাও আছে। কি করে তার সঙ্গে আমার মিলন হবে? কি করে কথাবার্তা

হবে ? এই অবস্থায় সংকল্পমাত্রই এক সূক্ষ্ম শরীরের নির্মাণ হয়ে যায়। এই শরীরের সংস্থান ছোট হয়। ছোট. খুবই ছোট। ধারণাতীত ক্ষুদ্র। এই শরীর হাজার মাইলের দূরত্ব এক মুহূর্তে পার হয়ে আমার ইঙ্গিতে ব্যক্তির কাছে পৌঁছে যায়। তার কাছে আমার প্রশ্ন রাখে, আবার উত্তরও নেয়, তার পরে ফিরে এসে আমার শরীরে প্রবেশ করে সমাহিত হয়ে যায়। এই সমস্ত ক্রিয়া এত অল্প সময়ের মধ্যে নিষ্পন্ন হয়ে যায় যে, ব্যক্তি নিজেই বুঝতে পারে না সম্পূর্ণ ক্রিয়াতে কত সময় লেগেছে। এই হল আহারক শরীরের কাজ। এই শরীর বিচারের—চিন্তা-ভাবনার—সংবাহক। চিন্তা বহন করে নিয়ে যায়, আবার চিন্তা বহন করে ফিরে আসে।

এর আগে আরও দুটি সূক্ষ্মতম শরীর আছে। তাদের একটি তৈজস শরীর, অপরটি কার্মণ শরীর। সবশুদ্ধ শরীরের তিনটি 'গ্রুপ' হয়ে গেল :

স্থূল শরীর—ঔদারিক শরীর—হাড়-মাংসের শরীর।

সূক্ষ্ম শরীর—বৈক্রিয় শরীর—নানারূপ গ্রহণে সমর্থ শরীর।

আহারক শরীর—বিচার-সংবাহক শরীর।

সূক্ষ্মতম শরীর—তৈজস শরীর—তাপময় শরীর।

কার্মণ শরীর—কর্মময় শরীর।

তৈজস শরীর হল তাপময় শরীর। এই শরীর আমাদের উষ্মা, সক্রিয়তা আর শক্তির সঞ্চালক। এই শরীর যদি না থাকত, তবে উষ্মা উৎপন্ন হতো না, পাচন ক্রিয়া হতো না, রক্তের সঞ্চারণও হতো না। এই তৈজস শরীরই আমাদের স্থূল শরীরের যাবতীয় ক্রিয়া সঞ্চালন করছে। স্থূল শরীরে যে শক্তি আছে তার সবচেয়ে বড় ভাণ্ডারই হল তৈজস শরীর। যার তৈজস শরীর মন্দ হয়, তার অগ্নিমান্দ্য হয়, সমস্ত ক্রিয়াতেই মন্দতা লক্ষিত হয়। অগ্নি তীব্র হলেই সমস্ত ক্রিয়াতে তীব্রতা আসে। আধুনিক বিজ্ঞানে এই তথ্য ভাল করেই ধারণা করা হয়েছে। ডঃ স্টাহাক প্রতিপাদন করেছেন যে, সূর্যের তেজ আমাদের আহারের পূর্তি করে।

সূর্যের তাপ আমাদের খাদ্যের পূরক। যদি সূর্যের তাপ না মেলে আমরা কেবল খাদ্যের সাহায্যে বেঁচে থাকতে পারি না। এই বিষয়ে মাইকেল ও তাঁর কয়জন সহকারী ইঁদুর নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে দেখেছেন। তাঁরা আঠারোটি ইঁদুর বেছে নেন। তাদের মধ্যে বারোটিকে এমন আহার দিলেন যাতে সুষম খাদ্যের সব উপাদানই ছিল, কিন্তু ক্যালসিয়াম ও ফস-ফরাসের অভাব ছিল। খাদ্যে প্রয়োজনীয় পুরো উপাদান না থাকায় ইঁদুরগুলি রোগগ্রস্ত হয়ে গেল। তাদের অন্ধকার ঘরে রাখা হয়েছিল। তারা রোগগ্রস্ত হওয়ায় তাদের সূর্যের তাপে রাখা হল। দু-একদিনের মধ্যেই তারা সুস্থ হয়ে গেল, যদিও তাদের খাদ্য অপূর্ণই রইল।

দ্বিতীয় দলের ইঁদুরগুলিকেও অপূর্ণ খাদ্য দেওয়া হল। তারাও রোগগ্রস্ত হয়ে গেল। কিন্তু এবার তাদের সূর্যের তাপে ছাড়া হল না। তারা অন্ধকার ঘরেই রইল। কিন্তু তাদের যে খাদ্য দেওয়া হচ্ছিল তা দেওয়ার আগে অনেকক্ষণ রৌদ্রে রাখা হল। দুই-চার দিনের মধ্যেই ইঁদুরগুলি সুস্থ হয়ে গেল। এই সব অভিজ্ঞতা থেকে ডাক্তার এই সিদ্ধান্তে পৌঁছলেন যে, সূর্যের তাপ কেবল খাদ্যকে পাক করে না, ঐ তাপ নিজেই খাদ্য এবং আহারের পরিপূরক। সূর্যের তেজ না পেলে বনস্পতির বিকাশ হয় না। মনুষ্য শরীরেরও বিকাশ হয় না, আর ভুক্ত দ্রব্যের পরিপাকও হয় না। এই বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়ার প্রসঙ্গে মনে এক চিন্তা আসছে। জৈন পরম্পরায় মুনিদের আতাপনা নেওয়ার কথা সর্বজনবিদিত। অনেক মুনি আতাপনা নিতেন। তাঁরা কয়েক ঘণ্টা ধরে সূর্যের তাপ নিতেন। তাঁরা পুরো দু দিন বা পুরো তিন দিন আহার না করে থাকতেন। তাঁদের ক্ষিধে কমে যেত। তাঁরা এই রহস্য জানতেন, সে জন্যই এই ক্রিয়াতে ব্রতী হতেন। আতাপনা তিন প্রকারের হতে পারে—জঘন্য, মধ্যম আর উৎকৃষ্ট। মুনি তাঁর শারীরিক শক্তি অনুসারে ব্রত নিতেন। স্থূল উপকরণের দ্বারা ভোজনের যে পূর্তি হতো, সূর্যের তাপ থেকে সহজেই সেই পূর্তি হয়। সূর্যের তাপ থেকেই মুনি পুরো ভোজন পেতেন। আতপ সেবন করার সময়ে মুনি পরিধানে

কেবল একটি নেংটি কাপড় রাখতেন, দেহের অধিকাংশ অংশই রৌদ্রে অনাবৃত রাখতেন। সমস্ত রোমকূপ দিয়ে সূর্যের রশ্মি শরীরে প্রবিষ্ট হতো, আর তা অনেক কেন্দ্রকে সক্রিয় করে তুলত। আজকাল লোকে শরীরের ওপর পোষাকের বোঝা চাপায়, সে বোঝা ভেদ করে হাওয়াও যায় না, আলোও যায় না। ফলে শরীর তাপ আর আলো পায় না।

সূর্যের তাপ আমাদের আহারের খাদ্যের পূর্তি কেবল তখনই করতে পারে যখন তৈজস সক্রিয় থাকে। তৈজস নিষ্ক্রিয় থাকলে সূর্যের আতপ কার্যকর হয় না। আমাদের তৈজস শরীরের শক্তি জাগ্রত হওয়া দরকার। তৈজস শরীরের দুটি কার্য আছে—

১। শরীর-তন্ত্রের সঞ্চালন।

২। অনুগ্রহ আর নিগ্রহ বা উপঘাত।

আমরা জানি কোন বিশিষ্ট ব্যক্তি যদি সুপ্রসন্ন দৃষ্টিতে কোন সভার দিকে তাকান তো সভাস্থ প্রত্যেক ব্যক্তিই অপূর্ব আনন্দ বোধ করে ও নিজেকে ধন্য মনে করে। প্রসন্নতা-ভরা দৃষ্টিতে কারো কিছু মেলে না। ওই বিশিষ্ট ব্যক্তি কাউকে কিছু দেওয়ার চেষ্টাও করেন না—তবুও প্রত্যেক ব্যক্তি মনে করে সে পূর্ণকাম হয়ে গিয়েছে, তাকে খুবই কৃপা করা হয়েছে। যেন অমৃত বর্ষণ হয়ে গিয়েছে। 'ভরত বাহুবলী' মহাকাব্যে কবি পুণ্যকুশল লিখেছেন—'নৃপাঃ প্রসীদন্তি দৃশৈব নো গিরা' —রাজারা দৃষ্টির দ্বারাই প্রসন্নতা বর্ষণ করেন, বাণীর দ্বারা নয়। তাঁরা এমন দৃষ্টি নিক্ষেপ করেন যে, সামনে যারা থাকে তারা আপনা-আপনি অনুগৃহীত হয়েছে বলে মনে করে। কেমন করে এই অনুগ্রহ তাঁদের দৃষ্টি থেকে ঝরে পড়ে? দৃষ্টি থেকেই ঝরে, কিন্তু আসলে এই অনুগ্রহ চোখে নেই। তা আছে তৈজস শরীরে। ঐ রকম ব্যক্তিদের তৈজস শরীর এতই অনুগ্রাহক, প্রভাবশালী আর তীব্র হয় যে, তাঁরা যে দিকেই দৃষ্টিপাত করেন সে দিকেই লোকে অনুভব করে যেন তারা সুধাস্নাত হয়েছে।

তৈজস শরীরের দ্বিতীয় কার্য হল—নিগ্রহ করা, উপঘাত করা।

তৈজস শরীরের নিগ্রহ করার বা উপঘাত করার প্রবল ক্ষমতাও থাকে। ঐ ক্ষমতা এমন যে, একবার যদি ঐ ক্ষমতার অধিকারী কোন দিকে ক্রুর দৃষ্টিপাত করেন, তবে হাজার হাজার লোক ভয়ে কেঁপে ওঠে। এই রকম উপঘাতক শক্তির প্রকাশ আমরাও দেখেছি। এভাবে তৈজস শরীর অনুগ্রহ ও নিগ্রহ করতে সমর্থ হয়।

কার্মণ শরীর সূক্ষ্মতম শরীর। এটা কর্ম-শরীর, অন্য সব শরীরেরই মূল আধার। এই শরীর আছে বলেই তৈজস শরীর আছে, বৈক্রিয় আর আহারক শরীর আছে, স্থূল ঔদারিক শরীর আছে। যদি এই শরীর না থাকে, কোন শরীরই থাকবে না। স্থূল শরীর মৃত্যুর পরেই ছেড়ে যায়, কার্মণ কিন্তু তা নয়। যখন কারো কার্মণ শরীর ছেড়ে যায় তখন আমরা বলি—তার মোক্ষ হল, সে মুক্ত হয়ে গেল। কার্মণ শরীরের বিচ্ছেদ একবারই হয়, স্থূল শরীরের বিচ্ছেদ বার বার হয়।

একটা ছোট ঘটনার কথা বলি। একবার মাছি আর পিঁপড়ের মধ্যে বিবাদ হল। মাছি পিঁপড়েকে বলল—'তুই কোথায় কোথায় যেতে পারিস? তোর গতির তো সীমা আছে। আর দেখ, আমি সব জায়গায় যেতে পারি। যেখানে ভগবানের ভোগ লাগাচ্ছে সেখানেও যেতে পারি। আমার চলাফেরার কোন বাধা নেই।' পিঁপড়ে বলল—'যাওয়া এক কথা, আর নিমন্ত্রণ পেয়ে যাওয়া আর এক কথা। তুমি যেখানেই যাও সেখানেই তোমাকে উড়িয়ে দেয়, মেরে দেয়, গাল দেয়।'

ওই মাছির দশাই আমাদের শরীরের। যতবারই আমরা শরীর ছাড়ি, ততবারই আবার শরীর এসে জোটে। কার্মণ শরীর কিন্তু এমন নয়। এই শরীর সহজে ছাড়ে না। কিন্তু একবার যদি ছেড়ে যায় তো চিরকালের মত ছাড়ে। এই শরীর—ভাবনার শরীর, বাসনার শরীর, সংস্কারের শরীর। এই শরীর থেকে মুক্তি পাওয়া কঠিন।

স্থূল শরীরের সঙ্গেই আমাদের কাজ। সাধনার উদ্দেশ্য হল, আমরা স্থূল শরীরের শক্তিকে জাগ্রত করব, সঙ্গে সঙ্গে সূক্ষ্ম শরীরের শক্তিকেও সক্রিয় করব। স্থূল ও সূক্ষ্ম—উভয় শরীর থেকেই আমরা লাভবান হব।

মনোবিজ্ঞান চেতন মন আর অবচেতন মন—এই দুই প্রকার মনের প্রতিপাদন করেছে। চেতন মনে যত শক্তি আছে, অবচেতন মনে তার অনন্ত গুণ শক্তি আছে। চেতন মন চতুর। অবচেতন মন সরল, কিন্তু অনন্ত শক্তির ভাণ্ডার। এ কাজ করতে হবে, ও কাজ করা হবে না—আপনার এ সব কথা চেতন মন শুনবে বটে, কিন্তু করার বেলায় তা সেই কাজই করবে যে কাজ তার আগে ভাল লেগেছে। অবচেতন মন সে রকম নয়। অবচেতন মনকে আপনি যা বলবেন তা যদি ঐ মন ধারণা করে নিতে পারে, তবে ঐ মন সেই কাজই করবে যে কাজ তাকে করতে বলবেন। এই যে চেতন মন আর অবচেতন মনের পার্থক্য, তা স্থূল শরীর ও সূক্ষ্ম শরীরের পার্থক্যও বটে। স্থূল শরীরের শক্তিকে যদি এক পয়সা মনে করা যায় তো সূক্ষ্ম শরীরের শক্তিকে বলতে হবে নিরানব্বই পয়সা। এত পার্থক্য দুই শরীরের মধ্যে। সূক্ষ্ম শরীরকে জাগ্রত করার অর্থ হল—বিদ্যুৎ ভাণ্ডার নির্মাণ করা। কিন্তু আমাদের চলতে হবে স্থূল শরীরকে নিয়েই। আমাদের শক্তিকে প্রকট করার প্রথম উপায় এই স্থূল শরীর। সাধনার দৃষ্টিতে এই শরীর মূল্যবান। আবার অনেক উচ্চে দৃষ্টি দিয়ে আমরা শরীরকে বহিষ্কার করেছি, কারণ শরীরই আমাদের বাসনার দিকে প্রেরিত করে। আমাদের সাহিত্যিকরাও জিভকে, চোখকে হাজার রকমের গাল দিয়েছেন, ভাল-মন্দ বলেছেন। কোন কোন সাধক বলেছেন, চোখকে ফুঁড়ে দেওয়াই খুব বড় সাধনা, কারণ চোখই বিকৃতির শক্তিমান মাধ্যম। চোখকে না ফুঁড়লে সাধনা সম্ভব হয় না। তাঁরা বাস্তবিকই চোখ ফুঁড়তেন, আর চিরকালের জন্য অন্ধ হয়ে যেতেন।

সাধনার জন্য শরীরের উপযোগিতা কি? শরীরের দুই মুখ্য ভাগ—মস্তিষ্ক আর সুষুম্না। মস্তিষ্ক সমস্ত শরীরতন্ত্রের নিয়ামক আর সঞ্চালক। চোখ দেখে। কিন্তু দর্শন শক্তি আছে মস্তিষ্কে। কান শোনে। কিন্তু শ্রবণশক্তি থাকে মস্তিষ্কে। সমস্ত জ্ঞানের গ্রাহক ও সঞ্চালক সংস্থান হল মস্তিষ্ক। সকল স্মৃতিই সেখানে সংগৃহীত থাকে। মস্তিষ্ককে জাগ্রত

করাই স্মৃতিকোষকে জাগ্রত করা। আমাদের মস্তিষ্ক অতিশয় শক্তিশালী। সেখানে শতকোটি কোষ আছে, আর সেই সব কোষে অসংখ্য সংস্কার, অসংখ্য স্মৃতি সংগৃহীত আছে। অবধান বিদ্যা স্মৃতিকোষেরই এক চমৎকারী প্রকাশ।

নন্দীসূত্রে মতিজ্ঞান সম্বন্ধে বিস্তৃত বর্ণনা আছে। সেখানে তার বারটি প্রকার-ভেদ নির্দিষ্ট করা হয়েছে—বহুগ্রাহী, ক্ষিপ্রগ্রাহী ইত্যাদি। ঐগুলি সমস্ত মস্তিষ্কের শক্তির দ্যোতক। তবে ঐগুলির বিবেচনা সময়-সাপেক্ষ। আজ একথা স্পষ্ট হয়ে গিয়েছে যে স্থূল শরীরের শক্তির বিষয়ে আমাদের পুরো জ্ঞান থাকা দরকার। আমাদের শরীরে মস্তিষ্ক, পৃষ্ঠরজ্জু, কণ্ঠ, ভ্রূকুটি, তালু, নাসাগ্র, নাভি, মূলবন্ধের স্থান ও পায়ের বুড়ো আঙ্গুল—এগুলি মুখ্য কেন্দ্র। এগুলিকে জানা আবশ্যক। এদের দ্বারা আমরা স্থূল শরীরকে জাগ্রত করব, আর ঐ শরীরের যে সব শক্তি আছে তাদের থেকে লাভবান হব। এ কথা বলা যায় যে, আমাদের স্থূল শরীরের সমগ্র শক্তির লক্ষ ভাগের মধ্যে কেবল দু-চারটি ভাগই আমরা বর্তমানে ব্যবহার করতে সক্ষম হয়েছি, বাকি সব ভাগই সুষুপ্ত রয়ে গিয়েছে, জাগ্রত হয় নি। কিন্তু এই সুষুপ্ত শক্তির বোধ আমাদের হওয়া চাই।

ধর্ম এই কথা বলেছে, অধ্যাত্মশাস্ত্র এই নির্দেশ দিয়েছে, সাধনা এই শিখিয়েছে যে—তুমি অনন্ত শক্তির স্রোত, তুমি নিজের শক্তি-সম্পদকে দেখ, বোঝ আর অনুভব কর, বৃথাই তুমি ভিখারির মত দুয়ারে দুয়ারে ঘুরে বেড়াচ্ছ, কেন তুমি ভিক্ষা চেয়ে মরছ। অবশ্য এই জ্ঞান কেবল তখনই হতে পারে যখন আমাদের শরীর সম্বন্ধে পূর্ণ বোধ হয়েছে। তাই আমরা শরীরকে উপেক্ষা করব না; শরীরের কাছে আমাদের যেমন প্রত্যাশা, তার অনুরূপ সম্মান ও আদর আমরা শরীরকে দেব।

১৭

প্রাণ ও তার কার্যক্ষেত্র

সাধারণ জৈন বিদ্যার্থীও জানে আমাদের শরীরে দশটি প্রাণ আছে। সে তাদের পারিভাষিক নাম ও বিশেষ বিশেষ কার্যও জানে। আমাদের সমস্ত ব্যবস্থাই অহিংসার আধারে স্থাপিত। হিংসা বোঝাতে একটি শব্দ আছে—প্রাণাতিপাত। প্রাণের বিনিযোজন করা—হিংসা। প্রাণী, প্রাণ ও প্রাণের বিনিযোজন—এই তিনটি পরস্পরের সঙ্গে জড়িত। প্রাণী তাকেই বলি যে প্রাণকে ধারণ করে আছে। প্রাণ না থাকলে আত্মাও প্রাণী হতে পারত না। আত্মার যে প্রাণীর অবস্থা, তা প্রাণধারার কারণেই হযেছে। প্রাণ জীবনের মুখ্য কেন্দ্র। আমাদের বুঝতে হবে, সাধনার দৃষ্টিতে প্রাণের কি মূল্য আছে। প্রাণ একটি ধারা, শক্তির এক প্রবাহ। ঐ প্রবাহ সমস্ত শরীরে প্রবাহিত রয়েছে। তার দ্বারাই জীবনের সঞ্চালন হচ্ছে। প্রকৃতপক্ষে প্রাণ দশটি নয়, প্রাণধারা একই। কিন্তু তা বিভিন্ন কাজ সম্পাদন করে, সেজন্য অনেক হযে যায। প্রাণের মুখ্য কেন্দ্র দশটি, সেজন্য প্রাণ দশটি বলা হয। যে জীব মাত্র এক ইন্দ্রিয়বিশিষ্ট তারও প্রাণ আছে, যে জীব পাঁচ ইন্দ্রিযবিশিষ্ট তারও প্রাণ আছে। এ রকম স্থলে প্রাণের সংখ্যার পার্থক্য হয় বটে, কিন্তু প্রাণশক্তির পার্থক্য হয় না।

প্রাণের দশটি কেন্দ্র আছে। যদি আমরা বলি শরীরে দশটি প্রাণ আছে, তাৎপর্য এই যে, শরীরে এমন দশটি কেন্দ্র আছে যেখান থেকে প্রাণশক্তি সঞ্চালিত হতে পারে। পাঁচ ইন্দ্রিয়, মন, বচন, কায়া, শ্বাস-প্রশ্বাস আর আয়ুষ্ব—এই দশটি প্রাণ। এই দশ প্রাণের স্থান কোথায় কোথায়? যে প্রাণের দ্বারা নিজের কেন্দ্রগুলিতে শক্তি যোগায় তার অবস্থানই বা কোথায়, তার 'সেন্টার' কোথায়? দশ প্রাণকেই শক্তি দেওয়ার কেন্দ্র আমাদের মস্তিষ্কে আছে। মস্তিষ্কে সমস্ত শক্তিই কেন্দ্রিত। লক্ষ্য করুন, আপনার শ্রবণের এক কেন্দ্র আছে, ঘ্রাণের এক কেন্দ্র আছে, শ্বাসের এক কেন্দ্র আছে, চিন্তন ও সংবেদনা প্রভৃতির এক কেন্দ্র আছে; কিন্তু ঐ সব কেন্দ্রই মস্তিষ্কে অবস্থিত। এর এই অর্থ যে, আমাদের ছয়টি পর্যাপ্তির কেন্দ্রই আমাদের মস্তিষ্কে আছে। পর্যাপ্তিগুলি পৌদ্গলিক রচনা। পর্যাপ্তি একটি সংস্থান, তাতে ক্ষমতা আছে। তার কেন্দ্রে যখন প্রাণের ধারা সঞ্চারিত হয়, তখন তা সক্রিয় হয়ে ওঠে। তখন পর্যাপ্তি প্রাণের রূপ ধারণ করে। এজন্য আমরা মানি যে পর্যাপ্তি কারণ, আর প্রাণ কার্য। দুয়ের মধ্যে সম্বন্ধ আছে। মূল প্রাণ কি? এই প্রশ্ন জটিল। এক আছে প্রাণবায়ু, আর এক আছে প্রাণ। দুটি কিন্তু একই বস্তু নয়। অনেক সময়েই আমরা প্রাণবায়ুকেই প্রাণ বলে মনে করেছি। আসলে কিন্তু ঐ দুটি পৃথক, এক নয়। যে বায়ু আমরা গ্রহণ করি তা সম্পূর্ণ প্রাণ নয়। যখন আমরা শ্বাস নিই তখন আমরা প্রাণকে টেনে নিই না, যখন আমরা শ্বাস ছাড়ি তখন আমরা প্রাণকে ছাড়ি না। যখন আমরা প্রাণায়াম করি তখন আমরা প্রাণের আয়াম, অর্থাৎ নিয়মন করি না, আমরা প্রাণবায়ুর আয়াম করি। এই যে এত শ্বাস নেওয়া ও ছাড়া—এ সবই বায়ুর কাজ, প্রাণের কাজ নয়। আমাদের প্রাণ তো এক সূক্ষ্ম ধারা, যা আমাদের ভেতরে থেকে সমস্ত কার্য সঞ্চালিত করে। প্রাণ আসছে আত্মশক্তি থেকে, তৈজস শরীরের রূপে। প্রাণবায়ুর চেতনার সঙ্গে সোজাসুজি সম্বন্ধ হয় না, প্রাণ কিন্তু চেতনার সঙ্গে সোজা সম্বন্ধে জড়িত।

আমাদের তৈজস শরীর সমস্ত উষ্মা উৎপাদন করে। জীবনের সঙ্গে ঐ শরীরের নিকট সম্বন্ধ, স্থূল শরীরের সম্বন্ধ নিকট নয়। এক দিকে জীবের তৈজসশক্তি আর এক দিকে চৈতন্য, যখন এই দুই দিকের সংযোগ হয়, তখন প্রাণের উৎপত্তি হয়। প্রাণে চৈতন্যের প্রবাহ আছে, প্রাণবায়ুতে চেতনার প্রবাহ নেই। প্রাণকে এক যৌগিক শক্তি বলতে হয়।

আমাদের শরীরে এক বিশেষ কেন্দ্র আছে। যে স্থানে সুষুম্নার নিম্নস্থ প্রান্তভাগ শেষ হয় তার নিচেই সেই কেন্দ্র অবস্থিত। কেন্দ্রটি প্রাণশক্তির উৎপাদক। প্রাণশক্তিকে প্রকটিত করার ও তাকে সঞ্চারিত করার মুখ্য কেন্দ্রই ঐটি। প্রাণশক্তি সুষুম্না দিয়ে বিভিন্ন মার্গে সঞ্চারিত হয় ও মস্তিষ্ক পর্যন্ত পৌঁছয়। প্রাণশক্তি ওপর থেকে নিচের দিকে যায় না, নিচ থেকে ওপরের দিকে যায়। ঐ শক্তি নিচ থেকে যত বেশি ওপরের দিকে যাবে, মানুষের শরীর ও মন ততই সুস্থ থাকবে। প্রাণশক্তির প্রবাহ যতই কম হবে মানুষ ততই শরীর ও মনে রুগ্ন হয়ে যাবে।

কর্মকার ভস্ত্রা চালায়। তাতে হাওয়া হয় এবং আগুন জ্বলে ওঠে। এক দিকে ভস্ত্রা দিয়ে হাওয়া বের হয়, অন্যদিকে আগুন জ্বলে। হাওয়া আর আগুন এক নয়। অথচ হাওয়ার যত তেজ হবে, আগুনেরও তত তেজ হবে। ঠিক এইভাবেই প্রাণবায়ু প্রাণকে উত্তেজিত করে, সহায়তা দেয়। আমরা যে মাত্রায় প্রাণবায়ু (অক্সিজেন) নেব, সেই মাত্রায় প্রাণ বিশুদ্ধ হবে, সক্রিয় হবে। যদি প্রাণবায়ু না মেলে তো প্রাণে উত্তেজনা বা সক্রিয়তা আসবে না। শরীর শাস্ত্রের দিক থেকে এর কারণ এই যে, আমাদের শরীরে রক্ত-সঞ্চালন হৃৎপিণ্ডের দ্বারা হয়, তবে ঐ রক্ত ফুসফুসে এসে তারপরে সারা শরীরে যায়। হৃৎপিণ্ড আর ফুসফুস—এই দুটি আমাদের রক্ত-সঞ্চালনের মুখ্য যন্ত্র। ফুসফুসে যে রক্তের শোধন হয় তার জন্য ইন্ধন চাই। ঐ ইন্ধনই হল প্রাণবায়ু-অক্সিজেন। যদি প্রাণবায়ু ঠিকমত মেলে, তবে অশুদ্ধ বায়ুকে শুদ্ধ

করে কার্বন প্রভৃতি শরীর থেকে বের করে দেওয়া যাবে, আর শুদ্ধ রক্ত ভেতরে প্রবাহিত হবে। আর যদি প্রাণবায়ু না মেলে তো রক্ত বিকৃতই থাকবে, আর তার ফলে সারা শরীরেই বিকৃতি দেখা দেবে। প্রাণবায়ু রক্ত-শুদ্ধির উপায়, আর শুদ্ধ রক্তকে সারা শরীরে প্রাণবায়ুই গতি দেয়। প্রাণের সঙ্গে তার সম্বন্ধ গভীর। প্রাণবায়ু রক্তের মাধ্যমে প্রাণকে উত্তেজিত করে, সক্রিয় করে। একটা ছোট গাছ যদি জলের পর্যাপ্ত সেচন পায় তবে তা সবুজ পাতায় পূর্ণ হয়ে বেড়ে ওঠে। সেই রকম, প্রাণবায়ুর পর্যাপ্ত সেচন পেলে প্রাণের ছোট গাছটিও পাতার সমারোহে বেড়ে ওঠে। পুরো সেচ না পেলে ছোট গাছ শুকিয়ে যায়। সেই রকম, মানুষও নিষ্প্রাণ ও নিষ্ক্রিয় হয়ে যায়।

যেখানে প্রাণবায়ু পৌঁছতে পারে না সেখানে রক্তের শোধন হয় না, আর শোধনের অভাবে দূষিত পদার্থ জমতে থাকে। যে প্রাণায়াম জানে সে সবার আগে এই বিষয়ে প্রযত্ন করে, কিভাবে বেশি বায়ু ফুসফুসে পৌঁছে দেওয়া যায়। কিভাবে শ্বাসকে দীর্ঘ করা যায়।

প্রাণবায়ুকে ঠিকমত নেওয়ার সাধনই হল—প্রাণায়াম। যে প্রাণায়াম জানে না, সে পুরো মাত্রায় প্রাণবায়ু গ্রহণ করতে সক্ষম হয় না। তিনটি ব্যাপার এখানে জড়িত—প্রাণ, প্রাণবায়ু আর প্রাণায়াম। প্রাণায়াম ছাড়া প্রাণবায়ুর সম্যক গ্রহণ হয় না, আবার প্রাণবায়ু ছাড়া প্রাণের সম্যক উদ্দীপন হয় না। সবশেষে আমি প্রাণায়ামের কথা বলছি। প্রাণায়াম এক সাধন। এই সাধন এতই গুরুত্বপূর্ণ যে এর সম্যক জ্ঞান না থাকলে প্রাণবায়ুকে জানা সম্ভব হয় না। যোগের আচার্যরা এই বিষয়ে যা কিছু লিখে গিয়েছেন আজকের বিজ্ঞান তার সঙ্গে একমত হতে চলেছে।

আমি প্রাণ থেকে আরম্ভ করেছিলাম, তারপরে প্রাণবায়ুর কথা বলেছিলাম, এখন প্রাণায়ামে এসে পৌঁছেছি। এবার উল্টো পথে যাত্রা শুরু করছি। আমি প্রাণায়াম থেকে আরম্ভ করছি। আমাদের প্রাণায়ামের অভ্যাস উপযুক্ত হওয়া দরকার। তাহলে প্রাণবায়ু স্বয়ং

প্রসাধিত হবে। প্রাণবায়ুকে কি মাত্রায় নেওয়া দরকার, প্রাণবায়ু কতদূর পর্যন্ত পৌঁছচ্ছে—এসব বিষয়েরও জ্ঞান থাকা চাই। প্রাণবায়ু ঠিকমত নিতে পারলে প্রাণকে সক্রিয় করার ক্ষমতা জাগ্রত হবে। প্রাণশক্তিকে আশ্রয় করে যোগী ব্যক্তি বিচিত্র কাজকর্ম করে দেখাতে পারেন। তৈজস শরীরের অনুগ্রহ ও নিগ্রহ করার ক্ষমতা আছে। তৈজসশক্তি সম্পন্ন ব্যক্তি নির্যাতন করতে পারেন, বিনষ্ট করতে পারেন, মারতে পারেন—আবার অনেক রকম অনুগ্রহও করতে পারেন, দিতেও পারেন। ঐ রকম ব্যক্তির দেওয়ার ক্ষমতাও থাকে। এ সবই আসলে প্রাণশক্তির ক্রিয়া; প্রাণের সম্বন্ধ আছে তৈজসের সঙ্গে। এসব ক্রিয়া তখনই হয়, যখন প্রাণায়াম থেকে প্রাপ্ত প্রাণবায়ুর অগ্নি প্রাণকে এতটা উদ্দীপ্ত করে—প্রাণকে এমনভাবে প্রজ্জ্বলিত করে—যে, প্রাণের অদ্ভুত ক্ষমতা প্রকটিত হয়ে যায়। সুতরাং এদিক থেকে প্রাণায়ামের যথেষ্ট গুরুত্ব আছে।

প্রাণের সমস্ত কেন্দ্র মস্তিষ্কে, কিন্তু প্রাণধারার দুটি পথ হতে পারে। একটি পথ বাইরে, আর একটি পথ ভেতরে। বাইরের পথই আগের পথ। এই পথ দিয়ে গেলে প্রাণশক্তি আমাদের শরীর-তন্ত্রকে সক্রিয় করে তোলে। আমাদের যে স্বাভাবিক শক্তি আছে, তা এর থেকেই উৎপন্ন হয়। তা অতিরিক্ত কিছু ক্ষমতা দেয় না। এই পথে প্রবহমান প্রাণশক্তি আমাদের দশটি প্রাণ-কেন্দ্রকে সক্রিয় করে, আর আমাদের জীবনযাত্রার সঙ্গে তাল রেখে চলে। যখন আমরা প্রাণশক্তির প্রবাহকে এই পথ থেকে অপর পথে ঘুরিয়ে দিই, তখন ভিন্ন প্রকারের শক্তির উৎপত্তি হয়।

প্রাণধারা প্রবাহিত হওয়ার ভেতরের পথকে বলা হয়—মহাবীথি। এই শব্দ আচারাংগ থেকে এসেছে—'পণয়া বীরা মহাবীহি'। জানি না সূত্রকার কি অভিপ্রায়ে এই শব্দ ব্যবহার করেছেন, জানি না ব্যাখ্যাকারদের অভিপ্রায়ই বা কি। কিন্তু এই রকম মনে হয় যে, এই সূত্র প্রাণধারাকে পৃষ্ঠরজ্জু দিয়ে ঊর্ধ্বগামী করে দেওয়ার সূত্র। এর

অর্থ যে বীর হয়, তাকে মহাপথ দিয়ে চলতে হয়। 'হঠযোগ প্রদীপিকায়' সুষুম্নার এক পর্যায়বাচী নাম 'মহাপথ'। অনুমান করি, মহাবীথি আর মহাপথ একই কথা। বীর সেই ব্যক্তিই, যে মহাবীথি ধরে চলতে পারে। সুষুম্নার পথ দিয়ে যাওয়া সত্যিই বীরের কাজ। সাধারণ মানুষ এ পথে চলতে পারে না। সুষুম্নার পথ দিয়ে প্রবহমান প্রাণধারা সুষুম্নার কোণে যে শক্তি আছে তাকে সংগ্রহ করে নেয় ও অধিকতর শক্তিশালী হয়ে যায়। প্রাণধারার এই দুটি পথ—একটি অগ্রগামী বা বাইরের, অপরটি পৃষ্ঠরজ্জুগামী বা ভেতরের।

যে সাধক প্রাণায়াম করে, প্রাণবায়ুর মর্ম বোঝে, সেই সাধক প্রাণবায়ুকে উত্তেজিত করতে পারে। আবার কুম্ভক করে সুষুম্না মার্গে ধাক্কা লাগায়, আর প্রাণকে ওপরে নিয়ে যায়। প্রাণ যতই জ্ঞান-কেন্দ্র পর্যন্ত, সহস্রার পর্যন্ত পৌঁছয়, ততই আমাদের বৌদ্ধিক ও আন্তরিক বিকাশ হয়। প্রাণধারা যদি মনের সঙ্গে নিচের দিকে প্রবাহিত হয় তবে ভাবাবেগ আর কামনা-বাসনায় আমরা ভরে উঠি। প্রাণ আর মনের সম্বন্ধ অতি গভীর। প্রাণধারা নিম্নগামী হলে মনও নিম্নগামী হয়, প্রাণধারা ঊর্ধ্বগামী হলে মনও ঊর্ধ্বগামী হয়। আবার মন নিম্নগামী হলে প্রাণধারাও নিম্নগামী হয়, মন ঊর্ধ্বগামী হলে প্রাণধারাও ঊর্ধ্বগামী হয়। এজন্য মন ও প্রাণ উভয়কেই ঊর্ধ্বগামী অবস্থায় রাখা বিশেষ প্রয়োজন।

১৮

আহার অনাহার

আমাদের জীবনের সকল কর্ম-প্রবৃত্তির আধারই হল শরীর, আর শরীরের আধার—আহার বা ভোজন। আহার ছাড়া শরীর চলে না, আবার শরীর ছাড়া কর্ম-প্রবৃত্তি হয় না। এই যে আঙ্গুল হেলাচ্ছি, এ কাজও আহার ছাড়া সম্ভব হয় না। আহার গ্রহণ না করে চিন্তা করা যায় না, কথা বলা যায় না, শ্বাস নেওয়া যায় না। আপনারা মনে করবেন না যে, পাঁচ ঘণ্টা আগে আমি যে আহার করেছিলাম তারই শক্তিতে এখন আঙ্গুল নাড়ছি। এখন যদি আঙ্গুল হেলাই, বুঝতে হবে এখনই আহার পেয়ে সে কাজ করতে পারছি। এখন যে আমি কথা বলে যাচ্ছি, তা সঙ্গে সঙ্গে আহার পাচ্ছি বলেই বলতে পারছি। এখন যে আমি চিন্তা করছি, তা সঙ্গে সঙ্গে আহার পাচ্ছি বলেই করতে পারছি। শরীরের প্রবৃত্তি যে ক্ষণে হয়, তার পূর্বক্ষণেই আমাদের আহার নিতে হয়। আহার নেওয়ার পরেই আমাদের প্রবৃত্তি হতে পারে। 'আহার' শব্দের অর্থ—বাইরে থেকে নেওয়া। বাইরে থেকে কিছু না নিয়ে কোন প্রবৃত্তিই হতে পারে না।

গৌতম মহাবীরকে জিজ্ঞাসা করলেন—'ভন্তে! এক সমর্থ মুনি আছেন। তিনি বৈক্রিয় রূপ নির্মাণ করেন। বৈক্রিয় শক্তির প্রয়োগ

করেন। তিনি নিজের থেকেই নানা রূপ সৃষ্টি করেন। কিন্তু তিনি কি আহার না নিয়ে, পুদ্গল গ্রহণ না করে, এসব করতে পারেন?

মহাবীর বললেন—গৌতম! তুমি খুবই শক্তিশালী, কিন্তু বহু পুদ্গল না নিয়ে তিনি এসব করতে পারেন না। তিনি বাইরে থেকে আহার নিয়েই এসব করছেন।

আমি স্বীকার করি আপনারা আহার সম্বন্ধে আমার এসব কথা পুরোপুরি বুঝতে পারছেন না। না পারার কারণও আছে। আমাদের মুখ দিয়ে খাওয়া হয় যে খাদ্য তাকেই কেবল আমরা আহার বলে মানি, অন্য কোন আহার আমাদের আহার বলেই মনে হয় না। কিন্তু প্রকৃত অবস্থা অন্য রকম। মুখ দিয়ে খাওয়া হয় যে পদার্থ তা আমাদের যত শক্তি দেয়, তার থেকে অধিক শক্তি দেয় অন্য অনেক তত্ত্ব, যা আমরা আহার রূপেই গ্রহণ করে থাকি। আহারের অর্থ—নেওয়া টেনে নেওয়া, আহরণ করে নেওয়া। আমরা মুখ দিয়ে নিই। কিন্তু কতবার? সাধারণত দুবার, আর খুব বেশি হলে দশ-বিশ বার। কিন্তু এ সবই স্থূল কথা। সূক্ষ্ম তত্ত্ব এই যে, আমরা প্রতিক্ষণই আহার নিয়ে থাকি, আর ঐ আহার ছাড়া আমাদের জীবন চলে না। জৈন পরিভাষায় এই আহারের সংজ্ঞা—'লোম আহার'। যে আহার মুখ দিয়ে নেওয়া হয় তা 'কবল আহার', আর যে আহার শরীরের প্রতি রোমকূপ দিয়ে নেওয়া হয় তা 'লোম আহার'। বাস্তবিক পক্ষে, এই দ্বিতীয় প্রকারের আহারই আমাদের জীবনের আধারভূত আহার। এই আহার ছাড়া জীবন চলে না। মুখ দিয়ে কিছু না খেয়েও আমরা ত্রিশ, চল্লিশ, পঞ্চাশ বৎসর বেঁচে থাকতে পারি, কিন্তু 'লোম আহার' ছাড়া বেঁচে থাকতে পারব না।

প্রথম আহার 'কবল আহার', দ্বিতীয় আহার 'লোম আহার'। আবার তৃতীয় প্রকারের আহারও আছে, তাকে বলে 'মনো আহার' বা 'মানসিক আহার'। এই আহারের জন্য শরীরের প্রয়োজন নেই, কবল বা গ্রাসের প্রয়োজন নেই, লোমেরও প্রয়োজন নেই। মনে সংকল্প করা

হল, আর অমনি পূর্ণ আহার হয়ে গেল। এই হল মনোভক্ষী আহার, মানসিক আহার। সুতরাং আহার হল তিন রকমের—কবল আহার, রোম আহার আর মনো আহার। সমগ্র আহার আমাদের শরীরকে নতুন স্বরূপ প্রদান করে, আর আমাদের আহার সম্বন্ধে স্থূল ধারণা দূর করে। আজ আহার বিষয়ে অনেক ভ্রান্ত ধারণা জন্মেছে। তার ফলে মানুষ অনেক অস্বস্তিতে ভুগছে। কারণ, সবাই বুঝে নিয়েছে যে, মুখ দিয়ে যা খাওয়া হয় তা শরীর ধারণের পক্ষে পর্যাপ্ত। এই পর্যাপ্ততার ধারণা কিন্তু ভুল। আজ 'সংতুলিত আহার' অর্থাৎ সুষম বা সুসমঞ্জস আহার, কথাটি বহুল প্রচলিত। সংতুলিত আহারের অর্থ, —সেই আহার, যাতে সব তত্ত্বই সংতুলিত মাত্রায় বিদ্যমান থাকে। আহারশাস্ত্রবিদের এই অভিমত। যোগশাস্ত্রজ্ঞদের অভিমত কিন্তু ভিন্ন। তাঁদের মতে সংতুলিত আহার তাকেই বলা যায়, যাতে এই চারটি তত্ত্বই পাওয়া যায়—যথা, খাদ্য, তেল, বায়ু আর প্রকাশ অর্থাৎ সূর্যের তাপ। শরীরশাস্ত্রীরা যে সংতুলিত আহারের কথা বলেন তার পরিধির মধ্যে আছে শুধু খাদ্য আর তেল, অর্থাৎ চারটি তত্ত্বের মধ্যে তাতে আছে প্রথম দুটি তত্ত্ব, কিন্তু শেষ দুটি তত্ত্ব নেই। আমি বলব সেই আহার সংতুলিত হতে পারে না, যাতে বায়ু আর প্রকাশের (রৌদ্রের) কোন স্থান নেই। আপনারা প্রশ্ন করতে পারেন, খাদ্য আর তেলেই তো ক্ষুধার উপশম হয়, জঠরাগ্নি শান্ত হয়, তবে বায়ু আর রৌদ্রের প্রয়োজন কি? ওগুলি দিয়ে কি পেট ভরবে? আর যদি ওগুলিতেই পেট ভরে, তবে তো বিশ্বের সবচেয়ে বড় সমস্যার সমাধান হয়ে গেল, আজকের সব অভাবই মিটে গেল। কথাটা ঠিকই বটে। আমি এমন বলব না যে, আপনারা পূর্ণভাবে বিশ্বাস করুন ওগুলিতে পেট ভরে। তবে আমার বিশ্বাস, এ বিষয়ে আমার সব কথা শোনার পরে আপনারা আমার সঙ্গে একমত হবেন যে, এগুলিতেও পেট সত্যিই ভরে।

আমি প্রথমে রৌদ্রের কথা বলছি। রৌদ্র বা প্রকাশ আমরা

সূর্যের কাছ থেকে পাই। আমাদের শরীরের ভিটামিন 'ডি'-র বিশেষ আবশ্যকতা আছে। এই ভিটামিন 'ডি' সূর্যের রশ্মি থেকে যত ভালভাবে পাওয়া যায় অন্য কোন উৎস থেকে তত ভালভাবে পাওয়া যায় না। আমাদের শরীরের চামড়ার আশপাশে এমন এক দ্রব্য থাকে যার ওপরে সূর্যের রশ্মি পড়লেই ভিটামিন 'ডি' স্বতই উৎপন্ন হয়। সূর্যের রশ্মি ভিটামিন 'ডি'-র পূর্তি করে। শরীরের ওপর পতিত সূর্যের রশ্মি ক্যালসিয়ম ও ফসফরাসেরও পূর্তি করে। এই দুটি দ্রব্যই শরীরের পক্ষে আবশ্যক। প্রাকৃতিক চিকিৎসাশাস্ত্রের এই অভিমত যে, মানুষের প্রতিদিন কিছু সময় জঙ্গলে গিয়ে বস্ত্রহীন হয়ে থাকা উচিত, নগ্ন হয়ে ঘোরা উচিত ও সূর্যের তাপ সেবন করা উচিত। এতে শরীরের অনেক অভাব পূর্ণ হয়। সাধনার ক্রম অনুসারে নগ্নতার স্থান ছিল, নগ্নতা অনাবশ্যক ছিল না বা মূর্খতার পরিচায়ক ছিল না। নগ্নতা খুবই আবশ্যক ছিল, এবং অনেক বিচার-বিবেচনা করেই তার স্থান নির্ধারণ করা হয়েছিল। শারীরিক আর মানসিক সাধনার দিক থেকে নগ্ন থাকায় যে লাভ হতো, সবস্ত্র থাকায় সে লাভ হতো না। উত্তরাধ্যায়ন সূত্রে স্পষ্ট ভাষায় উল্লিখিত হয়েছে, নগ্নতা (প্রতিরূপতা) থেকে লঘুতা হয়, লঘুতা থেকে অপ্রমাদ, জিতেন্দ্রিয়তা, বিপুলতপঃ প্রভৃতি লাভ হয়।

এখন শারীরিক ও বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে বিষয়টি বিবেচনা করি। নির্বস্ত্র থাকলে সূর্যকিরণ আমার সারা শরীরে পড়তে পারে। ঐ রৌদ্র আমার আহারের পূর্তি করে। বিজ্ঞানেরও এই অভিমত। রৌদ্র খাদ্যের পূরক তত্ত্ব। যে ব্যক্তি আতাপনা নেয়, রৌদ্র সেবন করে, তার আহারের মাত্রাও কমে যায়। আতাপনা সম্বন্ধে যত তথ্য জৈন সাহিত্যে পাওয়া যায় অন্যত্র তা পাওয়া যায় না। ঐ সাহিত্যে বলা হয়েছে, যে আতাপনা নেয় তার আহারের মাত্রা—আহারের আবশ্যকতা কমে যায়। সে অধিক ভোজন করতেই পারে না, কারণ তার আহারের অনেক আবশ্যকতাই রৌদ্র থেকে মিটে যায়। আতাপনার

মূল্য কত, আতাপনার মূল্য কত গুরুত্বপূর্ণ, তা আমরা ভুলেই গিয়েছি। আজকের আহারশাস্ত্রবিদেরাও স্বীকার করেন, যে ব্যক্তি রৌদ্র ও বায়ু থেকে নিজেকে বঞ্চিত করে, সে জেনেশুনে বিপদ ডেকে আনে। তাঁরা বলেন—জঙ্গলে চলে যাও, সমস্ত কাপড় ফেলে দাও, নেংটি রাখারও প্রয়োজন নেই। মাটির ওপর শুয়ে পড়, শরীর যদি রৌদ্রে জ্বলে যায়, জ্বলতে দাও—কোন ক্ষতি হবে না। যদি জ্বলন থেকে বাঁচতে চাও তো শরীরের ওপর একটা পাতলা কাপড়ের আবরণ রাখ। এই হল আতাপনার ক্রিয়া। একে হঠযোগের ক্রিয়া মনে করা মূর্খতা। এটা জীবনধারণের জন্য একটা গুরুত্বপূর্ণ ক্রিয়া।

এখন আমি বায়ু সম্বন্ধে বিচার করব আমরা যা খাই, তাতে প্রাণবায়ুর যোগ না থাকলে তার মূল্য কম হয়ে যায়। যে পুরোমাত্রায় প্রাণবায়ু নেয় না, তার বেশি মাত্রায় আহার নেওয়ার আবশ্যক হয়। যে পুরোমাত্রায় প্রাণবায়ু গ্রহণ করে, তার আহারের মাত্রা কমে যায়।

যদি এই বিষয় সম্বন্ধে আমরা গভীরভাবে চিন্তা করি তাহলে বুঝতে পারি যে, আমাদের শরীরে প্রধানত চারটি তত্ত্ব আছে—পৃথ্বী, জল, অগ্নি আর বায়ু। শরীরের এই চারটিরই প্রয়োজন আছে। এগুলি ঠিকমত যোগাতে হবে। খনিজ দ্রব্যের রূপে পৃথ্বীতত্ত্বের প্রয়োজন হয়। আমাদের শরীরের জন্য লৌহ আবশ্যক, সীসা আবশ্যক, রৌপ্য আবশ্যক, স্বর্ণ আবশ্যক—অনেক ধাতুই আবশ্যক। আমরা দুধ পান করি—দুধের মধ্যে অভ্র আছে। আমরা জিরা খাই—জিরার মধ্যে লৌহ আছে। মাতৃদুগ্ধে উৎকৃষ্ট রৌপ্য থাকে। আমরা শাকসব্জি খাই, তাতে অনেক মূল্যবান খনিজ থাকে। মানুষ স্বর্ণভস্ম, রজতভস্ম, লৌহ ভস্ম ইত্যাদি ঔষধ রূপে গ্রহণ করে। কিন্তু তা সম্পূর্ণ উপযোগী হয় না, তার বেশিরভাগই বৃথা চলে যায়। সেজন্য বলা হয়, প্রয়োজনীয় খনিজগুলি ভস্মরূপে না নিয়ে স্বাভাবিক আহার থেকে নেওয়ার চেষ্টা কর। এই প্রসঙ্গে একটা কথা মনে এসেছে। যেমন খনি থেকে পাওয়া খনিজ আমাদের দেহের সঙ্গে একরস হয় না, তেমনি গাছপালা

থেকে পাওয়া খনিজও পুরোপুরি একরস হয় না। এর থেকে যদি আমরা মানসিক আহার রূপে, কেবল মানসিক সংকল্পের দ্বারা, কোন দ্রব্য বিকশিত করে নিতে পারি, তবে তা সহজেই আমাদের সঙ্গে একরস হয়ে যায়। এই তথ্য প্রয়োগ করে দেখতে হয়, তবে প্রয়োগ দীর্ঘকাল-সাপেক্ষ হতে পারে। মনোভক্ষী আহারের ব্যাপার খুবই গুরুত্বপূর্ণ, খুবই সূক্ষ্ম। তবে সংকল্পের দ্বারা বিকশিত করার শক্তি অর্জন করতে পারলে আমরা মন থেকেই অনেক তত্ত্বের পূরণ করতে পারি। মনের দ্বারা পূরণ করা যদি কঠিন হয়, তবে আমরা সহজতর পথে বায়ুর দ্বারা পূর্তি করার চেষ্টা করব।

ভগবতী সূত্রে বলা হয়েছে, মানুষ ছয় দিক থেকে আহার গ্রহণ করে। পূর্ব, পশ্চিম, উত্তর, দক্ষিণ, ঊর্ধ্ব আর অধঃ—এই ছয় দিক থেকেই মানুষ আহার পায়। আজ একথা কেবল পাঠের বিষয়রূপে গ্রন্থমধ্যে নিবদ্ধ আছে। অনুসন্ধান আর চর্চার অভাবে আমরা এ কথার অর্থ আজ বুঝতে পারি না। কেন, আমরা কি পায়ের দিক থেকেও আহার সংগ্রহ করি না? নিশ্চয়ই করি। বলা হয়েছে—যখন হেঁটে বেড়াবে, খালি পায়ে হাঁট। আবার সড়ক দিয়ে হেঁট না, মাটির ওপর হাঁট। যদি সড়ক—বিশেষত পাকা সড়ক—আর জুতো দিয়ে ব্যবধান রচনা কর, তবে পৃথ্বী থেকে সাক্ষাৎ যে আহার মেলে, তা আর পাবে না। খালি পায়ে মাটির ওপর ঘুরে বেড়ালে পৃথ্বী থেকে সমস্ত তত্ত্ব টেনে নেওয়া যায়। আমরা নিজেদের মাথাকেও কাজে লাগাতে পারি। সৌর মণ্ডল থেকে প্রাণশক্তির উত্তেজক যে তত্ত্বটি বিকীর্ণ হচ্ছে তা আমরা মাথা দিয়ে দেহের মধ্যে টেনে নিতে পারি। এর থেকে এও প্রমাণিত হয় যে, কোন্ কোন্ দিকে মাথা রেখে শুলে কি কি লাভ হয়—এই সম্বন্ধে যে তথ্য প্রচলিত আছে, তার মধ্যেও সারবত্তা আছে। এতদিন তো আমরা এই তথ্যকে কেবল লোক-প্রসিদ্ধি বা অন্ধানুকরণ বলে মনে করেছি। কিন্তু এখন বৈজ্ঞানিক পরীক্ষার পরে এই তথ্য সত্য বলে নির্ণীত হয়েছে। ফরাসী ডাক্তার শোয়ার খাটের মাথার

দিক পরিবর্তন করে অনেক রোগীর চিকিৎসা করেছেন এবং এই পদ্ধতিতে রোগমুক্তি করতে আশাতীত সাফল্য লাভ করেছেন। এর বৈজ্ঞানিক কারণও আছে। সৌরমণ্ডল থেকে যে প্রবাহ আসছে তা আমার মাথাকে আকর্ষণ করে ও নিজের দিকে টেনে নেয়। যে প্রবাহের দিকে মাথা থাকে, সেই প্রবাহের তত্ত্বই মাথার মধ্যে প্রবেশ করতে পারে। এজন্য এই পদ্ধতির বিশেষ গুরুত্ব আছে।

আহারের অর্থ কেবল খাওয়াই নয়। প্রকৃত অর্থ নেওয়া, টেনে নেওয়া, আহরণ করে নেওয়া। মুখ দিয়ে, পা দিয়ে, নাক দিয়ে, মাথা দিয়ে, পা দিয়ে, চাই কি সারা শরীর দিয়ে আমরা যা কিছু বাইরে থেকে গ্রহণ করছি, তা সবই আহার।

এভাবে আমরা ওপর থেকে, নিচ থেকে, আশপাশ থেকে, ডাইনে থেকে, বাঁয়ে থেকে আহার নিয়ে থাকি। আমরা সব দিক থেকেই, সব বিদিক থেকেই, আহার নিয়ে থাকি। বায়ুর আহার আমরা বায়ুর মাধ্যমেই পাই। বায়ু থেকে লভ্য আহার সম্বন্ধে অনুসন্ধান করলে দেখব যে, গাছপালা আহার করে আমরা যে তত্ত্ব সংগ্রহ করি কেবল বায়ুর থেকেই তা আমরা লাভ করতে পারি। কারণ বায়ুমণ্ডলে সব তত্ত্বের পরমাণুই জমা আছে।

আরও দুটি বিষয় আছে। বিষয় দুটি অবশ্য সংতুলিত আহারের শ্রেণীতে পড়ে না, কিন্তু ঐ আহারের পরিপূরক হিসেবে তাদের উল্লেখ করা আবশ্যক। বিষয় দুটি—উপবাস আর মানসিক প্রসন্নতা। এদের বাদ দিলে, আহার অর্থশূন্য হয়ে পড়ে। আপনারা আহার করবেন অথচ উপবাস করবেন না, অনাহারে থাকা অভ্যাস করবেন না—সে ক্ষেত্রে আহার কষ্টের কারণ হতে পারে, জটিলতা সৃষ্টি করতে পারে। আমরা আহার করলাম ক্ষুধার সমস্যা সমাধান করার জন্য, অথচ সেই আহার থেকে অনেক সমস্যার উৎপত্তি হল। যে লোক কেবল আহার করে, উপবাস করে না, সে উপবাসের মর্ম বুঝতে পারে না। ফলে সে আহারজনিত সমস্যার প্রতিকার করতে পারে না। প্রকৃত

তথ্য এই যে, আহারেব সঙ্গে অনাহারের ও উপবাসের যোগ একান্ত আবশ্যক। এক্ষেত্রে উপবাসেব অর্থ একেবারে না খাওয়াও হতে পারে, আবার আহাবেব মাত্রা কমিয়ে দেওয়াও হতে পারে।

আহাবের সময় মনকে চিন্তামুক্ত রাখলে পাচন ক্রিয়া ভাল হয়। প্রসন্নতার অর্থ হর্ষ নয়। শোক যেমন একটা আবেশ, হর্ষও তেমনি এক আবেশ। প্রসন্নতা আবেশ নয়। প্রসন্নতা চিত্তের নির্মলতা। যেমন প্রসন্ন আকাশেব অর্থ নির্মল আকাশ, মেঘ-মুক্ত আকাশ। যে চিত্ত হর্ষ, ভয়, শোক প্রভৃতি আবেশের দ্বারা আক্রান্ত নয়, সেই চিত্ত প্রসন্ন। সেই চিত্তের বৃত্তিগুলি শান্ত। যে আহার করছে, তাকে কেবল আহাবেব কাজেই মগ্ন থাকতে হয়। সে জন্য চিত্তেব প্রসন্নতাও ভোজনেব এক গুরুত্বপূর্ণ তত্ত্ব।

১৯

ভাবনা

নদীর অপর তট সামনে। এক ব্যক্তি ঐ তটে যেতে চায়। নদী গভীর, অথচ সে সাঁতার জানে না। তাকে অবশ্যই নৌকোয় বসে অপর তটের দিকে যেতে হবে। অপর তটে যাওয়ার সাধন বা উপায় হল—নৌকো। নৌকো ছাড়া সেখানে পৌঁছনো যাবে না। আমরা যে তটে দাঁড়িয়ে আছি সেখানে সন্তুষ্ট বোধ করছি না। সামনে যে তট দেখতে পাচ্ছি সেখানে যেতে চাই। কিন্তু যাওয়া সহজ নয়, অনেক অসুবিধে আছে। নদী যেমন গভীর তাতে পায়ে হেঁটে আমরা ওপারে যেতে পারব না। আমাদের নৌকো চাই। সেই নৌকোই হল—ভাবনা। ভাবনার সাহায্য নিয়ে, ভাবনার নৌকোয় বসে, দূরে যে তট দেখা যাচ্ছে সেখানে পৌঁছব। এমন তটই থাকতে পারে না যেখানে ভাবনার নৌকোয় চড়ে পৌঁছনো যাবে না। এই হল ভাবনার প্রয়োজন, ভাবনার মহত্ত্ব।

প্রশ্ন এই যে, ভাবনা কি? কোন বিচার বা চিন্তা বারবার মনে আলোড়ন করাই ভাবনা। ধ্যানের তিন অঙ্গ—ধারণা, ধ্যান আর সমাধি। এই হল মহর্ষি পতঞ্জলি-কৃত বিভাগ। আমরা বলি—ভাবনা, ধ্যান আর সমাধি। ধারণা আর ভাবনার মধ্যে কোন পার্থক্য নেই।

ধারণার কাজ হল, মনকে কোন বিষয়ের সঙ্গে যুক্ত করা। বিষয়টি তখন ধ্যেয় হয়। ধারণা পুষ্ট হলে ধ্যান হয়ে যায়। ধ্যান পুষ্ট হলে সামাজিক সমাধি হযে যায। একই ধ্যানের—একই বিষয়ের—তিন রূপ হল: প্রথমে এক রূপ, মধ্যে আর এক রূপ ও শেষে আরও এক রূপ। এই হল ধারণা বা ভাবনার স্বরূপ। ভাবনাব অর্থ—সবিষয় ধ্যান। এটাই ভাবনার পাবিভাষিক নাম। যখনই আপনাদের মনে কোন বিষয় উপস্থিত হয়, আপনাবা কোন বস্তুকে ধ্যেয় বলে নির্বাচন করে নেন, তখনই আপনারা সবিষয় ধ্যান করেন—আর তাকেই ভাবনা বলাও যায। ভাবনা, সবিষয় ধ্যান আর জপ—এগুলির মধ্যে কোন ভেদ নেই, তিনটিই এক। তবে, প্রত্যেকের উপযোগিতা বিবেচনা করে ভিন্ন ভিন্ন নাম দেওয়া হয়েছে। তাৎপর্যের দিক থেকে কোন পার্থক্য নেই। জপের অর্থ এই যে, যা জপ্য, যার জপ করা হচ্ছে—সেই জপ্য বস্তুর প্রতি জপকারী ব্যক্তিব তন্ময ও একাগ্র হযে যাওয়া। ভাবনার অর্থ—ভাব্য ব্যক্তি বা বস্তুর প্রতি তন্ময ও একাগ্র হযে যাওযা। ধারণার অর্থও একই—যার ধারণা করা হচ্ছে তার প্রতি তন্ময ও একাগ্র হয়ে যাওযা। সবিষয় ধ্যানও তাই। বিষয়ের প্রতি বা ধ্যেযের প্রতি তন্ময ও একাগ্র হয়ে যাওযাই সবিষয় ধ্যান। জপ, ভাবনা, ধারণা আর সবিষয় ধ্যান—এই চারটি শব্দই একই পর্যায়ের। এদের মধ্যে তাৎপর্যের ভেদ নাই, আছে কেবল নামের ভেদ।

ভাবনা নৌকোর মত। ভগবান মহাবীর বলেছেন—যে ব্যক্তির আত্মা ভাবনা-যোগের দ্বারা বিশুদ্ধ হযেছে, সে যেন জলে নৌকো পেযেছে। যে যখনই চায় ওপাবে পৌঁছতে পারে। এখন, এই নৌকো কি করে ব্যবহার করা যায—এই প্রশ্ন থেকে যায়। ভাবনার দ্বারা ভাবিত হওযা আবশ্যক। আপনারা ভাবিত না হওযা পর্যন্ত সেই স্থিতিতে পৌঁছতে পারবেন না। আগমে 'ভাবিতাত্মা' শব্দটি ব্যবহার করা হযেছে। ভাবিতাত্মা হতে না পারলে লক্ষ্য বস্তুর প্রাপ্তি হয় না। ভাবিতাত্মা হলে পরে, যা হতে হবে তা-ই হওযা যায়।

এ সবই একাগ্রতার বিস্ময়জনক ফল। আমরা যা হতে চাই, তাই ঘটে যায়, মনকে যে রূপে বদলাতে চাই মন সেই রূপেই বদলায়। মন কেবল এক আকারের নয়, তার অসংখ্য পর্যায় আছে। মন ভিন্ন ভিন্ন আকারে বদলাতে পারে। আমরা যেমন চাই তেমন আকারই মন গ্রহণ করতে শুরু করে। এটা মনের নিজস্ব বিশেষত্ব। তন্ময়তা ও একাগ্রতার সঙ্গে আমরা যা ভাবনা করি তা অবশ্যই হতে থাকে। এ বিষয়ে কখনও অন্যথা হয় না। তবে, একাগ্রতা ও স্থিরতার প্রয়োজন। মন যখন বদলায় তখন সঙ্গে সঙ্গে শরীরও বদলায়।

ফরাসী দেশে একটা ঘটনা ঘটেছিল, যা এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যায়। আমেরিকার এক যুবক সেই দেশে এক পরিবারের সঙ্গে কিছুদিন বাস করেছিল। ঐ পরিবারের সঙ্গে তার গাঢ় সম্পর্ক হল। ঐ পরিবারে এক বয়স্কা কন্যা ছিল, তার সঙ্গে যুবকের প্রণয় হল। কিন্তু বিয়ের প্রশ্ন উঠলে যুবক বলল—'আমি তো এখনই বিয়ে করতে পারব না। যতদিন আমি নিজের পায়ে দাঁড়াতে না পারি ততদিন পত্নীর ভার বহন করতে পারব না। আমি আর্থিক দিক থেকে স্বাধীন হয়ে বিবাহ করব।' কন্যাটি এই কথা মেনে নিল। যুবক আমেরিকায় চলে গেল, যুবতী দেশেই রইল। কিন্তু যুবতীর মনে এক চিন্তা এল, 'পাঁচ-সাত বছর পরে যখন যুবক আমাকে বিয়ে করতে আসবে, তখন হয়ত আমার রূপ ও রঙ বিবর্ণ হয়ে যাবে, আমার যৌবনে ভাটা পড়বে। সে প্রতিদিন ভাবনা আরম্ভ করল। সে এক আয়নার সামনে দাঁড়াত আর চিন্তা করত—'আমি আজ যেমন আছি, তেমনি থাকব।' এই ভাবনায় সে তন্ময় হয়ে যেত। এইভাবে পনের বছর কেটে গেল। এদিকে যুবক নিজের পায়ে দাঁড়াল, তার আর্থিক অবস্থা ভাল হল। সে আত্মনির্ভর হয়ে গেল। তার মনে যুবতীর স্মৃতি অনুক্ষণ জাগ্রত ছিল। সে ফরাসী দেশে চলে এল। কিন্তু অন্য অনেক রকম চিন্তাও তার মনে এল। সে ভাবল, যুবতীর অবস্থা কেমন হবে? সে কেমন আছে? তার রূপ-যৌবনই

বা কেমন? যা হোক, সে যুবতীর সঙ্গে মিলিত হল। সে দেখল তার শরীরের লাবণ্য, তার সৌন্দর্য ও কমনীয়তা, পনের বছর আগে যেমন ছিল ঠিক তেমনিই আছে। তিলমাত্র পার্থক্যও হয় নি। সে বিবাহ-সূত্রে আবদ্ধ হল। দুজনেই সুখী হল। এই হল ভাবনার আশ্চর্যজনক ক্ষমতার এক উদাহরণ।

একেই ভাবনা-যোগ বলে। যে ব্যক্তি যে প্রকার ভাবনায় নিজেকে ভাবিত করে, সে সেই প্রকারেই পরিবর্তিত হয়ে যায়। ভাবনার এই রকম কত প্রয়োগই যে পৃথিবীতে হয়ে থাকে, তা কে জানে। জৈন পরম্পরায় ভাবনা-যোগকে বিশেষ মহত্ত্ব দেওয়া হয়েছে। আপনারা তার আধ্যাত্মিক মূল্য দেবেন কি না দেবেন আপনারাই জানেন, কিন্তু এই তথ্য স্পষ্ট যে ভাবনাকে আশ্রয় করে মানুষ নিজেকে গড়তে ও ভাঙতে পারে।

জাপানের ধ্যান সম্প্রদায় (জেন সম্প্রদায়) ভাবনার অনেক রকম প্রয়োগ করে। তাদের কেউ হয়তো আখড়ায় নেমে ভয়ঙ্কর নিষ্ঠুর ষাঁড়ের সঙ্গে লড়াই করে। সে খালি হাতে আখড়ায় নামে। তার কাছে কোন অস্ত্রই থাকে না, লাঠি পর্যন্ত থাকে না। ষাঁড় দৌড়ে সামনে এসে যায়। সে তাকে লাল নিশান দেখায়। লাল কাপড় দেখলেই ষাঁড় ক্রোধে ক্ষিপ্ত হয়ে যায়। সে তখন অতি বেগে তার দিকে ছুটে যায় ও তাকে ভয়ঙ্কর আক্রমণ করে। কিন্তু নিতান্ত কৃশকায় সাধকও ভাবনা ও সংকল্পের শক্তিতে সেই ষাঁড়কে পরাস্ত করে মাটিতে আছাড় দিয়ে ফেলে দেয়। তার ভাবনার রূপ হয় এ রকম—'আমি ষাঁড়ের সঙ্গে লড়ব। আমি নিশ্চয়ই ষাঁড়কে পরাস্ত করব।' এই ভাবনার সাহায্যে সে এমন শক্তি অর্জন করে যে, সে ঐ ভয়ঙ্কর, উত্তেজিত আক্রমণকারী ষাঁড়কে শান্ত করে দেয়, যেন তাকে ছাগল বানিয়ে দেয়। ভাবনার এ রকম প্রয়োগ আজও হয়ে থাকে। কেবল অতীতেই হয়ত হতো, একথা ঠিক নয়। আজও কিছু লোক এ রকম প্রয়োগ করে থাকে।

এক মঠ ছিল। সেই মঠে ছোট বড় অনেক সাধক সাধনাব অভ্যাস করত। সেখানে এক মল্লযুদ্ধের (কুস্তিব) আযোজন করা হল। দুই পালোয়ানকে আমন্ত্রণ করা হল। তাদের একজন ছিল পুষ্ট ও বলিষ্ঠ, অপব জন কম শক্তিশালী। মল্লযুদ্ধ আরম্ভ হল। বলিষ্ঠ পালোয়ান কম-জোবী পালোযানকে চিৎ করে দিল। সাধকদেব মনে এক চিন্তার উদয় হল। তারা দুর্বল পালোয়ানকে সাহায্য করতে ইচ্ছা করল। কযজন সাধক চোখ বন্ধ করে এই ভাবনায তন্ময় হয়ে গেল যে, এই পালোয়ানের জয় চাই। কিছু সময় গেল। সবলে দেখতে পেল, দুর্বল পালোয়ান বলিষ্ঠ পালোয়ানকে মাটিতে ফেলে দিল ও তার বুকে চেপে বসল।

ভাবনা অন্য ব্যক্তি পর্যন্ত পৌঁছতে পাবে, অন্য ব্যক্তির ওপবেও প্রভাব বিস্তার করতে পাবে। অপরের বিপদের শান্তি আনা ও রোগেব প্রতিকার করা, অপরের হৃদয়েব পরিবর্তন কবা বা চিন্তাধাবার পরিবর্তন করা—এ সবই ভাবনার প্রয়োগ। ভাবনার দ্বারা এ সবই কবা যায। ভাবনার মাধ্যমে নিজেব পবিবর্তন, অন্যের পবিবর্তন, আশপাশের ব্যক্তির পরিবর্তন, এমন কি সমস্ত বাতাববণেব পরিবর্তন করা সম্ভব। এক ব্যক্তির শরীব দুর্বল, তাব শবীর সুস্থ করার জন্য ভাবনা কবা যায়। এক ব্যক্তির মস্তিষ্ক দুর্বল, তার মস্তিষ্ক সবল করার জন্য ভাবনা করা যায। এক ব্যক্তির দৃষ্টি ক্ষীণ, হৃদয় দুর্বল, চিন্তা অপবিত্র—তার সব কিছু সুস্থ ও স্বাভাবিক করার জন্য ভাবনা করা যায়। অসংখ্য প্রকারের ভাবনা হতে পারে। আজকের চিকিৎসকবা—বিশেষত জার্মান দেশের চিকিৎসকবা—রোগীকে ঔষধ না দিয়ে 'অটো সাজেসন' (Auto suggestion) দ্বাবা আবোগ্য করতে চেষ্টা করেন। তাঁবা বলেন—'জঙ্গলে চলে যাও। সেখানে এক গাছের নিচে বসে সমাধিস্থ হয়ে যাও, আব নিজেকে বোঝাও—আমি সুস্থ আছি, আমি সুস্থ হযে যাচ্ছি।' এই চিকিৎসকরা মনে করেন, এই পদ্ধতিতে রোগী রোগমুক্ত হয়ে স্বাস্থ্য ফিবে পায।

এ সবই সামান্য কথা। যখন আমরা সাধনার দৃষ্টিতে বিচার করি তখন আমরা বুঝতে পারি যে, কি প্রকার ভাবনা আমাদের করতে হবে —তা একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন।

জৈন পরম্পরায় ভাবনা সম্বন্ধে অনেক বিচার করা হয়েছে। সব ধর্মেই ভাবনা সম্বন্ধে বিচার করা হয়েছে, তবে জৈন সাহিত্যে এই বিষয়ের উল্লেখ অনেক বেশি। ভাবনা প্রধানত এই চার প্রকারের—

১। জ্ঞান ভাবনা।

২। চারিত্র ভাবনা।

৩। তপ ভাবনা।

৪। বৈরাগ্য ভাবনা।

যে ব্যক্তি সাধনার ক্ষেত্রে প্রবেশ করছে, তাকে সবার আগে জ্ঞান ভাবনার দ্বারা নিজেকে ভাবিত করতে হয়। ভাবনার অর্থ বিচার বা চিন্তার পুনরাবৃত্তি নয়, বিচারের স্থাপন ও দৃঢ়ীকরণই ভাবনার অর্থ। অভ্যাসকালে বিচারকে পুনঃ পুনঃ আলোড়ন করতে হয়। বিচারের পুনরাবৃত্তি আর বিচারের স্থিরীকরণ—এই দুটি ব্যাপারেরই আবশ্যকতা আছে। যদি আপনারা একই বিষয়ের বার বার আবৃত্তি করেন, তবে তা ভাবনায় পরিণত হয়। আপনি তার দ্বারা ভাবিত হবেন, আর ঠিক তদনুসারে কাজ করবেন। এক ব্যক্তি দিনে দশ-পনরো বার দরজা খোলে আর বন্ধ করে। ফলে সে ঐ ক্রিয়ার দ্বারা ভাবিত হয়ে যায়, প্রভাবিত হয়ে যায়। যখনই সে ঘরে প্রবেশ করে তখনই—দরকার থাকুক বা না থাকুক—তার মন ঐ ক্রিয়ার দিকেই হয়। সে দরজা খুলুক বা না খুলুক, তার স্মৃতি কিন্তু ঐ ক্রিয়াতেই সংলগ্ন হয়। কারণ সে ঐ ক্রিয়ার দ্বারা ভাবিত হয়েছে। দু ভাবেই ব্যক্তি প্রভাবিত হতে পারে, বিচার দ্বারা প্রভাবিত হতে পারে, আবার কার্যের দ্বারাও প্রভাবিত হতে পারে। বিচার ও কার্যের পুনরাবৃত্তি—এই দুটি ভাবনার মূল।

প্রশ্ন উঠবে, ভাবনার দ্বারা আমরা কি করে আমাদের পরিবর্তন

করব? প্রক্রিয়া এই প্রকার—আপনার প্রথমে ধ্যেয় কি, তা নির্বাচন করুন। আপনারা স্থির করুন আপনারা কি হতে চান বা কি করতে চান। আপনারা কবি হতে চান, কি দার্শনিক হতে চান, কি লেখক হতে চান, কি সাহিত্যিক হতে চান—যা চান তাই হতে পারেন। যা আপনাদের হতে হবে তা-ই আপনাদের ধ্যেয়। এবার, যাকে ধ্যেয় করেছেন তাকে বাস্তবে পরিণত করার জন্য আপনারা ভাবনা অভ্যাস করুন। প্রশ্ন করতে পারেন, অভ্যাস কখন করব, কেমন করে করব? আপনারা নির্জন স্থানে চলে যান। শরীরকে শিথিল করে বসুন, মনকেও শিথিল করুন। মনে কোন উত্তেজনা রাখবেন না, আকুল-ব্যাকুল হবেন না। এটা প্রারম্ভিক স্থিতি মাত্র, কিন্তু এটা প্রয়োজন। যা আপনারা ধ্যেয় বলে পছন্দ করেছেন তাকে স্থূল মন থেকে হটিয়ে অবচেতন মনে পৌঁছে না দেওয়া পর্যন্ত আপনাদের 'হওয়ার' ভাবনা সফল হবে না। আপনারা বলতে পারেন—'ঐ রকম ভাবনা তো অনেক করেছি, কিন্তু সফল হই নি।' অসফলতার কারণ, আপনাদের কোথাও বোঝার ভুল হয়েছে। ভাবনার তাৎপর্য হল, চেতন মনকে ভুলিয়ে দিয়ে অবচেতন মনকে জাগ্রত করা। চেতন মনের চিন্তাকে অবচেতন মনের কাছে গচ্ছিত রেখে অবচেতন মনেই তাকে স্থাপন করে দেওয়া—এই হল ভাবনা, ভাবনার অভ্যাস। তা দিন আপনাদের কথা অবচেতন মন পর্যন্ত পৌঁছবে না, ততদিন হাজার-দশ হাজার বার প্রযত্ন করলেও, শব্দের আবৃত্তি করলেও, সফলতা মিলবে না। সফলতা লাভ করতে হলে আপনাদের শরীরকে বিসর্জন দিতে হবে, অর্থাৎ শরীরকে একেবারে শিথিল করে দিতে হবে ও চেতন মনকে শান্ত করতে হবে। তার পরে আপনারা ধ্যেয়ের আবৃত্তি করতে থাকুন—প্রথমে কিছুটা নিম্ন কণ্ঠে, পরে উচ্চ-কণ্ঠে আবৃত্তি করুন। এই ক্রম দশ মিনিট ধরে চলবে। তার চেয়ে কম সময়ে সফলতা অসম্ভব। প্রতিদিন এই ক্রম অনুসারে আবৃত্তি করুন। স্মরণ রাখবেন, কখনও

যেন ক্রমভঙ্গ না হয়। আপনারা ধ্যেযকে অনুসরণ কবে আচবণ করুন। নিশ্চিতভাবেই আপনাবা লক্ষ্যে পৌঁছে যাবেন। ক্ষেত্র বিশেষে সময় কম বা বেশি লাগতে পারে, কিন্তু লক্ষ্যপ্রাপ্তি নিশ্চিত। কোন ব্যক্তিই ভাবনা ছাড়া প্রকৃত ধার্মিক হতে পাবে না, ধ্যানের উচ্চ অবস্থা প্রাপ্ত হতে পারে না। শারীবিক, বৌদ্ধিক, মানসিক প্রভৃতি সর্ববিধ বিকাশের ক্ষেত্রে ভাবনার সর্বাধিক মহত্ত্ব আছে।

যে কোন লক্ষ্য পূবণ কবতেই অনেক বকম উপক্রম করতে হয। মনে করুন, আমরা নির্মোহ হতে চাই। এই লক্ষ্য পূরণ কবতে হলে আমাদের সব মোহজনক বস্তুকে ছাডতে হবে। যে বস্তু মোহ উৎপন্ন কবে, মনকে মূঢ় করে, তাকে সবিযে দিতে হবে। ধ্যেয়ের অর্থই হল ভাবনা।

২০

অধ্যাত্মের সাধনা

এক ব্যক্তি বিচারকের কাছে এসে জিজ্ঞাসা করল—'সত্য কি? ভ্রান্তিই বা কি?' বিচারক উত্তর দিলেন—'আমি যা বলি তাই ভ্রান্তি। তুমি যে তা মান না, সেটাই সত্য।'

আমরা সংসারে সত্য আর ভ্রান্তির চক্রে পড়ে পাছি। ধর্মের সকল পথই সত্যকে খোঁজার জন্য। আদিকাল থেকে মানুষ সত্যের খোঁজ করে চলেছে। সঙ্গে সঙ্গে ভ্রান্তিও চলেছে। ঐ রকমই চলবে। ভ্রান্তি যদি সঙ্গে সঙ্গে না চলত তবে ধর্মের আজ কোন অপেক্ষাই থাকত না। কিন্তু যেমন যেমন ধর্মের বিস্তার হয়েছে, তেমন তেমন ভ্রান্তিরও বিস্তার হয়েছে। সত্যকে উপলব্ধি করার উদ্দেশ্যেই আমরা ধর্ম আর অধ্যাত্মের চর্চা করি। মানুষ সোনার মূল্য করতে পারে, কিন্তু মাটির মূল্য করতে পারে না। কারণ মাটি এত সহজলভ্য যে প্রত্যেক ব্যক্তি তা অনায়াসে পেতে পারে। তবে প্রকৃত সত্য এই যে, সোনার তুলনায় মাটির মূল্য হাজার গুণ বেশি। সোনা মানুষের মৃত্যু ঘটাতে পারে, মাটি যে কত মৃত্যুপথযাত্রীকে রক্ষা করেছে তা কে জানে। তবুও মাটির মূল্য নির্ধারণ করা যায় না, কারণ মাটি সহজেই সুলভ। আমরা রুটির মূল্যাঙ্কন করি, কারণ আমরা জানি

রুটি আমাদের জীবন। পরন্তু যে প্রাণ সত্যই আমাদের জীবন তার মূল্যাঙ্কন আমরা কখনও করি না। অথচ প্রাণই আমাদের সকল স্বাস্থ্য। সাধনার পদ্ধতি মূল্যাঙ্কনের ওপরই প্রতিষ্ঠিত। যেখানে মতভেদের প্রশ্ন থাকে সেখানে হাজার সম্প্রদায় গড়ে ওঠে. লোকে বলে, এত সম্প্রদায় না থাকুক। আমি এই ভাবে চিন্তা করি যে, হাজার সম্প্রদায়ই হোক—প্রত্যেক ব্যক্তির একটা সম্প্রদায় হোক। কেবল অধ্যাত্মই এমন একটা ক্ষেত্র, যেখানে সম্প্রদায় ভেদ হয় না। সাধনা আর অধ্যাত্মের ক্ষেত্রে কোন সম্প্রদায়-ভেদ নেই। সাধনার পথে সবচেয়ে বড় যোগ হল ধ্যান। ধ্যানের অর্থই নির্বিকল্পতা, যেখানে কোন বিকল্প নেই, বিবাদ নেই। এখানে মতবাদের প্রশ্নই ওঠে না। সাধনার মুখ বন্ধ হয়ে যায়, কান বন্ধ হয়ে যায়, চোখ বন্ধ হয়ে যায়—সে ক্ষেত্রে বিবাদের প্রশ্ন উঠবে কি করে? আমাদের যে নৈতিকতার পুঁজি আছে তার প্রকৃত পশ্চাৎপট—অধ্যাত্ম। অধ্যাত্মের আধারেই নৈতিকতা বিকশিত হতে পারে। আজ আমাদের সমস্ত ধ্যানই শরীর-কেন্দ্রিত হয়ে গিয়েছে। মন কিন্তু মূল। অথচ সেই মনকে আমরা উপেক্ষা করে চলেছি। মনই সেই তত্ত্ব, যা আমাদের সব-চেয়ে বেশি প্রভাবিত করে।

একদিন মহাত্মা বুদ্ধ ভ্রমণ করছিলেন। সঙ্গে এক শিষ্য ছিল। সে প্রশ্ন করল—'ভন্তে! ধ্যানের শক্তি কি, আমি জানতে ইচ্ছা করি।' বুদ্ধ শুনলেন. কিন্তু উত্তর দিলেন না। পথে এক কুয়ো পড়ল। এক পিপাসার্ত পথিক সেখানে এল। কুয়োর পাশে দড়ি-বাঁধা এক বালতি ছিল। পথিক বালতিটি কুয়োয় নামিয়ে দড়ি টেনে তুলল। বালতি ওপরে চলে এল, কিন্তু বালতিতে জল ছিল না, ওটা ছিল খালি। পথিক আবার বালতি কুয়োয় নামাল, টেনে তুলল। কিন্তু এবারেও দেখা গেল বালতি খালি। পথিকের পিপাসার জল জুটল না। আসলে বালতির নিচে ছিদ্র ছিল, ফলে জলপূর্ণ বালতি ওপরে আসতে আসতেই খালি হয়ে যাচ্ছিল।

বুদ্ধ আরও এগিয়ে গেলেন। আবার এক কুয়ো দেখা গেল, তার পাশেও দড়ি-বাঁধা বালতি ছিল। এক পিপাসার্ত পথিক এল। বালতি দিয়ে জল টেনে তুলল। জল পান করল। তার পিপাসার শান্তি হল।

বুদ্ধ শিষ্যকে বললেন—'বৎস। তুমি জানতে চাও ধ্যানের শক্তি কি? ধ্যানের শক্তি এইভাবে বর্ণনা করা যায়—যে ব্যক্তি ধ্যান করে না, সে খালিই থেকে যায়, কখনও ভরে ওঠে না। তার ছিদ্র থেকে যায়। সে কখনও পূর্ণ হতে পারে না। যা কিছু তার ভেতরে আসে, তা সবই ছিদ্রপথে বেরিয়ে যায়। যে ধ্যান করে, তার ভেতরে যা প্রবেশ করে, তা হাজার গুণে বাড়ে।' এই হল ধ্যানের শক্তি—ধ্যানের মহত্ত্ব। আমার শরীরের, আমার মস্তিষ্কের কত শক্তিই না আছে। তাদের বিকাশ করার পথ—সাধনা। সাধনা ছাড়া তারা বিকশিত হয় না। সমস্ত সাধনার পথই শক্তি-বিকাশের পথ।

২১

ইন্দ্রিয় সংযম

এক কবি ছিলেন। তিনি তত্ত্বজ্ঞানী ছিলেন। তাঁর বাস ছিল আমেরিকায। তাঁর নাম ছিল 'ইউন্‌কো'। একদিন তিনি রাস্তা দিয়ে যাচ্ছেন। হঠাৎ আকাশে মেঘ জমল, আব দেখতে দেখতে মুষল-ধারে বৃষ্টি আরম্ভ হল। বৃষ্টির তেজ প্রবল ছিল। কবিকে থামতে হল। তাঁর কাছে এক স্বলিখিত ডাযেরি ছিল, যাতে তিনি অনেক কবিতা লিখেছিলেন। তাঁর কোন এক স্থানে যাওযা দরকার ছিল, অথচ বৃষ্টিতে ডাযেরি ভিজে যেতে পারে বলে তাঁর ভয় হল। পাশেই এক দোকান ছিল, এক বুড়ো দোকানদার সেখানে বসে ছিল। তিনি তার হাতে ডাযেরিটা দিযে বললেন—'দেখ, আমি তোমার কাছে এই ডায়েরি দিলাম। তুমি এটা ভাল করে রাখবে। কাল ফেবার পথে নিয়ে যাব। বৃষ্টি এসেছে। আমাব কাছে ছাতা পর্যন্ত নেই। ডাযেরিটা ভিজে যাবে, তাই তোমার কাছে রেখে যাচ্ছি। তুমি কিন্তু সাবধানে রেখ।' দোকানদার ডাযেরিটা নিযে বেখে দিল।

পরের দিন কবি তাঁর ডায়েরি নেওযার জন্য দোকানে এলেন। তিনি দেখলেন দোকানদার ডাযেরি থেকে পাতা ছিঁডছে, আব তা দিযে গ্রাহকদের পুরিযা বেঁধে দিচ্ছে। অবাক হযে তিনি দোকানদাবকে বললেন, 'আরে! এ কি করছ? ডাযেবিটা এভাবে কেন নষ্ট করছ?'

বৃদ্ধ বলল—'ক্ষমা করুন, আমার ভুল হয়ে গিয়েছে। আমি বড় ভুলো স্বভাবের। আমার স্মরণই ছিল না এটা আপনার ডায়েরি। তবে ব্যস্ত হবেন না। আমি এর ফালতু পাতাই ছিঁড়েছি। যে পাতাগুলি আপনি লিখে শেষ করেছেন সেগুলিই ছিঁড়েছি। যে পাতাগুলি সাদা, যেগুলিতে কিছুই লেখা হয়নি, সে পাতাগুলি যেমন ছিল ঠিক তেমনই আছে। আপনি ব্যস্ত হবেন না।'

দোকানদার তার নিজস্ব দৃষ্টিকোণ থেকেই এ কথা বলছিল। সে এই ভেবেই তুষ্ট ছিল যে, সাদা পাতা একটাও ছেঁড়েনি। কবির মনে কি ভাব হল—কে কল্পনা করবে? কবির কাছে সাদা পাতার চেয়ে লেখা পাতার মূল্য অনেক বেশি ছিল। সেই পাতাগুলিতে তিনি অনেক নতুন কবিতা লিখেছিলেন। হয়ত সেই কবিতাগুলি এতই উৎকৃষ্ট ছিল যে তাঁকে তা যশের শিখরে পৌঁছে দিতে পারত। তিনি খালি পাতা দিয়ে কি করবেন?

আমাদের ইন্দ্রিয়গুলির ব্যাপারেও ঐ রকম ঘটনা ঘটছে। এক ইন্দ্রিয় হয়ত খালি পাতার মতই আছে, আর এক ইন্দ্রিয় লেখা পাতার মত হয়ে গিয়েছে। কোনটিকে আমরা বেশি মূল্য দেব? আমাদের ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে যে রাগ-দ্বেষের ধারা বয়ে চলে, তার থেকে ইন্দ্রিয়ের ওপর রাগের অঙ্কন পড়ে, দ্বেষের অঙ্কনও পড়ে। ক্রমে অনন্ত অঙ্কন ইন্দ্রিয়কে ছেয়ে ফেলে।

যে লোক ইন্দ্রিয় সম্বন্ধে চিন্তা করে, জানার চেষ্টা করে, পরম্পরাগত সংস্কারকে লক্ষ্য করে বা ইন্দ্রিয়কে অধিক মর্যাদা দেয়, সে ভাবে যত কিছু অঙ্কন পড়েছে, সবই বহুমূল্য। যদি তা শেষ হয়ে যায়, সব কিছুই শেষ হয়ে যাবে। অঙ্কন মুছে গেলে সবই মুছে যাবে। ইন্দ্রিয় যে সুখ এনে দেয়, সে সুখ যদি না থাকে, তবে কি-ই বা অবশিষ্ট রইল? এই শ্রেণীর লোক চায়, রাগ-দ্বেষের ধারায় এতকাল যা কিছু লিখিত হয়েছে, যা কিছু অঙ্কিত হয়েছে, তা চিরকালই অক্ষুণ্ণ থাকুক। এই এক দৃষ্টিকোণ বটে।

দ্বিতীয় দৃষ্টিকোণ পূর্বোক্ত দোকানদারের। তার বিচারে সাদা পাতাই কাজে লাগে, লেখা পাতা অকেজো। খালি পাতার মূল্য আছে, কারণ তার ওপর লেখা যেতে পারে। লেখা পাতার মূল্য নেই, কারণ সে পাতা ভরে লেখা তো হয়েই গিয়েছে, আর নতুন কিছু তো তাতে লেখা যাবে না। এটা কিন্তু এক মহত্ত্বপূর্ণ দৃষ্টিকোণ। অবশ্য কবির তা পক্ষে প্রিয় হবে না, ইন্দ্রিয়বাদীর কাছে এই দৃষ্টিকোণ প্রিয় হয় না। কিন্তু সাধকের পক্ষে এই দৃষ্টিকোণ প্রিয় ও মনোজ্ঞ। খালি পাতাই কার্যোপযোগী, অর্থাৎ পাতা খালিই রাখব, খালি করে নেব। তার ওপর কখনও কিছু লিখব না। তাকে খালি থাকতেই দেব। ইন্দ্রিয়-জ্ঞানের ধারার সঙ্গে যে রাগ-দ্বেষের ধারা চলে, সেই রাগ-দ্বেষের ধারাকে রুদ্ধ করব, অবলুপ্ত করব। ইন্দ্রিয়-জ্ঞান তা হলে খালিই থাকবে। তার সঙ্গে রাগ-দ্বেষ জুড়ে দেব না, তার ওপর কোন অঙ্কনই পড়তে দেব না। একেই বলে ইন্দ্রিয়-সংযম।

দুটি মত আছে। মত দুটি সম্বন্ধে ভারতীয় যোগী ও সাধক-সম্প্রদায় বহুল আলোচনা করেছেন।

কোন কোন সাধক বলেন, ইন্দ্রিয়কে কাজে লাগিও না। চোখ দিয়ে দেখো না, চোখ বন্ধ রাখ। কান দিয়ে শুনো না, কানে তুলা কি কর্ক ঢুকিয়ে দাও। নাক দিয়ে ঘ্রাণ নিও না, নাক বন্ধ করে রাখ। জিভ দিয়ে স্বাদ নিও না, সরস খাদ্য কখন গ্রহণ করো না—রসহীন, স্বাদহীন দ্রব্যই আহার কর—যাতে রস না আসে। কিন্তু সহজেই প্রশ্ন হয়, এসব কি সম্ভব? রাত্রি-দিন কি চোখ বুঁজে থাকা সম্ভব হয়? যার দেখার শক্তি আছে, দৃষ্টি আছে, সে যদি চোখকে কাজে না লাগায় তো পরিণতি কি হবে? শোনার জন্যই কান। কান বন্ধ করে রাখলাম, কিছুই শুনলাম না, তাতে কি বড় উপলব্ধি হবে? আর, কখনও কিছু শুনব না —এ রকম সম্ভবও নয়।

আর এক মত আছে। কোন কোন সাধক বলেন, ইন্দ্রিয়দের নিজ-নিজ কাজ আছে। তারা সেই কাজ করুক। চোখ, কান, নাক, জিভ

—প্রত্যেককে কাজে লাগাও। দেখ, শোন, ঘ্রাণ নাও, স্বাদ নাও, স্পর্শ কর—সব কিছুই কর। কিন্তু সেই সঙ্গে যে রাগ-দ্বেষের ধারা উপস্থিত হয়, তাকে তোমার ইন্দ্রিয়ের কাজের সঙ্গে সংযুক্ত হতে দিও না। সেই ধারা যেন পৃথক ভাবেই চলে। তা হলে কোন বিপদ হবে না।

এই হল দুই মত। এক, বিষয়কে নিরোধ করা; আর এক, রাগ-দ্বেষকে নিরোধ করা। এক, ইন্দ্রিয়ের কাছ থেকে কোন কাজই না নেওয়া; আর এক, ইন্দ্রিয়ের কাজ থেকে কাজ নিয়েও তার সঙ্গে রাগ-দ্বেষকে যুক্ত হতে না দেওয়ার। মত দুটি ভিন্ন ভিন্ন। এখন চিন্তার বিষয়, সাধনার দৃষ্টিতে কোন্‌টি আদরণীয়? ইন্দ্রিয়ের কাজ না নেওয়াই ভাল, না রাগ-দ্বেষের সংযোগ বন্ধ করাই ভাল? কেউ বলবেন প্রথমটি ভাল, আবার কেউ বলবেন দ্বিতীয়টি ভাল। আমি কিন্তু বলতে পারব না প্রথমটি ভাল কি দ্বিতীয়টি ভাল। দুটিরই নিজ নিজ স্থান আছে, মহত্ত্ব আছে।

এক ঘটনা মনে আসছে। এক ব্যক্তি এক সাধুর কাছে এসে জিজ্ঞাসা করল—'মোক্ষ-প্রাপ্তির জন্য কি ঘর ছাড়া নিতান্ত আবশ্যক?' সাধু উত্তর দিলেন—'ঘর ছাড়া মোটেই দরকার নয়। যদি আবশ্যক হতো তো জনক ঘরে থেকেই কি করে বিদেহ হলেন? আদর্শ গৃহে থেকে ভরত কি করে কৈবল্য প্রাপ্ত হলেন? ভগবান ঋষভের মাতা মরুদেবার কি করে মোক্ষ মিলল? মরুদেবা সাধ্বী হয়ে যান নি, ভরত গৃহত্যাগী হন নি, জনক রাজ্য ছেড়ে সন্ন্যাসী হন নি। তবুও মরুদেবা মুক্ত হয়ে গেলেন, ভরত কেবলী হলেন, আর জনক বিদেহ হয়ে গেলেন।'

কিছু দিন পরে আর এক ব্যক্তি ঐ সাধুর কাছে এসে জিজ্ঞাসা করলেন, 'মহারাজ! মোক্ষের জন্য ঘর-সংসার ছাড়া আবশ্যক নয় কি?' সাধু বললেন, 'খুবই আবশ্যক, নিতান্তই জরুরী। যদি সংসার ত্যাগ না করেও মোক্ষ মেলে, তবে শুকদেব যে রকম সন্ন্যাসী ছিলেন সে রকম সন্ন্যাসীর জন্ম হয় কি করে? জৈন, বৌদ্ধ, বৈদিক নির্বিশেষে আমাদের ভারতীয় পরম্পরায় হাজার হাজার সন্ন্যাসী হয়েছেন, মুনি হয়েছেন,

ভিক্ষু হয়েছেন, তাঁরা সন্ন্যাসী হলেন কেন? কেন তাঁবা ঘর ছেড়ে এসে সাধনা করছেন? মোক্ষ প্রাপ্তিব জন্য গৃহত্যাগ নিতান্ত আবশ্যক।'

একবার এই দুই ব্যক্তি কোন স্থানে একত্র হল। একজন বলল, 'মহাবাজ বলেছেন মোক্ষলাভ কবার জন্য ঘর ছাড়া আবশ্যক নয়।' দ্বিতীয ব্যক্তি বলল, 'এ তুমি মিথ্যা বলছ। আমি ঐ সাধুকে জিজ্ঞাসা কবেছিলাম। তিনি আমাকে বলেছেন, মোক্ষ লাভ করার জন্য ঘর ছাডা নিতান্ত আবশ্যক।'

এই ভাবে দুজনেব মধ্যে বিবাদ হল। দুজনেই নিজেব বুদ্ধি-বিবেচনা মত সত্যিই বলছিল। যাক্, বিবাদ বেড়েই গেল, কোন সমাধান হল না। তখন তারা দুজনে সেই সাধুর কাছে গেল। তাঁকে, বলল 'মহাবাজ! আপনিই আমাদের মধ্যে লড়াই বাধিযে দিযেছেন। আমবা আপনাকে একই প্রশ্ন করেছিলাম, কিন্তু আপনি উত্তর দিয়েছেন দুটি। আর ঐ উত্তব দুটি পরস্পর-বিরুদ্ধ। এব সমাধান কি?'

সাধু বললেন—'তোমরা দুজনেই বোকা। আমার অভিপ্রায বুঝতে পার নি।' তারপর প্রথম ব্যক্তিকে সম্বোধন কবে সাধু বললেন—'দেখ, ঘর ছাডার মত মনোবৃত্তি তোমার ছিল না। তুমি সত্যিই ঘর ছেডে সাধনা করতে চাও নি। সেজন্যই আমি বলেছিলাম, মোক্ষ লাভের জন্য ঘব ছাড়া আবশ্যক নয। তুমি ঘরে থেকেই সাধনা করতে পার। দ্বিতীয ব্যক্তির মনোবৃত্তি ঘর ছাড়ার জন্য প্রস্তুত হয়ে গিযেছিল, সেজন্য আমি তাকে বলেছিলাম, মোক্ষ লাভেব জন্য ঘর ছাড়া আবশ্যক। আমি তাকে কি করে বলব, তুমি ঘবেই থাক? তোমাব মনোভাবনা যে দিকে ছিল সেদিকেই আমি তোমাকে প্রেরিত করেছি। আর ওব মনোভাবনা যেদিকে ছিল সেদিকেই আমি ওকে প্রেরিত কবেছি। ওকে সে দিকেই যেতে বলেছি। এতে অসুবিধে কি হল?'

এই এক ঘটনা। আমরা সব ক্ষেত্রে বলতে পারব না যে ঘর ছাডাই ভাল, আবার এ ও বলতে পারব না যে ঘর না ছাড়াই ভাল। যার যেমন

যোগ্যতা, যেমন ক্ষমতা, যেমন প্রস্তুতি, যেমন মনোবৃত্তি, তাকে তদনুসারে তার পথেই চলতে দেওয়া উচিত।

কেউ কেউ বলেন, চোখ বন্ধ করে বসে না থাকলে রূপের প্রতি যে আকর্ষণ আছে তা কখনও মিটবে না। রূপের প্রতি যে আসক্তি আছে তার এমনই নিবৃত্তি হবে না। সেজন্য প্রত্যেক ব্যক্তিরই দু-চার ঘণ্টা চোখ বন্ধ করে বসে থাকা উচিত। কেবল এরকম করলেই চক্ষু-সংযম সম্ভব হতে পারে।

আবার কেউ কেউ বলেন—এটা দুর্বলতা, এটা ক্লীবতা। বরং আমাদের প্রযত্ন করতে হবে যে, রূপ দেখেও আমাদের মনে যেন আকর্ষণের উপত্তি না হয়, বিকারের ভাব যেন না জাগে। চোখের কাজই দেখা। তবে, দেখার সঙ্গে আমরা রাগ-দ্বেষের চেতনা যেন না জুড়ে দিই, তা-ই হবে আমাদের সাধনা। আমাদের মনে যেন প্রিয়তা-অপ্রিয়তার ভাব, ভালমন্দের ভাব প্রবেশ না করে।

আমি বলি, প্রথমটি এক পথ, দ্বিতীয়টি আর এক পথ। দ্বিতীয়টি শ্রেষ্ঠ আর প্রথমটি অপকৃষ্ট, কিংবা প্রথমটি শ্রেষ্ঠ আর দ্বিতীয়টি অপকৃষ্ট—এমন বলা যায় না। দুটিই পথ। যার যেমন রুচি সে তেমন পথে চলবে। এক পথ আর এক পথের চেয়ে শ্রেষ্ঠ—এমন কথার অর্থ হয় না। আসল কথা, ব্যক্তির রুচি, যোগ্যতা ও ক্ষমতা কি? দুটি পথই আছে, তার যে কোন একটিকে ধরে লক্ষ্যে পৌঁছনো যেতে পারে।

যদি কোন ব্যক্তির এমন ক্ষমতা জাগ্রত হয়ে থাকে যে, সে চোখ খোলা রাখলেও তার মনে প্রিয়-অপ্রিয় বা রাগ-দ্বেষের ভাব উদিত হয় না, তার পক্ষে চোখ বন্ধ রাখার কোন প্রয়োজনই হয় না। চোখ বন্ধ রাখা তারই পক্ষে প্রয়োজন যার এমন ক্ষমতা জাগ্রত হয় নি, এবং ফলে যে মনে উদীয়মান প্রিয়তা-অপ্রিয়তার বা রাগ-দ্বেষের ভাবকে রোধ করতে অক্ষম।

মুখের ওপর পর্দা রাখার প্রথা আগে চলিত ছিল, এখনও আছে।

প্রশ্ন হতে পারে, পর্দা কে রাখবে—স্ত্রী না পুরুষ? এমন কথা নয় যে, স্ত্রী-ই পর্দা রাখবে, পুরুষ রাখবে না। পর্দা সে-ই রাখবে যার দৃষ্টি নির্বিকার নয়, যার দৃষ্টি সংযত নয়, তা সে স্ত্রীই হোক আর পুরুষ হোক। চোখ বন্ধ করে রাখা চোখের ওপর পর্দা রাখার মতই। ইচ্ছা হয় চোখ বন্ধ রাখা, ইচ্ছা হয় চোখের ওপর কাপড়ের আবরণ রাখা—দুই একই কথা। পর্দা আবরণ মাত্র। যার এমন ক্ষমতা হয়েছে যে, তার দৃষ্টিতে বিকার আসে না, রূপ-অরূপের প্রতি রাগ-দ্বেষ হয় না, তার ক্ষেত্রে পর্দার কোন আবশ্যকতা থাকে না। তার চোখ বন্ধ করে সাধনা করার আবশ্যকতাও নেই।

এক পথ—ইন্দ্রিয়-বিষয়ের নিরোধ। আর এক পথ—রাগ-দ্বেষের ধারা অবরোধ। এই দুটির সংযুক্ত নাম—ইন্দ্রিয়-প্রতিসংলীনতা। প্রতিসংলীনতার অর্থ—নিজের মধ্যেই লীন হয়ে যাওয়া। ইন্দ্রিয়-প্রতিসংলীনতা হল—চেতনার মধ্যে ইন্দ্রিয়ের লীন হয়ে যাওয়া।

ইন্দ্রিয় সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান খুবই কম। আমরা জেনে রেখেছি—চোখের কাজ দেখা, কানের কাজ শোনা ইত্যাদি ইত্যাদি। আসলে কিন্তু ব্যাপার তা নয়। বাস্তবে ঐ রকম কোন ভাগ নেই। জ্ঞানের ধারা একই। তা ভাগে ভাগে বিভক্ত নয়। আমাদের ব্যবহারের সুবিধের জন্যই আমরা বিভাগ কল্পনা করে নিয়েছি।

জৈন পরম্পরায় চব্বিশ প্রকার 'লব্ধি'-র উল্লেখ আছে। তাদের মধ্যে এক লব্ধি হল—সংভিন্নস্রোতোলব্ধি। যে সাধক যোগীর এটা উপলব্ধ হয়ে যায়, যে সাধক সাধনার দ্বারা চেতনার বিকাশ অত্যুচ্চ স্তরে নিয়ে যান, সেই সাধক যে কোন ইন্দ্রিয় দিয়ে যে কোন ইন্দ্রিয়ের কাজ করিয়ে নিতে পারেন। তিনি চোখ দিয়ে শুনতে পারেন, কান দিয়ে দেখতে পারেন—আঙুল দিয়েও দেখতে পারেন, শুনতে পারেন। তাঁর কাছে ইন্দ্রিয়ের কাজের কোন বিভাজন নেই। যে কোন ইন্দ্রিয়ই সব ইন্দ্রিয়ের বিষয় গ্রহণ করতে সক্ষম হয়। এর থেকে এই কথাই প্রমাণিত হয় যে, জ্ঞানধারা এক ও অবিভাজ্য।

'সংভিন্নস্রোতোলব্ধি' কথাটির শব্দার্থ হল—যে স্রোত আছে, তার সমস্তই ভিন্ন হয়ে যায়, খুলে যায়। ফলে এমন অবস্থা আর থাকে না যে, কান দিয়েই শুনতে হবে বা চোখ দিয়েই দেখতে হবে। তখন যে কোন ইন্দ্রিয় দিয়েই শোনা যায় বা দেখা যায়।

আজ বিজ্ঞানের দ্বারাও এই তত্ত্ব সম্ভব বলে প্রমাণিত হচ্ছে যে, কেবল কানের দ্বারাই শুনতে হবে—এমন কোন বিধান নেই। কেবল অভ্যাসের দ্বারাই আমরা এমন অবস্থায় পৌঁছেছি, যেখানে কানের মাধ্যম ছাড়া আমরা শুনতেই সক্ষম হই না। তা না হলে, শোনার শক্তি হয়ত দাঁতেই অধিক পরিমাণে থাকত। আপনারা চোখ দিয়ে নয়, আঙ্গুল দিয়েই হয়ত দেখতে পারতেন। রুশ দেশে রোজা কুলেশোবা নামে এক স্ত্রীলোক আছেন। তাঁর আঙ্গুলে অদ্ভুত ক্ষমতা বিকশিত হয়েছে। চোখে পট্টি বেঁধে তিনি আঙ্গুলের সাহায্যেই পুস্তক পড়তে পারেন। আঙ্গুল পাতার ওপর বোলান, আর পড়ে যান। যে কোন জিনিস তাঁর কাছে আনলে তিনি তার ওপর ডান হাতের আঙ্গুল ফেরান আর বলে দেন ঐ জিনিসের ওপর কি লেখা আছে বা কি ছাপানো আছে। তাঁর আঙ্গুল আয়নার পিছনেও দেখতে পায়। তিনি কোন বস্তুকে স্পর্শ না করেও তার পরিচয় বলে দিতে পারেন। অবশ্য অন্ধও পুস্তক পড়ে, তবে সে উঁচু করে প্রস্তুত অক্ষরই পড়তে পারে। ঐ রকম অক্ষর পড়ার বিদ্যা আয়ত্ত করার জন্য তাকে পূর্বে বিশেষ শিক্ষা গ্রহণ করতে হয়। সে সাধারণ পুস্তক পড়তে পারে না। কিন্তু ঐ রুশীয় স্ত্রীলোক সাধারণ পুস্তকই আঙ্গুলের মাধ্যমে পড়তে পারেন।

আমাদের ইন্দ্রিয়গুলির এই যে বিভাজন—অমুক ইন্দ্রিয় দিয়ে শুনতে হবে, অমুক ইন্দ্রিয় দিয়ে দেখতে হবে, অমুক ইন্দ্রিয় দিয়ে রসাস্বাদ করতে হবে, ইত্যাদি—তা আমাদের নিরন্তর অভ্যাসের কারণেই হয়েছে। কিন্তু এই বিভাগ যথার্থ নয়। যার চেতনা বিকশিত হয়ে যায় তার ক্ষেত্রে এই বিভাগ আর থাকে না।

আমরা দেখতে পাই, কোন ব্যক্তির মিষ্টান্নের প্রতি অনুরাগ আছে,

আবার কারও ঐ মিষ্টান্নের প্রতি দ্বেষ বা ঘৃণা আছে। কেউ কেউ এক বস্তু পছন্দ করে, আবার কেউ কেউ অন্য বস্তু পছন্দ করে। কোন ব্যক্তির যদি এক বস্তুর প্রতি অনুরাগ থাকে তো অন্য ব্যক্তির ঐ বস্তুর প্রতি দ্বেষ থাকে। ইন্দ্রিয়গুলি যেন রাগ-দ্বেষকে বণ্টন করে দিয়েছে। কিন্তু রাগ-দ্বেষ কি বণ্টন করা যায়, খণ্ড খণ্ড করা যায়? আমি বুঝি, এমন করা যায় না। রাগ-দ্বেষের একই ধারা। আমাদের চেতনার ধারাও এক। অনেক রকম পার্থক্যও যে দেখা যায়, তা কেবল অভ্যাসের কারণে, বাতাবরণের কারণে আর সংস্কারের কারণে। এক বিশেষ পরিস্থিতিতে যে রকম অভ্যাস, বাতাবরণ আর সংস্কার গড়ে ওঠে, তাই সমস্ত বিভাগের বা পার্থক্যের সৃষ্টি করে।

কারও রসাস্বাদনের শক্তি প্রবল হয়, কারও শ্রবণশক্তি প্রবল হয়, আবার কারও দর্শনশক্তি প্রবল হয়। রাগ-দ্বেষের ধারা এক হওয়া সত্ত্বেও বিভিন্ন রুচির যে সৃষ্টি হয়, তার মূল কারণই সংস্কারের বিকাশ—বিভিন্ন সংস্কারের বিকাশ। আমরা কোন এক বিষয়ে বিশেষজ্ঞতা অর্জন করি, অত্যন্ত অভ্যস্ত হয়ে যাই। এটা 'স্পেশালাইজেশনের' কথা। কোন ইন্দ্রিয়ের যদি কোন বিষয়ের প্রতি অত্যন্ত ঝোঁক হয়, তবে রাগ-দ্বেষের ধারা সেদিকেই প্রবাহিত হতে আরম্ভ করে।

চাষের জন্য ক্ষেতে জল নেওয়ার যে ব্যবস্থা করা হয়, তা আপনারা লক্ষ্য করে থাকবেন। বড় খাল থেকে ছোট ছোট নালা কেটে সমস্ত ক্ষেতে জল নিয়ে যাওয়া হয়। যেসব নালা দিয়ে জল নেওয়ার আবশ্যকতা থাকে না, চাষী কখনও কখনও সেই সব নালার মুখ মাটির বাঁধ দিয়ে বন্ধ করে। তখন জল আর সেসব বিভিন্ন নালা দিয়ে ছড়িয়ে না পড়ে এক দিকেই চলে। যে জল ভিন্ন ভিন্ন নালাতে বণ্টিত হয়ে প্রবাহিত ছিল, সেই জল এখন এক ধারাতে প্রবাহিত হতে আরম্ভ করল। আমাদের ইন্দ্রিয়গুলির স্থিতি ঠিক এই রকম। রাগ-দ্বেষের ধারা সব ইন্দ্রিয়ের সঙ্গেই চলছিল, এখন আমরা কতকগুলি

ইন্দ্রিয়ের দ্বার বন্ধ করে সেই ধারাকে একই ইন্দ্রিয়ের দিকে প্রবাহিত করে দিলাম। এখন সমস্ত প্রবাহ পূর্ণবেগে এক দিকেই চলল। এবার আমাদের সংস্কার বলবান হতে আরম্ভ করল।

আমাদের সমস্ত শরীরে রক্তের সঞ্চার আছে, সমস্ত অবয়বেই রক্ত প্রবাহিত হচ্ছে। কিন্তু আমি যখন শরীরের কোন এক বিন্দুতে ধ্যান কেন্দ্রিত করে সংকল্প করি যে ঐ বিন্দুতে রক্তের প্রবাহ অধিক হোক, তখন সত্যিই রক্তধারা সেখানে অধিক মাত্রায় প্রবাহিত হতে আরম্ভ করবে। প্রাণধারা সেখানে প্রবাহিত হতে থাকবে। প্রাণধারার সঙ্গে সঙ্গে রক্তের ধারাও এসে যাবে। এই ভাবে যে দিকে আমার মন যাবে, সংকল্প যাবে, প্রাণধারাও সেদিকেই যাবে। রাগ-দ্বেষের ধারাও সেদিকে প্রবাহিত হতে আরম্ভ করবে। ফলে, সংস্কার বলবান ও পুষ্ট হতে থাকবে। রাগ-দ্বেষের ধারার মধ্যে কোন ভেদ নেই, পার্থক্য নেই। চেতনার ধারার মধ্যেও ভেদ নেই, পার্থক্য নেই। আমরা সংকল্পের দ্বারা ঐ ধারাকে গতি ও পুষ্টি দিয়ে ভেদের সৃষ্টি করি।

আমরা যদি ইন্দ্রিয়-সংযম অভ্যাস করতে চাই তো ইন্দ্রিয়-বিষয়ের নিরোধ আর রাগ-দ্বেষের ধারার নিরোধ—এই দুই বিষয় সম্বন্ধে আমাদের একটা বোঝাপড়া করে নিতে হবে।

সকলের ইন্দ্রিয়-অভ্যাস এক রকম নয়। কারও চক্ষু-ইন্দ্রিয় প্রবল। কারও শ্রোত্র-ইন্দ্রিয় প্রবল, আবার কারও রসনা-ইন্দ্রিয় প্রবল। কারও ঘ্রাণ-ইন্দ্রিয় প্রবল হল তো অন্য কারও স্পর্শ-ইন্দ্রিয় প্রবল। ইন্দ্রিয়-সংযম অভ্যাস করার পূর্বে ব্যক্তিকে সর্বাগ্রে নির্ণয় করতে হবে, কোন ইন্দ্রিয়ের প্রতি—কোন বিষয়ের প্রতি—তার আসক্তি প্রবল। এইভাবে নির্ণয় করার পরে, তাকে নির্ণীত ইন্দ্রিয়কে সংযম করার পথে অগ্রসর হতে হবে। এই সংযম অভ্যাস এই ভাবে করতে হবে—যে ইন্দ্রিয়ের আসক্তি প্রবল, সেই ইন্দ্রিয়ের দিকে রাগ-দ্বেষের ধারাকে যেতে না দেওয়ার অভ্যাস করতে হবে। সর্বদা অবহিত থেকে নিরন্তর অভ্যাস চালিয়ে যেতে হবে। সাফল্য কতটা হচ্ছে, সে বিষয়ে সকালে

ও সন্ধ্যায় আত্ম-নিরীক্ষণ করতে হবে। এই যথেষ্ট। আর কিছু করার আবশ্যকতা হবে না। এতটা জাগরূকতা এসে গেলে ইন্দ্রিয়-সংযমের পথ খুলে যাবে। কেবল সাধনার দৃষ্টিতে নয়, জীবনের দৃষ্টিতেও ইন্দ্রিয়-সংযম আবশ্যক। স্বাস্থ্য, ব্যবহার প্রভৃতি সব কিছুর জন্যই ইন্দ্রিয়-সংযমের প্রয়োজন আছে।

প্রাচীনকালে এমন উল্লেখ দেখা যায় যে, রাজাদের পক্ষে ইন্দ্রিয়-সংযম অত্যন্ত আবশ্যক। যে রাজা ইন্দ্রিয়-সংযমে অপটু, তাঁর পক্ষে যথার্থভাবে রাজ্যপালন সম্ভবই নয়। ইন্দ্রিয়-লোলুপ রাজা কি করে বৃহৎ সাম্রাজ্য চালনা করবেন? যখন বহিঃশত্রুর আক্রমণ হল, তখন তখন হয়ত রাজা অন্তঃপুরে বিলাস-ব্যসনে ডুবে আছেন। তাহলে রাজ্য রক্ষা কেমন করে হবে? রাজার পক্ষে সংযত-ইন্দ্রিয় হওয়া অত্যন্ত আবশ্যক। সমাজে যাঁরা প্রধান ব্যক্তি তাঁদের পক্ষে ইন্দ্রিয়-সংযম আবশ্যক। প্রত্যেক ব্যক্তির পক্ষেই আবশ্যক। যে অত্যধিক ইন্দ্রিয়-চর্চা করে সে নিজের জীবনই নষ্ট করে ফেলে। তিন রকম অবস্থা হতে পারে—যোগ, অযোগ আর অতিযোগ। মহর্ষি চরকের অভিমত, যে ব্যক্তি ইন্দ্রিয়ের যোগ অর্থাৎ ব্যবহার না করে, ইন্দ্রিয়ের কাজ গ্রহণ না করে, তার ইন্দ্রিয় বিনষ্ট হয়ে যায়। ইন্দ্রিয় তার কাজ করা বন্ধ করে দেয়। আপনার চোখের ব্যবহার বন্ধ যদি করে দেন তো চোখের জ্যোতি নষ্ট হয়ে যাবে। সব ইন্দ্রিয়ের ক্ষেত্রেই এই এক নিয়ম। আপনারা হাত ভাঁজ করে রাখুন, কিছু দিন পরে দেখবেন হাতকে আর সোজা করতে পারছেন না—তার নমনীয়তা নষ্ট হয়ে গিয়েছে।

অযোগ বা অব্যবহারে যেমন শক্তি নষ্ট হয়, অতিযোগ বা অত্যধিক ব্যবহারে শক্তি তেমনই নষ্ট হয়। সেজন্য বলতে হয়, 'যোগই' উত্তম পথ। ইন্দ্রিয়ের যথাযথ ব্যবহার হওয়া চাই। ইন্দ্রিয়ের কাজ গ্রহণ করলাম, তারপরে বিশ্রাম করলাম। যতটা কাজ, ততটা বিশ্রাম। যতটা কাজ গ্রহণ করা দরকার ততটা কাজই গ্রহণ করলাম—তার অধিক বা অল্প নয়। এই হল যোগ। এটাই আয়ুর্বেদের অভিমত,

অর্থাৎ স্বাস্থ্যের দৃষ্টিকোণ থেকে দেওয়া অভিমত। এর তাৎপর্য এই যে, চোখের কাছ থেকে দেখার কাজ নেওয়া চোখের অসংযম নয়। কানের কাছ থেকে শোনার কাজ নেওয়া কানের অসংযম নয়। অসংযম তখনই হয়, যখন এদের সঙ্গে রাগ-দ্বেষ জুড়ে দেওয়া হয়। ইন্দ্রিয় সংযমের প্রকৃত অর্থ হল—আপনারা ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে জ্ঞান আহরণ করুন, কিন্তু সেই জ্ঞান যেন বিশুদ্ধ জ্ঞান হয়—তার সঙ্গে যেন আর কিছু জুড়ে না দেওয়া হয়। বিশুদ্ধ জলই যেন প্রবাহিত হয়, তার সঙ্গে যেন কোন আবর্জনা বা নোংরা জিনিষ যুক্ত না হয়। একেই ইন্দ্রিয়-সংযম বলে। জল প্রবাহিত হবে, না এক জায়গায় পড়ে থাকবে—সেটা আমাদের চিন্তার বিষয় নয়। জল প্রবাহধারায় চলতে পারে অথবা এক জায়গায় স্থির থাকতে পারে। আমাদের কেবল এই চিন্তাই হবে, জলের সঙ্গে যেন আবর্জনাও না চলে, ধুলো-বালি যেন না মেশে। এই ব্যবস্থা করতে পারলেই যথেষ্ট হবে। এর জন্য যদি আমাদের কোন নালা বন্ধ করে দিতে হয় তো তা বন্ধ করতে হবে। যদি কোন নালা ওপর থেকে ঢাকতে হয়, যাতে কোন আবর্জনা বা নোংরা জিনিষ তাতে না ঢোকে, তবে তাই করতে হবে। মূল কথা—জল যেন পরিষ্কার থাকে, তার স্বচ্ছতা যেন নষ্ট না হয়। এই হল ইন্দ্রিয়-সংযম। যদি আমরা এই বিষয়ে সতর্ক থাকি যে, কোনক্রমেই যেন আমাদের ইন্দ্রিয় ব্যাপারের সঙ্গে রাগ-দ্বেষের ধারার সংযোগ না ঘটে, তাহলে ইন্দ্রিয়-সংযমের পথ স্বতঃই প্রশস্ত হয়ে যাবে।

ইন্দ্রিয়-অসংযমের ফল সঙ্গে সঙ্গেই মেলে। এক ব্যক্তি একদিন এত অধিক পরিমাণে ভোজন করল যে সেদিন সন্ধ্যায়, বা তারপরে দুই-একদিন ধরে, তার ভোজন করার প্রয়োজনই রইল না। সে একবারে গলা পর্যন্ত ভোজন করল। তার ফল সে তৎক্ষণাৎ পেল। পরিণামের জন্য তাকে পরের জন্ম পর্যন্ত প্রতীক্ষা করতে হল না। প্রায়ই খবরের কাগজে পড়া যায়—অমুক শহরে একশ লোক মদ পান করে মারা গিয়েছে। ঐ মদ বিষাক্ত ছিল। তার ফল তখনই

ভুগতে হল। আমাদের সব হিসেব-নিকেশ বর্তমান কালেই হয়ে চলেছে।

আমাদের ভেতরে এমন এক 'কম্পিউটার' আছে যা সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম হিসেব রাখে, গণনা করে। সমস্ত হিসেবই আমাদের ভেতরে হচ্ছে।

এক ব্যক্তি অত্যন্ত ধনী। কিন্তু তার ধনী হওয়ার মূলে আছে কুটিল ও কপট প্রচেষ্টা। সে অন্যকে ঠকায়, ধাপ্পা দেয়, ভেজাল চালায়, চুরি করে। ধন তার হাতে স্তূপীকৃত হল। আমরা তাকে বহু মান দিলাম, কারণ সে ধনী। বাইরে থেকে তাকে খুবই প্রসন্ন দেখাবে। এবার তার ভেতরে উঁকি দিয়ে দেখুন। তাকে বড়ই দুঃখী বলে মনে হবে। তার আত্মা কাঁদছে। সংসারে তার অনেক ছিদ্র। তার ছেলে তার কথা শোনে না, তার স্ত্রী তার ওপর সন্তুষ্ট নয়। তার স্বাস্থ্য ভেঙ্গে গিয়েছে। দুশ্চিন্তায় তার প্রতি মুহূর্ত কাটছে। কুটিলতা কপটতার পরিণাম তাকে এখানেই ভোগ করতে হচ্ছে। তার ধন আছে, কিন্তু সুখ নেই, আত্মতোষ নেই, শান্তি নেই।

পরিণামের এই সূক্ষ্ম হিসেব-নিকেশ ভেতরে ভেতরে হয়েই চলেছে। আমরা প্রত্যক্ষভাবে তা দেখতে পাই না। ওটা স্বতঃ-চালিত ব্যবস্থা।

মার্কস বলেছেন, বাদ, প্রতিবাদ আর সমবাদ—এই তিনটি এক সঙ্গে চলে। বাদের সঙ্গেই প্রতিবাদের উৎপত্তি হয়। বাদ যে কোন পদ্ধতিতেই হোক—প্রতিবাদ অবশ্যই হবে। সংঘর্ষ অবশ্যই হবে। আমরা মনে করি, এই প্রতিবাদ বা সংঘর্ষ আজই উৎপন্ন হয়েছে। কিন্তু এ ধারণা ভুল। প্রতিবাদের উৎপত্তি সেই দিনই হয়েছিল, যেদিন বাদ উৎপন্ন হয়েছিল। শিশু যে দিন জন্মায়, যে ক্ষণ তাকে জন্ম দেয়, সেই দিন-ক্ষণ মৃত্যুর প্রারম্ভেরও সূচনা করে। শিশুর মৃত্যুর প্রারম্ভ হয়ে যায়। আমরা বলি, অমুক ব্যক্তি ষাট বছর হয়ে মারা গিয়েছে, অমুক ব্যক্তি আশি বছরে পৌঁছে মারা গিয়েছে। তা কিন্তু ভুল। যে ব্যক্তি ষাট কি আশি বছর বেঁচে থাকতে পারে, সে কখনই মরতে পারে না। সে মৃত্যুর অতীত হয়ে যায়। যে শিশু নতুন জীবন পেয়ে

দু দিন না মরে বেঁচে থাকতে পারে, সে আর কখন মরে না; সে অমর হয়ে যায়। আসলে কিন্তু এ রকম হয় না। এই জগতে চিরকাল বেঁচে থাকার ব্যবস্থা নেই। প্রাণী যে দিনে যে ক্ষণে জন্মায় সেই দিন সেই ক্ষণ থেকে মরতেও আরম্ভ করে। সে প্রতি ক্ষণেই মরে, তাই আমরা একদিন বলতে পারি—সে মরে গিয়েছে। একটা ঘড়া পড়ে আছে। আমরা একটা পাথর ছুঁড়ে মারলাম, ঘড়াটা ফেটে গেল। আমরা লাঠি দিয়ে ঘড়াকে আঘাত করলাম, ঘড়াটা চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে গেল। আমরা বললাম—'ঘড়াটা একটু আগেই অখণ্ড ছিল, এখন ফেটে গেল, ভেঙ্গে গেল।' সত্যিই কি ঘড়াটা এখনই ফেটে গেল? না, তা নয়। ঘড়াটা প্রতি ক্ষণেই ফাটছিল, তাই এখন ফেটে গেল। যখনই ঘড়াটা অস্তিত্ব লাভ করেছিল, যখনই ঘড়াটা বানানো হয়েছিল তখনই যদি সেটা না ফাটত, তবে পাথর বা লাঠির ঘায়ে কখনই সেটা ফাটত না। ঘড়া চিরস্থায়ী হয়ে যেত, কখনই বিনষ্ট হতো না। এই ভাবে পৃথিবীতে প্রত্যেক বাদের সঙ্গে প্রতিবাদ, প্রত্যেক জন্মের সঙ্গে মৃত্যু, প্রত্যেক অস্তিত্বের সঙ্গে নাস্তিত্ব, সংযুক্ত আছে।

বাদের প্রতিবাদ আসে, তারপরে আসে সমবাদ। সমবাদীর অর্থ হচ্ছে—পুষ্টি প্রদানকারী। সমবাদী পুরাতন ব্যবস্থার পরিবর্তন আনে, নূতন ব্যবস্থার প্রবর্তন করে। একটি তথ্য এই যে, আমাদের ভেতরে যে ক্রিয়া হচ্ছে, তার প্রতিক্রিয়াও সঙ্গে সঙ্গে হচ্ছে। কোন ব্যক্তি উত্তম আহার করছে। সে ভাবছে, আজ অমৃত আহার করলাম। কিন্তু সেই অমৃতের সঙ্গে কি বিষের মাত্রাও নেই? অবশ্যই আছে। কেউ দুধকে অমৃত ভাবে, কেউ শাক-সবজিকে। কিন্তু এ সব ক্ষেত্রেও অমৃতের সঙ্গে বিষের মাত্রা মিশ্রিত আছে। দুধে বিষ আছে, শাক-সবজিতেও বিষ আছে। এমন কোন খাদ্য নেই যা কেবলই অমৃত, বিষের সম্পর্কশূন্য। আবার এমন খাদ্যও নেই যা কেবলই বিষ, অমৃতের সম্পর্কশূন্য। অমৃত ও বিষ এক সঙ্গেই থাকে। যেখানেই জীবনের ক্রিয়া হয়, সেখানেই মরণের প্রতিক্রিয়া হয়। জন্ম যদি এক

ক্রিয়া হয় তো মৃত্যু তার প্রতিক্রিয়া। স্বাস্থ্যকে যদি ক্রিয়া বলা যায়, রোগকে বলতে হয় প্রতিক্রিয়া। উভয়কে আলাদা করা যায় না, তবে মাত্রা-ভেদ অনুসারে আমরা এদের আলাদা-আলাদা করেই নিই। ধনী ব্যক্তির ধনের মাত্রা দেখে আমরা বলি, এ ব্যক্তি এত পাপ করেও এত উন্নতি করেছে। কিন্তু সেই সঙ্গে যদি আমরা তার অন্তরের অবস্থা দেখি, তার সুখ দেখি, তার শান্তি দেখি, তবে হয়ত বলব যে, সে লোকসানে ডুবে গিয়েছে। ধন হয়েছে তো কি হয়েছে? সে না পেয়েছে শান্তি, না পেয়েছে সুখ, না পেয়েছে প্রসন্নতা। কারণ, হিসেব যে এক সঙ্গেই চলছে। পরলোকের কথা ছেড়েই দিন। ক্রিয়ার প্রতিক্রিয়া ইহলোকে, বর্তমান কালেই হচ্ছে। প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করার, পরিণাম প্রদান করার, হিসেব-নিকেশ নিষ্পন্ন করার যে অব্যর্থ 'কমপিউটার'—তা আমাদের ভেতরেই আছে। এর জন্য কোন বাহ্য সত্তাকে আমন্ত্রণ জানাবার আবশ্যকতা নেই।

২২

অপ্রমাদ

এক লোক তার সারা দিনের করণীয় কাজ একটি কাগজে লিখে রাখত। একদিন সে তার নিয়ম অনুসারে সেই দিনের কাজ কাগজে লিখে রাখল। তারপব কাজের সময় যখন এল তখন সে কাগজখানি এদিক-ওদিক খুঁজতে লাগল। কিন্তু কাগজ আব খুঁজে পেল না। এমন সময় তার এক বন্ধু সেখানে এল। সে জিজ্ঞাসা করল, 'এ তুমি কি কবছ?' সে বলল, 'আমি মনে করতে পারছি না, এখন আমাব কোন্ কাজ করার কথা।' বন্ধু বলল, 'কেন, তুমি তো কাগজে লিখে রেখেছ। কাগজ উঠিয়ে দেখে নাও না।' সে বলল, 'কাগজটা যে কোথায় বেখেছি তা ভুলে গেছি। মনে করতে পারছি না। কাগজই তো খুঁজছি।'

কাজের কথা স্মবণ রাখার জন্য কাগজ, আবার কাগজের কথা স্মরণ বাখার জন্য তৃতীয় কোন মাধ্যম দরকার। ভুলো স্বভাব এমনই যে, কেবল কাগজে কাজ চলে না, সেই কাগজ সামলে রাখার ব্যবস্থাও দরকাব। এ তো বড সমস্যা। কিন্তু কেন এমন হয? এমন হওযার কাবণ—প্রমাদ। প্রমাদেব অর্থ—বিস্মৃতি। 'কি', 'কি প্রকারে', 'কেন'—এসব কিছুর বোধ আমাদেব থাকে না। আমরা সবই ভুলে যাই।

জীবনে অপ্রমাদ নিতান্ত আবশ্যক। কিন্তু না ভুললেও কাজ চলে না; ভোলাও আবশ্যক। মানুষ নেশা করে—মদ খায়, ভাঙ খায়। কিন্তু তার পরিণতি কি? মদ বা ভাঙ কোন সুস্বাদু পদার্থ নয়। তবুও মানুষ লোলুপ হয়ে তা সেবন করে। এর কারণ কি হতে পারে? যারা মদ খায় তারাও বলে, মদ খাওয়ার সময় মুখ বিকৃত হয়—মদের গন্ধ অসহ্য লাগে। খেতে সুস্বাদু নয়, অথচ আমাদের খেতেই হয়, না খেলে চলে না—এরও অবশ্য একটা কারণ আছে। সেই কারণ হল—মানুষ একলা থাকতে চায়। নেশা তাকে ভুলিয়ে দেয়।

আমাদের সামনে দুটি দিক আছে। এক দিক সম্পর্কের, আর এক দিক একাকীত্বের। ব্যক্তির সম্পর্ক হয় পরিবারের সঙ্গে, প্রতিবেশীর সঙ্গে, সমব্যবসায়ীদের সঙ্গে, সামাজিক, ধার্মিক, রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান ও ঐ সব প্রতিষ্ঠানের সদস্যদের সঙ্গে। গ্রামের সঙ্গে, রাষ্ট্রের সঙ্গে সম্পর্ক হয়। অনেক প্রয়োজনে, অনেক দৃষ্টিকোণ থেকে, অনেক শ্রেণী ও অনেক ব্যক্তির সঙ্গে সম্পর্ক হয়। কেবল প্রাণীদের সঙ্গেই যে সম্পর্ক হয় তা নয়, শরীরের সঙ্গে, পোষাক-পরিচ্ছদের সঙ্গে, ঘর-বাড়ির সঙ্গে ও আরও অনেক বস্তুর সঙ্গেও সম্পর্ক হয়। যে ভাবে ব্যক্তির সঙ্গে সম্পর্ক গড়ে ওঠে, ঠিক সে ভাবেই বস্তুর সঙ্গে সম্পর্ক গড়ে ওঠে। ভাবনার সঙ্গেও সম্পর্ক হয়। এ সবই সম্পর্ক। একদিকে ব্যক্তি একাকী, অপর দিকে তার এই প্রকার সম্পর্কের বহুলতা। সম্পর্ক চিন্তা উৎপন্ন করে। যত সম্পর্ক, তত চিন্তা। সম্পর্ক থেকে চিন্তা বাড়ে। চিন্তা বাড়লে মনে হয় দুঃখও বাড়ছে। বস্তুত, দুঃখ কি? আমি তো মনে করি, সম্পর্কই দুঃখ। দুঃখের অর্থই হল, কোন না কোন বস্তুর সঙ্গে সম্পর্ক। সম্পর্ক হয়েছে কি দুঃখও হয়েছে, সম্পর্ক নেই তো দুঃখও নেই। সম্পর্ককে ছেড়ে দুঃখের কল্পনাও করা যায় না। এক ব্যক্তি শান্ত হয়ে অবস্থান করছে। তার মন শান্ত, চিন্তা-ভাবনাও শান্ত। হঠাৎ সে এমন এক ব্যক্তিকে দেখতে পেল,

যে তার প্রতি অনুকূল নয়, কিন্তু প্রতিকূল, যে তার অপ্রিয়, যে অতীতে তাকে ঠকিয়েছে বা অপমানিত করেছে। তাকে দেখা মাত্রই শান্ত ব্যক্তির শান্তি ভঙ্গ হল। তার মন ক্রোধে ভরে উঠল। সে অশান্ত হয়ে গেল, দুঃখী হয়ে গেল। তার এই দুঃখের হেতু কি? সম্পর্কই হেতু। দুঃখের অর্থই হল সম্পর্ক, আর সম্পর্কের অর্থই হল দুঃখ বা চিন্তা। কোন ব্যক্তি সব সময় চিন্তিত হয়ে থাকতে পারে না। যখন সে চিন্তিত থাকে তখন তার মনে অস্থিরতা আসে, ব্যাকুলতা আসে, উত্তেজনা আসে। এই অস্থিরতা, এই ব্যাকুলতা তাকে একলা হয়ে যেতে অনুপ্রাণিত করে বা বাধ্য করে—যেন তাকে বলে, 'তুমি একলা হয়ে যাও, তাহলে কোন চিন্তা থাকবে না, কোন ব্যাকুলতা থাকবে না।'

বোধ হয়, চিন্তামুক্তির জন্যই মাদক দ্রব্যের ব্যবহারের প্রচলন হয়েছিল। লোকে চিন্তা থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য, সম্পর্ককে ছিন্ন করার জন্য, দুঃখ থেকে ত্রাণ পাওয়ার জন্য নেশা করে, মাদক বস্তুর প্রয়োগ করে। যখনই কেউ মদ্য পান করে, তখনই সে একলা হয়ে যায়, তার সব সম্পর্ক টুটে যায়, বাইরের কোন বোধ আর থাকে না। সে অনুভব করতে আরম্ভ করে, সে একলা হয়ে গিয়েছে, আর এই একলা হওয়াতেই বড় সুখ। মদ্যপান করার মধ্যে সত্যিই কোন সুখ থাকতে পারে না। আসলে মদ্যপান একাকীত্বের একটা নিমিত্ত মাত্র। এ কথা সত্য যে, পৃথিবীর মধ্যে শ্রেষ্ঠ সুখই হল—একাকীত্ব। কিন্তু লোকে একলা হতে পারে না, কারণ সে এত সম্পর্কের সৃষ্টি করেছে আর সেই সব সম্পর্কের দরুণ চিন্তা-সূত্রের জঙ্গল এমনভাবে জড়িয়ে পড়েছে যে, সে নিজেকে আর আলগা করতে পারে না—পৃথক করে নিতে পারে না। তার এমন ক্ষমতা নেই যে সে ঝটকায় জাল ছিঁড়ে বের হতে পারে। সে তো ধ্যানের প্রয়োগ জানে না, সে যে ধ্যানের অভ্যাস করে নি। সে ধ্যানের দ্বারা আপনাকে একলা করার, সম্পর্ককে ছিন্ন করার, কৌশল আয়ত্ত করে নি; তাই সে মদিরা ও

অন্যান্য মাদক বস্তুর সাহায্য নিয়ে আপনার একাকীত্বের অনুভব করার চেষ্টা করে। লোকে মনোরঞ্জনের বিষয় পেলে রসবোধ করে, কিন্তু কেন? সে কেন সিনেমায় যায়, সার্কাস দেখে, নাট্যাভিনয় দেখে, বেড়াতে যায়, পিকনিক করে? এ সবেরই কিন্তু ঐ এক হেতু। সে ভাবে, সারাদিন তো অফিসের কাজে, কি দোকানে বসে কাটল—এখন চল, একটু স্বস্তির নিঃশ্বাস নেওয়া যাক—চিন্তায় তো ডুবে আছি, চল, কিছুক্ষণ নিশ্চিন্ত থাকা যাক। সে এইভাবে সারা দিনের শ্রম ও সকল চিন্তাকে ভুলতে চায়, বিস্মৃত হতে চায়। তার এই চেষ্টার দ্বারা সে কিছু সময়ের জন্য সকল সম্পর্ক থেকে, ও সেই সঙ্গে সকল চিন্তা থেকে, মুক্ত হয়।

মানব সমাজের সব চেয়ে বড় সমস্যা, সম্পর্ক-জনিত চিন্তা। বাইরে থেকে যখন এত চিন্তা এসে জড়িয়ে ফেলে, তখন বুঝতে হবে কোথাও না কোথাও তার উৎপত্তি আছে। তার উৎপত্তি স্থল—স্ব-বিস্মৃতি, অর্থাৎ নিজেকে নিজের ভুলে যাওয়া। যখন আপনি দ্বিতীয় কিছুর স্মরণ রাখতে থাকেন, তখন আপনি নিজেকে ভুলতে বাধ্য হন। আপনি নিজেকে না ভুললে অন্য কিছুর স্মৃতি রাখতে পারবেন না, আবার অন্য সব কিছুর স্মৃতি বিসর্জন না দিলে নিজের স্মৃতি রাখতে পারবেন না। নিজের বিস্মৃতি না ঘটলে পরের স্মৃতি থাকে না; আবার পরের বিস্মৃতি না হলে, নিজের স্মৃতি থাকে না। হয় আপনি নিজেকে ভুলবেন নয়তো পরকে ভুলবেন। হয় বাহ্য সম্পর্ককে কম করতে হবে, ছিঁড়ে ফেলতে হবে, নয়তো আপনার নিজের সঙ্গে আপনার সম্পর্ককেই ছিঁড়তে হবে, নিজের সম্পর্ক-সূত্রকেই কাটতে হবে। এর অর্থ হল, আপনাতে আপনার যে একত্ব ছিল, আপনাতে আপনার একাকীত্বের যে অনুভব ছিল—তা ফেলে দিয়ে, সেখানে বাইরের সঙ্গে অজস্র সম্পর্ক যোজনা করা। এরই নাম—আত্ম-বিস্মৃতি। বাহ্য সম্পর্কই আত্ম-বিস্মৃতির কারণ। যে লোক দ্বিতীয় কিছু সম্বন্ধে জাগরূপ হয়, সাবধান হয়, সে নিজের সম্বন্ধে সুপ্তবৎ হয়ে যায়, অসাবধান হয়ে যায়।

সক্রেটিস প্রাচীন গ্রীসের এক শ্রেষ্ঠ দার্শনিক ছিলেন। একদিন পথে যেতে তিনি সামনে এক ব্যক্তিকে দেখতে পেলেন। সে ছিল এথেন্সের এক প্রসিদ্ধ মদ্যপ। সক্রেটিস দেখলেন সে ব্যক্তি নেশায় চুর হয়ে আছে, কোন মতে টলমল করতে করতে চলছে। তিনি তাকে বললেন, 'সামলে চল, খানাখন্দে পড়ে যাবে।' মদ্যপ সে কথা শুনল, সে তো নেশায় চুর হয়ে আছে। সে বলল, 'আরে মহাত্মা! আমাকে কি শেখাচ্ছ? টলমল করে চলছি তো কি হয়েছে? খানায় যদি পড়ি, তাতেই বা কি হয়েছে? কাপড় যদি নোংরা হয়—হলই বা, আবার ধুয়ে নেব। আমি মদ্যপ, আমি নেশাখোর—সারা শহর তা জানে। যা কিছু হোক, তার জন্য আমার চিন্তা নেই। কিন্তু তুমি মহাত্মা ব্যক্তি। তুমি সামলে চল। তুমি যদি টলতে টলতে খানায় পড়, তোমার একূল ওকূল দুকূল যাবে। খুব সামলে চল, যেন পা পিছলে না যায়। আমাকে আর কেন জ্ঞান দিতে যাচ্ছ?'

এই হল এক দার্শনিক আর এক মদ্যপের মধ্যে কথাবার্তা। মদ্যপ এক বড় রহস্যের উদ্‌ঘাটন করেছে, এক সার কথা শুনিয়েছে। তার তাৎপর্য হল—যে মদ্যপ, যে নিজেকে ভুলেছে, যে একাকীত্বের আশায় নেশা করেছে, সে যদি টলমল করে, তার পা যদি পিছলে যায়, তবে কোন ক্ষতি বা দুঃখের কারণ হয় না। কিন্তু যে সাধক, যে আপনাকে আপনার মধ্যে পাওয়ার জন্য সাধনা করছে, যে একাকীত্বের সাধনায় রত আছে, তাকে তার নিজের চিন্তা নিয়েই থাকতে হয়, পরের চিন্তা করতে হয় না। সে জন্য মদ্যপ সক্রেটিসকে বলেছিল—'তুমি নিজের চিন্তা কর, আমার চিন্তা ছেড়ে দাও। তুমি যদি পিছলে পড়, তোমার পবিত্রতা নষ্ট হবে, তা কখনও আর ফিরে পাবে না। তুমি আর নির্মল থাকবে না। তুমি আত্ম-বিস্মৃতির গর্তে পড়ে যাবে।'

এই যে আত্ম-স্মৃতির কথা, জাগরূকতা আর সাবধানতার কথা—এগুলি বাস্তবিক পক্ষে সাবধানতার মহান সূত্র। এগুলিই হল—অপ্রমাদ। আমি একলা আছি, এই বিচার-সূত্রকে আত্মসাৎ করে

নেওয়া খুবই বড় সাধনা। এই সূত্র যখন আত্মগত হবে, তখন ব্যক্তি সকল সংকট ও দুর্ভোগ পার হয়ে যাবে, সকল ঝঞ্ঝাট ও সমস্যার অতীত হয়ে যাবে। এই সব সমস্যা বৈয়ক্তিক, সামাজিক বা জাগতিক হতে পারে। যে ব্যক্তি আপনার মধ্যে আপনার একাকীত্ব অনুভব করে সে এই সব সমস্যাই পার হয়ে যায়। কিন্তু যার একাকীত্বের অনুভব নেই, সে আর এই সব সমস্যা পার হতে পারে না। আর যেহেতু সে সমস্যার পার পায় না, সেহেতু তার মদ চাই, ভাঙ চাই, বিড়ি-সিগারেট চাই, আরও নানা রকমের মাদক বস্তু চাই। এগুলি সবই তার কাছে বিস্মৃতির মাধ্যম। যে আপনা-আপনি একলা হওয়ার রহস্য অবগত হয় নি, উপায় উদ্ভাবন করতে পারে নি— সে এই সব বাহ্য সাধনাকেই নিজের করে নেয়। কিন্তু এই সব বাহ্য সাধন উপকারের বদলে অপকারই করে। এদের থেকে ক্ষতিই হয়।

অপ্রমাদ আত্ম-স্মৃতির এক শক্তিযুক্ত সাধনা। এর অর্থ হল— আপনাতে আপন একাকীত্বের অনুভব করার অভ্যাস। এটা সাধনার পরম সূত্র তো বটেই, ব্যবহারেরও এটা মহান সূত্র। এ ছাড়া ব্যবহারিক জীবন সুখী ও আনন্দময় হয় না। আপনি যতদিন আপনাতে আপন একাকীত্ব অনুভব করতে সমর্থ না হবেন ততদিন চিন্তা থেকে মুক্তি পাবেন না। আমি কথাটা স্পষ্ট করার চেষ্টা করছি। ধরুন, এক পরিবার আছে। সেই পরিবারে পিতা মনে করে, পুত্রের ওপর তার অধিকার আছে; স্বামী মনে করে, স্ত্রীর ওপর তার অধিকার আছে। সম্পর্ক আছে বলেই পিতা আপন দায়িত্ব বোধ করে, আর মনে করে পুত্রের ওপর তার অধিকার আছে। স্বামীর ক্ষেত্রেও ঠিক একই কথা। কিন্তু যেখানে সম্পর্ক আছে, দায়িত্বের সেখানে চিন্তা নিশ্চয়ই উৎপন্ন হবে। এখন হয়েছে কি, পিতা একদিন বসে আছে, তার খুব পিপাসা হয়েছে, অথচ ছেলে জলের গেলাস হাতে নিয়ে আসে নি। আগের দিন যে সময়ে বাপকে জল খাইয়েছিল আজ সেই সময়ে জল নিয়ে আসে নি। পিতা অমনি ভাবতে আরম্ভ

করলেন, ছেলের আমার দিকে মন নেই। সে খাওয়ার জল আনল না। এই বকম চিন্তাই পিতাব মনে উৎপন্ন হল। কিন্তু কেন হল? ছেলের পক্ষে এটা কি খুবই জরুবী যে, সে জলেব গেলাস হাতে নিযে আসবে? আচ্ছা, জরুবীই বটে, কর্তব্য তো বটেই। কিন্তু এমন তো হতে পারে যে সে ভুলে গিযেছে, ঠিক সমযে তার কথাটা মনে হয নি। পিতার পক্ষে কি নিতান্তই এটা দবকার যে সে এই ব্যাপাবটা নিয়ে এতটা ভাবতে থাকবে, নিজেকে এতটা দুঃখী বোধ করবে? সত্যিই তার এত চিন্তাতুর হওযার কোন প্রয়োজন নেই। তবুও সে চিন্তাতুর হয়, কারণ তার একাকীত্বের অনুভব নেই।

একাধিক স্তরে আমাদের জীবন চলে। তাদের এক স্তরে আমরা অনুভব করি, আমাদের পরিবারে অনেক সদস্য আছে—চল্লিশ কি পঞ্চাশ জন সদস্য আছে। কিন্তু তাতে একটা অসুবিধা হতে পারে। আমরা যদি কেবল বাইরে থেকে মনে করি যে আমবা পঞ্চাশ জন, তবে সব ঠিকই আছে। কিন্তু যদি আমরা ভেতব থেকেও ভাবতে থাকি আমরা পঞ্চাশজন, আমরা একলা নই, তবে অনেক সমস্যাব উৎপত্তি হবে।

আমাদের অনুভূতি দুই স্তরেই হওয়া দরকার। এক ব্যবহাবের স্তর, যে স্তরে আমাদের অনুভব হয আমরা একলা নই, আমরা পঞ্চাশজন আছি। আর এক যথার্থতার স্তর, যে স্তরে আমাদের অনুভব হয় যে আমরা প্রত্যেকে একলা, আমাদেব আর কেউ নেই। যদি এই দুই অনুভূতি এক সঙ্গে চলে তবে কোন সমস্যা বা অসুবিধা হয় না। কিন্তু যখন আমাদের অনুভূতি একাঙ্গী হয, তখন প্রচুর সমস্যা দেখা দেয। যখন কোন ব্যক্তি ব্যবহাবেব স্তরের সঙ্গে যথার্থতার স্তবকে মিশিয়ে ফেলে, তখন বিপদ হয। যতক্ষণ সে জানে ব্যবহাবের দিক থেকে সে পঞ্চাশ, কিন্তু যথার্থতার দিক থেকে সে এক—সে একলা, ততক্ষণ কোন সমস্যা হয় না। কিন্তু যখনই সে মনে করে যেহেতু ব্যবহারে সে পঞ্চাশ, সেহেতু যথার্থই সে পঞ্চাশ,

সে একলা নয়, তখনই নানা সমস্যা এসে যায়। আজ পিতা বৃদ্ধ হয়েছে, অর্থোপার্জনে অসমর্থ হয়েছে। পরিবারের যে স্বার্থ তার দ্বারা সাধিত হতো, তা বন্ধ হয়েছে। এমন অবস্থায় তার প্রতি পরিবারের লোকদের উপেক্ষা আসতে পারে। তারা তাঁর কথাকে আর তেমন গুরুত্ব দেয় না। তখন সে ভাবতে থাকে, 'আরে, এ কি ব্যাপার। বিশ বছর আগে আমার সারা পরিবার আমার ইশারায় চলত, আমি ভ্রূকুটি করলে সকলে ভয়ে কাঁপত, একবার ডাকলে সকলে আমার সামনে এসে হাতজোড় করে দাঁড়াত। আর আজ কেউ আমার কথা শোনে না। আদর করা দূরে থাকুক, ছোট-বড় সকলে আমাকে তিরস্কার করে, আমাকে উপেক্ষা করে।' এইসব ভেবে বৃদ্ধ দুঃখী হয়ে যায়, চিন্তাতুর হয়ে যায়। একদিকে তার বিশ বছর আগেকার স্মৃতি কাজ করছে, অন্য দিকে তার বর্তমান পরিস্থিতি। যখনই সে তার আগেকার পরিস্থিতি বর্তমানের সঙ্গে জুড়তে চেষ্টা করে, তখনই তার দুঃখের অবধি থাকে না। তার মনে হয়, 'এই কি বেঁচে থাকা? কি হয়ে গেল? দুনিয়াই বদলে গেল, না যুগ পালটে গেল?'

এটা আমার কল্পনামাত্র নয়। অনেক লোকেরই এই রকম পরিস্থিতি, এই রকম অনুভব। নিজের প্রমাদের জন্যই লোকে দুঃখী হয়। সে যদি যথার্থতার দিক থেকে প্রমাদী না হত, তবে বর্তমান পরিস্থিতিতে সে দুঃখ বোধ করত না। তার প্রমাদ এই যে, যা কেবল ব্যবহারের বেলায় সত্য, তাকেই সে যথার্থ সত্য বলে মেনে নিয়েছে। এই ভুলই তার দুঃখের কারণ হয়েছে। ব্যবহারের সত্য এই যে, পিতার প্রতি পুত্রের কি কথা, দূরের লোকও 'যে আজ্ঞা' বলে উপস্থিত হয়, আদেশ মানে, আদর দেখায়, চোখের ইশারায় ওঠে-বসে। যেমনি স্বার্থের বন্ধন টুটে যায়, তেমনি পরিস্থিতির সম্পূর্ণ পরিবর্তন হয়ে যায়। সব কিছুই বদলে যায়। এখন আমাদের যদি স্পষ্ট অনুভূতি থাকত, জীবনের প্রতি অপ্রমত্ততা থাকত, জাগরূকতা থাকত, তবে আমরা স্পষ্টই অনুভব করতাম যে, আগে আমাদের যে ভূমিকা ছিল, সেখানে

আমরা অন্য অনেকের জন্য ছিলাম, আব সেজন্য তখনকার ব্যবহার ছিল এক রকম ; আর এখন আমাদের যে ভূমিকা, সেখানে আমবা অন্য কারও জন্য নয়, কেবল নিজের জন্য, সুতরাং এখনকার ব্যবহার হবে অন্য বকম। দুই ব্যবহারের মধ্যে রাত-দিনের তফাৎ হবে, আকাশ-পাতাল ফারাক হবে। এই যে আমরা মনে করছি 'এটা আমার'—এর মূলেই আছে আমাদের আত্মা সম্বন্ধে বিস্মৃতি। তুমি কি করে ভাবতে পার, এটা তোমার নিজস্ব ? কখনও নিজস্ব কিছু হয না। বস্তুত এই বিপবীত অনুভূতি হওয়া চাই যে, আমি একলা, আমি কেবল আমিই, আমার কেউ নেই। এটাই যথার্থ, এটাই প্রকৃত সত্য। এই আমাব পবিবার, এই আমার পত্নী, এই আমার পুত্র, এই আমার ভাই, এই আমার মিত্র—এসবই আমাদের ব্যবহারের ভূমি। ব্যবহাবের ভূমিতেই ব্যবহাবের বোধ থাকে, ব্যবহারের অনুভূতি থাকে, সম্পর্কেব বোধ থাকে। কিন্তু যখন চরম ও পরম সত্যের প্রশ্ন ওঠে, তখনই অনুভূতি হয় যে প্রকৃতপক্ষে আমি একলা, আমার কেউ নেই, আমিও কারও নই। যদি কারও এই অনুভূতি তীব্র হয, তবে তার বয়স ষাট হোক, সত্তর হোক, পরিবারের লোকেরা তাকে উপেক্ষা করুক—কোন কিছুতেই সে আর দুঃখী বোধ করবে না, চিন্তাপীড়িত হবে না। সে তখন ভাববে, 'আমি যখন অন্যেব কাজে লাগতাম তখন পরিবারের লোকেরা আমাব খাতির করত, বন্ধুরা পরামর্শ নিত। আজ তো আমি অন্য কারও জন্যই নই, তবে ওরাই বা আমাকে খাতির করবে কেন ? আর ওদেব খাতির আমি চাইও না।' এই চিন্তাই তাব দুঃখ মোচন করবে।

তেরাপন্থ সংঘে এক সন্ত ছিলেন, তাঁর নাম ছিল মগনলালজী স্বামী। তাঁকে মন্ত্রী-মুনি বলা হত। তাঁব জীবনী পড়লে মনে হয, তাঁব মত বুদ্ধিমান, বিবেকী, তত্ত্বজ্ঞ ও অধ্যাত্মরত ব্যক্তি অতি বিরল। তাঁর সত্তর-আশি বয়স হয়েছিল, কোন মুনি যদি তাঁকে জলপান করাতেন, তবে খুবই ভাল, যদি না করাতেন, তবে তাও কিছু

খারাপ নয়। আমি তাঁকে কখনও ক্রোধ প্রকাশ করতে দেখিনি। যখন কোন মুনি নিজের ভুল বুঝতে পেরে তাঁকে বলতেন, 'ক্ষমা করুন, আমার ভুল হয়ে গিয়েছে, অন্য কাজে ব্যস্ত থাকায় আপনাকে জলপান করাতে পারি নি'; তখন মন্ত্রী-মুনি উত্তর করতেন, 'ভুল হয়েছে তো কি হয়েছে, এমন কিছু মারাত্মক ভুল তো নয়। আমার যদি পিপাসা পেত, সামনে যাকে দেখতাম তার কাছ থেকে জল চেয়ে নিতাম। তা সম্ভব না হলে, এটা সামান্য কষ্ট মনে করে সহ্য করে যেতাম। ব্যাপারটা কিছু গুরুতর নয়।' এই রকমই ছিল তাঁর কথা। এর থেকে স্পষ্ট বোঝা যায়, তিনি ছিলেন নিজের মধ্যে লীন হয়ে যাওয়া আত্মসমাহিত ব্যক্তি। তিনি এই রকম মনে করতেন যে, কেউ যদি কারও জন্য কিছু করে তা নিজ গুণেই করে। এমন নয় যে তার ঋণ আছে, যা তাকে শোধ করতেই হবে। এই রকম অনুভূতি সেই ব্যক্তিরই হতে পারে যে বাস্তবিকই অনুভব করেছে যে, সে একলা। যে একাকীত্বের এই সূত্র আবিষ্কার করেছে, জীবন-যাপনের এই কৌশল আয়ত্ত করেছে, সে প্রকৃতপক্ষে সুখী জীবনের অধিকারী হয়েছে। যে এই সূত্র আবিষ্কার করতে পারে নি, সে অন্যের মধ্যে হাজার দোষ দেখতে পায়। সে সর্বদা অনুযোগ করে, 'ও এটা করে নি, ও এই রকম করেছে, ও ঐ রকম করেছে'—ইত্যাদি। তার অভিযোগের অন্ত থাকে না। অভিযোগের ভাব তখনই আসে যখন ব্যক্তির আত্ম-বিস্মৃতি হয়, অর্থাৎ ব্যক্তি যখন নিজেকে ভুলে যায়।

অপ্রমাদের সূত্র হল—আত্ম-স্মৃতি অর্থাৎ নিজের নিজেকে স্মরণ রাখা, এই ধারণাকে পুষ্ট করা যে, আমি একলা আছি—'একোঽহম্'। একত্ব ভাবনার যে সংস্কার আমাদের মধ্যে আছে, তাকে দৃঢ় করতে হবে। এই ভাবনা পুষ্ট হলে আত্ম-স্মৃতির ক্ষেত্রে প্রবেশ করা যায়, অপ্রমত্ত থাকার অভ্যাস হয়। এখানে আর একটা ব্যাপার বুঝতে হবে। 'আত্মার স্মৃতি' বলে ঠিক কোন কথা হয় না। আত্মা তো আমাদের

স্বভাব, আমাদের স্বরূপ। স্বভাবের স্মৃতি তাবই হতে পারে, যা আমরা বিস্মৃত হয়েছি। স্বভাব বিস্মৃত হতে পারি না, সুতরাং তাব স্মৃতিও সম্ভব নয়। এ কথা সত্যি বলেই মানতে হবে। প্রকৃত তথ্য এই যে, আমরা এক ব্যবধান রচনা করে বসেছি; আর এই ব্যবধানের দরুণ ভুলেই গিযেছি, আমরা কে বা কি। আমবা বাহ্য বস্তুর ওপর, অনাত্মীয বিষয়ের ওপব, আত্মীয়তা আরোপ করি, অথচ নিজের আত্মার দিকে দৃষ্টি দিই না। এই যে বাহ্য বস্তুর সঙ্গে সম্পর্ক—এটাই প্রমাদের বড কারণ। বাহ্য বস্তুব সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করাই অপ্রমাদেব সাধন। আমাদের অজ্ঞানেব কারণে, ভুল দৃষ্টিকোণের কারণে, মতিভ্রমের কাবণে, মানসিক বাচিক ও কায়িক চঞ্চলতার কারণে, প্রমাদ উৎপন্ন হয়। নিদ্রাও প্রমাদের হেতু হতে পারে। নিদ্রার সমযে ব্যক্তি নিজেকে বিস্মৃত হয। নিদ্রায় যে অবস্থা হয় তার সঙ্গে নেশার অবস্থাব খুব বেশি পার্থক্য নেই। দুই অবস্থাতেই আত্ম-বিস্মৃতি হয়। নিদ্রা ভুলে যাওয়ার অবস্থা। কিন্তু তাও প্রমাদ, প্রমাদের হেতু ও প্রমাদেব উৎপাদক। এই কাবণে সাধনেব জন্য সাধকের নিদ্রা জয কবা দরকার। নিদ্রাবিজয সাধনার আবশ্যকীয় অঙ্গ। ইন্দ্রিযের লোলুপতাও প্রমাদের কাবণ, সেজন্য ইন্দ্রিয় সংযম সাধনাব অঙ্গ। ইন্দ্রিয-সংযম সাধককে অপ্রমত্ততার দিকে নিযে যায। যতক্ষণ অপ্রমাদের সাধনা করা না হয়, ততদিন অধ্যাত্মের অভিমুখে অগ্রসর হওয়াই যায না। অপ্রমাদ সাধনার এক সশক্ত সূত্র। প্রমাদ হল ভয়, অপ্রমাদ অভয। ভগবান মহাবীব বলেছেন, 'সব্বও পমত্তস্স ভযং'—প্রমাদীর চার দিকেই ভয় ঘিরে থাকে। সর্বত্রই তার পক্ষে ভয় আব ভয়, এক ক্ষণের জন্যও সে অভযেব দশা পায় না। তাব প্রতি ক্ষণই ভয়েব মধ্যে কাটে। সকলের মধ্যেই সে অবিশ্বাসেব গন্ধ পায়। আপন ধন-ভাণ্ডারের চাবি কাউকেই দেয় না, তাব মনে ভয় থাকে কেউ হযত তার ধন নিযে পালিয়ে যাবে। নিজেব ছেলেকেও সে চাবি দেবে না, কাবণ তার ভয় আছে যে, ছেলে ধন-ভাণ্ডারেব

চাবি পেয়ে গেলে তাকে আর মানবে না, তাকে তোয়াক্কা করবে না। সে তার স্ত্রীকেও চাবি দেবে না, কারণ সে ভাববে, চাবি দিলে মা ও ছেলে দুজনে মিলে তার দুর্দশা ঘটাবে, তাকে একেবারে হেনস্থা করে ছাড়বে। সুতরাং অন্তিম কাল পর্যন্ত সে কারও হাতে চাবি ছাড়বে না, কারণ তার যে ভয় থাকবে। এই ভয়ই প্রমাদ।

কেউ কেউ একেই জাগরূকতা বলে। কিন্তু গভীর ভাবে চিন্তা করলে দেখা যায় এই জাগরূকতার পশ্চাতে ভয়ই ক্রিয়া করছে। এর পরে এরা আমার সঙ্গে কেমন আচরণ করবে, এই রকম ভয়-মিশ্রিত চিন্তা যদি না থাকত, তবে এই প্রকার জাগৃতিও আসত না। এই জাগৃতির কারণই যে ভয়। কখনও কখনও আমি এরকম ঘরে বাস করেছি, যে ঘরের আলমারিতে লাখ টাকার টাকার মাল পড়ে থাকে। সে ঘরে কোন পাহারাদার নেই, চৌকিদার নেই, কেবল আমিই আছি। বাড়ির মালিক সুখে নিদ্রা যাচ্ছে। সে জেগে নেই, কারণ তার এই ভয় নেই যে, মুনি তার ধন বের করে নেবে। তার মনে কোন ভয় নেই, তাই সে জেগে থাকে না, সুখেই নিদ্রা যায়। যেখানে ভয় নেই, সেখানে পরম নিশ্চিন্ততা।

এক আশ্চর্য এই যে, লোকে এই ভেবে চলে যে, তারা পঞ্চাশ জন কি একশ জন—যেন তারা এই পঞ্চাশ কি একশ জন মিলে একই ব্যক্তি। অথচ তাদের প্রত্যেকের মনেই অপর প্রতিটির জন্য ভিন্ন ভিন্ন প্রকোষ্ঠ আছে। কোন ব্যক্তিই অপর ব্যক্তিকে মনের সব কথা খুলে বলে না, কাউকে কিছুটা বলে, অপর কাউকে আর কিছুটা, এই রকম। যে কোন পরিবারের কর্তাই সেই পরিবারের কোন সদস্যকে পরিবার-সংক্রান্ত সব খুঁটিনাটি বিষয় জানায় না, কাউকে খানিকটা জানায়, আর কাউকে আর খানিকটা জানায় —কিন্তু কাউকেই সবটা জানায় না। তার মনে ভিন্ন ভিন্ন প্রকোষ্ঠ আছে, সেখানে পৃথক পৃথক ভয়ও আছে। মূলে এ সবেরই উৎপত্তিস্থল ভয়। ভয় হলে জাগতে হয়, ভয় না থাকলে জাগার প্রয়োজন হয়

না। এই ভয় আবার উৎপন্ন হয় বাহ্য সম্পর্ক থেকে। বাহ্য সম্পর্ককেই নিজেব বলে মেনে নিয়েছি, তাই ভয় হয়—পাছে সেই সম্পর্ক টুটে যায। এই ভযেব জন্যই নানা প্রকার প্রমাদ এসে উপস্থিত হয।

এই বকম অবস্থায় অপ্রমাদের উপায় হল, একাকীত্বেব অনুভূতি। অবশ্য সমস্ত সম্পর্ক ছিন্ন করে কোন ব্যক্তি ব্যবহাবের ভূমিতে বাস করতে পারে না। আমি একথা বলছি না যে, ব্যবহারকে তুলে দিতে হবে। তা কোন ব্যক্তি করতে পারে না। ব্যবহার ত্যাগ করে কোন ব্যক্তি জীবন ধাবণ কবতে পারে না। সংসার ত্যাগ চলবে না। এই সব কথায় ব্যবহাব বন্ধ হবে না, বরং আরও মধুর হযে উঠবে। বাস্তবিকই যদি আপনি আপনার মধ্যে আপন একাকীত্ব অনুভব করতে পারেন তবে অনেক কঠিন অবস্থা থেকে বেঁচে যাবেন। আপনাকে চিন্তা আর দুঃখের শিকার হতে হবে না। অন্যেব ব্যবহার দেখে আপনি জড়িয়ে পড়বেন না, বা দুঃখী হবেন না। তখন আপনার নিজের ব্যবহাব অন্যের কাছে মধুব লাগবে। আপনার মস্তিষ্কে তখন যে চিন্তা-সূত্র ক্রিয়াশীল হবে তা হল—আমি একলা। যখন কোন সমস্যা আপনার সামনে আসবে তখন এই চিন্তাসূত্র ধরেই সমাহিত থাকবেন। সমস্যা আপনাকে পীড়িত করবে না। যে সমস্যা ষোল আনা ছিল, তা এক আনা মাত্র হযে যাবে। তা আপনি ব্যবহারেব ভূমিতে সমাধান করে নিতে পারবেন। যদি একাকীত্বেব এই আলম্বন-সূত্র আপনার কাছে না থাকে, তবে ছোট সমস্যাও বড় বলে মনে হবে। সহজে তার সমাধান হবে না। বস্তুত অপ্রমাদের সাধনা কি ব্যক্তিগত জীবন, কি ব্যবহারিক জীবন—দুই ক্ষেত্রেই সমান ভাবে লাভপ্রদ ; দুই ক্ষেত্রেই তা সমস্যার সমাধান হতে সক্ষম। এই সাধনা সমস্যা মোচন কবে, আবার আমাদেব এক পা এক পা করে এগিযে যেতেও সাহায্য করে।

আমরা সম্পর্কের সঙ্গে যুক্ত হই, আবার সম্পর্ক থেকে পালিযে যাই, সম্পর্ক এড়িযে যাই। যুক্ত হওয়া আর পালিযে যাওযা—এই দুই ব্যাপারই ঠিক। জুড়ে যাওয়া ভাল, ভেগে যাওযাও ভাল। সমূহের

মধ্যে থাকাও ভাল, একলা থাকাও ভাল। এদের মধ্যে কোন একটাই কেবল ঠিক, এমন বলা যাবে না। কারণ আমাদেব ব্যবহাবেব জীবন যাপন করতেই হয়। আমাদের ব্যবহারের একটা স্তর আছে—যেখানে আমাদের শবীর থাকে, আমাদেব জীবন থাকে। সে স্তব আমাদেব আবশ্যক তো বটেই। আমাদেব রুটি খেতে হয়, কাপড় পরতে হয়, ঘব বানাতে হয, ঘবে থাকতে হয—এ সবই তো আমাদের অপরিহার্য। এই পবিস্থিতিতে আমবা সম্পর্ক ত্যাগ করতে সমর্থ হব কি করে? সব সম্পর্কের সাহায্যই আমাদের নিতে হবে। কিন্তু যখনই আমরা বাস্তবিকতাব জগতে বাস কবি, প্রকৃত সত্যেব জগতে বাস কবি, যথার্থতার জগতে বাস কবি, তখনই আমবা প্রত্যেকে একলাই বাস করি। তখন আমাদের একলাই থাকতে হবে। অন্যথায় অনেক কঠিন ভার আমাদেব বহন কবতে হবে। এব কোন বিকল্প নেই।

আশ্চর্য ভিক্ষু ভাবি সুন্দর একটা কথা বলেছেন। তিনি বলেছেন, 'গণের মধ্যে থেকেও তুমি একলা থাক।' কথাটা স্ব-বিবোধী বলে মনে হতে পাবে। শাসনের অধীন থাকব, সমূহের মধ্যে থাকব, আবার একলাও থাকব—এ কেমন করে সম্ভব? হয সমূহের মধ্যে থাকতে হবে, নয একলা থাকতে হবে। একই সঙ্গে তো দু ভাবেই থাকা যায় না। কথাটাব মধ্যেই যে বিরোধ আছে। অসংখ্য সাধু-সাধ্বীর মধ্যে থাকব, আবার একলাও থাকব—কথাটা স্ব-বিবোধী তো বটেই। কিন্তু সেরকম মনে হলেও, কথাটার সত্যিই কোন বিবোধ নেই। তার তাৎপর্য বুঝতে হবে। তাৎপর্য এই যে, তুমি সংঘে থাক, তোমার সেবা অপর সাধুকে দাও, আবার আবশ্যক হলে তার কাছ থেকে সেবা নাও। তুমি তার সহযোগিতা কর, আব প্রয়োজনে তার সহযোগিতা প্রার্থনা কব। তুমি লোককে বোঝাও, উপদেশ দাও, তাদেব কাছ থেকে যা নেওযার আছে, তা নাও। কিন্তু কারও সঙ্গে গাঁটছড়া বেধো না, কাবও সঙ্গে দল বেধো না।

গণ মেঁ রহুঁ নির্দাব অকেলো,
কিণ্ সুঁ হী নহীঁ বাঁধুঁ কীলো।

'আমি গণে থেকেও একলা থাকব, কারও সঙ্গে গাঁটছড়া বাঁধব না, কাবও সঙ্গে দল বাধব না।' এই কথার তাৎপর্য, সহযোগের স্তরে তুমি একলাই থাক। আর যদি কেবল সমূহেব মধ্যেই থেকে যাও, সংগঠনের মধ্যেই থেকে যাও, তবে তোমার সাধনাও শেষ হযে যাবে। কেবল সংগঠনের ভার, সংগঠনের চিন্তা যদি তোমার মাথায় থাকে তো তোমার সাধনার সমাপ্তি ঘটবে। তোমাকে সাধনাও করতে হবে, আর তোমার আবশ্যকতা-পূর্তির জন্য সংগঠনকেও বাঁচিযে রাখতে হবে। এই দু দিক রক্ষা হলেই ব্যাপারটা সম্পূর্ণ হয। কেবল একলা থাকাই সব নয়, আবার কেবল সংগঠনের মধ্যে থাকাও সব নয। তেমনি কেবল পরিবারেব মধ্যে থাকাই সব নয়, আবাব কেবল একলা থাকাও সব নয়। যেখানে সুখ-সুবিধা, সহযোগ প্রভৃতি দেওয়া-নেওযার প্রশ্ন আছে, সেখানে ব্যক্তি পরিবারের মধ্যেই থাকে, সম্পর্ক জোড়া দেয় আর অনেকের মধ্যেই বেঁচে থাকে। যেখানে যথার্থতার অনুভব করা প্রয়োজন, সম্পর্ক থেকে উৎপন্ন জটিল সমস্যার সমাধান করা আবশ্যক, সেখানে একলা থাকতে হবে, একাকীত্বের বোধ দৃঢ় করতে হবে। এই দুই ভাব এক সঙ্গে মিললে জীবন পবিপূর্ণ ও অখণ্ডিত হয়। তখন আমরা আর এ পাড়েও জড়িযে যাব না, ও পাড়েও জড়িয়ে যাব না; দুই তটই পার হযে চলে যাব।

০

২৩

জ্ঞান ও সংবেদন

সংবেদন এবং অহং—উভয়ে সাথে সাথে চলে। রাজা শুনলেন নগরে এক শক্তিশালী সাধু এসেছেন। বড়ই বিচিত্র তাঁর কার্যকলাপ। হাজার হাজার লোক আসছে যাচ্ছে। ঘরে ঘরে তাঁর যশোগান। রাজা তাঁর কাছে নিজের লোক পাঠিয়ে প্রার্থনা জানালেন সাধুজী যেন রাজাকে একবার দর্শন দেন। সন্ন্যাসী বললেন—'আমি রাজার প্রাসাদে যেতে পারব না, রাজা যদি দর্শন করতে চান তবে এখানে এসে অনুগ্রহ করে দর্শন করুন।' প্রকৃতপক্ষে ক্ষুধা ছিল রাজার, সন্ন্যাসীর নয়। ক্ষুধিত লোকেরই ভোজ্যের কাছে আসতে হয়। পিপাসা ছিল রাজার, সন্ন্যাসীর নয়। পিপাসিত লোককেই পানীয়ের কাছে আসতে হয়। তখন রাজা স্বয়ং সন্ন্যাসীর কাছে গেলেন এবং তাঁকে রাজপ্রাসাদে নিয়ে এলেন। সন্ন্যাসী প্রাসাদে এক দিন থাকলেন, দুদিন থাকলেন, মাস ভোর থাকলেন। তিনি চলে যাবার নামও করেন না। রাজা ভাবলেন, 'এ কেমন? আমি কোন্ আপদ ডেকে আনলাম? আমি তো ভেবেছিলাম বনবাসী লোক, দু-এক দিন প্রাসাদে থেকে চলে যাবেন। কিন্তু তিনি তো এখান থেকে চলে যাবার নামও করেন না।' এক দিন রাজা সন্ন্যাসীকে বললেন, 'মহারাজ, চলুন আমরা বনে বেড়িয়ে আসি।' সন্ন্যাসী এবং রাজা ভ্রমণ করতে বের হলেন। তাঁরা চলতে

চলতে নগর থেকে বহু দূর গেলেন। রাজা বললেন, 'আমরা অনেক দূরে চলে এসেছি। এবার চলুন প্রাসাদের দিকে ফিরে যাই।' সন্ন্যাসী বললেন, 'আর প্রাসাদে ফিরে যাব কেন? আমি তো বনের দিকেই চলেছি।' তখন রাজা বললেন, 'মহারাজ, আপনিও প্রাসাদে থাকতেন আর আমিও প্রাসাদে থাকতাম। তবে আপনার আর আমার মধ্যে প্রভেদ কি আছে?'

সন্ন্যাসী বললেন, 'আমি প্রাসাদে ছিলাম, কিন্তু আমার মনের মধ্যে প্রাসাদ ছিল না, আর তুমি প্রাসাদে থাক, প্রাসাদ তোমার অন্তর অধিকার করে আছে। তোমার আমার মধ্যে এই প্রভেদ। আমি বনে থাকলেও প্রাসাদে অবস্থান করি, প্রাসাদে থাকলেও বনে বাস করি। আমি যখন বনে থাকি তখনও নিজের ভাবে নিমগ্ন থাকি, যখন প্রাসাদে থাকি তখনও নিজের ভাবে নিমগ্ন থাকি। আমার মনে আমার অন্তরে প্রাসাদ ছিল না। প্রাসাদে বাস করা বা বনে বাস করা আমার অন্তরের ব্যাপার নয়। আমার কাছে উভয়ই সমান। তোমার পক্ষে দুই-ই সমান নয়। তোমার কাছে জঙ্গল জঙ্গল এবং প্রাসাদ প্রাসাদ বটে।'

সম্পত্তি থাকা বা না থাকা—উভয়ের মধ্যে কোন প্রভেদ নেই। পার্থক্য কেবল অন্তরে, সম্পত্তির বোধ হওয়ায় এবং না হওয়ায়।

একবার গৌতম ভগবান মহাবীরকে জিজ্ঞাসা করেন—'ভন্তে, ছয় খণ্ডের অধিপতি চক্রবর্তী রাজা এবং সূক্ষ্ম জন্তু উভয়ে কি সমান?'

মহাবীর বললেন, 'হ্যাঁ, উভয়ে সমান।'

'ভন্তে, আপনার কথায় বড়ই আশ্চর্য বোধ করছি। দুই-ই সমান হতে পারে কি করে? কোথায় চক্রবর্তী সম্রাটের ঈশ্বর্য ও প্রভুত্ব আর কোথায় ক্ষুদ্র প্রাণীর জীবন!'

'গৌতম! রাজচক্রবর্তীর মধ্যে যতটা আকাঙ্ক্ষা আছে প্রাণীর মধ্যেও ততটাই আকাঙ্ক্ষা আছে। ঐশ্বর্য বা প্রভুত্ব থাকা বা না থাকা আলাদা প্রশ্ন, কিন্তু আকর্ষণের দৃষ্টিকোণ থেকে উভয়েই সমান। যতটা

আকর্ষণ চক্রবর্তী সম্রাটে আছে ততটাই আকর্ষণ প্রাণীতে আছে।' উভয়ের মধ্যেই অবিরতি সম পরিমাণে বিদ্যমান। যেখানে উভয়ের অবিবতিব সমতা সেখানে উভয়ে সমতাপ্রাপ্ত হয়েছে।' কি গূঢ় তাৎপর্য-পূর্ণ কথা। যখন সংবেদনা জাগ্রত হয তখন বাইরের জগতের সঙ্গে সম্পর্ক বৃদ্ধি পায। যখন সংবেদনাব সংহরণ হয তখন অন্তর্জগতের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপিত হয়। যখন মনেব সংবেদন বৃদ্ধি পায় তখন অহং উৎপন্ন হয। যদি মনে সংবেদন না থাকে তবে সম্পত্তি বা ঐশ্বর্যের পবিগ্রহ ঘটে না। যখন সম্পত্তিপবিগ্রহ ঘটে তখন মনে সংবেদনা জেগে উঠে।

দুটি ব্যাপার আছে—একটি জ্ঞানের ধাবা, অপরটি সংবেদনা। আমবা যেন জ্ঞানের ধারাকে জ্ঞানেব ধাবা রূপেই থাকতে দিই। আর চেতনার জ্যোতিবশ্মিকে যেন চেতনার জ্যোতিবশ্মি রূপেই সংবক্ষিত কবি। একেই বলে সাধনা, এরই নাম আত্মদর্শন। এরই নাম প্রকাশ। একেই আমাদেব জানতে হবে, মানতে হবে এবং এর মধ্যেই থাকতে হবে। তাতে কোনও অসুবিধা বা বিঘ্ন হবে না।

যখনই জ্ঞানেব ধারা সংবেদনার গুরুত্বাকর্ষণের ক্ষেত্রে এসে পড়ে তখনই তা সংবেদনায় পরিণত হয়। তাতে ভাব এসে যায, আর তা ভেতর থেকে বাইরেব দিকে প্রবাহিত হয়। অন্তরীক্ষযাত্রী যখন অন্তরীক্ষেব সীমার মধ্যে যাকে তখন সে ভারশূন্য। তখন সে কালের সীমাকেও লঙ্ঘন করে। কিন্তু যখন সে পৃথিবীব গুরুত্বাকর্ষণের সীমার মধ্যে চলে আসে তখন সে ভারি হযে যায় এবং কালের সীমার মধ্যে আবদ্ধ হযে যায। এই ভাবে যতক্ষণ আমাদেব চেতনার ধারা, আমাদের জ্ঞানেব ধারা, বিশুদ্ধ রূপে প্রবাহিত হতে থাকে ততক্ষণ পর্যন্ত তা সাধনা, তথা পবিত্রতা। যখনই তা হৃদযাবেগেব গুরুত্বাকর্ষণের ক্ষেত্রে প্রবেশ করে তখনই বাসনা, লোভ, বঞ্চনা, মান প্রভৃতি সমুদয় দোষ তাকে আচ্ছন্ন করে ফেলে।

সাধনার দৃষ্টিকোণ থেকে দুটি বিষয়ের ওপরে আমাদের ধ্যান

কেন্দ্রিত করা প্রয়োজন। প্রথম কথা হল, আমাদের চেতনাকে চেতনা রূপেই থাকতে দেব। আর দ্বিতীয় কথা—আমরা চেতনাকে সংবেদনায় পরিণত হতে দেব না। চেতনাকে চেতনা রূপে সংরক্ষণের প্রধান উপায়—শুদ্ধ উপযোগ। জ্ঞানকে জ্ঞানরূপে জানা ও দেখা, সহজ আনন্দকে অনুভব করা, অনন্ত শক্তিকে উপলব্ধি করা, এই চেতনাকে চেতনার পরিধির মধ্যে সংরক্ষণের রূপ। যেখানে রশ্মির পরিবর্তন ঘটে সেখানে চেতনারও পরিবর্তন ঘটে। তার মূল কারণ হৃদয়াবেগের গুরুত্বাকর্ষণ। চেতনার ওপরে হৃদয়াবেগের ভার পড়লে চেতনা আর চেতনা থাকে না। তা বিকৃত হয়ে যায়। আমাদের চেতনায় স্থিতির ক্ষণই আমাদের জাগরূকতার ক্ষণ। সেই ক্ষণই আমাদের সাধনার ক্ষণ, তথা আমাদের আত্মদর্শনের ক্ষণ। ঐ ক্ষণ আমাদের চেতনার অভিমুখী হওয়ার ক্ষণ। যখন চেতনা হৃদয়াবেগ দ্বারা ভাবগ্রস্ত হয় তখন বাসনা, বঞ্চনা তথা অহমের ক্ষণ। তখন আমাদের সামনে সমস্যা এসে যায়। সংবেদনা সমস্যা উৎপাদন করে। ভয়, ঘৃণা, বাসনা, লোভ, আবেগ সবই এক একটি সমস্যা। এ সমস্ত সমস্যার মূল—হৃদয়াবেগের গুরুত্বাকর্ষণ। তার অভাব হলে সমস্যার অভাব হয়, এবং চেতনা চেতনা রূপে স্থিত হয়।

দুই স্থিতি অত্যন্ত স্পষ্ট। এক চেতনার বিশুদ্ধ স্থিতি, চেতনার ভাবাবেগসম্বলিত স্থিতি। সাধকের জাগরূক থাকা প্রয়োজন। তার চেতনাকে চেতনার সীমার মধ্যে থাকতে দিতে হবে। সেটাই সাধনা। ঐ হল আত্মার উপাসনা। যে লোক চেতনাকে চেতনা রূপে থাকতে দিতে পারে সে ভাবাবেগের গুরুত্বাকর্ষণ থেকে বাঁচতে পারে। সে-ই বাস্তবে আপনার লক্ষ্যের দিকে এগিয়ে যেতে পারে।

২৪

জপ ও মৌনতা

দুটি লোক নদীর ধারে এল। তারা নদী পার হতে চায়। তারা দেখল নদীর কিনারায় একটি নৌকো আছে। একজন বলল—'নাবিক তো নেই, কিন্তু নৌকো পড়ে আছে। কাজেই আমরা নদী পার হতে পারব।' দ্বিতীয় জন বলল—'এরকম হওয়া সম্ভব নয়। নদী পার হতে হলে কেবল নৌকো থাকলেই যথেষ্ট নয়। নাবিকও চাই, দাঁড়ও চাই, নৌকো চালনার কৌশলও জানা চাই। এইসব হলে তবে নদী পার হওয়া সম্ভব হয়।' প্রথমজন বলল, 'এ রকম কি করে হতে পারে? জীবন-ভোর শুনছি নদী পার হতে হলে নৌকোয় চড়ে পার হও। নৌকো পড়ে আছে। অন্য কোন বস্তুর কি আবশ্যকতা আছে?' দ্বিতীয় লোকটি তাকে বোঝাল, কিন্তু সে তার কথা মানল না। সে নৌকো পাড় থেকে খুলল, তাতে একাই বসল। জলের এক ঢেউ এসে লাগল, আর নৌকো এগিয়ে চলল। নৌকো নদী পার হওয়ার উপায়, কিন্তু আজ ঐ যাত্রীর পক্ষে নৌকো তার ডোবার কারণ হল। যে পার হওয়ার উপায়, সে কখনও কখনও ডোবার কারণ হতে পারে। বাস্তবে যে পার করতে পারে এবং যে ডোবাতে পারে—দুই ভিন্ন নয়, একই হয়ে থাকে। যে তারক,

সে-ই নিমজ্জক আর যে নিমজ্জক, সে-ই তারক। বাস্তবে এ দুটি স্বতন্ত্র নয়। তাদের প্রভেদ সংযোগের প্রভেদ। নৌকো চলল, লোকটি শান্তভাবে বসে থাকল। জলের খুব তোড় ছিল, স্রোত প্রবল ছিল। নৌকোটি টলমল করে চলতে লাগল। কিছু দূর যাওয়ার পরে নৌকোটি উলটে গেল। আরোহী জলে ডুবে গেল।

নৌকো নদী পার করে দেয়, একথা ঠিকই বটে। কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে শুধু নৌকো, একলা নৌকোই, নদী পার করে দেয়। তার সাথে অন্য কোন কোন জিনিসের প্রয়োজন আছে। যে লোক এক অংশ আঁকড়ে ধরে কিন্তু অন্যান্য অংশকে উপেক্ষা করে, তার পক্ষে পারপারকারী ডুবন্ত হয়ে যায়।

ঠিক এই রকম ঘটনা আমাদের জীবনে ঘটে থাকে। আমরা জানি, ওঙ্কার বড় মন্ত্র। আমরা জানি, অহম মহত্বপূর্ণ মন্ত্র। 'নমো অরহন্তাণং' বড় মন্ত্র। এই মন্ত্র জপ করলে সর্ব কর্মে সিদ্ধিলাভ হয়। একথা ঠিক। তেমনি সত্য যেমন নৌকোয় উঠে বসলেই নদীর অপর পারে পৌঁছানো যায়, এ কথা সত্য। মন্ত্র জপ করে সর্ব বিষয়ে সিদ্ধিলাভ করবে। এ কথা যথার্থ। কিন্তু শুধু মন্ত্রকে গ্রহণ করে, তাকে বছরের পর বছর জপ করতে লাগলে, অথচ কিছু হল না, কিছুই অনুভব হল না, কোন কাজে সিদ্ধিলাভ হল না। এই রকম পরিস্থিতিতে লোকে বলে থাকে—এত বছর ধরে জপ করলাম, জপের মালা ঘোরালাম, কিন্তু কই চমকপ্রদ কিছু তো ঘটল না। কোন কিছুই লাভ হল না। অর্থাৎ এ নৌকো পার হওয়ার উপায় নয়। মনে হয় এর প্রচেষ্টা ডুবিয়ে দেওয়ার, এবং সে চেষ্টায় অনেকটা সফল হয়েছে। কেউ কেউ বলে—এতদিন ধরে আমরা বিশ্বাসের সঙ্গে মালা ঘোরালাম আর মন্ত্র জপ করলাম, অমুক অমুক অনুষ্ঠান করলাম, কিন্তু মনে হল কিছুই ফল হচ্ছে না। তাই আমরা মালা ঘোরানো, মন্ত্র জপ করা সব ছেড়ে দিয়েছি। মনে আর ঐ সবের ওপরে কোন বিশ্বাস নেই। তার অর্থ এই যে, ঐসব লোক মাঝ দরিয়ায়

এসে ডুবে যাচ্ছে। এ রকম কেন হয়? ঐ রকম হওয়ার কারণ হল আমরা সম্পূর্ণ তত্ত্ব জানি না, আয়ত্ত করার চেষ্টা করি না। আমাদের সম্পূর্ণ তত্ত্ব জানতে হবে, আয়ত্ত করতে হবে। মন্ত্রের মধ্যে শক্তি আছে একথা ঠিক। মন্ত্র তরাতে পারে, কিন্তু সব কিছুই মন্ত্রের দ্বারা হবে, এমন হয় না। তার সঙ্গে অন্য আরও কিছু চাই। সবার আগে আপনি এই কথা চিন্তা করে দেখুন মন্ত্রের সঙ্গে আপনার মনের সংযোগ হয়েছে কিনা। আপনি তো মন্ত্র জপ করে যাচ্ছেন, কিন্তু মন্ত্রের সঙ্গে আপনার মনের যদি সংযোগ না হয়ে থাকে তবে কোন ফল লাভ হবে না। অর্থাৎ নদী পার হওয়ার আগে, নৌকোয় বসার আগে, আপনাকে দেখতে হবে নৌকোয় নাবিক আছে কিনা। নাবিকও নেই আর আপনি নিজেও চালাতে জানেন না, সেক্ষেত্রে নিশ্চিত ভাবে বলা যায় নৌকো আপনাকে পার করতে পারবে না। মাঝ দরিয়ায় নিয়ে গিয়ে আপনাকে ডুবিয়ে দেবে। মন্ত্রে শক্তি আছে এ কথা যথার্থ, কিন্তু আপনার মন যদি তাতে সংযুক্ত না হয়, যদি মনের সঙ্গে তার কোন সংযোগ না ঘটে, যদি মন তার দিকে চালিত না হয়, সে মন্ত্র মনকে চালিত না করে বিভ্রান্ত করবে। আমাদের সম্পূর্ণ তত্ত্ব জানতে হবে। প্রথম তত্ত্ব হল, মনকে সংযুক্ত কর। মনোযোগ না করে যে কাজ করা যায় তা সম্পূর্ণ হয় না, অর্ধসমাপ্ত থেকে যায়। যে লোক খাচ্ছে তার মন যদি খাওয়ার সঙ্গে সংযুক্ত না হয় তবে তার খাওয়া অসমাপ্ত থেকে যায়। যে লোক চলছে তার মন যদি চলার সঙ্গে সংযুক্ত না হয় তবে তার চলা অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। সে অর্ধেক মন নিয়ে চলে, সম্পূর্ণ মন নিয়ে নয়। আপনি এই বিষয়ে চিন্তা করে দেখুন। আপনি কি সম্পূর্ণ মন দিয়ে খান? কখনই নয়। কখনও কি এমন হয় যে খাওয়ার সময়ে আপনি খান, আর কিছুই করেন না? চিন্তা করেন না, কিছু বলেন না বা ইঙ্গিত করেন না? আপনার মন কি সম্পূর্ণ রূপে খাওয়াতে লেগে থাকে? না, কখনই না।

খেতে খেতে আপনি অসংখ্য কাজ করেন। কোথা থেকে কোথায় চলে যান। কত যাত্রাই করেন। কত রকম কল্পনা করে ফেলেন। কত রকম পরিকল্পনা করেন। আপনি পুরো মন দিয়ে খান না, অর্ধেক মন দিয়ে খান। এর তাৎপর্য এই যে, মনের এক কোণ খাওয়ার কাজে যুক্ত থাকে, আর তার হাজার কোণায় আলাদা আলাদা কাজ হতে থাকে। চলার ব্যাপারেও সম্পূর্ণ মন চলার মধ্যে থাকে না। আপনি যখন চলেন তখন আপনার মনের এক ভাগ চলার সঙ্গে সহযোগিতা করে, চলাতে সংযুক্ত থাকে। আর তার বাকি হাজার ভাগ কে জানে কোথায় উড়ে বেড়ায়। মন্ত্র জপেরও একই ব্যাপার। সম্পূর্ণ মন দিয়ে মন্ত্র জপ কই হয়? মনের এক ভাগ মন্ত্র জপের সঙ্গে লেগে থাকে, আর অবশিষ্ট হাজার ভাগ অন্যান্য নানা রকম কল্পনায় ব্যস্ত থাকে।

এক শ্রাবক ভাই বলেন যে যখন আমি অন্যান্য কাজ করতে থাকি তখন আমার মন সাধারণত সেই সব কাজে সংলগ্ন থাকে। কিন্তু যখন মালা ঘুরিয়ে জপ করতে থাকি তখন দুনিয়ার যত কল্পনা দুর্বার গতিতে মনের মধ্যে আসতে থাকে। ঐসব কল্পনা মনের মধ্যে ভিড় করে।

সম্পূর্ণ মনঃসংযোগ করে আমরা কোন কাজ করতে পারি না। সাধনার ব্যাপারে ঐ তো আমাদের ঘাটতি। সাধনার অর্থ কি? সাধনা থেকে আপনারা আর কিছু শিখুন বা না শিখুন, এটা অন্তত শিখে রাখবেন, যে কাজই করতে হবে সেই কাজই সম্পূর্ণ মন দিয়ে করা উচিত, সমগ্রতার সঙ্গে করা উচিত, অর্থাৎ ঐ কাজে মনকে সমগ্র রূপে নিয়োগ করা কর্তব্য। মনকে এমন ভাবে নিয়োগ করা প্রয়োজন যাতে মনের সমস্ত অংশ ঐ কাজে পরিপূর্ণ হয়ে যায়। মনের কোন কোণা যেন শূন্য না থাকে, যাতে তা থেকে অপসরণ করার কোনও অবসর না থাকে। তার সামনে যদি কোন শূন্য স্থান না থাকে তো বেচারা পালাবে কোথায়? এই পরিস্থিতি

যদি প্রাপ্ত হওয়া যায় তাহলে সাধনায় সাফল্য লাভ হয়। আপনি একে সাধনার প্রাথমিক রহস্য বা অন্তিম সাফল্য যাই বলুন এই হল সাধনার একমাত্র রহস্য। এর তাৎপর্য এই যে সাধনা দ্বারা মনকে এ রকম প্রশিক্ষিত করতে হবে যে, তাকে যে কাজে আমরা লাগাতে চাইব সে সেই কাজেই লেগে যাবে। আমরা যে কাজে তাকে লাগাতে না চাই সে কাজে সে লিপ্ত হবে না। যদি মনের ওপরে এতটা প্রভুত্ব স্থাপিত হয় তাহলে আর কোন সমস্যা উৎপন্ন হবে না। পরন্তু আমরা নিজেদের মনের মালিক হয়ে যাব। আমরা যা চাই তাই করতে পারব, যেমন করে চাই তেমনি করে করতে পারব। আমাদের মন এমন অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে বিভক্ত যে আমরা তা গুণে শেষ করতে পারি না। এই খণ্ডিত মনই মানব জাতির সবচেয়ে বড় সমস্যা। ভগবান মহাবীর বলেছেন, 'অনেগদিস্তে খলু অয়ং পুরিসে'—মানুষ অনেক মন সম্পন্ন, সে একমনা নয়। তার অনেক মন। ঐ মন অনেক ভাবে খণ্ডিত। এই জন্য মানুষ কোন বিষয় পুরো মন দিয়ে চিন্তা করতে পারে না। যদি সে সম্পূর্ণ মন দিয়ে চিন্তা করতে লেগে যায় তবে নির্ঘাৎ তার নৌকো নদী পার হতে পারবে, তা ভিন্ন এ কাজ করা সম্ভব নয়।

সবার আগে দেখুন মন্ত্রের সাথে মনের সংযোগ হয়েছে কিনা। মনের সমগ্র শক্তি মন্ত্রের সঙ্গে আছে কি নেই। মন্ত্র আর মন দুটি ভিন্ন জিনিস।

তৃতীয় প্রশ্ন, আপনি মন্ত্রের অর্থ জেনেছেন কিনা। মন্ত্রের অর্থ জানা অত্যন্ত প্রয়োজন। যদি আপনি মন্ত্রের অর্থ না জেনে থাকেন তাহলে আপনি যা করতে চান তা করতে পারবেন না। যা হতে চান তা ঘটা সম্ভব হবে না।

পরিবর্তনই চিরন্তন সত্য। কোনও বস্তু শাশ্বত নয়, চিরস্থায়ী নয়। সব পরিণামশীল। পরিবর্তনই সত্য। সব জিনিসই বদলায়। পরমাণু নষ্ট হয় না। যা আকার বা সংস্থান বা রূপ তা স্থায়ী হতে পারে না। সবই পরিবর্তনশীল। সব কিছুই বদলায়। মানুষও বদলে যায়।

কেবল আত্মা শাশ্বত। তার কোন পরিবর্তন নেই। মানুষ বদলায়। সেইজন্য মানুষ যা হতে চায় সে তা হতে পারে। সেই রূপেই সে বদলে যেতে পারে। তার যা সঙ্কল্প হবে সেই রূপে সে বদলে যাবে। মানুষ জীবনের প্রথম ক্ষণ থেকে বদলাতে শুরু করেছে। প্রতি মুহূর্তে সে বদলাচ্ছে। পরিবর্তনের ক্রম বন্ধ হয় না। তার ফলে মানুষের সঙ্কল্পের অনুরূপ পরিবর্তন হয়। আর যদি সঙ্কল্প না থাকে তবে অন্য যে কোন রূপে বদলায়। সঙ্কল্প থাকলে সঙ্কল্প অনুযায়ী পরিণতি ঘটে।

আমাদের শরীরে যেসব কোষ আছে সেগুলি তার সংগঠনকারী মূল উপাদান। তাদের দ্বারা শরীর নির্মিত হয়। তাদের সংখ্যা অনেক। আমাদের শরীরে ষাট হাজার অর্বুদ কোষ আছে। আমাদের মস্তিষ্কে প্রতি বর্গ মিটারে এক কোটি কোষ আছে। শরীরের কোষ প্রতি মুহূর্তে নষ্ট হচ্ছে, প্রতি মুহূর্তে নতুন কোষ উৎপাদিত হচ্ছে। হাজার হাজার কোষ লোপ পাচ্ছে, আবার হাজার হাজার কোষ নতুন জন্মাচ্ছে। পুরনো কোষ ক্ষয়প্রাপ্ত হয়, নতুন কোষ সৃষ্টি হয়। এই পরিবর্তন-চক্র নিরন্তর আবর্তিত হচ্ছে। বয়স অনুসারে মানুষের শরীরের কোষগুলি যখন অতিশয় ক্ষীণ হয় এবং নতুন কোষ খুব কম জন্মে, তখন শরীর ক্ষীণ হয়, মস্তিষ্ক ক্রমশ দুর্বল হয়, ইন্দ্রিয়সমূহ নিস্তেজ হয়, মস্তিষ্কের নিয়ন্ত্রণ শিথিল হয়ে পড়ে। জোয়ান মানুষ নিজের শরীর, নিজের মনকে যেমন ইচ্ছা তেমনি ভাবে নিয়ন্ত্রিত করতে পারে। কিন্তু বুড়ো মানুষের নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষমতা ক্ষীণ ও শিথিল হয়ে যায়। তার কারণ ষাট বা সত্তর বছর বয়সে মানুষের মস্তিষ্কের ক্ষমতা শতকরা দশ ভাগ হ্রাসপ্রাপ্ত হয়। এত কোষের ধ্বংস হয় যে মস্তিষ্কের ক্ষমতা কমে যায়। এই হল মানুষের শরীরের ভেতরকার অবশ্যম্ভাবী পরিবর্তন-চক্র। আমরা একটি চিতা জ্বলতে দেখে ভয় পেয়ে যাই। বলে উঠি, 'ওরে। চিতা জ্বলছে, মৃতদেহ পুড়ছে।' আমরা যদি নিজেদের ভেতরে তাকাই তবে দেখতে পাব, এক নয়, হাজার চিতা নিরন্তর জ্বলছে। হাজার হাজার কোষের মৃত্যু হচ্ছে, হাজার হাজার কোষের জন্ম হচ্ছে।

জন্ম এবং মৃত্যু—দুই-ই এক সাথে চলছে। একটি দিকে শ্মশান, তো অন্য দিকে প্রসূতিগৃহ। এক দিকে চিতা সাজানো হচ্ছে, মৃতদেহ পুড়ছে, অন্য দিকে নতুন নতুন চেহারা জন্মাচ্ছে, সূর্যকিরণের প্রথম স্পর্শ পাচ্ছে। বিচিত্র এই শরীর। আমরা কেবল বাইরে থেকে একে দেখি। বাইরে থেকে আমরা শ্মশানও দেখছি, প্রসূতিগৃহও দেখছি। সদ্যোজাত শিশুকেও দেখছি, মৃত্যুকবলিত বৃদ্ধকেও দেখছি। সব কিছুই বাইরে থেকে দেখছি, কিন্তু ভেতর থেকে কিছুই দেখছি না। ভেতরে এক পরিবর্তনের চক্র চলছে। সমস্ত কিছু অনবরত বদলে যাচ্ছে। তবুও কি আপনার কোন পরিবর্তন হচ্ছে না? অবশ্যই হচ্ছে। ভেতরে প্রতি মুহূর্তে সংঘর্ষ চলছে। জন্ম এবং মৃত্যুর কাজ, সৃষ্টি এবং ধ্বংসের কাজ অবিরাম চলছে। এ সবই স্বাভাবিক ভাবে হতে থাকে। যদি আপনি সঙ্কল্প করেন তবে এই চক্রের পরিবর্তন ঘটাতে পারেন। অর্থাৎ আপনি যা হতে চান তাই হতে পারেন। এসব কিছুই ঘটে প্রাণের স্তরে।

দুই বস্তু আছে—আত্মা আর প্রাণ। এক আত্মশক্তি, অপর প্রাণশক্তি। এক হল প্রাণবল, অপর হল আত্মবল। আমাদের লক্ষ্য—আত্মোপলব্ধি। আমরা আত্মার মূল স্তর পর্যন্ত পৌঁছতে চাই, আত্মাকে পেতে চাই, মূল চেতনা পর্যন্ত পৌঁছতে চাই। এই হল আমাদের মূল লক্ষ্য। এর আগে আসে প্রাণ। প্রাণের স্থান এর আগে। আত্মা পর্যন্ত কে পৌঁছতে পারে? যে প্রাণবান, যে শক্তিশালী, সে-ই শুধু আত্মা পর্যন্ত পৌঁছতে পারে। যার ইচ্ছাশক্তি প্রবল সে আত্মা পর্যন্ত পৌঁছতে পারে। যার মনোবল তথা সঙ্কল্পবল ক্ষীণ, যার ইচ্ছাশক্তি তথা প্রাণশক্তি ক্ষীণ, যে বীর্যহীন সে কখনও আত্মাকে লাভ করতে সমর্থ হয় না। আত্মাকে লাভ করার জন্য প্রাণকে শক্তিশালী করা বিশেষ প্রয়োজন। যা জপের স্তর তাই প্রাণের স্তরে চলনশীল লোকের চলার পথ। তা প্রাণকে শক্তিশালী করে। প্রাণ আমাদের বিদ্যুৎশক্তি। সব প্রাণীর মধ্যেই এই শক্তি আছে। এমন কোন

প্রাণী নেই যার মধ্যে এই শক্তি অনুপস্থিত। আমাদের সমস্ত সক্রিয়তা চঞ্চলতা, উন্মেষ ও নিমেষ, কথা ও চিন্তা, গতি ও দীপ্তি, তথা আকর্ষণ—এ সমস্তই প্রাণের আধারে ঘটে, বিদ্যুৎশক্তির আধারে ঘটে। বিদ্যুৎ-শক্তি এ সমস্ত ক্রিয়া সম্পাদন করে। আমাদের শরীরে এই বিদ্যুৎ মজুত আছে। তাকে আমরা তৈজস শরীর বলতে পারি, প্রাণ বলতে পারি। বিদ্যুৎ বৃদ্ধি করার অর্থ, মনোবল বৃদ্ধি করা। যার বিদ্যুৎ তীব্র হয় তার মনোবল বৃদ্ধি পায়। যার বিদ্যুৎ ক্ষীণ হয় তার মনোবল হ্রাস পায়।

'মানুষের ব্রহ্মচর্য পালন করা বাঞ্ছনীয়'—এটা কেবল কথার কথা নয়। এর পেছনে মস্ত বড় রহস্য আছে। আমাদের ভেতরে একটি বিদ্যুতের প্রতিষ্ঠান বা পাওয়ার হাউস আছে। তার অবস্থিতি পৃষ্ঠরজ্জুর অন্তিম বিন্দুতে। পৃষ্ঠরজ্জু যেখানে হয় সেখানে একটি কেন্দ্র আছে। পেছনের দিকে কোমরের কাছে এই কেন্দ্র অবস্থিত। সেখানে বিদ্যুৎ শক্তি উৎপন্ন হয়। সেটি একটি বিদ্যুৎ-উৎপাদক যন্ত্র বিশেষ। যে ব্যক্তির বিদ্যুৎশক্তি ঊর্ধ্বগামী হয় অর্থাৎ ওপরের দিকে উঠতে থাকে সে বিপুল শক্তির অধিকারী হয়। ব্রহ্মচর্যের সাধনা দ্বারা লোকে নিজের ওজঃশক্তিকে ঊর্ধ্বগামী করে মস্তিষ্ক পর্যন্ত নিয়ে যায়। তার শক্তি বৃদ্ধি পায়। তার প্রাণ শক্তিশালী হয়। তার মনোবল দৃঢ় হয় এবং ব্যক্তির পরাক্রম এতটা স্ফুরিত হয় যে সে যা কল্পনা করে তাই সিদ্ধ হয়। প্রাণ গেলেও কখনও সে তার সঙ্কল্প থেকে চ্যুত হয় না। যার প্রাণধারা কামনা ও বাসনার ফলে নিচের দিকে প্রবাহিত হতে থাকে তার মনোবল কমে যায়, চেতনা ক্ষীণ হয়, সঙ্কল্প ভঙ্গ হয়, মন নিরাশয় হয়ে যায়। পদে পদে পদস্খলন ঘটে, কোন ক্ষেত্রে এগিয়ে যেতে পারে না। এই কারণে ব্রহ্মচর্য, বাক্যের সংযম, মনের সংযম এবং একাগ্রতার সাধনা, এ সমস্তই প্রাণশক্তিকে ঊর্ধ্বগামী করার উপায়। এতে মনোবল বৃদ্ধি পায় এবং ধৈর্য দৃঢ় হয়। এ অধ্যাত্ম নয়, কিন্তু অধ্যাত্মতে পৌঁছবার উপায়। ঠিক নৌকোর মত। এ সবই

নৌকো বিশেষ। এটা লক্ষ্য নয়, লক্ষ্যে পৌঁছবার উপায় মাত্র। আমাদের গতি কোন্ দিকে? এই সাধনার মাধ্যমে আমরা যেখানে পৌঁছতে চাই সেখানেই পৌঁছতে পারি। সঙ্কল্প করলাম, আর অধ্যাত্মের সাধনা হয়ে গেল—ব্যাপারটা ঠিক এ রকম নয়। যে ব্যক্তি লক্ষ্য স্থির করতে পারে, লক্ষ্য স্থির করতে জানে, সে-ই শুধু সংকল্প করার অধিকারী। শিকারী যে লক্ষ্য সন্ধান করে তাতে তার সঙ্কল্প করতে এবং একাগ্র হতে হয়। শিকারীর কি একাগ্রতার অভাব হয়? লক্ষ্যভেদ প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণকারীর কি একাগ্রতার অভাব হয়? তাদের একাগ্রতার অভাব হয় না। সম্পূর্ণ একাগ্রতা হলে তবে লক্ষ্য-বস্তুতে তীর লাগতে পারে। যোদ্ধাদেরও সঙ্কল্প প্রয়োজন হয়। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে চার্চিল সঙ্কল্পের প্রতীকস্বরূপ 'ভি' চিহ্ন দিয়েছিলেন। তিনি প্রত্যেক যোদ্ধাকে বলেছিলেন, 'ভি'-কে আপনি সর্বদা মনে রাখবেন। আমরা জিতব।' ঐ 'ভি' জেতার দৃঢ় সঙ্কল্পের চিহ্ন। সৈনিকের যতটা দৃঢ় সঙ্কল্প, সাহস ও একাগ্রতা হতে পারে অন্য লোকের তা হতে পারে না। এখন প্রশ্ন হতে পারে এই সঙ্কল্প, সাহস ও একাগ্রতা কি আত্মোপলব্ধি? তা কি অধ্যাত্ম? তা নয়। ওটা উপায় মাত্র। সঙ্কল্প, ইচ্ছাশক্তি, প্রাণশক্তি, মনোবল, একাগ্রতা—এ সবই এক একটি উপায়। এখন এই সাধনকে আমি কোন্ দিকে নিয়ে যাচ্ছি, কোন্ দিকে প্রবাহিত করছি সেটা উদ্দেশ্যের ওপরে নির্ভর করে। আত্মার দিকে এগিয়ে যাওয়ার জন্যও এর ব্যবহার হতে পারে। আত্মার অভিমুখে এর প্রয়োগ হতে পারে। এ সাধন মাত্র, অর্থাৎ উপায় বা উপকরণ মাত্র। আপনি তাকে কোন্ দিকে প্রয়োগ করবেন তা আপনার উদ্দেশ্যের ওপরে নির্ভর করে।

জপও এক সাধন। তা সাধন বা উপায়, সাধনার উদ্দেশ্য বা সাধ্য নয়। জপ প্রাণশক্তির এক প্রকার প্রয়োগ মাত্র। এতে শব্দ এবং মন দুয়ের সংযোগ হয়। শব্দ এবং মনের সমুচিত যোগ হলে এক বিশেষ শক্তি উৎপন্ন হয়। আমরা কথা বলি। কথা বলার সঙ্গে সঙ্গে

বিদ্যুতের তরঙ্গ উৎপন্ন হয়। আমরা চিন্তা করি। আমাদের চিন্তার সাথে সাথে বিদ্যুতের তরঙ্গের উদ্ভব হয়। এই সব বিদ্যুৎ-তরঙ্গের বিস্ময়কর প্রভাব হয়।

রঙ, শব্দ, মন এবং উচ্চারণ—এই চার মুখ্য বস্তু। আমার চিন্তন তথা আমার জীবনের সঙ্গে রঙের গভীর সম্বন্ধ। রঙ দ্বারা চিকিৎসার পদ্ধতি আজও প্রচলিত আছে। 'কালার থেরাপি' বা বর্ণ চিকিৎসা এখনও চালু আছে। এক চিকিৎসা পদ্ধতির নাম 'কসমিক রে থেরাপি' বা বিশ্বকিরণ চিকিৎসা। এরও রঙের সঙ্গে সম্বন্ধ আছে। রঙ এবং সূর্যকিরণ উভয়ের সাথে এর সম্বন্ধ আছে। সূর্যের আলোর সঙ্গে এর সম্বন্ধ। রঙ আমাদের শরীর এবং মনকে নানা ভাবে প্রভাবিত করে। তাতে রোগ সারে, তা সে রোগ শারীরিক বা মানসিক যাই হোক। মানসিক রোগের চিকিৎসাতেও রঙের বিশিষ্ট স্থান আছে। উন্মাদ রোগেরও রঙের মাধ্যমে চিকিৎসা হতে পারে। রঙের সামান্য বিকৃতি হলে মানুষ পাগল হয়ে যেতে পারে। রঙের পূর্তি হলে লোক সুস্থ হয়। শরীরে রঙের ঘাটতি হলে অনেক রোগের উৎপত্তি হয়। 'কালার থেরাপি' বা বর্ণ চিকিৎসা পদ্ধতির সিদ্ধান্ত এই যে, জীবাণু থেকে রোগের উৎপত্তি হয় না। রঙের ঘাটতি থেকেই রোগের জন্ম হয়। যে রঙের ঘাটতি হয়েছে তাকে পূরণ করে দাও, রোগী সুস্থ হবে, রোগ নিরাময় হবে। রোগ হওয়া বা না হওয়া, মানুষের সুস্থ থাকা বা না থাকা, সবই রঙের আধারে ঘটে।

আমাদের চিন্তার সাথেও রঙের সম্বন্ধ আছে। যখন মানুষের মন কুচিন্তা বা অনিষ্টকর চিন্তায় পূর্ণ, যখন সে অশুভকর চিন্তা করে, তখন ঐ সব চিন্তার পরমাণু কৃষ্ণ বর্ণ হয়। তার লেশ্যা বা কর্মবন্ধনের কারণ কৃষ্ণ বর্ণ হয়। যদি সে সৎ, হিতকারী বা শুভ চিন্তা করে তবে তার পুদ্গল হলুদ রঙের হতে পারে, আবার লাল বা সাদাও হতে পারে। তখন তেজোলেশ্যা, পদ্ম লেশ্যা বা শুক্ল লেশ্যা হতে পারে। অসৎ চিন্তার পুদ্গলের বর্ণ কালো, সৎ চিন্তার পুদ্গলের বর্ণ হলুদ, লাল

বা সাদা। চিন্তার সঙ্গে বর্ণের কত বড় সম্বন্ধ। যে রকম চিন্তা তার সেই রকম রঙ।

শরীরের সঙ্গে রঙের গভীর সম্বন্ধ। প্রত্যেক লোকের শরীরের আশেপাশে রঙের এক আভামণ্ডল আছে। তাতে অনেক রঙ হতে পারে। কারও আভামণ্ডলের রঙ কালো, কারও নীল, আবার কারও লাল বা সাদা হয়। আবার কারও নানা রঙের আভামণ্ডল হতে পারে। আপনার চোখ সে রঙ দেখতে পায় না। কিন্তু তা অবশ্যই আছে। এমন কোন লোক নেই যার চারপাশে আভামণ্ডল নেই। মানুষের আভামণ্ডলের প্রভাব হয় তার নিজের ওপরে। আবার অন্যের ওপরেও প্রভাব হয়। আপনি কোন লোকের কাছে গিয়ে বসেন। বসার সঙ্গে সঙ্গে আপনার মনে এক পরিবর্তন হয়। আপনার মনে হয় আপনি এক অপূর্ব শান্তি অনুভব করছেন। আপনার মন আনন্দময় হয়, আর আপনার অন্তরের অন্তঃস্থলে এক মধুর সঙ্গীত হতে থাকে। আপনি অন্য এক লোকের কাছে গিয়ে বসেন। অকারণে আপনার মন উদাস ও উদ্বিগ্ন হয়ে পড়ে। মনের মধ্যে ক্ষোভ ও সন্তাপের উদ্ভব হয়। সেখান থেকে তাড়াতাড়ি উঠে যাবার ইচ্ছা হয়। এসব কেন হয়? ভিন্ন ভিন্ন লোকের পাশে বসলে ভিন্ন ভিন্ন রকম ভাবনা দ্বারা আমাদের মন আক্রান্ত হয়। এ রকম কেন হয় এবং কি করে হয়? এর কারণ হল, প্রত্যেক লোকের নিজ নিজ আভামণ্ডল বা আভাবলয় আছে। সামনে যিনি বসে আছেন তাঁর আভামণ্ডল বা আভাবলয়ের যে রঙ তার দ্বারা পাশে যে লোক বসে আছে সে প্রভাবিত হবে। সে ইচ্ছা করুক বা না করুক, সে সেই রঙ দ্বারা প্রভাবিত হবে। যে লোকের আভামণ্ডল সাদা, লাল, নীল বা হলুদ বর্ণের, তার পাশে এসে বসলে মন শান্ত হয়ে যায়। শান্তিতে অন্তর পূর্ণ হয়। যার আভামণ্ডল বিকৃত, কৃষ্ণবর্ণ পুদ্গলে নির্মিত, তার কাছে এলে মন অকারণ দুশ্চিন্তায় ভরে ওঠে, উদাস ভাব ও উদ্বেগে পূর্ণ হয়, আর মনের মধ্যে ঈর্ষা-দ্বেষ-অসৎ ভাবনা আসতে থাকে। এ থেকে স্পষ্ট বোঝা যায়, রঙ আমাদের প্রভাবিত

করে থাকে।

এক হল রঙ, আর এক শব্দ। আমাদের জীবনে শব্দের প্রভাব পড়ে। মনের ওপরেও শব্দের প্রভাব হয়। শব্দের স্থূল প্রভাবের সঙ্গে আমাদের পরিচয় আছে। একবার স্বামী বিবেকানন্দকে এক ব্যক্তি বলেছিল, 'শব্দ নিরর্থক। তার প্রভাব বা অপ্রভাব বলে কিছু নেই। তা নির্জীব পদার্থ।' বিবেকানন্দ শুনলেন, কিছুক্ষণ মৌন থেকে তিনি বললেন—'তুমি নির্বোধ। বসে থাক।' যাকে এ কথা বললেন সে রেগে আগুন হয়ে গেল। তার চেহারা বদলে গেল। তার চোখ লাল হয়ে গেল। সে বলল—'আপনি এত বড় সাধু হয়ে আমাকে গাল দিলেন। কি কথা ব্যবহার করছেন তাও ভেবে দেখলেন না।' বিবেকানন্দ মুচকি হেসে বললেন—'তুমি এখনি বলছিলে, শব্দের আবার কি প্রভাব। এখন নিজে এক 'নির্বোধ' কথাটিতে এই পরিমাণ প্রভাবিত ও ক্রুদ্ধ হয়েছ!'

শব্দের ভেতরে শক্তি আছে। তা মানুষকে প্রভাবিত করে। আমি এতক্ষণ তার স্থূল প্রভাবের কথা বললাম। শব্দের অনেক সূক্ষ্ম প্রভাব আছে। আজকাল শব্দের দ্বারা চিকিৎসা হয়ে থাকে। শব্দের দ্বারা অপারেশন করা হয়। অপারেশনের জন্য কোন অস্ত্রের প্রয়োজন হয় না। কোন উপকরণের প্রয়োজন হয় না। শব্দের সূক্ষ্ম তরঙ্গ আসে, আর তার সাহায্যে চেরা-ফাঁড়ার কাজ হয়। শব্দের দ্বারা, সূক্ষ্ম ধ্বনির দ্বারা, কাপড় ধোলাই হয়। সূক্ষ্মতম ধ্বনির দ্বারা হীরা কাটা হয়। আগেকার দিনে বলা হতো হীরে দিয়ে হীরে কাটা হয়। এই সিদ্ধান্ত সবাই মানত। আজকাল সূক্ষ্ম ধ্বনির সাহায্যে হীরা কাটা হয়। যন্ত্র ঘুরতে থাকে, ধ্বনির সূক্ষ্ম তরঙ্গ নির্গত হতে থাকে এবং ক্ষণকালের মধ্যে হীরা কাটার কাজ সম্পন্ন হয়। এই হল শব্দের চমৎকারিতা। জপ এবং মন্ত্রের চমৎকারিত্ব এর থেকেও বেশি।

শব্দের উচ্চারণ ছয় রকম হতে পারে। যথা—হ্রস্ব, দীর্ঘ, প্লুত, সূক্ষ্ম, অতি সূক্ষ্ম এবং পরম সূক্ষ্ম। মন্ত্রবিদ আচার্যগণ বলেন, শব্দের হ্রস্ব

উচ্চারণ পাপ নাশ করে। দীর্ঘ উচ্চারণে শ্রীবৃদ্ধি ও স্ত্রী লাভ হয়, আর প্লুত উচ্চারণে জ্ঞানবৃদ্ধি হয়। আরও তিন প্রকার উচ্চারণ আছে—সূক্ষ্ম, অতি সূক্ষ্ম এবং পরম সূক্ষ্ম। ওগুলি শুভ সমাপ্তি আনে, ব্যক্তির সঙ্গে ধ্যেয়ের সংযোগ করে। আপনি দৃষ্টান্তস্বরূপ 'অর্হ' শব্দটি নিন। ঐ কথাটি আপনি উচ্চারণ করেন। তার এক হ্রস্ব উচ্চারণ, এক দীর্ঘ উচ্চারণ হয়। আর আছে প্লুত উচ্চারণ। আবার সূক্ষ্ম, অতি সূক্ষ্ম এবং পরম সূক্ষ্ম উচ্চারণও হয়। পরম সূক্ষ্মে এসে আপনি অনুভব করেন আপনি লক্ষ্যে পৌঁছে গিয়েছেন, অর্হৎকে অনুভব করতে শুরু করেছেন। এই ছয় প্রকার উচ্চারণের প্রভাব বিভিন্ন রকম হয়। শব্দের ছয় প্রকার শক্তি আমাদের জানতে হবে। শব্দের অর্থ আর তার উচ্চারণ জানতে হবে।

চতুর্থ বস্তু হল মন। মনের সঙ্গে শব্দের সংযোগ করতে হবে। যে শব্দ আমরা জপ করছি তার সাথে মনের সংযোগ করতে হবে। এ সবের সমুচিত সংযোগ হলে জপের শক্তি উৎপন্ন হয়। কেবল নৌকো দিয়ে কাজ হবে না। কেবল মালা ঘোরালেই কোন কাজ হবে না। নৌকো দিয়ে নদী পার হতে হলে নৌকো ছাড়া আর কি কি জিনিস দরকার তা আমাদের জানতে হবে, বুঝতে হবে। জপের সঙ্গে আর কি কি বস্তু প্রয়োজন তাও আমাদের বুঝতে হবে। 'ণমো অরহন্তানং' অতিশয় শক্তিশালী মন্ত্র—এ কথা খুবই সত্যি, কিন্তু তার উচ্চারণ যদি ঠিক না হয় তবে ঐ মন্ত্র কি করে ফল দেবে? তার উচ্চারণ কি উদ্দেশ্যে কি রকম হওয়া উচিত তা যতক্ষণ আমরা জানতে না পারি সে পর্যন্ত আমাদের অজ্ঞতা ও দোষের জন্য আমরা মন্ত্র এবং জপ থেকে লাভবান হতে পারি না, অথচ আমরা সমস্ত দোষ মন্ত্র ও জপের ওপরে চাপিয়ে দিই। আমরা বলে বসি—'মন্ত্র থেকে কোন ফল হয় না।' শব্দের উচ্চারণের ধ্যেয়কে বোঝা অত্যন্ত প্রয়োজন। এই সমস্ত জিনিস জপের জন্য অত্যন্ত আবশ্যক।

জপের স্বরূপ কি? ধ্যেয়ের সাথে এক হয়ে যাওয়া হল জপ।

মহর্ষি পতঞ্জলি চিত্তবৃত্তিনিরোধকে ধ্যান বলে স্বীকার করেছেন। চিত্তের বৃত্তিসমূহের নিরোধ ধ্যান। ধ্যানের সম্বন্ধ চিত্তের সঙ্গে। জৈন আচার্য বলেছেন—'ধ্যান 'ত্রিবিধম্', অর্থাৎ ধ্যান তিন প্রকার—কায়িক ধ্যান, বাচিক ধ্যান এবং মানসিক ধ্যান। এ এক নতুন দৃষ্টিভঙ্গি, নতুন পরম্পরা। শরীরের শিথিলীকরণ, শরীরের স্থিরতা, তার নাম—কায়িক ধ্যান। বচনকে ধ্যেয়ের সঙ্গে যোগ করা, বচন এবং ধ্যেয় উভয়ের সমন্বয় ঘটানো, একত্ব সাধন করার নাম বাচিক ধ্যান। বাচিক ধ্যান বচনের মাধ্যমে হয়। বচনের মাধ্যমে আমরা এমন একাগ্রতা প্রাপ্ত হই, ধ্যেয় বস্তুতে এত লীন হয়ে যাই যে আমরা এবং আমাদের ধ্যেয়ের মধ্যে কোন ভেদ থাকে না।

আপনি 'ণমো অরহন্তাণং' এই মন্ত্র জপ করেন, কিন্তু যত দিন ঐ মন্ত্র আপনার মস্তিষ্কে যথার্থ প্রতিষ্ঠিত না হবে, আর যত দিন আপনার এ রকম অনুভূতি না হবে যে, 'আমি স্বয়ং অর্হতে পরিণত হচ্ছি' ততদিন পর্যন্ত 'ণমো অরহন্তাণং' এই মন্ত্র থেকে আপনার ফলপ্রাপ্তি হবে না। হ্যাঁ, এটুকু লাভ অবশ্যই হবে, উচ্চারণ দ্বারা যে তরঙ্গ উৎপন্ন হয় তার দ্বারা প্রাণশক্তির কিঞ্চিৎ বিকাশ হবে। কিন্তু জপের দ্বারা আপনারা অর্হৎ রূপে যে পরিণতি আনতে চেয়েছিলেন, যে পরিণাম চেয়েছিলেন, তা সম্ভব হবে না। এই বড় লাভ থেকে বঞ্চিত হয়ে আপনি সামান্য লাভ প্রাপ্ত হবেন। অনেক বার এ রকম হয়—আমরা মহৎ ধ্যেয়কে উদ্দেশ্য করে চলতে থাকি, মহৎ বস্তু সামনে রেখে চলতে থাকি, কিন্তু এর মধ্যে ছোটখাটো লাভ প্রাপ্ত হলে আমরা মনে করি আমাদের উদ্দিষ্ট লাভ মিলেছে। এটা মস্ত আশঙ্কার কথা। বিকাশের পথে এই বিপদের আশঙ্কা। আমরা মহৎ উদ্দেশ্য সামনে নিয়ে চলতে থাকি। আত্মোপলব্ধি সবচেয়ে বড় উদ্দেশ্য, সেই আদর্শ নিয়ে আমরা চলি। মাঝখানে সামান্য কিছু পেয়ে যাই। তাকেই সব কিছু মনে করে আমরা এগিয়ে যাওয়ার চেষ্টা ছেড়ে দিই। এই সামান্যতেই আমরা সন্তুষ্ট হয়ে থাকি। এই সন্তোষ সমূহ আশঙ্কার কারণ। আমাদের সন্তুষ্ট হওয়া

উচিত নয়। পথ চলতে চলতে মিলে যাওয়া সাথীর মত এই সব ছোট-খাট পাওয়াগুলি আমাদের সাধনার পথে যাত্রাসহচর মাত্র। এক সাথী মিলল। তার সঙ্গে রাতভোর পান্থশালায় থাকলাম, আলাপ করলাম, মনোরঞ্জন করলাম। যদি আমরা তাকে আমাদের গন্তব্যস্থল মনে করে সেখানেই থেকে যাই তবে আমরা কোনদিনই আমাদের উদ্দিষ্ট স্থানে পৌঁছতে পারব না। এই হল সাধনার পথে বিষম বিপদ। এ সমস্তই প্রাণবিদ্যার খেলা, এরা মধ্যপথে প্রাপ্ত সহযাত্রী মাত্র। মধ্যপথে এসে আমাদের সাথে এরা মিলিত হয় এবং মনোরঞ্জন করে। কিন্তু ওগুলি আমাদের অভীষ্ট প্রাপ্তি নয়।

আমাদের ধ্যেয় হবে অর্হতে পরিণত হওয়া। অর্হৎ বীতরাগ বা নিরাসক্ত। যার মধ্যে সমস্ত অর্হতা, ক্ষমতা, শক্তি ও যোগ্যতা বিকশিত হয় সে-ই অর্হৎ হতে পারে। তার মধ্যে অবিকশিত কোন কিছু থাকে না। এই আত্মোপলব্ধির নাম—অর্হৎ। আমাদেরও অর্হৎ হতে হবে। এই জন্যই আমরা 'ণমো অর্হন্তাণং' এই মন্ত্র জপ করে থাকি। এই মন্ত্র জপ করার আগে আমাদের মনে এই ভাবনা, এই সঙ্কল্প হওয়া প্রয়োজন যে 'আমি অর্হৎ, আমি অর্হৎ'। আর জপ করার সময় আমাদের মনে এই ধারণা হওয়া প্রয়োজন যে 'আমি অর্হতে পরিণত হচ্ছি, আমি অর্হতে পরিণত হচ্ছি।' এই ধারণা, এই ভাবনা করে নিতে হবে। তার পরে আমরা 'ণমো অর্হন্তাণং' এই মন্ত্র জপ করতে পারব। আমি অর্হৎকে নমস্কার করছি না, আমি নিজেই অর্হতে পরিণত হওয়ার পথে অগ্রসর হচ্ছি। অর্হতের সম্পূর্ণ মূর্তিচিত্র এমনভাবে আমাদের মস্তিষ্কে স্থিরভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়ে যাবে, আর তার আশেপাশে আমাদের ধ্বনি চলতে থাকবে এবং সেই শব্দ-তরঙ্গ বাস্তবে অর্হতের রূপে আমাদের পর্যায়ের পরিবর্তন ঘটাতে শুরু করবে। আমি অর্হতের রূপে বদলে যেতে থাকব আর কিছু দিনের মধ্যেই জানতে পারব যে রাগ, দ্বেষ ও বাসনা কমে যাচ্ছে, অর্হতা জেগে উঠছে, শক্তিসমূহ বিকশিত হচ্ছে। তখন বুঝতে হবে জপ সম্যক ভাবে হচ্ছে। সব

কিছু সামগ্রী পাওয়া গেছে। নৌকো আছে, নাবিক ও দাঁড়ি পাওয়া গেছে। সমস্ত উপকরণ পাওয়া গেছে। নৌকো ঠিক খেয়া পার করছে। যদি উপকরণের কোন ঘাটতি বা বিফলতা থাকে, এবং আপনি জপের দোষ দিতে থাকেন, তবে জপ আপনাকে পেছনে ফেলে চলে যাবে।

২৫

একাগ্রতা

যাঁরা সাধনা করেন তাঁরা ধ্যেয়কে কল্পনা করে নিয়ে মনকে তার সঙ্গে সংলগ্ন করেন। মনকে এমন দৃঢ়ভাবে তার সঙ্গে সংযুক্ত করেন, যাতে ঐ সংযোগ কোনক্রমে শিথিল না হয়। যদি কখনও কখনও মন ধ্যেয় থেকে বিচ্যুত এবং বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়, যদি তার সামনে কোন বিকল্প এসে যায়, তবে জাগরূক সাধক মনকে তা থেকে বিচ্ছিন্ন করে নিয়ে তাঁর সমগ্র শক্তির দ্বারা ধ্যেয়ের দিকে চালিত করেন। তখন মন ধ্যেয়ের সঙ্গে সংযুক্ত হবে। এই ধারাবাহিক জ্ঞান একই দিকে একই ধ্যেয়ের উদ্দেশ্যে চালিত হবে। সর্বদা নিরবচ্ছিন্নভাবে চলতে থাকবে। মধ্যপথে যদি কোনও ছেদ ঘটে তবে তখনই সংযোগ স্থাপন করতে হবে। এই হল মনের সমাধি, এর নাম মনের একাগ্রতা। যখন এই একাগ্রতায় আমরা সিদ্ধ হই তখন ঐ অবস্থায় স্থিতিকালে আমরা বিভিন্ন সূক্ষ্ম দৃশ্যের আভাস পাই। অনেক রকম সূক্ষ্ম বস্তু দেখতে পাই। জ্যোতির দর্শন হয়। সূক্ষ্ম লোকে বিচরণকারী আত্মার দর্শন মেলে। স্থূল জগতের অতীত অনেক প্রকার শব্দ শোনা যায়। স্থূল জগতের অতীত রূপ দেখা যায় এবং অনুভূতি লাভ হয়। আমাদের অনুভূতির জগৎ বদলে যায়। এই রকম স্থিতিতে আনন্দের অনুভূতি হয়।

কিন্তু তা কোন উৎকৃষ্ট সফলতা নয়, কিংবা চরম সমাধি নয়। তবে তা আত্মবিকাশের দিকে আমাদের এক পদক্ষেপ। সেখানে পৌঁছলে মন আর ফিরে আসতে চাইবে না। মন আর নিচে নেমে আসতে চাইবে না। এটা নিশ্চিত সত্য।

ঐ স্থিতি প্রাপ্ত হলে উৎক্রমণ হতে থাকে। আমাদের জীবনে পরিবর্তন ঘটতে থাকে। ভক্ত রুইদাস মস্ত বড় সাধু ছিলেন। জাতিতে তিনি ছিলেন চামার। তিনি পরম আত্মজ্ঞানী সাধক ছিলেন। তিনি কাশীতে বাস করতেন এবং নিজে নিজেই সাধনা করতেন। তিনি ছোট এক ঝুপড়িতে থাকতেন। তাঁর স্ত্রী ছিল এবং ছোট একটি পরিবার ছিল। তিনি জুতো সেলাই করতেন এবং তা থেকে যা পেতেন তাই দিয়ে তাঁর সংসার চলত। ঐ কাজ থেকে যখনই নিবৃত্ত হতেন তখনই সাধনায় নিমগ্ন হয়ে যেতেন। একদিন এক সাধু রুইদাসের সঙ্গে দেখা করতে এলেন। তিনি রুইদাসের তত্ত্বজ্ঞান ও প্রসিদ্ধি সম্বন্ধে অনেক কথা শুনেছিলেন। এসে তিনি দেখে ভাবলেন—'আরে। ইনি এমন দরিদ্র অবস্থায় থাকেন। এত বড় সাধু, অথচ এত দরিদ্র। এ রকম ফুটোফাটা ঝুপড়িতে থাকেন আর জুতো সেলাই করেন। এঁর কাছে কিছুই নেই।' তিনি রুইদাসের সঙ্গে দেখা করলেন। তাঁর পা ছুঁয়ে প্রণাম করে বললেন—'মহারাজ। আমি আপনাকে কিছু ভেট দিতে এসেছি। আপনার অবস্থা দেখে আমার প্রাণ কাঁদছে। আমি আপনাকে এই পরশ পাথর দিচ্ছি। আপনি এটি গ্রহণ করুন। আপনি এরকম হীন অবস্থায় আর থাকবেন না, সচ্ছল অবস্থায় জীবনযাপন করুন।' রুইদাস বললেন—'ভাই। আমার পরশ পাথরের কোন প্রয়োজন নেই। আমি বেশ ভাল অবস্থায় আছি। আমার কোন অভাব নেই। জীবনধারণের জন্য যা প্রয়োজন সে সবই আমার আছে। আমার মনে পূর্ণ সন্তোষ আছে। যার মনে অসন্তোষ আছে তাকে ঐ পরশ পাথর দাও। আমি পূর্ণ সন্তুষ্ট। আমার পরশ পাথরের কোন প্রয়োজন নেই।'

সাধু পরশ পাথর তাঁকে দেওয়ার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করতে লাগলেন। রুইদাসও 'না, না' করতে লাগলেন। তিনি নেবেন না, আর সাধুও পরশ পাথর তাঁকে না দিয়ে সেখান থেকে যাবেন না। দুজনের মধ্যে অনেকক্ষণ ধরে জেদাজেদি হতে থাকল। শেষমেষ রুইদাস বললেন—'বেশ, তোমার যখন এতই আগ্রহ তখন ঐ পরশ পাথর এই ঝুপড়ির চালায় কোথাও গুঁজে রেখে যাও।' সাধু চালায় পরশ পাথর গুঁজে দিয়ে চলে গেলেন।

রুইদাসের জীবনের ধারা ঠিকই চলতে থাকে। তাঁর লালসাও ছিল না, আকাঙ্ক্ষাও ছিল না। জীবনযাত্রার জন্য যা প্রয়োজন তা তাঁর ছিল। তাঁর কোনও অসন্তোষ ছিল না। তাঁর সামনে এমন কোন সমস্যা ছিল না যার সমাধানের জন্য পরশ পাথর দরকার হবে। সত্যিই কোন সমস্যা ছিল না। তিনি তো সেই জিনিস পেয়ে গিয়েছিলেন যা পেলে পরশ পাথরের আর কোনও মূল্য থাকে না।

কয়েক মাস চলে গেল। সেই সাধু আবার রুইদাসের কুটিরে ঘুরে এলেন। তিনি ভেবেছিলেন—এখন সন্ত রুইদাসের বাড়িতে কত আড়ম্বর দেখব। কত ঐশ্বর্য, কত সুন্দর প্রাসাদ, কত রাজকীয় আড়ম্বর দেখতে পাব। উনি তো সাধু হয়েছেন, সন্ন্যাসী হয়েছেন, কিন্তু রাজকীয় হালচালের মোহ যায় নি। তিনি এসে দেখলেন সেই ফুটো-ফাটা ঝুপড়িই আছে, আর ভক্ত রুইদাস আগের মত বসে জুতো সেলাই করছেন। 'আরে। এ কি? উনি কি পরশ পাথর ব্যবহারই করেন নি। ব্যবহার করলে আজ এই দশা থাকত না। জুতো সেলাই করার অবস্থা থাকত না আজ। ইনি যেমন অবস্থায় ছিলেন ঠিক তেমন অবস্থায় এখনও আছেন।'

বিতর্কের বিষয়। যাঁর কাছে পরশ পাথর আছে তিনি কি এমন দারিদ্র্যের জীবন যাপন করতে পারেন? যাঁর কাছে পরশ পাথর আছে তিনি কি জুতো সেলাইয়ের কাজ করতে পারেন? যাঁর কাছে পরশ পাথর আছে তিনি কি সামান্য শুকনো রুটি খেয়ে সন্তুষ্ট থাকতে পারেন?

কখনই তা সম্ভব নয়। লোকে তো পরশ পাথরের নামে লালায়িত হয়। কিন্তু যাঁর কাছে সেই পরশ পাথর আছে যা এক মুহূর্তে লোহাকে সোনা করতে পারে, যাঁর হাতে লোহাকে সোনা করার শক্তি এসেছে, তিনি কি থেকে কি হয়ে যান। তাঁর মাটিতে পা পড়ে না, তিনি চলেন না, আকাশে ওড়েন। কেউ আবার এই রকম হয়।

কোন লোক এমনও হয় যে তার পরশ পাথর মিলেছে, পরশ পাথর তার সামনে পড়ে রয়েছে, কিন্তু তার মনে চিন্তা আসে নি যে 'আমি লোহাকে সোনা বানিয়ে নেব। পরশ পাথরের সাহায্যে আমি অনেক সম্পদ সংগ্রহ করব, উত্তম বাসগৃহ তৈরি করে নেব, সূক্ষ্ম বস্ত্র পরব'—এসব কিছুই সে স্বপ্নেও ভাবে নি। রুইদাস কখনও ভাবেন নি, 'পরশ পাথর পড়ে আছে, এখন আর আমার জুতো সেলাই করার দরকার কি আছে? যখন চাইব, এবং যত চাইব সব কিছুই হতে পারবে।' বরং ভেবেছেন, 'জুতো সেলাই থেকে আমি পরম সন্তোষ অনুভব করছি। ভাঙ্গাচোরা ঝুপড়িতে আমি পরম সন্তোষ অনুভব করছি। শুকনো রুটিতে পরম আনন্দ আর আত্মতৃপ্তি অনুভব করছি। ফুটোফাটা ঝুপড়িতেই আমি সন্তুষ্ট আছি।' এসবের মূল কারণ কি। এই পরম সন্তোষ কোথা এসেছে? তার হেতু কি? এই পরিবর্তন কেন আসে? যখন আমরা তার কারণের খোঁজ করি তখন জানতে পারি যে ঐ পরিবর্তন মানসিক সমাধির স্তরে হয়। ভক্ত রুইদাস নিজের মনকে সেই স্তরে, সেই আনন্দের ভূমিতে পৌঁছে দিয়েছিলেন যেখানে পৌঁছলে সোনার আনন্দ, উত্তম বাসগৃহ, উত্তম ভোজ ইত্যাদি সব কিছুর আনন্দ শেষ হয়ে যায়। সমস্ত আকর্ষণ শেষ হয়ে যায়। তার আর মনে হয় না সেগুলি বড় জিনিস, বিশিষ্ট উপলব্ধি বা মূল্যবান বস্তু। তার কাছে সমস্ত জাগতিক সম্পদের মূল্য শেষ হয়ে যায়। এ কথা নিশ্চিত সত্য, জাগতিক বস্তুর মূল্য নিজের কাছে শেষ হয়ে না গেলে কোন মানুষ ঐ রকম আচরণ করতে পারে না। যতদিন তার মনে পরশ পাথরের লোহাকে সোনা করবার ক্ষমতা সম্বন্ধে মূল্যজ্ঞান

থাকবে, আর সোনা দিয়ে ভাল ভাল জিনিস সংগ্রহ করে অবস্থাপন্ন লোক হওয়ার মূল্যবোধ থাকবে, ততদিন সে এ রকম আচরণ করতে পারবে না যে, সামনে পরশ পাথর পড়ে থাকলেও সে জুতো সেলাই করবে, একটা শুকনো রুটি খেয়ে ক্ষুধার নিবৃত্তি করবে। ঐ পরিস্থিতিতে এ রকম হওয়া সম্ভব নয়। ঐ রকম তখনই হতে পারে যখন তার চেয়েও বড় কোন আনন্দ লাভ তার হয়। এই রকম এক ঘটনা ঘটেছিল।

এক ব্যক্তি এক সন্ন্যাসীর কাছে গিয়ে বলল—'বাবা! আমার খিদে পেয়েছে। আমাকে কিছু খেতে দিন।' সন্ন্যাসী বললেন—'তোমাকে দেব এমন আমার কি আছে। আমি তো সব কিছু ত্যাগ করেছি। তোমাকে কি দেব?' লোকটি বলল—'না, না, তা হবে না। বড়ই আশা নিয়ে আপনার কাছে এসেছি। নিরাশ হয়ে ফিরে যাব না। কিছু না কিছু দিতেই হবে।' সে বড়ই জেদ করতে লাগল। সন্ন্যাসী ভাবলেন—'বড়ই মুশকিল তো। আমার কাছে এক দানাও খাদ্য নেই। এই বেচারিকে কি দেব? ও তো নিজের জেদ ছাড়বে না দেখছি। কি করব?' শেষমেশ সন্ন্যাসী বললেন—'ভাই! আমার কাছে তো কিছু নেই। এই দিকে নদী আছে, তার পাশে চলে যাও। আমি কালই ওখানে একটা পাথর ফেলে দিয়েছি। ওটা পরশ পাথর। ওর ছোঁয়ায় লোহা সোনা হয়। ঐ পাথর লোহাতে ছোঁয়াও, লোহা সোনা হয়ে যাবে। যাও, ঐ পাথর নিয়ে চলে যাও।'

পরশ পাথরের কথা শুনে লোকটা লালায়িত হল। মন ভবিষ্যতের কল্পনায় ভরে উঠল। সে দৌড়তে দৌড়তে নদীর তীরে গেল। পরশ পাথর দেখতে পেল। রোদে চকচক করছে। সে সেটা তুলে নেওয়ার জন্য হাত বাড়াল। হঠাৎ অন্য এক চিন্তা মাথায় আসতে তার হাত মাঝপথে থেমে গেল। সে ভাবল, সন্ন্যাসী পরশ পাথর ফেলে দিল কেন? কেন ফেলে দিল? কোন লোক কি কখনও পরশ পাথর হাতে পেয়ে তা ফেলে দিতে পারে? না, কখনও তা পারে না। তবে কি এটা

নকল পরশ পাথর? না, নকলও নয়। কিন্তু যদি আসলই হয় তবে সন্ন্যাসী এটাকে ফেলে দিয়েছেন কেন? নিশ্চয়ই সন্ন্যাসীর কাছে এর চেয়েও বেশি দামী কোন বস্তু আছে, তাই তো তিনি এই কম মূল্যবান পাথর ফেলে দিয়েছেন। তাঁর কাছে যদি এর চেয়ে বেশি ভাল বস্তু থাকে তবে তিনি এই পরশ পাথর কখনও ছুঁড়ে ফেলে দিতে পারতেন না। সন্ন্যাসী তো আর সে রকম মূর্খ নন। সে ফিরে এসে সন্ন্যাসীকে বলল—'মহারাজ! আমি পরশ পাথর চাই না।' যে জিনিস পেয়ে আপনি পরশ পাথর ফেলে দিয়েছেন আমাকে সেই জিনিস দিন।' লোকটির যুক্তি অতি সুন্দর।

এ কথা অত্যন্ত সত্যি যে পরশ পাথরের চেয়ে বেশি মূল্যবান বস্তু না পেলে, হস্তগত না করলে, কেউ পরশ পাথর ছুঁড়ে ফেলে দিতে পারে না। তার চেয়ে কোন মূল্যবান বস্তু পেলে তবে পরশ পাথরের মূল্য শেষ হয়ে যায়। আর তখন লোকে তা ফেলে দিতে পারে। রুইদাস পরশ পাথরের চেয়ে অনেক বেশি মূল্যবান বস্তু আগেই পেয়ে গিয়েছিলেন বলে তাঁর পরশ পাথরের ওপরে কোন আকর্ষণ ছিল না। কাজেই তাঁর মনের আকর্ষণ তুচ্ছ বস্তুকে সরিয়ে দিয়ে মহৎ বস্তুর ওপরে কেন্দ্রিত হয়েছিল।

তেরাপন্থ ধর্মসঙ্ঘের চতুর্থ আচার্য ছিলেন শ্রীমজ্জয়াচার্য। তিনি মুনির অবস্থা প্রাপ্ত হয়েছিলেন। এক বার তিনি পালীতে এসেছিলেন। বাজারের এক দোকানে তিনি অবস্থান করলেন। তাঁর বয়স তখন খুব কম। সেখানে এক নটমণ্ডলী এসে উপস্থিত হল। তারা দোকানটির সামনের ময়দানে তাদের কাজ শুরু করে দিল। বহু দর্শক সমবেত হল। নাটক আরম্ভ হল। এক ঘন্টা ধরে অভিনয় চলল, তার পরে শেষ হয়ে গেল। দর্শকদের মধ্যে একজন তার সাথীকে বলল—'তেরাপন্থ ধর্মসঙ্ঘের ভিত্তি আরও একশ' বছরের জন্য দারুণ দৃঢ় হয়ে গেল।' ঐ লোকটি জিজ্ঞাসা করল—'তুমি কি করে সে কথা জানতে পারলে? কেমন করে এ জ্ঞান লাভ হল? কোন গল্প

ফাঁদানোর তাল করছ নাকি ?' তখন প্রথম লোকটি বলল, 'নাটক এক ঘণ্টা ধরে চলল। নট বড় সুন্দর অভিনয় করছিল। কিন্তু আমি নাটক একেবারেই দেখি নি। আমি তো সামনের দোকানে সমাসীন নবীন মুনিকে এক ঘণ্টা ধরে দেখেছি। ঐ মুনি চোখ তুলেও এদিকে চেয়ে দেখেন নি। আমি এক দৃষ্টিতে ঐ মুনিকে দেখেছি। আমিও নাটক দেখি নি, আর ঐ মুনিও দেখেন নি। আমি ঐ মুনির মানসিক একাগ্রতা দেখছিলাম। যে সঙ্ঘে এ রকম মুনি হয় সে সঙ্ঘের ভিত্তি দৃঢ় না হয়ে পারে না।'

মুনির এই রকম ভাবনা কি করে হল ? এই পরিবর্তন কি করে এল ? এ রকম হওয়া কি স্বাভাবিক ? না, একেবারেই না। প্রত্যেক লোকই এ রকম পরিস্থিতিতে রস গ্রহণ করে। বুড়ো বা জোয়ান, বালক ব কিশোর, স্ত্রী বা পুরুষ, যাই হোক না কেন, সব মানুষই আমোদ প্রমোদে রস পায়। সকলের চোখই অভিনয় দেখার জন্য উৎসুক হয়। কিন্তু নবীন সন্ন্যাসী এক মুহূর্তের জন্যও নাটকের দিকে দৃষ্টিপাত করেন নি। কেন করেন নি ? তার একটাই কারণ, যে ভূমিতে নাটক দেখা থেকে আনন্দ পাওয়া যায় তিনি তা থেকে অনেক ওপরে উঠে গিয়েছিলেন। বাহ্য আনন্দের স্রোত তাঁর মনকে আকর্ষণ করত না। তিনি তো অনেক বড় নাটক দেখছিলেন। কাজেই নটের অভিনীত নাটক তাঁর কাছে অকেজো এবং অনাবশ্যক বস্তুতে পরিণত হয়েছিল।

এটা সনাতন সত্য, কোন লোক শ্রেষ্ঠ বস্তু প্রাপ্ত হলে সামান্য বস্তুসমূহের ওপরে তার আকর্ষণ কমে যায়। কোন লোক রুটি খাচ্ছে। এমন সময় তার সামনে মিষ্টি এসে গেল। সে রুটি ছেড়ে মিষ্টি খেতে শুরু করে। তার কারণ মিষ্টির সঙ্গে তুলনায় রুটির মূল্য কম। মিষ্টির চেয়ে রুটির মূল্য কম হওয়াতে তার কাছে রুটির আকর্ষণ কমে যায়, মিষ্টির আকর্ষণ বেড়ে যায়। যে শ্রেষ্ঠ বস্তুর প্রতি আপনার আকর্ষণ হয় তা অপকৃষ্ট বস্তুর প্রতি আকর্ষণ শেষ করে দেয়।

আমাদের সঙ্ঘের এক সাধু ছিলেন সতীদাসজী। আচার্য ভিক্ষু

যখন তাঁকে স্মরণ করতেন তখন যদি কেউ তাঁর কাছে গিয়ে বলত, 'স্বামীজি আপনাকে স্মরণ করেছেন, আপনাকে ডাকছেন,' তখুনি তাঁর দুই হাত জুড়ে যেত এবং ঐ অবস্থায় হাতে যা কিছু থাকত, তা মাটিতে পড়ে যেত এবং ভেঙ্গে যেত। হাতের জিনিস মাটিতে রেখে তার পরে কৃতাঞ্জলি হবেন এ কথা তাঁর মনে থাকত না। তিনি স্বামীজির আদেশ পাওয়া মাত্র কৃতাঞ্জলি হতেন। এই রকম করা তাঁর স্বভাব হয়ে গিয়েছিল। আচার্যের আজ্ঞার প্রতি তাঁর এত আকর্ষণ ছিল যে তার সামনে বা তাঁর হাতে জল, আহার্যে পূর্ণ পাত্র বা কোন পুস্তক আছে, সে বোধ তাঁর থাকত না। তাঁর হাতে যা কিছু থাকত তা মাটিতে পড়ে যেত। তাঁর মন সেই ভূমিতে পৌঁছেছিল যেখানে আর সব আকর্ষণ শেষ হয়ে গিয়েছে।

সাধনা মানুষের মনকে এমন এক স্তরে নিয়ে যায় যেখানে পৌঁছলে মানুষ এক পরম ভূমিকা প্রাপ্ত হয়, তার মনে এক বিশেষ আকর্ষণ উৎপন্ন হয়। এর মধ্যে আর সমস্ত আকর্ষণ মিশে যায়, শেষ হয়ে যায়। ঐ স্তর একাগ্রতার ভূমিকা। তা মানসিক সমাধি, চিত্তের সমাধি। সে সাধক এই স্তরে পৌঁছেছে, সে অগণিত সমস্যা অতিক্রম করেছে। বস্তুজগতে যত অসন্তোষ, লালসা, বাসনা, আকাঙ্ক্ষা বা সংঘর্ষ উৎপন্ন হয় সব কিছু থেকে ঐ সাধক ছুটি পেয়ে যায়। সমস্ত সমস্যা লোপ পেয়ে যায়, সাধক তাদের অতিক্রম করেন।

আমাদের ধ্যেয় উচ্চ হবে, আত্মাভিমুখ হবে। ধ্যেয় নিম্ন স্তরের হওয়া উচিত নয়। উচ্চ ধ্যেয় এবং নিচ ধ্যেয় উভয় ক্ষেত্রেই একাগ্রতার কার্যকারিতা আছে। তার কার্যক্ষমতায় কোন বাধা হয় না। একাগ্রতা শক্তিস্বরূপ। এক ধারায় প্রবহমান মনে তার উৎপত্তি। মন এক ধারায় ওপরের দিকেও বয়ে যেতে পারে, আবার নিচের দিকেও প্রবাহিত হতে পারে। ঐ রকম এক ধারায় প্রবাহিত হওয়া থেকেই একাগ্রতা উৎপন্ন হয়। তা থেকে ঊর্জা বা ওজঃশক্তি আসে। ঐ শক্তি নিজের কেরামতি দেখাবে। কিন্তু যদি নিচ ধ্যেয়ের ওপরে মনকে একাগ্র করা

যায় তবে নিম্ন স্তরে শক্তির বিস্ফোরণ হবে। তা থেকে কোনই উপকার হবে না। নিম্নগামী শক্তি চেতনার প্রবাহকে নিচের দিকে নিয়ে যাবে। যদি উচ্চ ধ্যেয়ের ওপরে মনকে একাগ্রভাবে নিয়োজিত করা হয় তবে শক্তির বিস্ফোরণ হবে উচ্চ স্তরে। তা মনকে বিকশিত করবে এবং অনেক উপলব্ধির বাহক হবে।

একটা কথা ভেবে দেখবেন। একাগ্রতা খুব ভাল জিনিস। কিন্তু তারও একটা সময়ের সীমা আছে। এ কথা আপনাদের খেয়াল রাখা প্রয়োজন। আজ বীজ বপন করলেন, আর আজই বৃক্ষ তৈরি হবে, এ অসম্ভব কথা। তার জন্য একটা সময়ের পরিমাণ নির্দিষ্ট আছে। ঠিক এই ভাবে একাগ্রতার ফললাভ করার জন্য একটা সময়ের পরিমাণ ধার্য আছে। আজ একাগ্রতার অভ্যাস আরম্ভ করলেন। পাঁচ, দশ বা বিশ মিনিট অভ্যাস করতে লাগলেন। বেশ ভাল অনুভূতি হতে থাকে, কিন্তু পূর্ণ ফল লাভ হয় না। এখন বীজ অঙ্কুরিত হওয়ার অবস্থা। তা থেকে গাছের চারা গজাতে সময় লাগবে। কাল পূর্ণ হলে তবে বীজ থেকে বৃক্ষের উৎপত্তি সম্ভব হবে। প্রথমেই তা সম্ভব হবে না। সেই রকম, আপনি যদি আপনার মনকে তিন ঘন্টা ধরে প্রবাহিত করতে পারেন তবে আপনার বোধ হবে একাগ্রতায় আপনার সিদ্ধিলাভ হয়েছে। তখন তাতে ফল ফলতে আরম্ভ করবে। আমাদের সময়ের সীমাও বুঝতে হবে।

প্রশ্ন হচ্ছে, একাগ্রতা কি করে হবে? এ প্রশ্ন স্বাভাবিক। মন চঞ্চল। সে এক ধারায় বইতে চায় না, একদিক লক্ষ্য করে চলতে চায় না। মনের চঞ্চল অবস্থায় একাগ্রতা প্রাপ্ত হওয়া যায় না। মনকে এক ধারায় প্রবাহিত করা যেতে পারে কি উপায়ে? এটা অনুভূত সত্য যে, মন যতক্ষণ সূক্ষ্মতা প্রাপ্ত না হয় ততক্ষণ তা এক দিকে প্রবাহিত হবে না। মনকে সূক্ষ্ম না করতে পারলে আমরা তাকে ধ্যেয়ের ওপরে এক ভাবে নিবদ্ধ করে রাখতে পারব না। এখন প্রশ্ন, মনকে কি ভাবে সূক্ষ্ম করা যায়? এর উত্তর: মনকে সূক্ষ্ম করার যে উত্তম উপায়টি

আছে তা হল, শ্বাসের অভ্যাস। শ্বাসের ওপরে ধ্যানকে কেন্দ্রিত করা, মনকে নিয়োগ করা মনকে সূক্ষ্ম করার নির্ভুল উপায়। ঠোঁটের ওপরে এবং নাকের নিচে যেখানে শ্বাসের স্পর্শ অনুভূত হয় এবং ঘর্ষণ হয় সেখানে মনকে কেন্দ্রিত করা, ঐ স্পর্শবিন্দুতে মনকে স্থির ভাবে সংলগ্ন করা, নিশ্বাস এবং প্রশ্বাসকে অনুভব করা প্রয়োজন। তা থেকে শ্বাস দীর্ঘ এবং সূক্ষ্ম হবে। এই প্রয়োগ যত পারেন অভ্যাস করুন। যদি চান দশ-বিশ-ত্রিশ বা ষাট মিনিট কাল অভ্যাস করুন। তাতে কোন আপত্তি নেই।

ঐ রকম অভ্যাস-কালে আপনার অনুভূতি হবে, অতীতের সমস্ত স্মৃতি, বর্তমানের সমুদয় চিন্তা ও ভবিষ্যতের কল্পনার ভার হ্রাসপ্রাপ্ত হচ্ছে, একে একে ঐ সমস্ত ভার নিচে নেমে যাচ্ছে এবং লঘুতা প্রাপ্ত হচ্ছে। যখন মন এভাবে হাল্কা হয়ে যাবে তখন তাকে যে দিকে চালিত করা যাবে সে দিক থেকে অন্য দিকে ঘুরবে না। সেই দিকেই চলতে থাকবে। সুতরাং শ্বাসের দ্বারা, শ্বাসের প্রক্রিয়ার অভ্যাস দ্বারা আমরা যেন মনকে হালকা করি। মনকে হালকা করে একদিকে দীর্ঘকালের জন্য চালিত করলে একাগ্রতায় সিদ্ধিলাভ হতে পারে এবং তা থেকে যে যে ফল পাওয়া সম্ভব তা সবই পাওয়া যেতে পারে।

২৬

সাধনার তিন পক্ষ

কিছু লোক অন্যকে অনেক প্রযোগ শেখায এবং নিজেবাও সেগুলি আচবণ কবে। তাবা বিশেষ শক্তিশালী সাধক। কিন্তু সাধাবণ লোকেব পক্ষে এ বকম করা সম্ভব নয। তাব কাবণ, কতকগুলি প্রযোগ সব লোক আচবণ কবতে সমর্থ হবে না। তাবা যদি ঐ সমস্ত প্রযোগ অভ্যাস কবতে যায তবে বিশেষ ক্লেশকব অবস্থায পডবে। ঐ সমস্ত প্রযোগ শক্তি এবং বিশেষ যোগ্যতাব ওপবে নির্ভর কবে। কিন্তু অনেক প্রযোগ আছে যা সর্বসাধাবণ অভ্যাস কবতে পাবে। প্রত্যেক লোকই সেগুলি আচবণ কবতে পাবে। সবাব পক্ষেই ঐ প্রযোগগুলি আচবণ কবা সম্ভব। আমি আগে থেকে এই বকম চিন্তা কবেছি যে আমবা এই শিবিবে একটি প্রযোগ শিক্ষা কবব এবং পববর্তী শিবিব পর্যন্ত সেটি অভ্যাস কবব। তাবপবে আমবা অন্য একটি প্রযোগ নেব এবং সেটি তাব পবেব শিবিব পর্যন্ত আচবণ কবব। প্রত্যেক প্রযোগ অন্তত ছয মাস কাল অভ্যাস কবা উচিত। যদি অনুভূতি হয তবে আবও দীর্ঘকাল আচবণ কবা যেতে পাবে।

সাধনাব তিনটি অঙ্গ—অধ্যাত্ম, প্রাণ এবং ব্যবহাব। আমাদেব কেবল প্রাণবিদ্যাব ওপবে নির্ভব কবলে চলবে না। আমাদেব মুখ্য ধ্যেয অধ্যাত্ম বা আত্মিক বিকাশ। তা চৈতন্য বিকাশেব পথে সবচেযে

উঁচু ভূমি।

সাধনার দ্বিতীয় পক্ষ—প্রাণের প্রয়োগ। এরও আবশ্যকতা আছে। আমাদের প্রাণবল, মনোবল এবং শক্তির বিকাশ ঘটাতে হবে যাতে অধ্যাত্ম পর্যন্ত পৌঁছনোর সুবিধে হয়।

সাধনার তৃতীয় অঙ্গ—ব্যবহার সম্বন্ধীয়। যদি অধ্যাত্মের সাধনা তথা প্রাণের সাধনা চলতে থাকে অথচ ব্যবহারের কোন পরিবর্তন না হয়, তবে তা মানুষের ঠাট্টা-তামাশার ব্যাপার হয়ে দাঁড়াবে। সাধনার সাথে সাথে আমাদের ব্যবহারেরও পরিবর্তন হওয়া বাঞ্ছনীয়। অধ্যাত্মের বিকাশ হতে থাকলে ব্যবহার আপনা থেকে বদলাতে থাকে, না বদলে পারে না। অধিকন্তু সাধনার বিকাশের সঙ্গে সমান তালে ব্যবহারেরও পরিবর্তন হওয়া প্রয়োজন। ব্যবহারের সাধনা অধ্যাত্ম সাধনার পরিপূরক এবং সহযোগী প্রমাণিত হবে। আজ আমি এক প্রয়োগের চর্চা করব।

অধ্যাত্মের দৃষ্টিকোণ থেকে আপনি ছয় মাস কাল অহং বিসর্জন করুন। অহংকার এবং মমকার—এই দুই অধ্যাত্ম সাধনার তথা চৈতন্য-বিকাশের পথে অন্তরায়। আপনি অহং বিসর্জনের প্রয়োগ অভ্যাস করুন।

প্রাণসাধনার ব্যাপারে দুটি কথা আছে—এক দীর্ঘশ্বাস, আর এক সমতাল শ্বাস। আপনি এই দুয়েরই অভ্যাস করুন। দীর্ঘ শ্বাস নিন। শ্বাস যত দীর্ঘ হবে, মনের বিকার তত কমে যাবে। ক্রোধ কমে যাবে। আবেগ কমে যাবে। শ্বাস যত ছোট হবে, মনের বিকার ততই বেশি হবে। যখন শ্বাস দীর্ঘ এবং পুরো হয় তখন তা আমাদের ভেতরকার সব উত্তেজনাকর বস্তুকে নিষ্কাশিত করে। এ রকম ঘটার পেছনে এক বৈজ্ঞানিক কারণ আছে। ফুসফুসে রক্তের শোধন হয়, হার্ট বা হৃৎপিণ্ড সেই রক্ত শরীরের মধ্যে সঞ্চালিত করে।

হার্ট থেকে সঞ্চালিত হয়ে রক্ত সারা শরীরে ছড়িয়ে পড়ে। সেই রক্তের সঙ্গে সংস্কার শরীরে প্রবাহিত হয়। রক্ত যত শুদ্ধ হবে, মন তত

শান্ত হবে। আবেগ কমে যাবে। রক্ত যত দূষিত হবে, স্বভাব তত উত্তেজনাপূর্ণ হবে, ক্রোধ তত বেশি হতে থাকবে। যখন আমরা দীর্ঘ শ্বাস নিই তখন ঐ শ্বাসের সঙ্গে সব কার্বন, সব দূষিত বস্তু আমাদের শরীর থেকে বাইরে চলে যায়। ছোট শ্বাস নিলে সম্পূর্ণ অক্সিজেনও আমাদের শরীরের ভেতরে প্রবেশ করে না, আর শরীরের ভেতরে যে সমস্ত ময়লা জমেছে সেগুলিও সম্পূর্ণ নিষ্কাশিত হয় না। এই জন্য মানুষের স্বভাবের পরিবর্তন হয় না। তাই দীর্ঘ শ্বাস অভ্যাস অত্যন্ত প্রয়োজন।

দ্বিতীয় ব্যাপার হল, আমাদের সমতাল শ্বাস নিতে হবে। সঙ্গীতে যতক্ষণ তালের সমতা না হয় ততক্ষণ সঙ্গীতের আনন্দ পাওয়া যায় না। তালের সমতা চাই। শ্বাসের ক্ষেত্রেও তালের মূল্য আছে। শ্বাস সমতাল হওয়া প্রয়োজন। প্রথম শ্বাস নিতে এবং ছাড়তে যতটা সময় লেগেছে, দ্বিতীয়, তৃতীয় এবং তার পরবর্তী নিশ্বাসসমূহে ততটাই সময় লাগা বাঞ্ছনীয়। সময়ের কোন তফাৎ যেন না হয়। আমরা যখন চলি তখন যদি প্রথম পদক্ষেপ এক দিকে, দ্বিতীয় পদক্ষেপ আর এক দিকে, তৃতীয় পদক্ষেপ অন্য আর এক দিকে হয় তাহলে আমরা অগ্রসর হতে পারি না। যখন আমাদের পদক্ষেপ একই দিকে একই ভাবে হয় তখন আমাদের অগ্রগতি হয়। শ্বাস সমতাল হওয়া প্রয়োজন। মনে করুন, প্রথম শ্বাস নিতে ও ছাড়তে আপনার বিশ সেকেণ্ড লেগেছে। দ্বিতীয় এবং তৃতীয় শ্বাসেও বিশ সেকেণ্ড করে লাগা উচিত। এই হল সমতাল শ্বাস। এতে এমন এক লয়বদ্ধতার সৃষ্টি হয় যে মানুষ সহজে ধ্যানের স্থিতিতে পৌঁছে যায়। শান্তি আসে। আসনে বসে প্রয়োগ করাই শুধু ধ্যান নয়। যখন আমাদের মন শান্ত থাকে, যখন আমাদের মনে কোন উদ্বেগ থাকে না তখনই আমাদের ধ্যানের স্থিতি হয়। সমতাল শ্বাস থেকে এই অবস্থা আসে। প্রাণের দৃষ্টিকোণ থেকে দুটি দিক আছে—দীর্ঘশ্বাস এর সমতাল শ্বাস।

এর পরে তৃতীয় কথা—ব্যবহার সম্বন্ধে। ব্যবহারের দৃষ্টিকোণ থেকে

সাধকের করুণা অভ্যাস করা উচিত এবং তা আগামী অধিবেশন পর্যন্ত চলা প্রয়োজন। প্রতি মুহূর্তে আমাদের এ বিষয়ে জাগরূকতা অভ্যাস করা দরকার। নিজের ছেলেমেয়ে, নিজের পরিবার, নিজের দাস-দাসী, সবার প্রতি করুণা প্রদর্শন করা আবশ্যক। কারও সঙ্গে নির্দয় ব্যবহার করবেন না, নির্দয় ভাব পোষণ করবেন না। যখনই মনে নিষ্ঠুর ভাব আসে আমরা তখনই যেন তা সামলে নিয়ে সদয় ভাব নিয়ে আসি। যদি আমাদের মনে করুণা আসে তবে জীবনের অনেক বিপত্তি মিটে যাবে। ক্রূরতার ফলে অনেক অন্যায় সংঘটিত হয়। লোকে ক্রূরতার বশবর্তী হয়ে অন্যায় কাজ করে। যদি করুণা বিকশিত এবং অভ্যস্ত হয় তবে অনেক অস্বস্তিকর অবস্থার সমাপ্তি ঘটে। জৈন-পরম্পরায় এ কথা স্বীকৃত যে, মানুষের মনে করুণা না থাকলে তার সম্যক দৃষ্টি হওয়া সম্ভব নয়। সম্যক দৃষ্টির এক লক্ষণ—অনুকম্পা। যদি লোকের অনুকম্পা বা করুণা থাকে তবে বুঝবেন, তার সম্যক দৃষ্টি আছে। যদি করুণা না থাকে তবে সে মিথ্যাদৃষ্টি। কোন লোক সম্যক দৃষ্টি বা মিথ্যা দৃষ্টি কিনা তা জানার এই হল কষ্টিপাথর। এই হল আমাদের ব্যবহারের সূত্র।

অধ্যাত্ম সাধনায় অহং বিসর্জন, প্রাণের সাধনায় দীর্ঘশ্বাস ও সমতাল শ্বাসের অভ্যাস, আর ব্যবহারের সাধনায় করুণার অভ্যাস—এই তিন রকম সাধনার প্রয়োগের রূপ। এই তিন প্রয়োগ থেকে ফলপ্রাপ্তি হবে, সাফল্য লাভ হবে। প্রথম প্রয়োগ থেকে অহং বোধ ত্যাগ হবে, দ্বিতীয় থেকে লাভ হবে বাসনা-বিজয়, তৃতীয় থেকে লাভ হবে করুণার অভ্যাস।

তবে এর সঙ্গে আর একটি বিষয় আছে। সেই বিষয়টি হল জপ। তিন তত্ত্বকে সবল করতে জপ অত্যন্ত প্রয়োজন। কারণ তাতে আমাদের সমস্ত শক্তির পরিবর্তন ঘটে। শক্তির বিকাশ হয়। তা প্রাণ-শক্তি এবং আত্মশক্তি উভয়কেই প্রভাবিত করে। এর জন্য আপনি নবকার মন্ত্র জপ করেন, মালা ঘোরান। পর্যায়ক্রমে এই রকম চলতে

থাকে। এই নিয়মের সামান্য একটু পরিবর্তন আপনাদের বুঝিয়ে দিই। কেউ হয়ত নবকার মন্ত্রের মালা একবার ঘুরিয়ে জপ করে। হয়ত আপনিও তাই করেন। একটা পরিবর্তন করুন। আমি যে নিয়ম বলছি তদনুসারে মালা ঘোরান। আপনি নমস্কার মন্ত্রে এক চরণ নিন 'ণমো অর্হন্তাণং'। আপনাকে এই চরণ জপ করতে হবে। শ্বাস নেওয়ার সময় মন্ত্রের জপ করবেন না, উচ্চারণ করবেন না। শ্বাস ত্যাগ করার সময়েও মন্ত্র জপ করবেন না। পূরকের সময়েও এ মন্ত্র জপ করবেন না, রেচকের সময়েও এ মন্ত্র জপ করবেন না। কুম্ভকের অবস্থাতে এই জপ করবেন। আপনি পূরক করুন, অর্থাৎ সম্পূর্ণভাবে নিশ্বাস গ্রহণ করুন, নিশ্বাস দেহের মধ্যে আবদ্ধ রাখুন। এই হল কুম্ভকের অবস্থা। এই অবস্থায় স্থিতিকালে জপ করুন। 'ণমো অর্হন্তাণং' এই মন্ত্র উচ্চারণ করুন। এবার নিশ্বাস ত্যাগ করুন, আবার নিশ্বাস নিন। নিশ্বাস ত্যাগ করার সময়েও মন্ত্র জপ করবেন না। আবার শ্বাসকে দেহমধ্যে আবদ্ধ করে কুম্ভক করুন। তখন 'ণমো সিদ্ধাণং' এই মন্ত্র জপ করুন। যতক্ষণ কুম্ভক করবেন ততক্ষণ জপ করবেন। পুরো মালা ফিরানোর কোন প্রয়োজন নেই। নমস্কার মহামন্ত্র বিধিসম্মতভাবে যদি দশবারও জপ করা যায় তবে তা প্রভূত ফলদায়ক এবং মূল্যবান হয়। যতটুকু আপনার সুবিধে ততটুকু সময়ই আপনি বিধিসম্মতভাবে জপ করবেন। তবে একটা পরামর্শ দিই। অন্তত একুশবার জপ করবেন। এক মালা সম্পূর্ণ ফেরে তো খুব ভাল কথা। না হলেও অন্তত এই সংখ্যক জপ অবশ্য করবেন। আপনার স্থিরতা বৃদ্ধি পাবে, একাগ্রতা বৃদ্ধি পাবে। জপ করার এই এক বিধি। কুম্ভকের স্থিতিকালে জপ করতে হবে, অর্থাৎ পূরক এবং রেচকের মাঝখানে স্থিতিকালে জপ করতে হবে। এই এক জপের বিধি। তার সাথে সাথে রঙের ধ্যান আবশ্যক, স্থানের ধ্যানও অত্যন্ত প্রয়োজন। জপের সঙ্গে চার বস্তু সংযুক্ত হয়েছে—পদ, রঙ, স্থান ও শ্বাসের স্থিতি।

আমরা 'ণমো অর্হন্তাণং' মন্ত্রটি নিয়ে আলোচনা করি। এই মন্ত্রের

বর্ণ শ্বেত, তার স্থান মস্তিষ্কে, সহস্রার চক্রে। এই মন্ত্রের উচ্চারণকালে মন সহস্রার চক্রে স্থিত হয়, তার সম্বন্ধে চিন্তা বা আভাসের বর্ণ শ্বেত হয়। সহস্রার চক্র বা ব্রহ্মরন্ধ্র হল তালুর ওপরের দিক। কুম্ভকের স্থিতিকালে মন্ত্র জপের সময়ে আমাদের মন সহস্রারে নিবদ্ধ হবে। চারটি বিষয়ের আলোচনা করা গেল—

পদ—ণমো অর্হন্তাণং।

রঙ—শ্বেত।

স্থান—সহস্রার চক্র (ব্রহ্মরন্ধ্র, অর্থাৎ তালুর ওপরকার স্থান)।

শ্বাসের স্থিতি—কুম্ভক। অন্তর কুম্ভক।

'ণমো সিদ্ধাণং' এই হল দ্বিতীয় পদ। এর বর্ণ লাল। এর স্থান ললাটের মধ্যভাগে স্থিত আজ্ঞাচক্র। শ্বাসের স্থিতি হল কুম্ভক।

'ণমো আয়রিয়াণং'—এই হল তৃতীয় পদ। এর বর্ণ পীত। এর স্থান বিশুদ্ধি চক্র বা গলদেশ। ঐ চক্র পবিত্রতার স্থান। তা আমাদের সমস্ত ভাবনা এবং আবেগের নিয়ন্ত্রণ স্থান। শ্বাসের স্থিতি হবে—অন্তর কুম্ভক।

'ণমো উবজ্ঝায়াণং'—এটি চতুর্থ পদ। এর বর্ণ নীল। এর স্থান হৃদয়কমল। শ্বাসের স্থিতি—কুম্ভক।

'ণমো লোএ সব্বসাহুণং'—এই হল পঞ্চম পদ। এর বর্ণ কৃষ্ণ। এর স্থান পায়ের বুড়ো আঙ্গুল। শ্বাসের স্থিতি—কুম্ভক।

পাঁচটি পদের বর্ণ ভিন্ন, স্থিতি ভিন্ন, শ্বাসের স্থিতি পাঁচটি পদেরই সমান। প্রত্যেকটির সাথে পদ, বর্ণ, স্থান এবং শ্বাসের স্থিতি—এই চার বস্তু সংযুক্ত হয়েছে। এখন এই সবের সঙ্গে আমাদের মনের পূর্ণ সংযোগ হওয়া প্রয়োজন। এই পাঁচ বস্তুর বিধির সংযোগ হলে জপ শক্তিশালী হয়। একটিরও ন্যূনতা হলে পরিণামের ন্যূনতা ঘটে।

আপনি অহং বিসর্জন করতে চান, করুণার বিকাশ করতে চান, শ্বাসের স্থিতি নিয়ন্ত্রণ করতে চান। এই তিনই আমরা জপের দ্বারা সাধনা করছি। এর দ্বারা মন্ত্র শক্তিশালী হয়। আপনারা ভাবতে

পাবেন এত নবকাব মন্ত্র জপ ববলাম, এত মালা ফেবালাম, বছবেব পব বছব জপ কবে চলেছি, কিন্তু দৃশ্যত কিছুই লাভ হল না। এ বকম অনুভূতি দু-এক জনেব নয, অনেকেবই হতে পাবে। ওপবে যে প্রক্রিযা বর্ণনা কবলাম সেভাবে ছয মাস কাল জপ করুন, তাব পবে আমাকে জানাবেন কিছু পবিবর্তন হযেছে কিনা। অবশ্যই পবিবর্তন হবে। আমি এই এক প্রযোগেব আলোচনা কবলাম। যাঁবা নানা প্রকাব প্রযোগেব মধ্যে যেতে চান না, যাঁদেব অনেক বকম প্রযোগ অভ্যাস কবাব ক্ষমতাও নেই, তাঁবা এই এক প্রযোগ আঁকড়ে ধরুন। একে হৃদযঙ্গম করুন। একেই চাব বিযযেব ফল লাভ হবে।

প্রথম তত্ত্ব হল অহংকে বিসর্জন কবা। তাব অর্থ—বিনম্রতা। এও এক সমাধি। ভগবান মহাবীব চাব বকম সমাধিব কথা বলেছেন: বিনয সমাধি, শ্রুত সমাধি, তপ সমাধি এবং আচাব সমাধি। প্রথম হল বিনয সমাধি, তাব অর্থ অহং বিসর্জন। অহং স্বযং-উদ্দণ্ডতা বা চণ্ডতা বা প্রকৃতিব ঔদ্ধত্যেব দ্বাবা পবিচিত। লোকে নিজেকে অনেক বড মনে কবে। সেই হল অহং। বিনযেব অর্থ কি? বিনযন—অর্থাৎ দূব কবা, হটানো। বিনযেব উদ্দেশ্য দূব কবা বা অপসাবিত কবা। আমাদেব ভেতবে যে কবাযের ভাব আছে, যে অহং ভাব আছে, তাকে দূব কবাব নাম হল বিনয বা বিনম্রতা। বিনম্রতা অন্যেব প্রতি ব্যবহাবেব রূপ নয। এ হল নিজেব ভেতবকাব গুণ। অহঙ্কাব নিজেব ভেতবেব দোষ। বিনযেব অভ্যাস কবা, বিনয সমাধিতে, আত্ম-সমাধিতে অবস্থান কবা বাঞ্ছনীয। ঐ সমাধি অহঙ্কাবেব বিসর্জন থেকে প্রাপ্তব্য ফল। এতে স্বযং-অনুভূতিব সমাপ্তি ঘটে, একাগ্রতাব সিদ্ধি লাভ হয।

দ্বিতীয বিষয—করুণা অভ্যাস কবা।

তৃতীয বিষয—প্রাণেব সাধনা।

চতুর্থ বিষয—বিধিবৎ মন্ত্র জপ কবা।

এই সব বিষয় একত্র হলে প্রযোগ সম্পূর্ণ হয। এই বকম প্রযোগে

সিদ্ধি প্রাপ্তি হয়। এতে আমাদের চতুর্মুখী বিকাশ হয়। কোন এক অংশের নয়, সমস্ত অংশের বিকাশ হয়। যদি কেবল আমাদের প্রাণ-কোষের বিকাশ হয় কিন্তু স্বভাব না বদলায় তবে ঐ শক্তি আমাদের পক্ষে বিশেষ ক্ষতিকারক হয়, আমাদের পক্ষে দুঃখদায়ক হয়। আমরা আত্মার বিকাশ করতে চাই। কিন্তু যদি প্রাণের বিকাশ না হয় তবে দুর্বল প্রাণ আত্মা পর্যন্ত পৌঁছতে পারে না। উপনিষদে একটি সুন্দর উক্তি আছে, 'নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ'—বলহীন বা বীর্যহীন ব্যক্তি আত্মাকে লাভ করতে পারে না, আত্মা পর্যন্ত পৌঁছতে পারে না। বলহীন লোক কিছু করতে পারে না, কিছু পাওয়ার অধিকারী নয়। করুণার অভ্যাস, অহঙ্কারের বিসর্জন নিজের সঙ্কল্পের ওপরে নির্ভর করে, সঙ্কল্পের সাথে সাথে চলে। করুণার প্রয়োগ ব্যবহারে, কিন্তু এখনও এই ভূমি প্রয়োগ করার উপযোগী নয়। আপনি কি এখন কারও প্রতি ক্রূর আচরণ করছেন? কারও প্রতি করুণা প্রদর্শন করছেন? এ ব্যাপার আপনার ওপরে নির্ভর করে। আপনাকে নিজেকেই ভেবেচিন্তে প্রয়োগ করতে হবে। দীর্ঘশ্বাস, সমতাল শ্বাস আর নমস্কার মন্ত্র জপ—এর প্রয়োগ করতে পারেন, শিখতে পারেন।

২৭

নির্বিচার ধ্যান

চীনের সম্রাট এক ধ্যান-সাধককে আমন্ত্রণ করে বললেন, 'আমি উপদেশ শুনতে চাই, আমাকে কিছু উপদেশ দিন।' সাধক স্থির হয়ে বসলেন, সম্রাটও তাঁর সামনে বসলেন। পাঁচ মিনিট গেল, দশ মিনিট গেল, সম্রাট সাধকের মুখের কথা শোনার জন্য প্রতীক্ষা করতে লাগলেন। সমস্ত পরিবেশ নিস্তব্ধ হয়ে রইল। আধ ঘণ্টা কেটে গেল—সম্রাট প্রতীক্ষারত, সাধুও মৌনতায় অটল। শেষে যখন এক ঘণ্টা পার হয়ে গেল, সম্রাট অধীর হয়ে বললেন, 'ভন্তে। উপদেশ দেওয়ার জন্য আপনাকে এখানে নিমন্ত্রণ করেছি। আপনার উপদেশ শোনার জন্য আমি খুব উৎসুক। এবার দয়া করে কিছু বলুন।' সম্রাটের মন্ত্রী ধ্যানের মর্ম বুঝতেন। তিনি বললেন, 'রাজন্। উপদেশ তো সমাপ্ত হয়ে গেল। এবার উনি যাওয়ার জন্য তৈরি।' সাধু সত্যিই উঠে চলে গেলেন।

খুবই ভাল হতো যদি আমি ঐ রকম করতে পারতাম—মৌন থেকে যেতাম, আর মৌনতাই হতো উপদেশ। কথা না বলে, মৌন থেকে যতটা বোঝানো যেত, কথা বলে হয়ত ততটা বোঝাতে পারব না। এ-ও আমার পক্ষে এক সমস্যা। কথা না বলার দ্বারা যে বিষয় বোঝানো সম্ভব,

কথা বলার দ্বারা সে বিষয় বোঝানো সম্ভব না-ও হতে পারে। তবে কখনও কখনও মৌনীর পক্ষেও কথা বলার দরকার হয়। যে ভাষাতে সংযত, সে যদি সারা দিন ধরে কথা বলে তাহলেও যেন কিছু বলে না। নিযুক্তিকারের এক গুরুত্বপূর্ণ রহস্য-সূত্র আছে—যে বিকল্পের জালে ফেঁসে যায় নি, সে কথা বললেও তা না বলার সামিল, আর যে বিকল্পের দ্বারা প্রতারিত, সে কথা না বললেও যেন অনেক কথা বলে।

মনের ক্রিয়া সমাপ্ত করতে পারলে তবেই আমরা নির্বিচারের স্তরে পৌঁছতে পারি। নির্বিচারের স্তরে পৌঁছতে হলে মনের বিচরণ বন্ধ করতে হবে। যতক্ষণ মন সক্রিয় থাকবে, বিচরণশীল থাকবে, চারদিকে ঘুরবে, বিষয় থেকে বিষয়ান্তরে যাবে, পরিভ্রমণ করবে, ততক্ষণ নির্বিচার ধ্যান হবে না। ঐ রকম ধ্যানের জন্য মনের সংক্রমণশীলতা একেবারে বন্ধ করা প্রয়োজন। এক শব্দ থেকে আর এক শব্দে, এক অর্থ থেকে আর এক অর্থে, এক চিন্তা থেকে আর এক চিন্তায়, মন সর্বদা বিচরণ করছে। আমি মনকে একাগ্র করতে চেষ্টা করছি, কিন্তু শব্দের চক্র চলছে, আর মন তাতে বিচরণ করছে। মনের চঞ্চলতার আর শেষ হয় না। চঞ্চলতা একাগ্রতার মধ্যেও থাকে, কিন্তু সেই চঞ্চলতা এত সীমিত হয়ে যায় যে আমরা সেই অবস্থায় মন স্থির আছে বলেই মনে করি। এর তাৎপর্য এই যে, সেই অবস্থায় মনের চঞ্চলতা একই বিষয়ে সীমাবদ্ধ থাকে, অর্থাৎ মন অন্য কোন বিষয়ে সংক্রমণ করে না। সেজন্য তখন মনকে স্থির বলেই মনে করা হয়। কিন্তু বাস্তবিক তা স্থিরতা নয়—তা পূর্ণ স্থিরতা নয়, আংশিক স্থিরতা মাত্র বা চঞ্চলতার বর্জন। চঞ্চলতার বর্জন আছে বলেই আমরা ঐ মনকে স্থির আর শান্ত বলে মেনে নিই। কিন্তু যেখানে বিচার আছে, মনের ক্রিয়াশীলতা আছে, চিন্তা আছে, সেখানে স্থিরতা কি করে থাকতে পারে? মনের স্থিরতা হলে নির্বিচারতার স্থিতি এসে যায়। কেবলজ্ঞানের তাৎপর্য—শুদ্ধ জ্ঞান, অবিমিশ্র জ্ঞান, একক জ্ঞান—জ্ঞানের অতিরিক্ত আর কিছুই নয়।

'কেবল' শব্দের তিনটি অর্থ হতে পারে—একক, শুদ্ধ, পরিপূর্ণ।

'কেবল'-এর এক অর্থ, একক। যখন আমরা জ্ঞানই করি, তার সঙ্গে কোন সংবেদন করি না, তখন আমাদের জ্ঞান একক জ্ঞান—কেবল-জ্ঞান।

'কেবল'-এর দ্বিতীয় অর্থ, শুদ্ধ। যখন আমরা জ্ঞানই করি, সংবেদন করি না, জ্ঞানের সঙ্গে সংবেদন জুড়ে দিই না, তখন আমাদের জ্ঞান শুদ্ধ হয়, উপযোগ শুদ্ধ হয়। এবং সেই অর্থে আমরা কেবল-জ্ঞানী হয়ে যাই।

'কেবল'-এর তৃতীয় অর্থ, পরিপূর্ণ। পরিপূর্ণতা আপনা আপনি এসে যায়। যখন অবিমিশ্র জ্ঞান হয়, কেবলজ্ঞান হয়, তখন পরিপূর্ণতা আপনা আপনি আসবে। আমরা তাকে আনতে যাব না, আমন্ত্রণ করব না—পরিপূর্ণতা স্বতই আসতে বাধ্য হবে। যখন আমাদের জ্ঞান একক, আমাদের জ্ঞান শুদ্ধ, তখন পরিপূর্ণতা আমাদের কাছ থেকে সরে থাকতে পারবে না—তাকে আসতেই হবে।

যখন আমরা শুদ্ধ উপযোগের স্থিতিতে পৌঁছতে পারব তখন আমরা নির্বিচারতার স্থিতিও লাভ করব। উপযোগের অর্থ—চেতনার প্রবৃত্তি, চৈতন্যের ব্যাপার। যেখানে চৈতন্যের ব্যাপার শুদ্ধ—অবিমিশ্র, নির্ভেজাল—সেখানে উপযোগ শুদ্ধ। সেখানেই নির্বিচারের স্থিতি। সেখানে সমস্ত সংবেদন সমাপ্ত হয়ে যায়।

এক পৌরাণিক কাহিনী আছে। এক প্রসিদ্ধ সাধু ছিলেন। তাঁর কাছে হাজার হাজার লোক আসত। তাদের মধ্যে কিছু ভাল লোক ছিল, কিছু খারাপ লোকও ছিল। কারও তাঁর কাছে যাওয়া-আসার, বা তাঁর কাজে থাকার, বাধা ছিলনা। একদিন এক দুর্জন লোক সাধুর কাছে এসে বসে গেল। তার মনে সত্যিই কোন জিজ্ঞাসা ছিল না। সে সাধুকে বিরক্ত করার জন্য নানা অবাস্তব প্রশ্ন করতে লাগল। তার মন ছিল দূষিত—কেবল দুরাগ্রহ ও কু-তর্কে ভরা। বোঝার কোন ইচ্ছাই তার ছিল না। সে সাধুকে প্রশ্ন করল। সাধু শান্তভাবে তার উত্তর দিলেন, তাকে বোঝানোর জন্য নানা রকম চেষ্টা করলেন। কিন্তু

তাঁর সমস্ত প্রয়াসই জলকে মন্থন করার মত বিফল হল। দধিকে মন্থন করলে মাখন পাওয়া যায়, কিন্তু জলকে মন্থন করলে কি পাওয়া যাবে? তবুও সে লোক তার দুরাগ্রহ ছাড়ল না। সাধু হয়রাণ হয়ে গেলেন। ক্রোধকে আসতে দেওয়া উচিত নয়, কিন্তু হয়রাণির ফলে সাধুর ক্রোধ প্রকট হয়ে গেল। তিনি সাধক ছিলেন, একেবারে সিদ্ধ ছিলেন না। তিনি বললেন, 'তুমি বড়ই দুষ্ট, এখান থেকে দূর হও।' তাকে ধাক্কা দিয়ে বের করে দিলেন। এরপরে কাহিনীতে বলা হয়েছে, রাত্রে ঐ সাধকের কাছে ভগবান প্রকট হয়ে বললেন, 'তুমি বড়ই অন্যায় করেছ, ঐ ব্যক্তিকে ঘর থেকে বের করে দিলে?' সাধু বললেন, 'ভগবন্, আর কি করব? ঐ লোক বড়ই দুষ্ট, ক্রোধী ও কু-তার্কিক ছিল, তার বোঝার কোন ইচ্ছাই ছিল না। সুতরাং আমি আর কি করতে পারি?' ভগবান বললেন, 'সাধু! তুমি ভুলে যাচ্ছ যখন আমার সৃষ্টিতে, আমার জগতে, তার জন্যও স্থান আছে, তখন তোমার ওখানেও তার জন্য স্থান থাকা উচিত ছিল।' সাধু বললেন, 'ভগবন্, আপনি পরম শুদ্ধ। আমি তো শুদ্ধ নই। আমি কি করে তাকে স্থান দেব?'

শুদ্ধতা লাভ করলে আর কোন বিকার থাকে না। যখন চেতনা শুদ্ধ হয় তখন সকলের জন্যই স্থান দেওয়া সম্ভব হয়; কিন্তু অশুদ্ধ চেতনা নিয়ে সকলকে স্থান দেওয়া যায় না। ভগবান পরম শুদ্ধ। শুদ্ধের জগতে সব কিছুকেই সমান বোধ হয়। ভাল হোক, মন্দ হোক, নোংরা হোক, পরিষ্কার হোক, স্বরূপ হোক, কুৎসিত হোক—সবই সমান। কিন্তু অশুদ্ধতার ক্ষেত্রে সব সমান হয় না। সেখানে সীমার কথা ওঠে। এই পর্যন্ত দেখ, এই পর্যন্ত অনুভব কর—এসবই সীমার কথা। শুদ্ধতাতে কোন সীমাবন্ধন থাকে না। সবই নিঃসীম হয়ে যায়। আমাদের চেতনা যখন শুদ্ধ হয়, তখন সেই স্থিতিতে সুজন হোক, দুর্জন হোক, ভাল হোক, মন্দ হোক—যা কিছু হোক, কেউই আর কোন সঙ্কটের সৃষ্টি করতে পারে না।

শুদ্ধ চেতনা বা নির্বিকার ধ্যানের কষ্টিপাথর—তার প্রকৃত তত্ত্ব

এই যে, সেই অবস্থায় সুখ-দুঃখ সমান হয়ে যায়। আচার্য- কুন্দকুন্দ বলেছেন, শুধু চেতনায় উপনীত হলে, সাধক সুখ-দুঃখের প্রতি সমান হয়ে যান। তাঁর তখন সুখ বা দুঃখের মধ্যে পার্থক্যবোধ থাকে না, তাঁর তখন দুই-ই সমান বলে মনে হয়। কি করে তা সম্ভব হয়? তিনি কি রকম মানুষ—যাঁর কাছে সুখের অনুভূতি প্রিয় নয়, আর দুঃখের অনুভূতিও অপ্রিয় নয়? এই দুয়ের প্রতি সমান ভাব পোষণ করার অবস্থা কি করে ঘটতে পারে? কবে তা ঘটে, কেনই বা ঘটে? এই অবস্থা অশুদ্ধ চেতনায় কখনই ঘটে না। যখন আমাদের চেতনা শুদ্ধ হয়ে অবিমিশ্র জ্ঞানের স্থিতি প্রাপ্ত হয়, তখন কোন সুখও থাকে না, দুঃখও থাকে না। সুখ ও দুঃখ—এই দুই সংজ্ঞাই তখন লুপ্ত হয়ে যায়। সেই সময়ে শত্রুও থাকে না, মিত্রও থাকে না। শত্রু ও মিত্র—এই দুই সংজ্ঞারই তখন অবসান ঘটে। তখন বেঁচে থাকার জন্য আকাঙ্ক্ষাও থাকে না, মরে যাওয়ার সম্ভাবনায় ভয়ও থাকে না। আকাঙ্ক্ষা আর ভয়—দুই-ই শেষ হয়ে যায়। 'গীতায়' ভগবান কৃষ্ণ এই স্থিতি এ ভাবে বর্ণনা করেছেন—

'সিদ্ধ্যসিদ্ধ্যোঃ সমো ভূত্বা, সমত্বং যোগ উচ্যতে।'

সিদ্ধির অর্থ—উপলব্ধি, সফলতা। অ-সিদ্ধির অর্থ—অনুপলব্ধি, অসফলতা। যে সাধক সিদ্ধি আর অ-সিদ্ধিতে, উপলব্ধি আর অনুপলব্ধিতে, সমান থাকেন, তাঁর সেই সমত্বকে যোগ বলে। সমত্বই নির্বিচারতার স্থিতি।

নির্বিচার ধ্যানকে সামায়িক বলা যায়। ভগবান মহাবীর সামায়িকের ওপর যতটা জোর দিয়েছেন, আর কিছুর ওপর ততটা দেন নি, কারণ, সামায়িক ধ্যান থেকে আলাদা নয়। সামায়িকের নামই ধ্যান। ধ্যান সামায়িক থেকে পৃথক বস্তু নয়। গৌতম মহাবীরকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, 'ভন্তে! সামায়িক কাকে বলে? সামায়িকের অর্থ (বিষয়) কি?' ভগবান মাত্র দু কথায় ছোট একটা উত্তর দিয়েছিলেন, কিন্তু সেই উত্তর খুবই গুরুত্বপূর্ণ। তিনি বলেছিলেন, 'আয়া সমাইএ, সামাইয়স্স

অট্‌ঠে'—আত্মা সামাযিক, আব আত্মাই সামাযিকেব অর্থ। যখন আমবা মূল চেতনাব থাকি, আত্মায় স্থিতিলাভ কবি, তখন সেই স্থিতিব নাম সামাযিক। আপন আত্মায থাকাই সামাযিক। সামাযিকেব বেশে থাকা বাস্তবিক সামাযিক নয, নিজেব আত্মাতে থাকাই বাস্তবিক সামায়িক। আত্মাতে অবস্থানই সামাযিকেব অর্থ, সামাযিকেব বিষয। আত্মা আর সামাযিক দুটি পৃথক বস্তু নয, শব্দ দুটি হলেও বস্তু একই।

আত্মা আব ধ্যানও পৃথক পৃথক বস্তু নয। নির্বিচাব ধ্যানেব উদ্দেশ্য হল, আত্মাতে থাকা। সামাযিকেবও ঐ একই উদ্দেশ্য। তিনটি শব্দ আছে—ধ্যান, নির্বিচাবতা আব সামায়িক। আসলে কিন্তু ঐ তিন একই। সামাযিকে থাকাব অর্থই নির্বিচাব ধ্যানেব অবস্থায থাকা, আব নির্বিচাব ধ্যানেব অবস্থায থাকাব অর্থই সামাযিকে থাকা। কথা দুটি একই। যখনই আমবা আত্মায স্থিত হই—আমাদেব কেবল আত্মদর্শন হয, মনে কোন সংকল্প-বিকল্প হয না, মনেব কোন গতি বা বিচবণ থাকে না, তখনই সেই অবস্থায আমাদেব আত্ম-বমণ হয, আব সেই অবস্থায স্থিতিই সমত্বে স্থিতি, সামাযিকেব স্থিতি। সব দিক থেকেই আমবা তখন সমান হযে যাই, কোন দিকেই আব বিষমতা থাকে না। তখন কেবল সমতা আব সমতা। এই হল, পূর্ণ জাগরূকতাব স্থিতি, চৈতন্যেব স্থিতি। প্রথম যে নেশা, তা সত্যি মদেব নেশা নয—বিচাবেব নেশা। আচ্ছা, মদেব নেশা কি বিচাবেব নেশা থেকে কম হতে পাবে? মদেব নেশায তো মানুষ পাগল হযে যায়, টলমল কবে চলে, কখনও বা পড়েও যায। আবাব, কখনও কখনও দু-চাব ঘণ্টা মূর্চ্ছাব ঘোবেই থাকে। ঠিকই বটে, তবে সে তো জ্ঞান ফিবে পায, সাবধানও হযে যায। কিন্তু বিচাবেব নেশা বডই শক্তিশালী। বিচাবেব নেশায লোকে ঘোবতব লড়াই কবে যায, বদ্ধ উন্মাদ হযে যায। কত সংঘর্ষ, কত উন্মাদনা, কত ঝঞ্ঝাট, কত পাগলামি যে বিচাবেব নেশায উৎপন্ন হয, তা বলে শেষ কবা যায না।

একদিন রাত্রি বেলায় একটি লোক তার বাড়ি থেকে বেরিয়ে এক প্রসিদ্ধ দার্শনিকের বাড়িতে উপস্থিত হয়ে তাঁর বন্ধ দরজায় আঘাত করল। দার্শনিক নিচে এসে দরজা খুললেন। তিনি দেখলেন—সামনে একটি লোক দাঁড়িয়ে, তার মাথা কাঁপছে। তিনি ভাবলেন, 'এ তো দেখছি নেশার ঘোরে আছে। যদি সজ্ঞানে থাকত, জাগরূক বা হুঁশিয়ার থাকত, তবে এমন মাথা ঝাঁকাবে কেন?' দার্শনিক জিজ্ঞাসা করলেন, 'এত রাতে কেন এসেছ?'

'আমার এক জিজ্ঞাসা ছিল। আপনাকে একটা প্রশ্ন করতে এসেছি।' 'আরে। এই হল জিজ্ঞাসার সময়? প্রশ্ন করার সময় এই? এত রাত হয়েছে—বারটা বেজে গিয়েছে, আর এখন তোমার প্রশ্ন করতে আসার সময় হল?'

'এখনই জিজ্ঞাসাটা মনে উঠল, তাই এখনই আপনার কাছে চলে এলাম। এই শহরে আপনার চেয়ে শ্রেষ্ঠ জ্ঞানী ব্যক্তি তো আর পাব না। আপনি অত্যন্ত বুদ্ধিমান। আমার জিজ্ঞাসার উত্তর দিন। আমার প্রশ্ন, ঈশ্বর আছেন, কি নেই?'

'বড় অদ্ভুত লোক দেখছি। এই কি প্রশ্ন করার উপযুক্ত সময়? ঈশ্বর আছেন কিনা—এই প্রশ্নের এত জলদি উত্তর দরকারই বা কেন? এজন্য তোমার কোন কাজ তো এখন ঠেকে নেই। তোমার ঘরে তো আর আগুন লাগে নি যে এখনই উত্তর পেতে হবে। এত জলদি কেন? মনে হয়, নেশায় চুর হয়ে আছ, পাগল হয়ে আছ, তাই এখনই প্রশ্নের উত্তর চাইছ।'

'মহাশয়! নেশাতেই তো এই প্রশ্ন উঠেছে। যখন জাগরূক থাকি, সতর্ক থাকি, তখন ঈশ্বর আছেন কিনা, এই প্রশ্ন ওঠে না। প্রশ্নটা তো নেশার মধ্যেই উঠেছে, আর এই সময়েই তো এর উত্তর পাওয়া চাই।'

'যখন তোমার হুঁশ ফিরবে তখন এসো।'

'যখন আমার হুঁশ হবে তখন কে আর আপনাকে প্রশ্ন করতে আসবে? আমি তো আর প্রশ্ন করব না।'

দেখুন, এখানে হুঁশে থাকার কথা হচ্ছে। কিন্তু বাস্তবে কে হুঁশে আছে? এটাই সম্ভব যে, যিনি প্রশ্ন করছেন তিনি হুঁশে নেই, আর যিনি উত্তর দিচ্ছেন তিনিও হুঁশে নেই। বিচারের, দুরাগ্রহের, মান্যতার নেশা এতই ভয়ঙ্কর যে, মন যখন চঞ্চল হয়ে ঐ দিকে দৌড়য় তখন মনের মাদকতা, মনের চঞ্চলতা মানুষকে পাগল করে দেয়। কেবল পাগলামির মাত্রার তারতম্য থাকে। কেউ চার আনা, কেউ আট আনা, কেউ বার আনা, কেউ একেবারে ষোল আনা পাগল হয়—সে তো কেবল মাত্রার পার্থক্য। অর্থাৎ কেউ কম পাগল, কেউ বেশি পাগল। প্রত্যেক লোকই পাগল, কিন্তু যখন কারও পাগলামি সীমা লঙ্ঘন করে তখন কেবল আমরা তাকে 'পাগল' বলে অভিহিত করি। সব লোকই তার থেকে বেশি কম বা অল্প কম পাগল। যে পাগলের দৌরাত্ম্য সীমা ছাড়িয়ে যায় তার পায়ে বেড়ি, হাতে হাতকড়া পরানো হয়—আর বলা হয়, লোকটা পাগল। যখন সে অনর্গল বক-বক করে, অহংবদ্ধ ভাষা প্রয়োগ করে, তখন সবাই বলে—লোকটা পাগল হয়ে গেছে। নতুবা আমরা তাকে পাগল বলি না। কিন্তু বাস্তবে আমরা সবাই পাগল, আমি-আপনি, ইনি-উনি—সবাই পাগল। বাস্তবে মনের চঞ্চলতার জন্য এই অবস্থার সৃষ্টি হচ্ছে। প্রকৃত প্রস্তাবে মনের চঞ্চলতাই পাগলামি। পূর্ণ হুঁশের স্থিতিতে কেউ নেই। নির্বিচারতার দশাতেই সেই স্থিতি আসে। যেখানে বিচার শেষ হয়, সেখানে সকল পাগলামির অন্ত হয়। তখন কেউ আর পাগল থাকে না, নিরন্তর পূর্ণ হুঁশেই থাকে। যেখানে বিচার নেই সেখানে হুঁশ আছে, পরিপূর্ণ প্রকাশ আছে। সেখানে কোন অন্ধকার নেই। যেখানে হুঁশ নেই, সেখানে অন্ধকার ও আলো জড়িত হয়ে আছে।

আপনি মনে করছেন, এখন এখানে কোন অন্ধকার নেই। তাই যদি মনে করেন, বাইরে রোদে গিয়ে দেখুন। আপনি বুঝতে পারবেন, রোদে যেখানে দাঁড়িয়েছেন সেখানে প্রকাশ অর্থাৎ আলো বেশি, আর এখানে কম। কম প্রকাশের অর্থই হল—অন্ধকার। এটাই হল

আপেক্ষিক স্থিতি। অধিক প্রকাশের তুলনায় কম প্রকাশকে অন্ধকার বলা যায়। কামরার ভেতরের দিকে তাকান—আপনার মনে হবে এখানে প্রকাশ বেশি, ওখানে প্রকাশ অপেক্ষাকৃত কম। সামনে যে রৌদ্রে-ঝলমল দেয়াল আছে, সেখানকার চেয়ে এই বারান্দায় প্রকাশ কম, আর এই বারান্দার চেয়ে ভেতরের কামরায় প্রকাশ আরও কম। তুলনামূলক দৃষ্টিতে দেখলে বোঝা যাবে যে, আমরা যেখানে কেবল প্রকাশ বলে মনে করেছি, সেখানে অন্ধকারও আছে। তবে, এমন এক বিন্দু আছে যেখানে পৌঁছলে অন্ধকার শেষ হয়ে যাবে। তা না হলে, জ্ঞানই বলুন, দর্শনই বলুন, অনুভবই বলুন, বিকাশই বলুন—সর্বত্রই অন্ধকার লুকিয়ে আছে। এই অন্ধকারের পূর্ণ বিলোপ ততক্ষণ ঘটবে না, যতক্ষণ না আমাদের চেতনা শুদ্ধ উপযোগের স্তরে উন্নীত হবে। অবিমিশ্র জ্ঞান আর অবিমিশ্র চেতনার উপযোগ না হওয়া পর্যন্ত অন্ধকার আমাদের সঙ্গে সঙ্গেই চলবে। প্রকাশের মাত্রা কম হলেই আমরা তা অন্ধকার বলে মনে করি না। কিন্তু গভীরভাবে বিচার করলে তা অন্ধকার বলেই বোধ হবে।

এক ঘটনার স্মৃতি আমার মনে আসছে। আমি তখন মাদ্রাজে। আমি একদিন এক জায়গায় বসে ছিলাম, সেখানে আলো ছিল। কিন্তু যখন লেখার প্রশ্ন এল, তখন মনে হল এখানে তো অন্ধকার, এখানে লেখা যাবে না, কারণ লেখার উপযুক্ত আলো এখানে নেই। আমি উঠে আর এক জায়গায় গিয়ে বসলাম, সেখানে আলো বেশি ছিল। লিখতে আরম্ভ করলাম এবং কিছু লিখলামও। কিছুক্ষণ পরে সূক্ষ্ম লিপিতে লেখা একটা পাতা পড়ার প্রয়োজন হল। অক্ষর খুবই সূক্ষ্ম ছিল, তা পড়ার পক্ষে সেখানকার আলো যথেষ্ট ছিল না। সুতরাং সে জায়গা ছেড়ে আর এক জায়গায় যেতে হল। যেখানে আমি আলো মনে করেছিলাম, সেখানেই অন্ধকার হয়ে গেল। লেখার প্রশ্ন আসায় যেখানে আলো ছিল সেখানেই অন্ধকার হল। আমি ঐ আলোয় তো লোককে চিনতে পারছিলাম, কিন্তু লিখতে পারছিলাম না। আবার যখন সূক্ষ্ম

অক্ষর পড়ার প্রয়োজন হল, তখন লেখার উপযুক্ত যে আলো ছিল তাও অন্ধকার গেল। আমাকে আর একটা তৃতীয় জায়গা বেছে নিতে হল।

এই রকম স্থিতিতে কি করে মানা যায় যে, যেখানে আলো থাকে, সেখানে অন্ধকার থাকে না? আলো আর অন্ধকার—দুই-ই এক সঙ্গে চলে। তবে এমন এক বিন্দু আছে যেখানে আলো কেবল প্রকাশই—যেখানে অন্ধকারের লেশমাত্র থাকে না। সেই বিন্দু হল—নির্বিচারতার স্থিতি। সেই বিন্দুতে পৌঁছলেই সমস্ত অন্ধকার শেষ হয়ে যায়। সেখানে পূর্ণ প্রকাশ বিরাজ করে, অবিমিশ্র প্রকাশই বিদ্যমান থাকে। কেবল উজ্জ্বলতা—অন্ধকার কিছুমাত্র নেই। যে দেখবে, কেবল সত্যই দেখবে। সেখানে বাস্তবিক সত্যের দর্শন মেলে। ঐ আলোয় যথার্থ সত্যকেই দেখা যায়। ঐ আলোয় অসত্যের রেখামাত্র থাকে না। পূর্ণ প্রকাশ প্রকট হয়, নির্বিচারতার স্থিতি লাভ হয়।

আমরা ধ্যান করছি। এটাই আমাদের প্রাথমিক অভ্যাস। প্রথম প্রক্রিয়াই হল, মনকে একাগ্র করা, একই বিচারের ওপর মনকে মগ্ন করা, একই দিকে মনকে প্রবাহিত করা। এ রকম করা খুবই ভাল এবং প্রয়োজনও বটে। বস্তুত এ রকম না করে আমাদের গতি নেই। প্রথম দফায় আমরা আর কি করব, আর কি-ই বা হবে? তবে এ রকম করাকেই যেন অন্তিম লক্ষ্য বলে মনে না করি। এর ফলে কিছু অবশ্য হয়—আমি মানছি, কিছু হয়-ই। ধ্যান কালে হয়ত আমরা কিছু দেখতে পাই। সেই দেখাই বাস্তবিক বলে আমরা মনে করতে পারি, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তা বাস্তবিক নয়, মনের পরিণতি মাত্র। এমন সব জিনিষ দেখা যায়, এমন সব শব্দ শোনা যায়, যা বাস্তবিক নয়—ধ্যানের সঙ্গে যার কোন সম্বন্ধই নেই। অথচ এই গুলিকেই বাস্তবিক বলে ধরে নিলাম। এ যেন একটা চক্র। এই চক্রে পড়লে ভ্রান্তি বা বিপর্যয় দূর হয় না, পূর্ণ সত্যের দর্শন হয় না, আত্মার সাক্ষাৎকার হয় না।

আত্মা নির্বিচার, বিচারের দ্বারা সেখানে পৌঁছনো যায় না। আত্মা অ-শব্দ, শব্দের মাধ্যমে সেখানে পৌঁছনো যায় না। আত্মা নির্বিকল্প,

বিকল্পের সাহায্যে সেখানে পৌঁছনো যায় না। আত্মা অচিন্ত্য, চিন্তার দ্বারা সেখানে পৌঁছনো যায় না। কেবল নির্বিচার, নিঃশব্দ, নির্বিকল্প, নিশ্চিন্ত আর নির্মনস্ক স্থিতির দ্বারাই আত্মাতে পৌঁছনো যায়। ঐ স্থিতির যে অনুভব হয়, সেই অনুভবই আমাদের সকল শাস্ত্রের সার নির্যাস।

ধর্মশাস্ত্র বলে, আত্মায় প্রকৃত অনন্ত সুখ আছে, বিষয়াতীত সুখ আছে, অবাধ সুখ আছে। অনন্ত সুখ তাকেই বলে যার কখনও অন্ত হয় না। অবাধ সুখ তাকেই বলে যাতে কখনও বাধা বা বিঘ্ন হয় না। এমন হয় না যে, এখন যদি সুখ হল তো পরক্ষণেই দুঃখ এসে হাজির হবে। এই সুখ অক্ষয়, কখন তা ক্ষীণ হয় না। এই সুখ বিষয়াতীত, বিষয় থেকে তা প্রাপ্ত হওয়া যায় না। এখন আমরা বিষয়াতীত সুখ কি বস্তু তা কল্পনা পর্যন্ত করতে পারি না। সামনে বিষয় নেই, বিষয়ের উপভোগ নেই, তবে সুখ কি করে হয়? শব্দ নেই যে শুনতে পাব, তবে সুখ কি করে হবে? রূপ নেই যে দেখতে পাব, তবে সুখ কি করে হবে, চোখের তৃপ্তি কি করে হবে? সুগন্ধ নেই যে গ্রহণ করতে পারব, তবে ঘ্রাণের সুখ কি করে হবে? উৎকৃষ্ট রস নেই যে আস্বাদন করতে পারব, তবে জিহ্বার সুখ কি করে হবে, রসনার তৃপ্তি কি করে হবে? সুকোমল স্পর্শের অভাবে সুখের কল্পনা কি করে করা যেতে পারে? আমাদের কল্পনা এইসব ইন্দ্রিয়জনিত বিষয়সুখ ছেড়ে অন্যত্র যেতেও চায় না। আমরা স্বীকার করতে চাই না যে বিষয়াতীত সুখও আছে। কিন্তু এটা সত্য যে, বিষয়াতীত সুখ আছে। ইন্দ্রিয়ের বিষয়ের সঙ্গে সেই সুখের কোন সম্বন্ধ নেই। ঐ সুখ বিষয় থেকে উৎপন্ন হয় না, বিষয় তাকে উৎপন্ন করে না। আমরা ঐ সুখের বিষয়ে চিন্তা পর্যন্ত করতে পারি না। আমরা মনে করি, যারা বিষয়াতীত সুখের কথা বলে, তারা অতিরঞ্জন করে, অতিশয়োক্তিপূর্ণ বাক্য প্রয়োগ করে, অযথা বলে। এই হল আমাদের অসুবিধে। আমাদের এই রকম চিন্তায় যে দোষ আছে তাও বলতে পারি না, কারণ আমরা

ইন্দ্রিয়ের স্তরেই জীবন যাপন করি। ঐ স্তর থেকেই চিন্তা করি। আমরা মনের স্তর থেকে চিন্তা করি, আর মনের স্তর থেকে চিন্তা করলে এর বেশি কিছু ভাবা সম্ভব হয় না। আমাদের দোষ নেই—ভাবার বা চিন্তা করার যে স্তরে আমরা আছি, সেই স্তর থেকে যা ভাবা সম্ভব তাই আমরা ভেবেছি, আর সেই ভাবনাকেই বাস্তবিক বলে বোধ করেছি। কিন্তু যখন আমাদের চেতনা সূক্ষ্ম অনুভূতির ক্ষণে এসে পৌঁছয়, নির্বিচারতার শুদ্ধ অনুভূতিতে প্রবেশ করে, তখন সেই ক্ষণে যে সহজ আনন্দ স্ফূর্ত হয়, যে সুখের অনুভব হয়, তাই হল সহজ সুখ—অবাধ সুখ। সেই সুখের ক্ষণিক দর্শন মিললেই অনুভব হয়, বিষয়জনিত সুখ আর সহজস্ফূর্ত বিশুদ্ধ সুখের মধ্যে কতই না পার্থক্য। সেই সহজ বিশুদ্ধ সুখ কত মহান। এই হল নির্বিচারতার স্থিতি, আত্মার স্থিতি—আত্মানুভবের স্থিতি, আত্ম-রমণের স্থিতি। বাইরে থেকে নিজেকে সরিয়ে এনে নিজের মধ্যে সম্পূর্ণরূপে নিজেকে গুটিয়ে আনার স্থিতি। যা ছড়িয়ে ছিটিয়ে ছিল, তাকে অল্পের মধ্যে জড়ো করে রাখার স্থিতি।

আমাদের মস্তিষ্কে অগণিত প্রকোষ্ঠ আছে। একটা লোকের মস্তিষ্কে যত প্রকোষ্ঠ থাকে তা যদি মাটির ওপর পর পর বিছিয়ে দেওয়া যায় তো কন্যাকুমারী থেকে কাশ্মীর পর্যন্ত ভূভাগ ঢেকে যাবে, উপরন্তু কিছু প্রকোষ্ঠ অবশিষ্ট থাকবে। আমাদের মস্তিষ্কে যখন থাকে তখন ঐ প্রকোষ্ঠগুলি অত্যন্ত সঙ্কুচিত থাকে, কিন্তু তাদের বাইরে ফেললে এতটা ভূভাগ ঢেকে যাবে। আমাদের মস্তিষ্কে প্রকোষ্ঠ এত অসংখ্য।

যখন আমাদের চেতনার ছড়িয়ে পড়া বন্ধ করে, চেতনাকে গুটিয়ে এনে, নিজের সমস্ত অনুভূতিকে একত্র করে এক কেন্দ্রে সংহত করা যায় তখন তার কত তীব্র যে অনুভব হবে তা কল্পনাও করা যায় না। তার শক্তি হবে অত্যন্ত প্রবল।

যখন আপনারা ঘর ছেড়ে কোথাও যান—দেশের আর এক স্থানে, কি বিদেশে যান—তখন মনে হবে যাত্রা করছেন। যাত্রার অনুভব

ভিন্ন রকমের। আবার যখন যাত্রা থেকে ঘরে ফেরেন তখন মনে হবে আপনাদের মূল স্থানে এসে গেছেন। মনের যে ছড়িয়ে পড়া, বৃত্তির যে ছড়িয়ে পড়া, বিচারের যে ছড়িয়ে পড়া—তাও এই রকম। যখন তাদের ছড়িয়ে পড়া বন্ধ করে তাদের গুটিয়ে এক কেন্দ্রে আনা যায়, তখন তারা যেন আপন ঘরে ফিরে আসে। এই অনুভূতি অলৌকিক বোধ হয়।

আত্মা মনের মাধ্যমে, ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে, বিচারের মাধ্যমে, স্মৃতির মাধ্যমে, কল্পনার মাধ্যমে চার দিকে দৌড়চ্ছে। তার শক্তি ছড়িয়ে পড়ছে, কেন্দ্রিত হচ্ছে না। যখন আমরা ইন্দ্রিয়ের দরজা বন্ধ করে, বিচার বন্ধ করে, স্মৃতি আর কল্পনা বন্ধ করে—সব কিছু সংযত করে, নিজের ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন চেতনাকে সংহত করে তার মূল স্থানে তাকে স্থাপিত করি, তখন তার ছড়িয়ে পড়া শক্তি কেন্দ্রিত হয়ে যাবে। সেই শক্তি হবে প্রবল। সেই সময়ে বিলক্ষণ এক অনুভব হয়। এমন নয় যে, সেই অনুভব এখন আর আমাদের হতে পারে না। আমি আগেই বলেছি, আজও কেবলজ্ঞান অনুভব করা যায়, অতীন্দ্রিয় জ্ঞান অনুভব করা যায়, আত্মার সহজ আনন্দ অনুভব করা যায়। আমাদের কেবল এটুকু করতে হবে যে, বিচারের ভূমি ছেড়ে নির্বিচারের ভূমিতে পৌঁছতে হবে, স্মৃতি, কল্পনা ইত্যাদি পরিহার করে অবিমিশ্র জ্ঞানের, শুদ্ধ চেতনার আর শুদ্ধ উপযোগের স্থিতিতে পৌঁছতে হবে, আর সেই স্থিতির অনুভব করতে হবে।

জাগরূকতার সঙ্গে দেখতে হবে, মনের কোন ব্যাপার যেন না ঘটে, আর মন যেন শুদ্ধ চেতনার স্থিতিতে কোন বাধার সৃষ্টি না করে। আমরা যদি এতটা জাগরূকতার সঙ্গে দেখতে পারি, আর অবিমিশ্র জ্ঞানের স্থিতি অনুভব করতে পারি, তবে আজও আমাদের পক্ষে কিছুই অসম্ভব হবে না। অনেক কিছু অসম্ভব বলে ধারণা করে বসে আছি, আর সেই ধারণা এই ভাষায় প্রকাশ করছি—এখন কলিকাল, ঘোর কলিযুগ, ঐ সব এখন পাওয়া যায় না, মোক্ষ মেলে না, কেবলজ্ঞান

হয় না, ইত্যাদি। এই রকম ধারণার ফলে মন নিরাশা ও কুণ্ঠায় ভরে যায়, আগে এগোবার জন্য যে পা তুলেছি তা পিছিয়ে পড়ে। আমাদের এগিয়ে যাওয়ার আকুলতা নষ্ট হয়ে যায়, কারণ যদি আমরা মেনে নিই অমুক স্থিতি এখন প্রাপ্য নয়, তবে তার জন্য প্রচেষ্টা কে করবে, আর কেনই বা করবে? আমরা কোন বিশেষ স্থিতি এখন প্রাপ্ত হতে পারি না—এই ধারণা আমাদের দূর করতে হবে। কি পাওয়া সম্ভব, কি পাওয়া সম্ভব নয়, সে চিন্তা আমার অধিকার-ক্ষেত্রের মধ্যে নয়। আমাদের অধিকার কেবল চলার, কেবল চলতে থাকার, কেবল পা আগে বাড়িয়ে দেওয়ার। চরৈবেতি, চরৈবেতি—এই আমাদের কর্তব্য। আমাদের গতিশীল হওয়ার অধিকার আছে, কোন এক নির্দিষ্ট দিকে এগিয়ে যাওয়ার অধিকার আছে।

আমরা নির্বিচার চেতনার স্থিতির দিকে এগিয়ে যাওয়ার জন্য পা বাড়াব। যা ঘটার, তা অবশ্যই ঘটবে। যে উপলব্ধি প্রাপ্তব্য হয়, তা আমরা পেয়ে যাব। যা ঘটার নয়, তা ঘটবে না। যা প্রাপ্তব্য নয়, তা পাওয়া যাবে না। প্রথমেই কেন চিন্তার বোঝা মাথায় তুলে নেব? কেন চিন্তার ভারে নুয়ে পড়ব?

যে ব্যক্তি শুদ্ধ চেতনার স্থিতির—শুদ্ধ উপযোগের স্থিতির—যথেষ্ট দৃঢ় অভ্যাস করেছে, সে নিশ্চিত সেই স্থিতিতে পৌঁছে যাবে, যে স্থিতিতে পৌঁছলে মোক্ষ আছে কি নেই, পরমাত্মা আছেন কি নেই, পরমাত্মার স্থিতিতে সুখ আছে কি নেই—এ সব প্রশ্নই শেষ হয়ে যাবে, মীমাংসিত হয়ে যাবে।

২৮

চেতনার দিক পরিবর্তন

অনেক দিন আগেকার কথা। এক পথিক পথ চলছিল। পথের মাঝখানে এক জঙ্গল পড়ল। সে জঙ্গলে প্রবেশ করল। জঙ্গলের পথ খানিকটা পার হল। তার পরণে সাদা কাপড় ছিল। হঠাৎ তার সামনে চারটি মানুষ এসে দাঁড়াল। তারা ডাকাত। পথিক একলা, তারা চারজন। তারা হেঁকে বলল—'থাম'। পথিক থেমে গেল। তারা তাকে চেপে ধরতে চেষ্টা করল। পথিকেরও গায়ে বেশ জোর ছিল। হাতাহাতি শুরু হল। পথিক কিছুক্ষণ লড়াই করল। কিন্তু সে একা, লুটেরারা চারজন। কতক্ষণ আর তাদের ঠেকিয়ে রাখতে পারবে? ডাকাতরা তাকে জাপটে ফেলল। তার শরীর তল্লাসী করল। কিন্তু তারা শুধুই হয়রাণ হল। তার কাছে একটি পয়সা ছাড়া আর কিছুই পাওয়া গেল না। ডাকাতরা আশ্চর্য হয়ে তাকে জিজ্ঞাসা করল—'ওহে! এক পয়সার জন্য এত লড়াই করলে? প্রথমেই যদি এ কথা বলতে, তাহলে আমরা তোমার ওপরে হামলা করতাম না।' পথিক বলল—'প্রশ্ন তো এক পয়সার নয়, প্রশ্ন আকর্ষণের। এক পয়সাই হোক আর হাজার টাকাই হোক, আমার ধনের ওপরে আকর্ষণ। হাজার টাকা থাকলে আমার যতটা আকর্ষণ থাকত ঐ এক পয়সার

ওপবও আমাব সেই আকর্ষণ। প্রশ্ন সংখ্যাব নয, প্রশ্ন আকর্ষণেব।'

মূল কথা হল আমাদেব আকর্ষণ কোন্ দিকে যাচ্ছে। আমাদেব আকর্ষণ এক বিশেষ দিক-অভিমুখী হলে আমাদেব প্রবৃত্তি, চিন্তা এবং ক্রিয়া এক বকম হবে, আব যদি আমাদেব আকর্ষণ অন্য আব এক দিক-অভিমুখী হয তো আমাদেব প্রবৃত্তি, চিন্তা ও ক্রিযা অন্য রকম হবে। আকর্ষণই প্রধান কথা। তা সব কিছুব মধ্যেই পবিবর্তন এনে দেয।

প্রশ্ন হচ্ছে—অ-ব্রত কি? ব্রত কি? এক দিক অভিমুখী আকর্ষণ অ-ব্রত, আর অন্য আব এক দিক অভিমুখী আকর্ষণ ব্রত। দুটি দু বকম জিনিস নয়। দুটি একই জিনিস। কেবল দিকেব পবিবর্তন। ব্রত ও অ-ব্রত দুই বিপবীত দিক-অভিমুখী পথিক।

যে আকর্ষণ আত্মা থেকে নির্গত হযে বাইবেব দিকে যায় সেই আকর্ষণেব নাম অ-ব্রত। আব যে আকর্ষণ বাইবে থেকে ফিবে আত্মাব অভিমুখে প্রবাহিত হয তাকে বলা হয ব্রত। ব্রত কোন নতুন জিনিস নয। আকর্ষণেব দিক পবিবর্তনেব নাম ব্রত। ইন্দ্রিযেব মাধ্যমে আমাদেব আকর্ষণ বহির্মুখী। এক আছে আমাদেব মূল চেতনা। এই চেতনাকে ঘিবে এক কষায-বলয দিকে আছে। কষায-বলযেব পবে আছে প্রবৃত্তিব বলয। কষায-আত্মা ও যোগ আত্মা এই দুটি দ্রব্য আত্মাব সঙ্গে যুক্ত হযেছে। মূল-চেতনা, কষায-বলয, যোগ-বলয আব প্রবৃত্তি-বলয। আমাদেব জ্ঞান থেকে নিঃসৃত বশ্মি কষাযেব সঙ্গে মিশ্রিত হলে স্বকীয জ্ঞানরূপ হাবিযে ফেলে এবং সংবেদনেব রূপ নেয়। জ্ঞান সংবেদনে পবিণত হয। যতক্ষণ পর্যন্ত জ্ঞানধাবাব সঙ্গে কষাযেব মিশ্রণ না হয ততক্ষণ জ্ঞান জ্ঞানই থাকে। বিশুদ্ধ জ্ঞান রূপে থাকে। যখন কষায জ্ঞানধাবাব সঙ্গে মিশ্রিত হয তখন জ্ঞান সংবেদনে পবিণত হয। তাব আব বিশুদ্ধ জ্ঞান রূপ থাকে না। সংবেদন থেকে আকর্ষণ উৎপন্ন হয। বাগেব আকর্ষণেব উদ্ভব হয, দ্বেষেব আকর্ষণব জন্ম হয। সমস্ত আকর্ষণেব উদ্ভব হয সংবেদন থেকে। বিষযেব প্রতি আকর্ষণ হয, তাব তাব মূল কাবণ সংবেদন। খাদ্য সুস্বাদু মনে হয, কাবণ জিহ্বাব নিজস্ব

সংবেদন আছে। সুগন্ধ বস্তু শুঁকতে ভাল লাগে, তার কারণ নাকের নিজস্ব একটা সংবেদন আছে। মন ঐ সবের দিকে আকৃষ্ট হয়। কাউকে গালাগালি করলে গালাগালির প্রতি আকর্ষণ হয়, তার কারণ তখন আমরা জ্ঞানের জগতে বাস করি না, সংবেদনের জগতে বাস করি। সংবেদনের জীবন প্রতিক্রিয়ার জীবন। জ্ঞানের প্রভাবে মানুষ ক্রিয়া করে। সংবেদনে প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়। জ্ঞান স্বতন্ত্র, সংবেদন পরতন্ত্র। জ্ঞানের প্রভাবে মানুষ নিজস্ব ভঙ্গিতে ক্রিয়া সম্পাদন করে। সংবেদনে নিজস্ব কোনও ক্রিয়া হয় না, প্রতিক্রিয়া হয়। সামনের লোক যে রকম ক্রিয়া করে, সেই রকম ক্রিয়া করায়। কেউ পাথর ছুঁড়ছে দেখলে সে-ও পাথর ছোঁড়ে। কেউ প্রশংসা করলে সে-ও প্রশংসা করে। অর্থাৎ ক্রিয়ার প্রতিক্রিয়া হয়। প্রতিবিম্ব হয়। স্বতন্ত্র কোন ক্রিয়া হয় না। সে লোকের নিজস্ব কোন ক্রিয়া সম্পাদন করার ক্ষমতা থাকে না। ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য, চিন্তন, মনন এবং ক্রিয়ার স্বাতন্ত্র্য—এ সবই জ্ঞানের অবস্থায় সম্ভবপর, সংবেদনের অবস্থাতে নয়। থালাতে করে খাবার এসেছে। যদি রুচিকর এবং মনোরম খাদ্য হয় তবে প্রশংসা করা হয়, অপ্রিয় এবং অরুচিকর হলে অখাদ্য বলে গালি দেওয়া হয়। এ সবই প্রতিক্রিয়ার জীবন। 'যে যেমন তার সঙ্গে তেমন ব্যবহার', 'শঠের সঙ্গে শাঠ্য আচরণ কর'—এ সবই সংবেদনের ক্ষেত্রে প্রচলিত সিদ্ধান্ত, প্রতিক্রিয়ার ক্ষেত্রে প্রচলিত মতবাদ। 'শঠে শাঠ্যের' অর্থ—প্রতিক্রিয়া, ক্রিয়া নয়।

সংবেদনের জগতে যে জীবন যাপন করে সে ক্রিয়ার জগতে বাস করতে পারে না। সে নিজস্ব ক্রিয়া সম্পাদন করতে অসমর্থ। সে যা কিছু করে সবই প্রতিক্রিয়া। আপনি নিজের কার্যকলাপ লক্ষ্য করে দেখুন। একশটা কাজের মধ্যে একশটাই প্রতিক্রিয়া-প্রেরিত মনে হবে। ঐ লোক আমার উপকার করেছে, আমিও তার উপকার করব। ঐ লোকটি আমার নিন্দা করে অনিষ্ট করেছে, আমিও তার অনিষ্টকর নিন্দা করব। ঐ লোকটি আমাকে অপমানিত করেছে, আমিও তাকে

অপমান করব। এ সবই প্রতিক্রিয়া। আমাদের মনে অনেক বিজার্ভেশন বা ভাবগুপ্তি, অনেক অবরোধের প্রক্রিয়া হয়। তা মানুষকে প্রতিক্রিয়ার জীবন যাপন করতে বাধ্য করে। কারণ তার ভেতরে জ্ঞান নেই, সংবেদন আছে। সংবেদন মানুষকে অ-ব্রতের দিকে নিয়ে যায়। হিংসা, অসত্য, চুরি, অ-ব্রহ্মচর্য এবং মমত্ব—এ সবই সংবেদনের প্রতিফলন, প্রতিক্রিয়ার পরিণাম।

লোকে অনেক কিছু সংগ্রহ করে। প্রশ্ন হচ্ছে—কেন? ঐ রকম সংগ্রহ করার কি কোন প্রয়োজন আছে? তা কি এতই উপযোগী? প্রয়োজন নেই, উপকারও নেই, তবুও লোকে সংগ্রহ করে। এর মূল কারণ প্রতিক্রিয়া। সে ভাবে—'অমুক লোক ধন অর্জন করেছে, বিত্ত সংগ্রহ করেছে এবং আজ সে সমাজে সমাদৃত। লোকে তাকে সম্মান দেয়, পূজা করে। তাকে সামনের পংক্তিতে বসানো হয়। এই রকম পরিস্থিতিতে আমিও কেন ধনোপার্জন করব না? ধন সংগ্রহ করাতে কি আপত্তি থাকতে পারে?' এই প্রতিক্রিয়া দ্বারা প্রভাবিত হয়ে সে ধন সংগ্রহ করে। তার পক্ষে অত ধনের কোন প্রয়োজন নেই, তবু সে ধন সংগ্রহ করে। সে এই রকম চিন্তা করে: 'এই রকম করলে যদি এই রকম ফল হয় তবে আমারও ঐ রকম করা উচিত।' এ সবই হল সংবেদনের জীবন, সংবেদনের চিন্তাধারা। যতদিন পর্যন্ত জ্ঞানের ধারার সঙ্গে কষায়ের ধারার সংমিশ্রণ হতে থাকবে, ততদিন পর্যন্ত আমরা এই রকম জীবন থেকে নিজেদের বাঁচাতে পারব না।

অজ্ঞানে হিংসা হয় না। কোন অজ্ঞানী অর্থাৎ জ্ঞানশূন্য জীব, বা জড় পদার্থ কখনও হিংসা করতে পারে না। প্রাণী বা জীবই শুধু হিংসা করে। যে জীবের জ্ঞান আছে সে-ই শুধু হিংসা করতে পারে। হিংসা সজ্ঞানে সম্পাদিত হয়। অসত্যাচরণ সজ্ঞানে সাধিত হয়। চোর চুরি করে সজ্ঞানে। বাসনা এবং কামনা জ্ঞানের সীমার মধ্যে ঘটে। মমত্বের সংগ্রহও জ্ঞানের সীমার মধ্যে হয়ে থাকে। অচেতন পদার্থ দ্বারা হিংসা বা কোন কিছু হতে পারে না। প্রশ্ন হচ্ছে—এ রকম কেন

হয়? চেতনা কি এই রকম জিনিস চায়? তা কি আত্মার ধর্ম? তা কি আত্মস্বভাব? ঐ সমস্ত ক্রিয়া আত্মার স্বভাব নয়। কষায় বিহ্বল জ্ঞানের দিক থেকে এই সমস্ত ক্রিয়া সম্পাদিত হয়। যখন জ্ঞান কষায়ের দ্বারা প্রাবিত হয়, বিহ্বল হয়, তখন এই সব কাজ হয়। যখন কষায়ের রসায়ন জ্ঞানের ধারার সঙ্গে মিশে যায় তখন অসদাচরণকে সদাচরণ বলে, প্রিয় বলে মনে হতে থাকে। এই সব বস্তুর প্রতি আকর্ষণ বেড়ে যায়।

এক জনকে গালি দিয়েছে। যতক্ষণ গালির প্রতিশোধ গালি দ্বারা না হয় ততক্ষণ সে ভাবে—'ওহো। এ আমি কি করলাম? গালির উত্তরে গালি দিলাম না। লোকে কি ভাববে? তারা বলবে—'ও তো মাটি দিয়ে তৈরি। ওর মধ্যে কোন কর্তৃত্ব নেই। এত বড় অপমান। তাও সয়ে গেল। ও তো কেবল মাটির পুতুল।' মনের ওপরে প্রতিক্রিয়া হয়। যখন সে ঐ রকম পালটা আচরণ করতে পারে, গালির বদলে গালি দিতে পারে, তিরস্কারের জবাব তিরস্কারে দিতে পারে, তখন তার সন্তোষ হয়। এ হল আকর্ষণের ব্যাপার, সন্তোষের ব্যাপার। ও সবই কষায়—রসায়নের প্রতিক্রিয়া। তার মিশ্রণ হলে মানুষের চিন্তার ধারা বদলে যায়। সে ভাবে—'এর চেয়ে বড় কোন সন্তোষ নেই, কোন আনন্দ নেই। কোন তৃপ্তি নেই।' সাপে কামড়েছে, নিম খাওয়ানো হচ্ছে। নিম তেতো, কিন্তু মিষ্টি লাগছে। নিম তো মিষ্টি নয়, তেতো। কিন্তু তা মিষ্টি মনে হচ্ছে। কেন? তার কারণ রক্তে এমন একটা রসায়ন অর্থাৎ সাপের বিষ প্রবেশ করেছে যে নিমের কারবাইড তাতে লীন হয়ে যায়, নিম মিষ্টি লাগে। সেই রকম মনে যতটা কষায়ের পরিণাম বা ফল প্রবেশ করবে আমাদের অনুভূতি, চিন্তা অথবা তৃপ্তিকে ততটা বদলে দেবে, সন্তোষ এবং অসন্তোষকে নতুন রূপ দেবে।

একটি পৌরাণিক কাহিনী বলি। একবার ইন্দ্র এবং ইন্দ্রাণী দুজনে মনুষ্যলোকে এলেন। তাঁরা ঘুরে বেড়াতে বেড়াতে এক গ্রামে এসে

পৌঁছলেন। সেখানকার সব লোকই খুব গরীব। তারা সকলেই দুঃস্থ। ইন্দ্রাণীর মন করুণায় ভরে উঠল। তিনি ইন্দ্রকে বললেন—'দেব। আপনি যখন এ গ্রামে এসেছেন তখন একে সম্পদশালী করে দিন। ঐ লোকগুলি কেন গরীব থাকবে? ওদের মনে সন্তোষ নেই। আপনি কৃপা করে এদের সমৃদ্ধ করে দিন যাতে এরা সন্তোষের সঙ্গে জীবন যাপন করতে পারে।' ইন্দ্র বললেন—'তুমি ঠিকই বলেছ। আমি এদের সমৃদ্ধ করে দেব, কিন্তু তাদের সন্তুষ্ট করব এ দায়িত্ব আমি নিতে পারব না। তুমি কি সে দায়িত্ব নিতে পারবে?' ইন্দ্রাণী বললেন—'আপনি এদের সমৃদ্ধ করে দিন। এদের দারিদ্র্য দূর হোক। দারিদ্র্য দূর হলে অসন্তোষ আপনা থেকেই মিটে যাবে, তারা নিজে নিজেই তুষ্ট হবে। আমার কোনও দায়িত্ব নিতে হবে না।' ইন্দ্র বললেন—'দেবি। তুমি জান না, এ রকম কখনও হয় না। আমি জানি, ও রকম হবে না। সম্পদ লাভ হলেই যে সন্তোষ হবে তার কোন নিশ্চয়তা নেই।' ইন্দ্রাণী জেদ করলেন। ইন্দ্র গাঁয়ের বাইরে একটা সোনার খনি করে দিলেন। গাঁয়ের লোক তার খোঁজ পেল। তারা জানতে পারল যে গাঁয়ের বাইরে ভাল ভাল সোনা পড়ে আছে। যে যত চায়, নিয়ে আসতে পারে। তাদের সোনার মূল্য জানা ছিল। তারা জানত, সোনা কত মূল্যবান। গাঁয়ের সব লোক এসে সেই সোনা নেওয়ার জন্য ঝুঁকে পড়ল। সকলের আকর্ষণ একই দিকে চালিত হল। সবাই এল। যে যত পারল সোনা নিয়ে গেল। গ্রামে এমন একজনও অবশিষ্ট রইল না যে সোনা নেয় নি। সারা গাঁ এক দিনে ধনবান হয়ে গেল। সবাই সম্পদশালী হল। এক দিন আগে সবাই দরিদ্র ছিল। আজ সবাই ধনবান হয়ে গেল। খুব চমৎকার ব্যাপার হল।

রাত কাটল, সকাল হল। ইন্দ্র এবং ইন্দ্রাণী সেখানে ছিলেন। গ্রামে আলোচনা হতে থাকে। কেউ বলল, 'এ কি ব্যাপার? কেমন করে হল? কোন দেবতা এই অদ্ভুত কাজ করেছেন। আবার এ-ও মনে হচ্ছে, যে এ রকম করেছে সে নিতান্ত মূর্খ।' সবাই বলে উঠল,

'সে কি ? মূর্খ হল কি করে ?' যে আমাদের এত ধন দিয়েছে তাকে মূর্খ বলছ কেন ?' সে বলল, 'সে যদি বুদ্ধিমান লোক হতো তবে কখনই সবাইকে সে সোনা দিত না। কয়েক জনকে সোনা দিলে তার একটা অর্থ হতো। সবাকে সোনা দেওয়াতে সোনার আর কোন অর্থ বা মূল্য রইল না। এখন সবাই ধনবান হয়ে গেল। কেউ আর সেবক রইল না। এখন আর ভৃত্য বা সেবক থাকবে না। এখন কাজ চলবে কি করে ? আমাদের কাছে ধন আছে, অথচ আমাদের ভৃত্য-পরিজন নেই, তবে ধন লাভের অর্থ কি ? ছোট-বড় সব সমান হয়ে গেল।' ইন্দ্র শুনলেন। তিনি ইন্দ্রাণীকে বললেন—'শুনলে তো ? এদের সন্তোষ বৃদ্ধি পেয়েছে, না অসন্তোষ বৃদ্ধি পেয়েছে ? ধন দেওয়া আমার হাতের মধ্যে ছিল, কিন্তু সন্তোষ দেওয়া আমার হাতের মধ্যে ছিল না।'

এটা কাহিনী মাত্র। কিন্তু আমরা এর ভিত্তিতে একটু চিন্তা করলে দেখি অসন্তোষ কোন বস্তুর আধারে ঘটে না। কষায়জড়িত চেতনার আধারে অসন্তোষ উৎপন্ন হয়। কষায়গ্রস্ত চেতনার ধারার একটি লক্ষণ যে, মানুষ অন্যের চেয়ে বড় হতে চায়। যত তার লোভের পূরণ হয় তত তার আত্মাভিমান বাড়ে, তত সে সবার চেয়ে বড় হতে চায়। যখন আশেপাশে সবাই ছোট এবং শ্রমজীবী হয় তখন সে নিজের শ্রেষ্ঠত্ব অনুভব করে। একবার চোখ তুলে ভ্রূকুটি করলে দশ-বিশ জন লোক সামনে এসে দাঁড়িয়ে যাবে, তবে তো বড় হওয়ার মজা, শ্রেষ্ঠত্বের আনন্দ পাওয়া যাবে। ধনবান হওয়ার, ক্ষমতার অধিকারী হওয়ার আনন্দ তখনই পাওয়া যাবে। তা না হলে সবই ব্যর্থ। ধনবান হওয়ার ব্যাপার যেমন, অন্য অন্য জিনিসের ক্ষেত্রেও ব্যাপার তেমনি। এতে কি লাভ ? লোকের সন্তোষ হয় না। যখন লোকে অগ্রণী হয় তখন তার সন্তোষ হয়। তার পেছনে এক লম্বা সেবকের সারি চলতে হবে। কষায়-চেতনার ফলে এ সব প্রতিক্রিয়া হয়। যখন চেতনার কষায়-আবরণ বিচ্ছিন্ন হয়ে চেতনার বিশুদ্ধ ধারা

প্রবাহিত থাকে তখন সমস্ত আকর্ষণের সমাপ্তি ঘটে এবং মানুষের মধ্যে অহিংসা প্রভৃতি সদাচার বিকশিত হয়।

ভগবান মহাবীর একদা কায়োৎসর্গ মুদ্রায় এক শূন্য গৃহে ধ্যানস্থ অবস্থায় দণ্ডায়মান ছিলেন। কতকগুলি লোক সেখানে এল। তারা তাঁকে গালি দিল, তার পরে তাঁকে প্রহার করল। কিন্তু কোন পরিবর্তন হল না। শুরুতে যে ধ্যানের প্রবাহ চলছিল তা গালি দেওয়ার সময়েও চলতে থাকে, প্রহারকালেও চলতে থাকে। কোন পরিবর্তন ঘটল না। ধ্যানের ধারা খণ্ডিত হল না। তা অখণ্ডিত ভাবে লক্ষ্যে নিবদ্ধ রইল। আমরা ভাবি—এ রকম ক্ষেত্রে মানুষের তো পরিবর্তন আসা উচিত। ভগবান মহাবীর কি শূন্যবৎ হয়ে গিয়েছিলেন, কিংবা তাঁর মধ্যে পরিবর্তন হয়েছিল কিন্তু লক্ষিত হয় নি? এর কারণ কি? এর মূল কারণ—দিক পরিবর্তন। তাঁর চেতনার পরিবর্তন ঘটেছিল। তাঁর প্রবাহের দিক পরিবর্তন হয়েছিল। তাঁর চেতনা নিজের দিকে প্রবাহিত হয়েছিল। গালাগালি তাকে ভেদ করতে পারে নি। কারণ তাঁর চেতনা অ-শব্দ বা শব্দের অতীত দশায় উপনীত হয়েছিল। সেখানে সমস্ত শব্দের সমাপ্তি ঘটেছিল। তা শব্দার্থের অতীত অবস্থা।

একদা ভগবান ধ্যানে স্থিত ছিলেন। কতকগুলি রূপসী যুবতী এসে তাঁকে প্রার্থনার সুরে বলল—'প্রভু, এ আপনি করেছেন? আপনি অসময়ে যোগ আচরণ করছেন কেন? আপনি আমাদের কেন ত্যাগ করছেন? আপনি একবার ঘরে চলুন, আমাদের সঙ্গে বাস করুন। আমাদের অনুরোধ রক্ষা করুন। আমাদের কৃতার্থ করুন।' মহাবীরের ধ্যানের ধারা অবিচলিত রইল। কোন পরিবর্তন ঘটল না। তাঁর মধ্যে অনুগ্রহ বা নিগ্রহ কোন কিছুই অবশিষ্ট ছিল না। তাঁর কারণ, ভগবান মহাবীরের আকর্ষণের দিক পরিবর্তন হয়ে গিয়েছিল। যিনি ক্ষণমাত্র আগে রাজচক্রবর্তীর মত বৈভবশালী ছিলেন, পর মুহূর্তে সব কিছু ছেড়ে অকিঞ্চন হয়ে গৃহত্যাগ করেছিলেন—এ কেমন করে সম্ভব হয়েছিল? আকর্ষণের দিক পরিবর্তন হওয়াতেই তা সম্ভব হয়েছিল।

দিক পবিবর্তনেব নামঃ ব্রত, প্রব্রজ্যা, সন্ন্যাস।

অহিংসা ক্রিযা, হিংসা প্রতিক্রিযা। সত্য ক্রিযা, অসত্য প্রতিক্রিয়া। অকিঞ্চনতা ক্রিযা, সংগ্রহ প্রতিক্রিযা। যাব মধ্যে আকর্ষণেব দিক পবিবর্তন ঘটেছে তাব পক্ষে অহিংসা, সত্য, অসংগ্রহ প্রভৃতি সহজ হযে যায, স্বভাবে পবিণত হয। তাব পবে তাব পক্ষে হিংসা কবা সম্ভব হয না, অসত্য ভাষণ বা চুবি কবা সম্ভব হয না, সংগ্রহ কবা বা আসক্ত হওযা সম্ভব হয না। এসব হল আকর্ষণেব দিক পবিবর্তনেব প্রতিফলন। তখন তাব গতি আত্মাভিমুখী হয। চেতনা আত্মাব দিকে প্রবাহিত হতে আবম্ভ কবে। তা ব্রত, সুমহৎ সমাধি।

গৌতম ভগবান মহাবীবকে জিজ্ঞাসা কবেছিলেন—'ভন্তে। কোন লোক ঘুমায, কেউ কেউ জেগে থাকে, কেউ কেউ নিদ্রিত অবস্থায জেগে থাকে। এ কথা কি ঠিক?'

মহাবীব বললেন—'গৌতম। ও কথা ঠিক। যাব আকর্ষণ বিষযেব প্রতি, যাব আকর্ষণ বাইবেব দিকে ধাবিত হয, সে লোক ঘুমিযে থাকে। যাব চেতনা নিবন্তব আত্মাব দিকে প্রবাহিত হয, যাব আকর্ষণ শেষ হযেছে, সে জেগে আছে, সে সর্বদা জাগ্রত থাকে। যাব চেতনা কখনও বাইবেব দিকে ধাবিত হয, আবাব কখনও কখনও থেমে গিযে ভেতবেব দিকে প্রবাহিত হয সে ঘুমিযে জাগে। ঘুমিযেও থাকে, আবাব জেগেও থাকে।

ব্রত জাগবণ। চেতনাব জাগ্রত অবস্থাকে ব্রত বলে। তাবই নাম সমাধি। এই অবস্থায পৌঁছলে মানুষেব সব সমস্যাব সমাধান হযে যায বলে এই অবস্থাকে সমাধি বলে।

কষাযকে ঘিবে চাব দুযাব আছে—অনন্তানুবন্ধী, অপ্রত্যাখ্যানী, প্রত্যাখ্যানী এবং সংজ্বলন। প্রথম দুযাব অনন্তানুবন্ধী। যে এব ওপবে আঘাত কবে, প্রহাব কবে তাব দৃষ্টিকোণ সম্যক হযে যায। তাব দৃষ্টি সমীচীন হয। সে সত্যেব দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ কবে। যে লোক দ্বিতীয দবজায, অপ্রত্যাখ্যানী কষাযেব ওপবে আঘাত করে, ঐ দুযাব ভেঙ্গে

ফেলে, সে ব্রতী হতে পাবে, সে ব্রতেব ভূমিতে প্রবেশ কবতে সমর্থ হয। যে তৃতীয় দুযাব প্রত্যাখ্যানী কষাযেব ওপবে আঘাত কবে, সে মহাব্রতী হয়, দীক্ষিত হয, প্রব্রজ্যা লাভ কবে। যে চতুর্থ দুযাব সংজ্বলন কষাযে আঘাত করে সে বীতবাগ, বাগ, দ্বেষ প্রভৃতি সব কিছুব অতীত হযে যায।

কষায় চেতনাব ওপবে আঘাত কবলে তবে ব্রত এবং মহাব্রত প্রাপ্তি হয। যতদিন পর্যন্ত কষাযের বলযে আঘাত কবে তাকে ভেঙ্গে ফেলা না যায় ততদিন পর্যন্ত মানুষ ব্রতীতে পবিণত হতে পাবে না। ব্রত অতি উচ্চ স্তবেব সমাধি বা সমাধান। তাতে চেতনাব পবিবর্তনেব ক্ষমতা এসে যায। তাব সমাধান হযে যায, তাব সমাধি মিলে যায। তাকে আব কেউ সন্তাপ দিতে পাবে না। ক্রোধ, অভিমান, মাযা বা লোভ—কিছুই তাকে সন্তপ্ত বা বিচলিত কবতে পাবে না। বাগ বা দ্বেষ তাকে ক্লেশ দিতে পাবে না। তাব সব কিছু সমাহিত হযে যায। সব সমস্যাব সমাধান হযে যায। আব কোন বন্ধন হয না।

লোকে ব্রতী হতে চায। কিন্তু আবদ্ধ হওয়াব ফলে ব্রতীতে পবিণত হতে পাবে না। বন্ধন কি? এক বন্ধন, মানুষেব কষাযেব চেতনাব প্রবলতা। সে এখন পর্যন্ত কষায চেতনাব ওপবে আঘাত কবতে পাবে নি। সে এখনও অব্যবস্থিত, সংশয়ে দোদুল্যমান। সাধনাব পথ তাব ভাল লাগে, কিন্তু সে পথে সে পৌঁছতে পাবে না। সে চিন্তা কবে—'আমি একলাই চলব। দুনিযা তো আমাব সাথে চলবে না।' সঙ্কল্প দুর্বল হযে যায, বিশ্বাস তৈবি হয না, পথ মেলে না। কষাযেব ওপবে আঘাত না কবলে সে কাজ পুবো হবে না। কষায চেতনাব ওপবে আঘাত পডলে বিবতি উৎপন্ন হয। 'বতি' শব্দেব অর্থ বমণ কবা। তাব অর্থ, আনন্দ কবা। আনন্দ গ্রহণে বত হওযা। 'বিবতি' কথাটিব অর্থ সাংসাবিক আনন্দ থেকে দিক পবিবর্তন কবে বিপবীত দিকে মনকে নিযে যাওযা। বিরতি বতিব সম্পূর্ণ বিপবীত মার্গ।

দুই ভাই ছিল। তাবা বস্ত্রেব ব্যবসা কবত। বড ভাই তাব স্ত্রী

এবং পুত্রকে ত্যাগ করে সংসার ছেড়ে চলে গেল। ছেলে বড় হল। একদিন তার মা তাকে বলল—'বাছা। তোর বাবা আমার কাছে এক পুঁটলি রেখে গিয়েছেন। তাতে রত্ন আছে। কাকার কাছে নিয়ে গিয়ে ওগুলি বাজারে বেচে আয়। এখন দর উঁচু। অনেক টাকা পাওয়া যাবে।' সে কাকার কাছে এল। কাকা পুঁটলি খুলল না, সেটা আবার বেঁধে দিয়ে বলল—'এটি তোমার মাকে দিয়ে দিও। বাজার এখন মন্দা চলছে। এগুলি চড়া দরে বিক্রি হবে না। দর কমতি হবে।' ছেলে মার কাছে এসে সব কথা বলল।

কয়েক মাস গেল। বছর গেল। ছেলেটি কাকার কাছে রত্ন পরীক্ষা শিখতে লাগল। অনুভব বাড়তে লাগল। একদিন কাকা বলল—'বাছা। বাজার এখন তেজী চলছে। যাও, সেই পুঁটলিটি নিয়ে এস, রত্নগুলি বেচে দেব।' ছেলেটি দৌড়তে দৌড়তে মার কাছে গেল। পুঁটলিটি দোকানে নিয়ে এল। কাকা গদিতে বসে ছিলেন। তাঁর কাছে দু-এক জন লোকও ছিল। ছেলেটি পুঁটলিটি খুলল। তার চোখ ঝলসে গেল। সে স্তব্ধ হয়ে গেল। বলে উঠল—'আরে। এ কি। রত্ন কোথায়? হীরা কোথায়? এ সব তো কাচের টুকরো। সবগুলিই কাচ। এ কেমন করে হল? হীরা কি পালটে কাচ হয়ে গেল, না আসলেই এগুলো কাচের টুকরো?' সে পুঁটলিটি গলিতে ছুঁড়ে ফেলে দিল। কাকা বলল—'ওহে। এ তুমি কি করলে? আমি কি বলব?' ছেলেটি বলল—কাকা। আমি বুঝতে পেরেছি, এ সবই কাচের টুকরো ছিল। হীরা ছিল না, রত্ন ছিল না।'

ধারণার পরিবর্তন হয়েছিল। আসলের পরীক্ষা হয়ে গিয়েছিল। ঠিক পরিস্থিতি সামনে এসে গিয়েছিল।

পরিবর্তন কেন আসে?

যাঁরা ত্যাগীতে বা মহাব্রতীতে পরিণত হন তাঁদের নতুন জন্ম হয় না। তাঁদের মধ্যে কেবল চেতনার প্রবাহের দিক পরিবর্তন হয়, আকর্ষণের পরিবর্তন হয়। যে জিনিস আগে ভাল লাগত, যে জিনিস

কষায় চেতনার প্রভাবে মনোজ্ঞ মনে হতো, আজ দিক পরিবর্তন হওয়ার ফলে তা একেবারে বিপরীত লাগে, অর্থাৎ মোটেই চিত্তাকর্ষক মনে হয় না।

সম্রাট অশোকের মনে এক ভাবনা জেগেছিল, 'আমি সংসারের সবার ওপরে আমার শাসন প্রতিষ্ঠা করব।' ঐ ভাবনা একদিন তীব্র ছিল। ভাবনার পরিবর্তন হল, তাঁর আকর্ষণের গতি বদলে গেল—'আরে! যুদ্ধ করা তো পাগলামো। নরহত্যা নিচ কাজ।' তাঁর আকর্ষণ বদলে গেল। তিনি শিলালিপি উৎকীর্ণ করালেন—'কারোর সঙ্গে লড়াই কোরো না। কলহ কোরো না। যুদ্ধ কোরো না।' কলিঙ্গ-যুদ্ধে যে সম্রাট লক্ষ মানুষ হত্যা করেছিলেন, তিনি সকলকে ভালবাসার কথা বললেন। এটা কেমন করে সম্ভব হল? চেতনার দিক পরিবর্তনের ফলে এটা সম্ভব হয়েছিল। যে লোক নিজের চেতনার সঙ্গে কষায়-চেতনার সংযোগ হতে দেয় না, সে নিজের চেতনা-প্রবাহের মোড় ফেরাতে সমর্থ হয়, তার পরিবর্তন আনতে সমর্থ হয়। তার আকর্ষণ মিটে যায়। পুরনো মূল্যবোধের দৃষ্টি বদলে যায়। নতুন মূল্যবোধের প্রতিষ্ঠা হয়। যে সমস্ত জিনিস অর্থপূর্ণ বলে মনে হতো সেগুলি এখন অর্থহীন, অসার মনে হতে আরম্ভ করে। এই মনোভূমির, এই চেতনার দিকের নাম ব্রত। ব্রত এক। উপযোগের দৃষ্টিতে তা পাঁচ, বার, বা অসংখ্য হতে পারে। ব্রতই বলুন, বা বিরতিই বলুন, তা চেতনার দিক পরিবর্তন—সবই এক, কেবল ভিন্ন ভিন্ন নাম।